সতেরো শতকের রাঢ়-বাংলার সমাজ ও সাহিত্য



অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : দ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী। ১৪১ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

মুদ্রাকর : কুশধ্বজ মান্না, মান্না প্রিন্টার্স। ৬৭।এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৬

বাংলা আকাদেমি গ্রন্থ প্রকাশ অনুদান প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ : কৌশিক মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে দেখলে
যে বৃদ্ধের মুখখানি
অনাবিল খুশীর হাসিতে ভরে উঠতো,
আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশায়
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্র :
কৌশিক মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

মানুষের ভাব চিন্তা কর্মে আচরণে যা কিছু অভিব্যক্ত, তার কিছুটা প্রাণিসুলভ সহজাত, আর কিছুটা মননলব্ধ তথা অর্জিত। এই দুই-এর সংমিশ্রণে অবয়ব পায় মানুষের চরিত্র, পরিস্ফুট হয় জীবনাচরণ। কাল প্রবাহে এবং জীবন জীবিকার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে অনুশীলনের স্তরভেদে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির আচার-আচরণ আবর্তিত হয়। নানা পারস্পরিক প্রভাবে মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনা বহুমুখী, বিচিত্রধর্মী, দুর্লভ ও জটিল হয়ে ওঠে। তখন, কারা কাদের প্রভাবে কি হয়েছে, কতোটুকু পেয়েছে, কতোটা হারিয়েছে, তা পরবর্তী কালে নিঃসংশয়ে বলা এবং বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবু, আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে হয়। এবং সন্ধানে, নিদর্শনে, বিশ্লেষণে, প্রমাণে ও অনুমানে যা মেলে, তা দিয়েই মনমতো উত্তর তৈরী করে আমাদের কৌতূহল মেটাই এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো কোনো মানবিক সমস্যার মূলানুসন্ধানে, কারণ নিরূপণে ও সমাধান চিন্তায় সে জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত কাজে লাগাই।

নিরবচ্ছিন্ন কালের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন প্রবাহের এই বিশ্লেষণের সময়ে, আমরা সুবিধার জন্যে কালের পর্ব বা বিভাগ কল্পনা করি। 'শতাব্দ' এই জাতীয় বিভাগের একটি একক মাত্র। এই একান্ত কৃত্রিম অথচ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট এককের মাধ্যমে নিরবধি কালের একটি খণ্ডাংশকে আমরা তার প্রকৃত পরিমাণে উপলব্ধি করতে পারি। তাই, কোনো দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস রচনার সময়ে শতাব্দগত হিসাবই একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থটিও এই রকম একটি বিশেষ শতাব্দকে আশ্রয় করে রচিত। সতেরো শতকের রাঢ়-বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের একটি অনতি-বিস্তারিত অথচ সামগ্রিক সমীক্ষাই আমাদের মূল আলোচনার বিষয়।

এই আলোচনার পরিসর হিসেবে বিশেষভাবে রাঢ় দেশকে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ, রাঢ় হলো বিশাল গৌড়-বঙ্গ অঞ্চলের দ্বার স্বরূপ। এদেশে যতোবার রাজশক্তির পরিবর্তন ঘটেছে, তার প্রথম সূচনা হয়েছে এই রাঢ়েই। রাজনৈতিক পরিবর্তনের অনুবর্তী হয়ে আসে সামাজিক পরিবর্তন। এদেশের সামাজিক ইতিহাসের মর্মে যে স্তরবিন্যাস ও বিকাশের ছাপ, এই রাঢ় অঞ্চলেই তার প্রায় প্রত্যেকটির প্রাথমিক সূচনা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে আধুনিক পূর্ব যুগের সাহিত্য-কৃতিতে রাঢ় অঞ্চলই সর্ব প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই বিশেষ গুরুত্বের জন্যেই রাঢ়দেশ আমাদের বর্তমান আলোচনার পটভূমি। রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। বিশেষতঃ প্রাচীন জনপদগুলির বিভাগ আধুনিক কালের মতো সুনির্দিষ্ট নয়।

সেই হেতু রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমারেখা সম্পর্কে আমরা সে বিতর্কে প্রবেশ না করে ঐতিহাসিক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থের এ সম্পর্কিত মতটি এখানে গ্রহণ করতে পারি। বিস্তৃত আলোচনার পরে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী ভূখণ্ড (মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ) অর্থাৎ আমরা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ বলতে যা বুঝি, তার অধিকাংশই ছিল প্রাচীন রাঢ় জনপদ। আর এই কারণেই বর্তমান গ্রন্থে সর্বত্র আমরা রাঢ়-বাংলা শব্দটিকে গ্রহণ করেছি।

কাল নির্বাচনে সতেরো শতকেরও একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সতেরো শতকের বাংলা সাহিত্যকে ষোলো ও আঠারো শতকের সাহিত্য কর্মের তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হয়। অথচ, এই শতকটি অনিবার্য কারণেই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ। যদিও ষোড়শ শতক বাঙালি জীবনের ছোটোখাটো রেনেসাঁসের যুগ বলে প্রায় সর্বজন গ্রাহ্য একটি মত প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এই রেনেসাঁস একান্তই বৈষ্ণবের। এই প্রাণ প্রাচুর্য শ্রীচৈতন্যদেবেরই দান। তাই, অবৈষ্ণবগণ এই বিপ্লব বন্যায় বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ষোড়শ শতকে অবৈষ্ণবের রচনা বিরল দৃষ্ট। অন্যদিকে সতেরো শতকের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি অনেকাংশে অবৈষ্ণব কবিদেরই লেখনী নিঃসৃত। এই শতকের প্রথম পাদে অবশ্য বৈষ্ণব অবৈষ্ণব নির্বিশেষে অনেক কবিই বাংলা-সাহিত্যের সৌধ নির্মাণে অংশ গ্রহণ করেছেন। ফলে, এই পর্বের বাংলা-সাহিত্য হয়ে উঠেছে অনন্য-সাধারণ। এই পর্বে এমন চারজন কবি তাঁদের কাব্য সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁদের মধ্যে যে কোনো একজন যে কোনো শতকে আত্মপ্রকাশ করলে সেই শতকের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। গোবিন্দদাস কবিরাজ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও কাশীরামদাস—এঁরাই হলেন এই চার দিকপাল কবি। আধুনিক পূর্ব বাংলা সাহিত্যে আর কোনো সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যখন একই সঙ্গে এতজন অমর কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এই সময় মুঘল বাংলার বহির্ব্যাপ্তির অবকাশে রাঢ়ের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যের ইংগিত রয়েছে। মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে বাংলা কখনও স্বাধীন আবার কখনও দিল্লীর অধীন হয়ে অস্থির শতাব্দগুলি অতিক্রম করেছে, সতেরো শতকে সেই বাংলাই অবশেষে কেন্দ্রীয় মুঘল রাজশক্তির সুদৃঢ় রাজনৈতিক স্থিরতার আশ্রয় পেয়েছে। যে যুগে কিছুই সহজে পরিবর্তিত হবার নয়, যখন সাধারণের কাছে ভবনের বাইরের ভুবন ছিল একান্ত অজ্ঞাত, তখন এই সপ্তদশ শতাব্দেই মুঘলের দিল্লী কেন্দ্রিক শাসন ও দরবারী জলুস, বাণিজ্যিক সূত্রে বিভিন্ন বিদেশী পাশ্চাত্য জাতির রাঢ়ে ঘাটি স্থাপন, পাশ্চাত্য বাণিজ্যের সঙ্গে রাঢ় বাসীর ক্রম-বর্ধমান পরিচয়, কেন্দ্রীয় শাসনে উত্তরাপথে প্রাদেশিক রাজ্যসীমার বাধা লুপ্ত হওয়ায় জলপথে ও স্থলপথে কাশী-প্রয়াগাদি তীর্থযাত্রার প্রসার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় কূপমণ্ডুক রাঢ় সমাজের চিত্তে দূরাঞ্চলের সংস্কৃতির প্রাথমিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও এই শতাব্দ রাঢ়ে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। ষোড়শ শতাব্দ যেমন বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ও ব্যাপ্তির কাল, সতেরো শতকে রাঢ়দেশে সুপ্রাচীন শাক্তধর্ম ও শক্তি উপাসনাও তেমনই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হয়। আবার তথাকথিত নীচের তলার ধর্মঠাকুর সমাজের উপর শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে 'মঙ্গল'-কাব্যের বিষয়ীভূত হলেন। রাঢ়ের একাধিক শক্তিমান কবির হাতে পড়ে এই শতাব্দেই এই 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যধারা বিশেষ ভাবে বিকশিত হয়ে উঠলো। এছাড়াও শিবমঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদি অনেকগুলি নতুন কাব্য ধারা এই শতকেই আত্মপ্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের ধারা বেয়ে পীর-সাহিত্যেরও উদ্ভব ঘটে এই শতকেই। একে পরিপূর্ণ সাহিত্যিক গুণমণ্ডিত বলা না গেলেও, রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এর মূল্য অনস্বীকার্য।

সুতরাং কি সমাজ, কি সাহিত্যে রাঢ় দেশের সপ্তদশ শতাব্দ 'মৌলিকতাবর্জিত স্থিতিস্থাপনের কাল'—এরূপ মন্তব্য নির্বিচারে মেনে নেওয়া চলে না।

সাহিত্য সূত্রে সমাজ চিত্র অঙ্কণের কাজ আমাদের দেশে অবশ্যই নতুন নয়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল প্রমুখ পথিকৃৎ পণ্ডিতেরা ছাড়াও ঐতিহাসিক ডক্টর তপন রায় চৌধুরি এবং সাম্প্রতিক কালের ডক্টর গৌতম ভদ্রের মতো আরও অনেকেই অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। অবশ্য সেসব কাজের বেশির ভাগই সমগ্র মধ্যযুগ নিয়ে বিস্তৃত আকারের কাজ। শুধু একটি শতক নিয়ে যে কাজ হয়েছে তার মধ্যেও ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের সমাজ-ইতিহাস নিয়ে যতো কাজ হয়েছে, তুলনায় সতেরো শতক নিয়ে বিস্তৃতভাবে তেমন কোনো কাজ হয়েছে বলে জানা নেই।

এ বিষয় নিয়ে আলোচনার একটি বড়ো প্রতিবন্ধক, উপযুক্ত সূত্রের সংখ্যাল্পতা। আলোচ্য সময়ের সাহিত্যসৃষ্টির যে সমস্ত নিদর্শন আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তাদের অনেকগুলি এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নি। এ সময়ের চিঠিপত্র এবং দলিলপত্র সম্পর্কেও সেই একই কথা। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল রচিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' থেকে আমরা অবশ্য অনেক উপকৃত হয়েছি। এ ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান গবেষণা আমাদের পথ নির্দেশ করেছে। যদিও সমকালীন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সাহিত্যই আমাদের প্রধান উপজীব্য, তবু আলোচনার সুবিধার জন্য সমসাময়িক সাহিত্য, ইতিহাস গ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকেও প্রয়োজন বোধে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে অনেক সময়ে কিছু পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালে রচিত কাব্য থেকেও তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে শেষ অধ্যায়ে বাংলা গদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে, গদ্যের সূচনা ও বিকাশের ধারাটিকে দেখাতে, আঠারো শতকের তারিখ সংবলিত বেশ কিছু গদ্যের নমুনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে। হিন্দু

ও মুসলমান এই দুই ধর্মভিত্তিক পৃথক চেতনার মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাসের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবুকতার ও বাস্তব বিষয়ের আদান প্রদান সম্পর্ক আপনা হতেই গড়ে উঠেছে নানা সময়ে, নানা ভাবে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা এই বিষয় নিয়ে যেটুকু আলোচনা করেছেন, তা সবই সমাজের ওপর তলার সম্পর্ক নিয়ে। কারণ সরকারী দলিল পত্রকে মূলধন করে সমাজের নীচের তলায় পৌছানো সহজসাধ্য নয়। অথচ বাংলা পুঁথিপত্রে সেকালের সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে যে সব তথ্য এখনও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে, তা যে কোনো সরকারী দলিল অপেক্ষা কম মূল্যবান নয়। মোট কথা মধ্যযুগের হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের সব দিক মিলিয়ে যে চিত্রখানি পাওয়া যাচ্ছে সেখানি সম্পূর্ণ সাদাও নয়, আবার কালোও নয়—নানা বর্ণে রঞ্জিত একটি চিত্র। আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকে যার আংশিক রূপটি তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

সে যুগে সমাজ-সংস্কৃতি ছিল স্থানু এবং স্থায়ী কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত। নতুন ভাব চিন্তা সেকালের অশিক্ষায় আচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজে সহজে পৌছানোর উপায় ছিল না। সমাজ পর্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজের ভালো মন্দ মিলিয়ে যে সামগ্রিক রূপ সেটিকেই তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিবাহাদি অনুষ্ঠানের নানা কৃত্য থেকে শুরু করে মৃতের সংকার প্রার্থনা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পারলৌকিক ক্রিয়া কর্মের সঙ্গে সঙ্গে, আলোচ্য শতাব্দে রাঢ়ে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি, রন্ধন-ভোজন, নারী-পুরুষের বসন-ভূষণ, প্রসাধন-অলঙ্কার, নৃত্যগীত, বাজবাজি, ক্রীড়াকৌতুকাদি নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ, নেশা ইত্যাদি বিবিধ ঘরোয়া খুঁটিনাটি ঘিরে আমাদের সপ্তদশ শতাব্দের বিচিত্র জনজীবনের বিচিত্রতর আত্মপ্রকাশের পুঁথি ভিত্তিক একটি চিত্ররূপ এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে—এ বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি।

সাহিত্য আলোচনার পর্যায়ে সতেরো শতকের রাঢ়দেশের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলি অনুসরণ করে কেবল মাত্র উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্যের আলোচনার মাধ্যমে একটি সামগ্রিক সমীক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকজন সম্পূর্ণ নতুন কবির পরিচয় নবাবিষ্কৃত পুঁথি থেকে তুলে ধরা হয়েছে, সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা সম্পূর্ণ নতুন। এই সঙ্গে আরও কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁদের অসম্পূর্ণ কাব্যের মধ্যেই এ পর্যন্ত সব আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদেরও সম্পূর্ণ কাব্যের পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কৃষ্ণরামদাসের 'কালিকামঙ্গলে'র প্রসঙ্গ। এই কাব্যখানি নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ঐসব আলোচনায় এই কাব্যের অসম্পূর্ণ পুঁথি ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ পুঁথি অবলম্বনে কৃষ্ণরামদাসের 'কালিকামঙ্গলে'র পরিচয় দেওয়া গেল। দ্বিজ পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যখানি

সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা চলে। এখানেও আলোচ্য কাব্যের মুদ্রিত গ্রন্থের অতিরিক্ত অংশগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি নবাবিষ্কৃত কাব্য ও তার কবি সম্পর্কে এবং কয়েকটি স্বল্প আলোচিত কাব্য সম্পর্কে অপ্রকাশিত পুঁথি অবলম্বনে যে আলোচনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে দ্বিজ গঙ্গাদাসের 'চণ্ডীমঙ্গল', রাজারামদাসের 'নারায়ণীমঙ্গল', কৃষ্ণরামদাসের 'চণ্ডীমঙ্গল', প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল', যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস' ও ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'।

পুরোনো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাল নির্ধারণ একটি জটিল সমস্যা। এই গ্রন্থে আমরা আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি, মুকুন্দরাম সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে দেশত্যাগ করেছিলেন ও কাব্য রচনা করেছিলেন। ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিষয় থেকে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য ষোড়শ শতাব্দে রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, সেই বিষয়গুলিকে নতুন করে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করা হলো। এ বিষয়ে আমরা ডক্টর সুকুমার সেনের বক্তব্যকে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছি। সেই সঙ্গে আরও একটি কথা বলার আছে যে, ডক্টর ক্ষুদিরাম দাসও মুকুন্দরামের কাব্যকে সতেরো শতকের প্রথম দিকে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'মঙ্গলকাব্য', 'চৈতন্য চরিত', 'বৈষ্ণব চরিতাখ্যান' ইত্যাদি থেকে সমকালীন জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যাদি ইতিপূর্বেই বিভিন্ন যশস্বী গবেষকগণ কর্তৃক নানা গ্রন্থে সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। তাঁদের ব্যবহৃত কাব্যগুলি ছাড়াও সতেরো শতকের আরো অনেক অনালোচিত ও স্বল্প আলোচিত কবিকুলের কাব্যসম্ভার থেকে এই সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্ব আমরা এই গ্রন্থে সংকলন করেছি। এতেও তিন শতাধিক বৎসর পূর্বের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা, চিন্তা চেতনা, জগৎ ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লভ্য হবে না বটে, কিন্তু তথ্যের সঞ্চয় বাড়বে, আলোচনার পরিসরও হবে বিস্তৃতর—এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় আমাদের এই গ্রন্থনা।

পুঁথি থেকে উদ্ধৃত অংশগুলির বানান সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করবার চেষ্ট করা হয়েছে। পুঁথির বানান যথা সম্ভব অবিকৃত রাখা হয়েছে। চিঠি ও দলিল পত্রের ক্ষেত্রে একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। গ্রন্থের পাদটীকা সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। দীর্ঘকাল ধরে বইটির ছাপার কাজ চলায় পাদটীকায় গ্রন্থ নামের উল্লেখের সময়, প্রথম থেকে শেষাবধি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় নি।

গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে নানা সময়ে নানা জনের কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাই ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলের কথা। এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে তিনিই আমাকে উৎসাহিত করেন। গ্রন্থটি রচনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি উপদেশ নির্দেশ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ এবং

উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্ত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের পাণ্ডুলিপিগুলির আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন তৎকালীন উপাচার্য ডক্টর সুরজিৎচন্দ্র সিংহ। এছাড়া ডক্টর সিংহ তাঁর প্রতিষ্ঠিত "রাঢ় গবেষণা ও বিশ্বভারতী সমাজ"-বিষয়ক গবেষণা সংস্থায় আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধের আকারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে 'পুঁথির অলংকরণ'-বিষয়ক দীর্ঘ অধ্যায়টি 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ সাগ্রহে প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য ডক্টর নিমাই সাধন বসু, উক্ত বিষয় সম্পর্কিত একটি আলোচনা কলকাতা দূরদর্শন থেকে প্রচারের সময়, বিশ্বভারতী সংগ্রহের চিত্রিত পুঁথির পাতার আলোক চিত্রগুলি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কয়াল তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বহু মূল্যবান পুঁথি এবং কিছু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত গ্রন্থ সাগ্রহে ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুবর দিব্যজ্যোতি মজুমদারের সক্রিয় সহযোগিতা মনে রাখবার মতো। অণিমা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীদ্বিজদাস কর এই বৃহৎ গ্রন্থখানি যত্ন সহকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে এবং সহকারী শ্রীজগবন্ধু সাহা সে কাজে সহযোগিতা করে আমার ভার লাঘব করেছেন। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার স্বামী, বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষা ভবনের অধ্যাপক শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটি রচনা থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে নিরলস সাহায্য করে এসেছেন। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া এই কাজটি কোনো দিনই সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। তাঁর অবদান গ্রন্থের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে।

আমার অন্যান্য বই-এর মতো এই বইখানিরও প্রচ্ছদ-শিল্পী আমার পুত্র শ্রীকৌশিক মুখোপাধ্যায়।

দীপান্বিতা
পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন

অণিমা মুখোপাধ্যায়

সংকেত-নির্দেশ

সংকেত নির্দেশিত গ্রন্থগুলির লেখক, সংস্করণ ও অন্যান্য বিবরণের জন্যে 'গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য।

অ—অন্ত্যলীলা

অ. পুঁ.—অনাদ্যের পুঁথি

অ. ম.—অভয়া মঙ্গল

আ—আদিলীলা

ঋক্—ঋক্ বেদ

ক. ক. চ.—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

ক. ক. চ. ধ, উ.—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধনপতি উপাখ্যান

ক. বি. পুঁ. সং—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সংখ্যা

কৃ. রা. গ্র.—কবি কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী

ক্ষে. ম.—ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল

গো. বি.—গোর্খ-বিজয়

ঘ. ধ.—ঘনরামের ধর্মমঙ্গল

চি. প. স. চি.—চিঠিপত্রে সমাজচিত্র

চি. ব.—চিন্ময়বঙ্গ

চৈ. চ.—চৈতন্য-চরিতামৃত

চৈ. ভা.—চৈতন্য-ভাগবত

চৈ. ম.—চৈতন্যমঙ্গল

জ. উ. স্মা. গ্র.—জয়ন্তী উৎসব-স্মারক গ্রন্থ

জা. ভে.—জাতিভেদ

দ্র.—দ্রষ্টব্য

ধ. ধ.—ধর্মদাস বণিকের ধর্মমঙ্গল

ধ. পূ. বি.—ধর্মপূজা বিধান

ধ. পূ. প.—ধর্মপূজা পদ্ধতি

ন. পুঁ—নকুণ্ডার আদর্শ পুঁথি

নি. ব. মা.—হি. মু. বি.—নিজাম বক্তৃতামালা—হিন্দু মুসলমানের বিরোধ

প. সং—পত্র সংখ্যা

পা. টী.—পাদটীকা

পুঁ. প.—পুঁথি পরিচয়

পূ. পা.—পূজা-পার্বন

পৃ.—পৃষ্ঠা

বা. ই.—বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব

বা. গ. সা. ই.—বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস

বা. ম. সা.—বাংলার মর্সিয়া সাহিত্য

বা. দে. ই.—বাংলা দেশের ইতিহাস

বা. পু.—বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত

বা. ম. কা. ই.—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

বা. মু. বৈ. ক—বাংলার মুসলমান-ভাবাপন্ন বৈষ্ণব কবি

বা. সা. ই.—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

বা. সা. ই. ১ম। অ—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, অপরার্ধ

বা. সা. গ.—বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য
বি. পা. ম. ম.—বিষ্ণু পালের মনসা মঙ্গল
বি. পি. ম.—বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসা-বিজয়
বি. ভা. পুঁ. সং—বিশ্বভারতী পুঁথি সংখ্যা
বি. ভা. প. সং—বিশ্বভারতী পত্র সংখ্যা
বৈ. র. প্র.—বৈষ্ণব রস প্রকাশ
বৌ. দে.—বৌদ্ধদের দেব-দেবী
ব্রা. রো. ক্যা. সং—ব্রাহ্মণ রোম্যান-ক্যাথলিক সংবাদ
ভা. শ. শা. সা—ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য
ভূ.—ভূমিকা
ম—মধ্যলীলা
ম. বা.—মধ্যযুগে বাঙ্গালা
ম. বা. বা.—মধ্যযুগে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী
ম. বা. ত. কা.—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম
ম. বি.—মনসা বিজয়
ম. সা. স. সং. রূ.—মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ
. গো.—যশোশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস
যা. ধ. পু.—যাদুনাথের ধর্মপুরাণ
র. ম.—রসিকমঙ্গল
র. সা. প. প.—রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
রা. প. ধ. পু—রামাই পণ্ডিতের ধর্ম-পুরাণ
রা. শি.—রামেশ্বরের শিবায়ন
রা. সং.—রাঢ়ের সংস্কৃতি
রূ. ধ.—রূপরামের ধর্মমঙ্গল
শূ. পু.—শূন্য পুরাণ
সা. প. প.—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
সা. প. পুঁ.—সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি
সা. প্র.—সাহিত্য প্রকাশিকা
সী. ধ.—সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল
সী. ভূ.—সীতারামের ভূমিকা (বঙ্কিমচন্দ্র)—স্যার যদুনাথ সরকার লিখিত
সে. শু.—সেক্ শুভোদয়া
হ. রা. ম.—হরিদেবের রায়মঙ্গল
H. O. A. III=History of Aurangzib Vol. III.
H. O. B.=History of Bengal.
L. A. I.=Life in ancient India as depicted in the Jain Canons.

বিষয়-সূচী

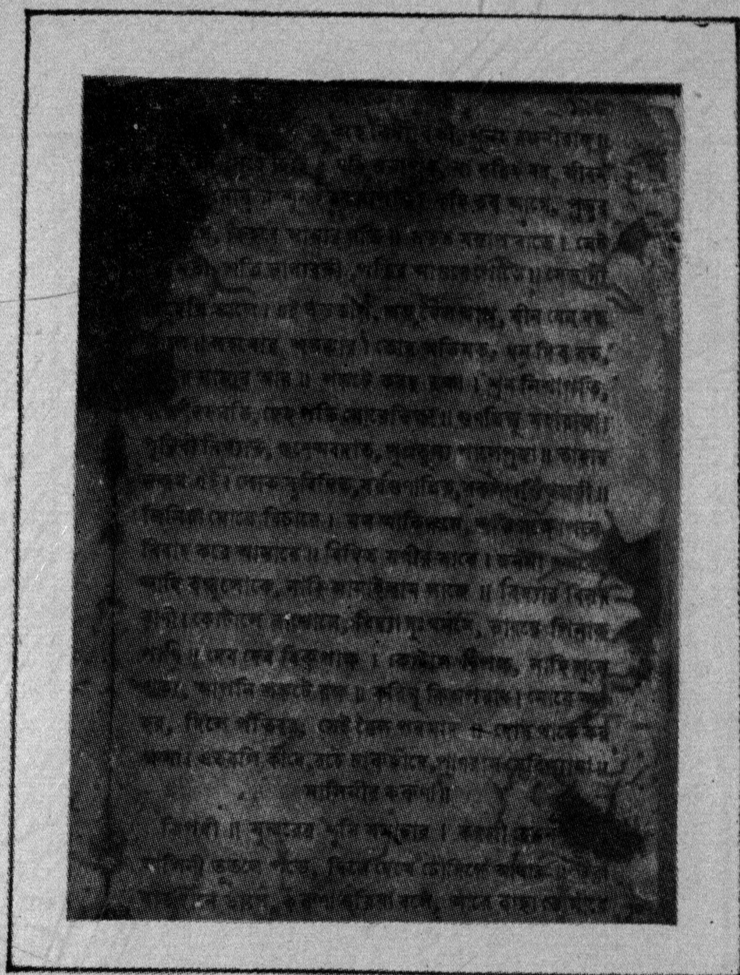
চিত্রক্রম :

সমাজ

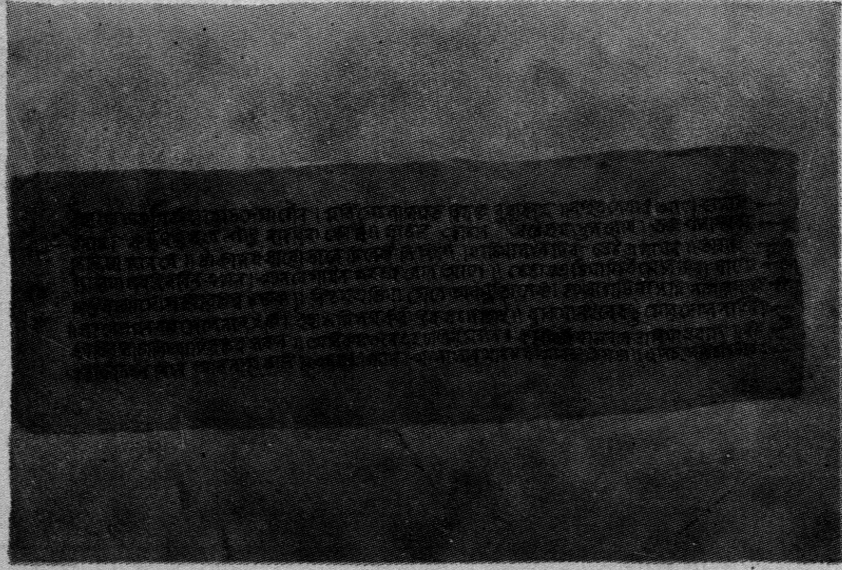
মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীকে প্রদত্ত ভূমি দানপত্র [পৃ ৩৯৪]



৯ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রূপরামের স্মৃতি-বিজড়িত কাঁইতি
শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা শৈলীর শিবমন্দির [পৃ ১২৬]



১২ প্রাণরামের কালিকামঙ্গলের প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের একখানি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি [পৃ ৩৩৩-৩৬]



১৫ কৃষ্ণরামদাসের 'চণ্ডীমঙ্গলের' পুঁথির একখানি পত্রের প্রতিলিপি [পৃ ৩৩৬]

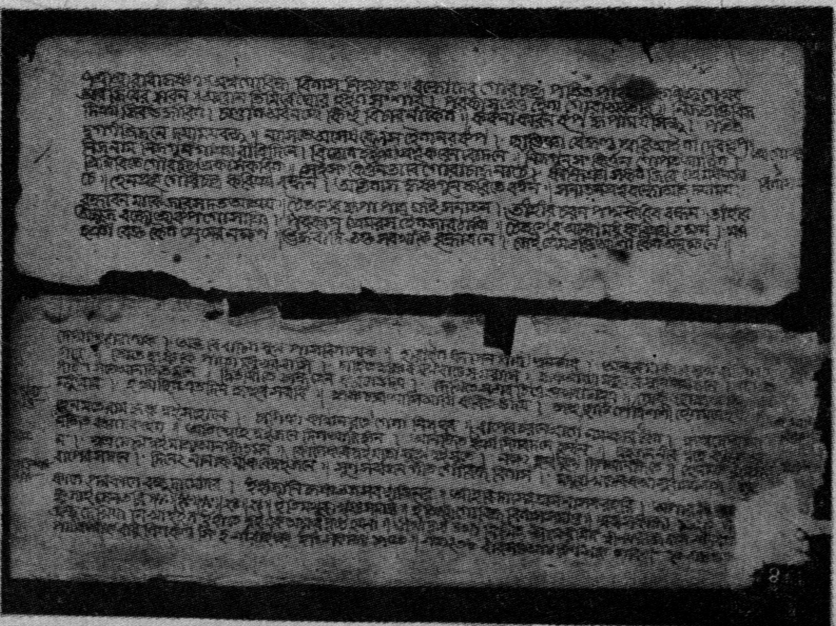
১১ নন্দরামদাসের মহাভারতের পুঁথির একখানি প্রতিলিপি [পৃ ২৯৪-৯৫]



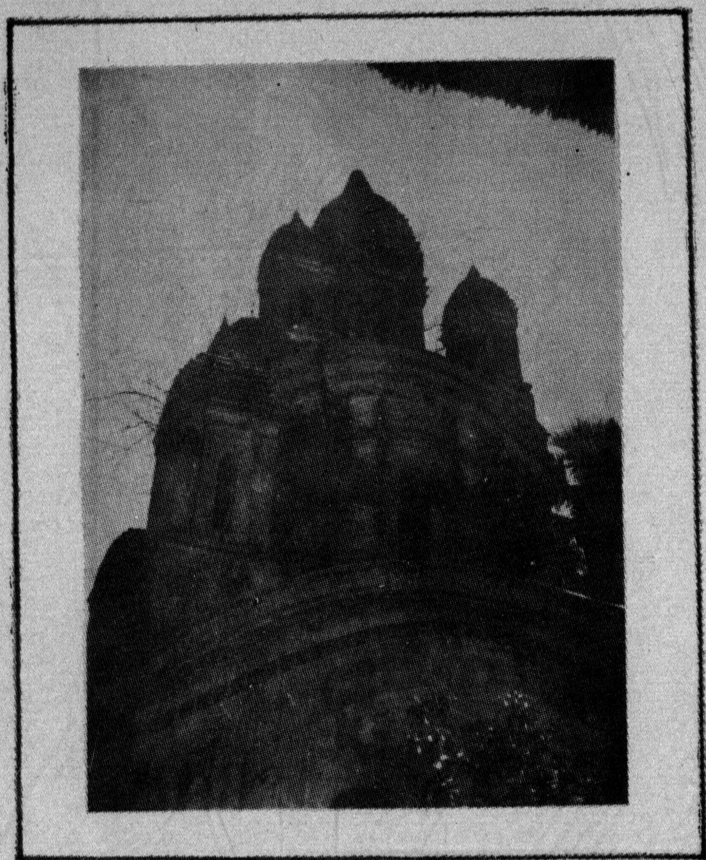




বিভিন্ন চিত্রিত পুঁথির তিনটি পৃষ্ঠা [পৃ ১০৭-১৯]



১৩ যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দ বিলাসের' প্রথম ও শেষ পত্রের প্রতিলিপি [পৃ ৩৫৯ দ্র]



১০ কবি রূপরামের স্মৃতি-বিজড়িত বর্ধমানের দিগ্‌নগর
তাঁতিপাড়ার নবরত্ন মন্দির [পৃ ১২৭]

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

'রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল সুজা
পরম কল্যাণে আছিল ত সব প্রজা ॥'

শতাব্দ-পরিক্রমার সূচনায় তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমির বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। রাজশক্তির উত্থান-পতনে দেশের সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসও কম-বেশি প্রভাবান্বিত হয়। এই কারণে প্রথমেই আমাদের আলোচ্য সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের রাজনৈতিক-ইতিহাসের সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সপ্তদশ শতকের বাংলার ইতিহাস কেন্দ্রীয় মুঘল রাজশক্তির সমৃদ্ধি যুগের ইতিহাস। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবার মতো সুবা-বাংলার শাসনও কেন্দ্রনির্দিষ্ট একটি সর্বভারতীয় নিয়মে পরিচালিত হতো।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ, এই প্রায় বার বছর একাধিকবার সুবাদারী করে রাজা মানসিংহ বাংলাদেশে মুঘল রাজশক্তিকে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর শৌর্য ও বুদ্ধি বলে, ভুঁইয়ারা কেউ কেউ নিহত বা নির্জিত হলেন। অবশ্য অনেকে তখনও সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হন নি। 'বিষ্ণু-পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' রাজা মানসিংহ বাংলা দেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের ছত্র ছায়াতলে আনতে সাহায্য করে, এদেশে এক দীর্ঘস্থায়ী শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত করলেন।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মহামতি সম্রাট আকবরের দেহান্ত হলো। পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। মানসিংহের স্থলে বিশ্বস্ত ধাত্রীপুত্র কুৎবুদ্দীন-খান কোকা বাংলাদেশের সুবাদার নিযুক্ত হলেন। রাঢ়-বর্ধমানের তুর্কী জায়গীরদার শের আফগান নিহত হলেন। তাঁর পত্নী মেহেরুন্নেসা সম্রাট পত্নী হয়ে পরবর্তী কালে ভারত ইতিহাসে 'নূরজাহান' নামে খ্যাত হলেন।

শের-আফগানের হাতে কুৎবুদ্দীনের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুলী খান বাংলাদেশের সুবাদার হয়ে আসেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর জায়গায় ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেন (১৬০৮ জুন)। তখনও কিছু ভূস্বামী স্বাধীন রাজার মতো আচরণ করছিলেন। এর বাইরে অসংখ্য বড়ো ও ছোটো জমিদার এবং বিদ্রোহী পাঠান নায়কেরা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাঢ়ের তিনজন বড়ো জমিদার, মল্লভূম ও বাঁকুড়ার বীর হাম্বীর, এর দক্ষিণ পশ্চিমে

পাঁচেতে শামস্ খান এবং হিজলীতে সেলিম খান—এঁরা মুখে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করলেও, কখনও সুবাদার ইসলাম খানের দরবারে উপস্থিত হতেন না। পরে, অবশ্য বীর হাম্বীর ও সেলিম খান বিনা যুদ্ধে এবং শামস্ খান পক্ষাধিক কাল গুরুতর যুদ্ধ করার পরে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করলেন (১৬১০-১১)। একে একে পূর্ব-বাংলার জমিদাররা, পাঠান উসমান প্রমুখ বিদ্রোহী পাঠান নায়কেরা এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার রামচন্দ্র ইত্যাদি প্রায় সকলেই ইসলাম খানের, তথা মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করলেন (১৬১১-১২)।

এইভাবে ইসলাম খান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এদিকে গঙ্গা নদীর স্রোত পরিবর্তনের ফলে, রাজধানী রাজমহলে বড়ো রণতরীর যাতায়াত বিঘ্নিত হওয়ায়, ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইসলাম খান রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় সুবে-বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। ঢাকার নতুন নামকরণ হলো 'জাহাঙ্গীর-নগর।'

এর এক বছর পরেই ইসলাম খানের মৃত্যু হয়। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ইসলাম খান অদ্ভুত দক্ষতায় ও রাজনীতি জ্ঞানের সাহায্যে বাংলায় মুঘল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের প্রবর্তন করলেন।

ইসলাম খানের মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশিম খান, তাঁর জায়গায় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেন। তাঁর আমলে (১৬১৪-১৭ খ্রীঃ) বাংলায় মুঘল শাসন কিছু পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়লো।

পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম খানের আমলে বাংলায় মুঘলরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই ইব্রাহিম খানের আমলেই সম্রাটপুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং পরাজিত হয়ে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। শাহজাহান রাজমহল দখল করলে, ইব্রাহিম খানের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হলো। ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হলেন এবং শাহজাহান রাজধানী 'জাহাঙ্গীর-নগর' অধিকার করে স্বাধীন রাজার মতো রাজত্ব করতে লাগলেন (১৬২৪ খ্রীঃ)। অবশ্য, কিছুকালের মধ্যেই বাদশাহী ফৌজের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলেন (১৬২৪ খ্রীঃ অক্টোবর)। এর চার বছর পরে, পিতার মৃত্যুর পরে শাহজাহান সম্রাট হলেন।

সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮ খ্রীঃ) থেকে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্রীঃ) বাংলা দেশে মুঘল শাসন মোটামুটি শান্তিতেই পরিচালিত হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিন জন সুবাদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-৫৯ খ্রীঃ), (২) শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৮৮ খ্রীঃ) এবং (৩) ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্সান (১৬৮৮-১৭০৭ খ্রীঃ)। এই যুগে বাংলার কোনও স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। বাংলাদেশের ইতিহাস তখন মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই অংশমাত্র।

শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করা হয়।[১] এই সময়ে সপ্তগ্রামের প্রান্তবাহিনী সরস্বতীর অবস্থা শোচনীয় হওয়ায়, ব্যবসায়ীরা একে একে সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে হুগলীতে এসে ব্যবসায় শুরু করে। ক্রমে অন্য অধিবাসীরাও হুগলী ও গঙ্গাতীরের নানা জায়গায় বসবাস আরম্ভ করে। রাজকীয় অফিস আদালত ইত্যাদি সপ্তগ্রাম থেকে হুগলীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের পূর্বসমৃদ্ধি লুপ্ত হয়। পর্তুগীজদের বাংলা থেকে বিতাড়ণের কিছুদিন পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকে এখানে এসে বাণিজ্য করবার অনুমতি পায়। কিন্তু মুঘল কর্তৃপক্ষ পর্তুগীজদের পূর্ব আচরণের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার দরুণ, প্রথমে ইংরেজদের কোথাও স্থায়ী কুঠি স্থাপন করবার অনুমতি দেন নি। তাঁরা প্রথমে বালেশ্বর অঞ্চলে সমুদ্রতীরে পিপ্‌লী ইত্যাদি স্থানেই ব্যবসায় চালিয়েছিলেন। শেষে, শাহজাহানের পুত্র শুজার অনুগ্রহে দেশের মধ্যে কুঠি স্থাপন করে বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

শুজার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের ফলে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় (১৬৩৯-৫১ খ্রীঃ)। ঢাকা থেকে রাজধানী আবার রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়। সুলতান শুজা সদাশয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি টোডরমলের রাজস্ব-বন্দোবস্ত সংশোধন করেন। চল্লিশ বছরের মুঘল অধিকারে যে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ আয়ত্ত হয়েছিল, নবার্জিত বিভাগগুলি পূর্বতন সরকারে সংযুক্ত করে শুজা যে রাজস্ব বন্দোবস্ত সুস্থির করেন, 'অর্থনৈতিক অবস্থা' অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হবে।

সিংহাসন লাভের জন্যে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে বিবাদের ফলে, শুজা খাজুয়ার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেন (১৬৫৯ খ্রীঃ জানুয়ারী)। মুঘল সেনাপতি মীরজুমলা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে ঢাকা নগরী দখল করলে (১৬৬০ খ্রীঃ মে), শুজা আরাকানে পালিয়ে গেলেন। এর দু বছর পরে, আরাকান রাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হলেন।

পরবর্তী সুবাদার মীরজুমলার (১৬৬১-৬৩ খ্রীঃ) অহোম রাজ্য অভিযানে গিয়ে ফিরে আসার সময় মৃত্যু হলে, প্রায় এক বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসন পর্বে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

১. সপ্তগ্রামের নীচে সরস্বতীর প্রবাহ মন্দীভূত হওয়ায়, পর্তুগীজ বণিক কোম্পানীর লোকেরা বাদশাহের অনুমতি নিয়ে এক কুঠি স্থাপন করে। এখানে ১৫৯৯ খ্রীঃ তাঁরা বাংলার প্রাচীনতম গীর্জা ব্যাণ্ডেল চার্চ স্থাপনা করেন। ব্যাণ্ডেলের পর্তুগীজ কুঠি ক্রমে দুর্গে পরিণত হলো। পর্তুগীজ কোম্পানীর লোক অন্যান্য স্থানের মতো এ-দেশেও সুবিধে পেলেই অত্যাচার করতো। প্রকাশ্যভাবে বোম্বেটে না হলেও এরা বাণিজ্যে জোর জবরদস্তী কোনও সময়েই ত্যাগ করে নি। সময়ে সময়ে লোককে বলপূর্বক খৃষ্টান করাও হতো। স্থানে স্থানে বালক বালিকা ধরে নিয়ে অন্যত্র দাসরূপে বিক্রয় করা হতো। ব্যাণ্ডেলের কাছ দিয়ে ব্যবসায়ীর নৌকা গেলে বলপূর্বক মাশুল আদায় করতো। পর্তুগীজ বোম্বেটেরা এই সময়ে মগেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে ভয়ানক অত্যাচার করছিল। সুবাদার কাশিম খাঁ বাদশাহ শাহজাহানের অনুমতি নিয়ে হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করলেন।

অবশেষে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শায়েস্তা খান্ বাংলাদেশের সুবাদার হয়ে এলেন। মাঝখানে এক বছর বাদ দিয়ে, সুদীর্ঘ বাইশ বছরকাল রাজোচিত ঐশ্বর্য ও জাঁক জমকের সঙ্গে মহাপ্রতাপে শায়েস্তা খাঁ বাংলাদেশ শাসন করেন। সমসাময়িক ইংরেজদের রিপোর্টে শায়েস্তা খাঁর অর্থগৃধ্নুতার উল্লেখ থাকলেও, তাঁর শাসনকালে দেশময় শান্তি, ধনবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। 'টাকায় আটমন চালের' এই নায়ক ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পদত্যাগ করে আগ্রায় ফিরে গেলেন।

পরের বছরের মাঝামাঝি নতুন সুবাদার হলেন ইব্রাহম খাঁ। ইনি পরম ধার্মিক, বৃদ্ধ, কোমল হৃদয় ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। ইনি বই পড়তে ও পণ্ডিতদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন। যুদ্ধবিগ্রহ বা চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। এঁর চেষ্টায় বাংলায় কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হলেও, রাজনৈতিক অ-দূরদর্শিতায় বাংলাদেশে অরাজকতা উপস্থিত হলো। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাদশাহী শাসনের অবনতি, মারাঠা, জাঠ ও রাজপুতের হাতে মুঘল সেনা ও সেনাপতিদের নিগ্রহ এবং বাদশাহের অক্ষমতার সত্য সংবাদ দূর প্রান্ত বঙ্গদেশে পৌছাতে লাগল পল্লবিত হয়ে। ফলে জমিদাররা খাজনা দেওয়া বন্ধ করলেন, ডাকাতেরা দল বেঁধে লুণ্ঠন শুরু করে দিল। শোভাসিংহ ও রহিম আফগানের বিদ্রোহ, বর্ধমান-হুগলী থেকে রাজমহল অবধি ছড়িয়ে পড়লো (১৬৯৬-৯৮ খ্রীঃ)। শেষে ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে পদচ্যুত করে পরবর্তী কালে আজিমুস্সান নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিমুদ্দীনকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করলেন এবং রহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন। জবরদস্ত খান বিদ্রোহী রহিম খানকে পরাজিত করে রাজমহল, মালদহ, মখসুসাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করলেন। শোভাসিংহের আগেই অপঘাতে মৃত্যু হয়। রহিম খান আবার লুঠপাট আরম্ভ করলে এবং সন্ধির প্রস্তাব আলোচনার ছলে সুবাদারের মন্ত্রীকে হত্যা করলে, আজিমুদ্দীনের প্রেরিত সৈন্যবাহিনী রহিম খানকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে।

এই সময়ের অপর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহের সময় কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকেরা সুবাদারের অনুমতি নিয়ে নিজেদের বাণিজ্য কুঠিগুলিকে প্রায় দুর্গের মতো সুরক্ষিত করলো। বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আজিমুদ্দীনের একমাত্র লক্ষ ছিল স্বর্ণখনি বাংলা থেকে নানা অবৈধ উপায়ে এবং প্রজাদের পীড়ন করে অজস্র অর্থ সংগ্রহ করা—যাতে পিতামহের মৃত্যুর পরে সিংহাসন পাওয়ার পথ অন্ততঃ অর্থের বিনিময়ে সুগম হয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে বাংলা ত্যাগ করে আগ্রা রওয়ানা হবার সময়ে আজিমুদ্দীন প্রায় তিন কোটি টাকা সঙ্গে নিয়ে যান বলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে।

চন্দননগরের ফরাসী কুঠিয়ালরা এই সময়কার বাংলাদেশের অবস্থার বিবরণ

সম্বলিত রিপোর্ট তাঁদের প্যারিসের কর্তাদের কাছে পাঠান। ১৬৯৯-১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের চিঠিতে বলা হয়েছে—"শাহজাদা-আজিমুদ্দিন বিদ্রোহীদের দমন করবার পরে প্রাচ্যদেশের প্রথা অনুসারে, লোকেদের রীতিমত শোষণ করা ছাড়া আর কিছুতেই মন দিলেন না। সব কর্মচারী তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য হল। ঔরঙ্গজেবের অতিবার্ধক্য এবং তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে আসন্ন প্রশ্নের ফলে রাজ্যময় অরাজকতা বেড়ে গেল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এই সুযোগে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগল এবং অত্যধিক জোরে আদায় ও অবিচার দ্বারা প্রজাদের দলিত করা ছাড়া আর কিছুই করল না।···শাহজাদা আজিম ও বাদশাহ কর্তৃক অসামান্য ক্ষমতা যুক্ত হয়ে বঙ্গে প্রেরিত নূতন দেওয়ান (মুর্শিদকুলি খাঁ), নিজেই ঘৃণিত লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখালেন এবং প্রজাদের শোষণ করবার কোনো পন্থা থেকেই নিবৃত্ত থাকলেন না।··· সমস্ত প্রদেশটি ক্রমাগত গরীব হতে লাগল। টাকা অধিক হতে অধিকতর দুষ্প্রাপ্য হলো, শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা ধরল। বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।"[১]

সতেরো শতকের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো, তা ঐ শতাব্দীর সমাজ ও সাহিত্যকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, সমাজ ও সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনেক বিষয় সমাজ-সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তবুও যে কোনো দেশের, যে কোনো সময়ের, সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসকে সযত্নে বিশ্লেষণ করলে, তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়। সপ্তদশ শতকের বাংলার বা তার একটি বিশিষ্ট অঞ্চল রাঢ়ের সমাজ-সাহিত্যের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। পরবর্তী আলোচনায় এই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে বলে আশা করি।

সপ্তদশ শতকের বাংলার ইতিহাসে আমরা তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্ব দেখতে পাই। প্রথম পর্বের সময় সীমা, আকবরের রাজত্বের শেষ দিক্ থেকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিক্ পর্যন্ত। এই পর্বে বাংলার ইতিহাসে একটা অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলতার আবহাওয়া বিরাজ করছিল। রাঢ় অঞ্চলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই অনিশ্চয়তা ও শৃঙ্খলাহীনতার প্রভাব তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যেও দেখা যায়। এই সময়কার সমাজ ছিল অনেকটা অবিন্যস্ত ধরনের। হিন্দুরা পূর্ববর্তী শতাব্দীর শেষভাগে রচিত রঘুনন্দনের স্মৃতি শাস্ত্রের বিধান খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে চলছিলেন। প্রতিবেশী মুসলমান সমাজের সংস্পর্শ থেকে তাঁরা দূরে দূরেই থাকতেন। পক্ষান্তরে, মুসলমান সমাজও নিজেদের বাঙালি বা হিন্দুদের আত্মীয়-

১. যদুনাথ সরকার কর্তৃক 'সীতারাম' উপন্যাসের ভূমিকা, পৃ. ১১

বলে মনে করতেন না। বাংলা ভাষাকে তাঁরা বলতেন 'হিন্দুয়ানী' বা 'হিন্দুয়ালী' ভাষা।

সাহিত্যের দিক্ দিয়ে এই পর্বে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে ঠিক্ই, কিন্তু, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো যোগসূত্র বা সমধর্মিতা নেই। এই বইগুলির মধ্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' এবং নরোত্তম দাসের বিবিধ রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লেখকদের প্রত্যেকেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সেই কারণেই এঁদের গ্রন্থগুলি উচ্চাঙ্গের হয়েছে। কিন্তু, আলোচ্য সময়ে এঁদের একত্র আবির্ভাব কতকটা আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এঁরা সাহিত্যের কোনো সমৃদ্ধ ধারার প্রবর্তন করতে পারেন নি, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরে যে সব তত্ত্বাশ্রিত 'চৈতন্যজীবনী' রচিত হয়েছিল, অথবা মুকুন্দরামের পরে যে সব 'চণ্ডীমঙ্গল' রচিত হয়েছিল, কিংবা কাশীরাম দাসের পরে যে সমস্ত বাংলা 'মহাভারত' রচিত হয়েছিল, সেগুলি খুবই নগণ্য ধরনের। এই কবিদের আবির্ভাব সত্ত্বেও এই পর্বের বাংলা সাহিত্য একটি সুস্থির, সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধরূপ লাভ করতে পারে নি।

সপ্তদশ শতকের বাংলা তথা রাঢ়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষভাগ থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রসারিত। এই পর্বে, দেশে প্রায় পরিপূর্ণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যেও তার পরিপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়। বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই পর্বে অনেক কাছাকাছি এসেছিল। ফলে, একটা অখণ্ড বাঙালি জাতি গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। হিন্দুরা সমাজের আভ্যন্তরীণ বন্ধনকে অবশ্য শিথিল করেন নি, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাঁরা আগের চাইতে অনেক বেশী মেলামেশা করতেন। মুসলমানরাও হিন্দুদের আর ততটা পর বলে মনে করতেন না। এটাও লক্ষণীয়, এই পর্বে বাঙালি মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলাই তাঁদের মাতৃভাষা। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুস্থ আবহাওয়া দেখা যায়।

এই পর্বে, বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি শক্তিশালী শাখা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মঙ্গলকাব্যের 'ধর্মমঙ্গল' শাখা। বহু শক্তিশালী কবি আলোচ্য সময়ে 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেছিলেন। অপর দুটি উল্লেখযোগ্য শাখা হলো, 'কালিকামঙ্গল' ও 'রায়মঙ্গল'। প্রাণরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস, বলরাম কবিশেখর প্রমুখ শক্তিশালী কবিগণ এই পর্বে আবির্ভূত হন। বৈষ্ণব সাহিত্যের 'পদাবলী' ও 'চরিত-সাহিত্যে'র ধারা ইতিমধ্যে বিশুষ্ক হয়ে এসেছিল, কিন্তু আলোচ্য পর্বে বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি নতুন ও শক্তিশালী শাখা আত্মপ্রকাশ করলো। সেটি হলো, রসপর্যায় অনুসারে বিভক্ত 'পদসংকলন'-গ্রন্থের ধারা। এই ধারার প্রথম

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার, রামগোপাল দাস ও তাঁর পুত্র পিতাম্বর দাস এই পর্বেরই লোক। বাংলা 'শিবায়ণ'-কাব্যের আবির্ভাবও এই পর্বেই ঘটেছিল।

এ পর্যন্ত আমরা বাংলা সাহিত্যের যে-সমস্ত নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করলাম, তাদের অধিকাংশ রাঢ়েই রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের তৃতীয় পর্বের গোড়ার দিকে, ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা ও হিন্দুবিদ্বেষী নীতি পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত হয়। এই পর্বের শেষ দিকে, ঔরঙ্গজেবের আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনাকে উপলক্ষ করে যে থমথমে ভাব দেখা দিয়েছিল, তার ফলে দেশের আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক আবহাওয়ার এই প্রভাব, এই পর্বের সমাজে ও সাহিত্যেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

সমাজের ক্ষেত্রে দেখি, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আবার অনৈক্য বা বিভেদ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া এই সময়ে সমাজে নানারকম ব্যভিচার ও দুর্নীতির বাড়াবাড়ি ঘটেছিল। এই পর্বের সাহিত্যেরও মানের অবনতি দেখা যায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতো এই পর্বের সাহিত্যও হয়ে উঠেছে মালিন্য যুক্ত। এমন বহু গ্রন্থ এই পর্বে রচিত হয়েছিল যে গুলি সাময়িক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, আসলে তাদের মধ্যে তেমন কোনো সারবস্তু নেই। যেমন শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রথম দিক্‌কার রচনাবলী এবং অখ্যাত লৌকিক দেবদেবীদের মাহাত্ম্য অবলম্বনে রচিত রাশি রাশি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর মঙ্গলকাব্যসমূহ।

এই পর্বের বহু রচনার মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতার বাড়াবাড়ি দেখা যায়। সমাজে যে গ্লানি ও দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, এই পর্বের সাহিত্যেও তার প্রতিফলন পড়েছে। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং শিবঠাকুরকেও অতিমাত্রায় চরিত্রহীন ও 'নীচজাতিয়া' স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তরূপে দেখানো হয়েছে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর যে অশ্লীলতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায়, তারও সূচনা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক

'না মিলে পরম ব্রহ্ম হলে দ্বৈত জ্ঞান।
এক উপাসনা করে হিন্দু মুসলমান ॥
কেহ বন্দে সত্যপীর কেহ নারায়ণ।'

॥ **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে** ॥ ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলায় প্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলেও, ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিক্‌ই বাংলায় প্রকৃত মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের সক্রিয় যুগ। এই সময় থেকেই ইসলামী গাজী এবং সন্তগণ বাংলার ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রম বর্ধমান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। মধ্যযুগীয় বাংলার এই সকল সন্ন্যাসী যোদ্ধারা ছিলেন খৃষ্টের সমাধি-রক্ষাকারী যোদ্ধবর্গের মত ইসলামের রক্ষাকর্তা। মুসলমান শাসকের তরবারি যখন দিকে দিকে বিদ্যুৎ-শিখায় ঝল্‌সিয়ে উঠতে লাগলো, তখন এই সব ধর্মপ্রাণ ফকিরেরা নেমে পড়লেন আসরে, বিধর্মীদের ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় এনে তাদের কল্যাণ সাধনের ব্রত নিয়ে। কিন্তু এই ফকীরেরা অহিংসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তাঁদের কোরাণ আর তরবারি চলতো পাশাপাশি। এই সন্তগণ হিন্দুরাজ্য সীমায় যে কোনো ছল ছুতোয় প্রবেশ করে বসবাস করতেন। পরে, হিন্দুদের কাছে মহাপাপ বলে বিবেচিত গো-হত্যাদি কাজে বাধা পেয়ে, 'ইসলাম অধিকার' লঙ্ঘনের অভিযোগে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্যে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং পেশাদারি সৈনিক আমদানি করে হিন্দু রাজ্যটি অধিকার করে নিতেন। আর এক শ্রেণীর সাধু ছিলেন, তাঁরা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকের কাছে হিন্দু শাস্ত্রের ও অনুষ্ঠানের নিন্দা করে তাঁদের ধর্মান্তরিত করতেন। এই ভাবে জঙ্গী রাজনৈতিক জয়ের এক শতাব্দী পরে শুরু হয়, গাজী ও সন্ত কর্তৃক আত্মিক জয়ের চেষ্টা। যে মঠ ও মন্দিরগুলি পূর্বে শুধুমাত্র সম্পদের লোভে ধ্বংস করা হয়েছিল, এখন তার ওপর দরগাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করে, হিন্দু ও বৌদ্ধ গাথা থেকে হুবহু সংগ্রহ করা নানা রকম গল্পের সাহায্যে, এঁরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে লাগলেন। মুসলিম সন্তদের হিন্দুদের স্থানে অনধিকার প্রবেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, রাজগীরের 'শৃঙ্গ-ঋষি কুণ্ডে'র 'মখ্‌দমকুণ্ডে' রূপান্তর, এবং আলৌকিক-কৃতী ভগবান্‌ বুদ্ধের দেবদত্ত কাহিনীকে শ্রদ্ধেয় মুসলিম সন্ত মকদুম্‌ সাহেবের কাহিনীতে অনুবাদ।[১]

১. H. O. B. V. 11. P. 69-70.

এই সময়ে এদেশের জনগণ, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে সহজিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। তুর্কী বিজেতাগণ এই সব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অধিকৃত করলেন এবং তাঁদের সমাজে নিজেদের মৌলিক আরবীয় প্রথা এবং রীতিনীতি প্রচলিত করলেন। দেশীয় ধর্মাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায় এবং আচার আচরণকে ইসলামী প্রভাবের আওতায় নিয়ে এলেন। পণ্ডিতগণ বলেন[১], এই ভাবে স্থবিরগণের চৈত্যপূজার ইসলামীকরণ হয়েছিল এবং সেগুলি পীর সাহেবদের দরগাহ্-পূজায় রূপান্তরিত হলো।

বস্তুতঃ, ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার প্রধানতঃ দুটি ভিন্ন পথ বা পদ্ধতিকে অনুসরণ করে চলছিল, 'তুর্কানা পদ্ধতি' ও 'সুফিয়ানা পদ্ধতি'। তুর্ক সেনার দল 'জিতলে গাজী, মরলে শহীদ', এই নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতো। তাদের কাছে হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা, মঠ ও মন্দির ধ্বংস করা, আর সেই বিচূর্ণ দেবালয়গুলির পাথর নিয়ে মসজিদ তৈরী করা, কাফের বধ করা, এ সবই ছিল অত্যন্ত পুণ্যকর্ম। কিন্তু, এই নীতি বেশিদিন চললো না। কারণ, অপর পক্ষের বাধাও প্রবল হতে লাগলো। প্রথম দিকে হিন্দুরা বিনা প্রতিবাদে মার খেলেও ক্রমশঃ তাদের মধ্যেও একটা আত্মরক্ষা জনিত প্রতিরোধ গড়ে উঠতে লাগলো। এতকাল আমরা দেখেছি—

'দেউল দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়।
হাতে প্রাণ কর‍্যা কত দেয়াসি পালায়॥[২]

হিন্দুদের এই ভীত-সন্ত্রস্ত পলায়নী মনোবৃত্তিই একমাত্র সত্য নয়। তারাও রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। সপ্তদশ শতকের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে এই প্রতিরোধের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় 'হাসন-হোসেন পালায়'। সেখানে দেখা যায় মনসা পূজায় বাধাসৃষ্টিকারী 'নেড়ার' প্রতি রাখালদের প্রধান—

"বাসু বলে আরে নর‍্যা : নাড়া বেটায় দেহ মার‍্যা :
কানে ধর‍্যা দেহ গোছমান।
আমার বচন ধর : টাকায়্যা টাকায়্যা মার :
কি করিবে হাসন হুসন॥
... ...
ধরিয়া বেটার ঘার : বজ্র মুটিকা মার :
টিকরে টাকরে ভাঙ্গ খুলি।[৩]

অতঃপর, রাখালে ধরিল তারে বেড়্যা।
মারিয়া মুদ্গর বাড়ি॥

১. আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—সে. শু. ভূ. দ্রঃ।
২. বি, ভা, পু, সং ১২৯।
৩. বি, ভা, পু, সং, ২৮৬ [পৃ, ৯২৫]।

বালা পাগড়ি নিল কাড়ি।
টাকরে টাকরে গেল ছিড়ি॥
টাক্যা হইল রক্ত বর্ণ।
মুচড়ে ছিড়িল কন্ন ॥[১]

যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসাবিজয়'-কাব্যে যে 'হাসন-হোসেন পালা' বর্ণিত হয়েছে, তাতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবু, পঞ্চদশ শতকের বর্ণনার সঙ্গে সপ্তদশ শতকের বর্ণনার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিপ্রদাসের কাব্যে, কারণে অকারণে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের যে মারমুখী ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে, কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে তা দুর্লক্ষ্য। এর কারণ, বিভিন্ন সূত্রে দেখা যায়, হিন্দুদের দেখা মাত্রই আক্রমণের সেই তীক্ষ্ণ ভঙ্গী পরবর্তী কালে স্তিমিত হয়ে আসে। কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে হাসনের চর 'আত্মা' রাখালদের পুজো করতে দেখেই মারমুখী হয় নি। বরং, তাদের হাসনের ভয় দেখিয়ে নিষেধ করবার দিকেই তার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রাখালদের হাতে প্রহৃত হয়ে হাসন-হোসেনের কাছে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে। সেই সঙ্গে 'কচুয়ার তটে' পরমা সুন্দরী কামিনী-রূপী দেবী মনসার উপস্থিতিও জ্ঞাপন করে। তখন হাসন-হোসেন রাখালদের শাস্তি বিধান অপেক্ষা সুন্দরী কামিনী দর্শনে অধিক উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, 'কচুয়ার তটে' গিয়ে "কামিনী না দেখি হইল স্থকিত রাজন"[২]। তারপর হিন্দুদের তরফের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দ্বিমুখী আক্রমণে পলায়নপর হাসন-হোসেন দেবীর আদেশানুসারে মসজিদ ভেঙ্গে 'দেউলের পিড়া'[৩] নির্মাণ করে দিয়ে রক্ষা পায়। সপ্তদশ শতকের অপর কবি বিষ্ণু পালের 'মনসামঙ্গলের' 'হাসন-হোসেন' পালায়ও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪]

কোহবর ভাঙ্গিয়া দেওল বসায়া দিব
পূজা নামে দিবেন ব্রাহ্মণ॥

মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধের প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক কাজীদলনের ঘটনাটিও মনে করা যায়। সুতরাং মুসলমানরা পীড়ন করেছে, আর হিন্দুরা বিনা প্রতিবাদে উৎপীড়িত হয়েছে, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে প্রবল রাজশক্তির তুলনায় এই প্রতিরোধ নিতান্তই নগণ্য।

এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে হিন্দুদের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শুরু হয়, 'সুফীয়ানা পদ্ধতিতে' ইসলাম প্রচার। কিন্তু, সুফীগণ অবিশ্বাসী কাফেরদের বিধর্মী-পনা ঘুচিয়ে তাদের ইসলামের দীক্ষা দিয়ে বশ করতে গিয়ে দীর্ঘকালের হিন্দুপ্রভাবে কালক্রমে নিজেরাই বশীভূত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা ত্রিবেণীর 'জাফর খাঁ

১. বি, ভা, পু, সং ৯৮৬। [পৃ. ৯২খ—৯৩ক]
২. ঐ [পৃ. ৯৮ক]।
৩. ঐ [পৃ. ১১২খ]
৪. [বি, ম, পৃ, ৪১] কোহবর = কবর ?

গাজীর' কথা স্মরণ করতে পারি। যিনি প্রথম জীবনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'গাজী' উপাধি লাভ করেন, এবং ১২৯২ সালে ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম জয়ের পরেই স্থানীয় প্রস্তর নির্মিত হিন্দু বিষ্ণু মন্দিরটি ধ্বংস করে, তার উপরে মসজিদ প্রস্তুত করান।[১] কিন্তু এদেশের হিন্দুদের মুসলিম-ধর্মে দীক্ষিত করবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন হলেও, 'জাফর খাঁ' কালক্রমে হিন্দু রমণী বিবাহ করে, পরিবেশের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তী জীবনে একটি গঙ্গাস্তোত্রও রচনা করেন বলে শোনা যায়[২]। বাংলা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের 'দিক্-বন্দনা'-অংশে তাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, পরবর্তী জীবনে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল লোকের তিনি পূজনীয় হয়ে উঠেছিলেন।

প্রাক্ মুঘল যুগে মুসলিম রাজত্বকালে অনেক হিন্দু কর্মচারীকে সুলতানদের মন্ত্রী, অমাত্য ও চিকিৎসকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করার কথা জানা যায়। সুতরাং সেই যুগের সব মুসলিম শাসন কর্তাই ধর্মান্ধ ছিলেন, একথা বলা চলে না। সপ্তদশ শতকে আকবর, জাহাঙ্গীর এবং তাঁদের অধীনস্থ অনেক সুবাদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ও জনপ্রিয় ছিলেন। প্রচণ্ড রকমের ধর্মান্ধ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবকে সমসাময়িক সব হিন্দুই অপছন্দ করতেন না। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যে ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে 'রাম রাজা সর্ব জনে বলে'—বলে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণরাম দাস যে অঞ্চলে বাস করতেন, সে অঞ্চলে ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা বা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জের পৌঁছোয় নি। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল' রচনার সময়েও (১৬৭৬ খৃঃ) ঔরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, এই সময়ে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে যথেষ্ট জটিলতা ছিল। কোনো কোনো সম্রাট্ বা সুবাদারের ধর্মান্ধ নীতির দরুণ হিন্দুরা জর্জরিত হতো। আবার কোনো কোনো আঞ্চলিক শাসনকর্তা উদার মতাবলম্বী হওয়ার দরুণ, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির সঙ্কীর্ণ নীতি সবক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে নি। তবে, তাঁরা যে সব সময় সফল হয়েছেন, তাও বলা যায় না। চরদের মাধ্যমে খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি তাঁদের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করতেন। সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে ঔরঙ্গজেব মখসুদাবাদের সরকারী সংবাদ লেখক 'মীর মুহম্মদ আসান'কে পত্র লিখে কৈফিয়ৎ তলব করেন, যে উক্ত অঞ্চলে প্রয়াগদাস ও মথুরামল নামক দুজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ, প্রস্তর মূর্তি গড়িয়ে মন্দির স্থাপনা করেছেন; সে-সংবাদ তিনি কেন বাদশাহকে জানান নি। এবং তাকে তিনি আজ্ঞা দেন অবিলম্বে উক্ত দলের শাস্তি বিধান করে, মন্দির ভেঙ্গে ফেলে, সেই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে।[৩] এর থেকে বোঝা যায় ঔরঙ্গজেব যে নিজে শুধু ধর্মান্ধ ছিলেন তাই নয়, তাঁর অধীনস্থ শাসন কর্তারা সকলেই কেন অনুরূপ ধর্মান্ধ নন, প্রয়োজন হলে তার

১. বি, ভা, প, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সং।
২. ঐ।
৩. যদুনাথ সরকারের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসের ভূমিকা, পৃ. ১৪ দ্রঃ।

কৈফিয়তও তলব করতেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের অবস্থা কেমন ছিল, তা বলা কঠিন। শাহজাহানের দৃষ্টিভঙ্গী মোটামুটি সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ছিল। তবে তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে তাঁর উদার মনোভাবসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা, কার্যত শাসনকর্তা ছিলেন। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজা কুড়ি বছর (১৬৩৯-৫৯) বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনিও তেমন কট্টর সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না। সুতরাং শাহজাহানের নিজস্ব ধর্মনীতি তাঁর প্রজাদের, অন্তত বাংলার প্রজাদের খুব বেশী স্পর্শ করে নি। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার হিন্দুরা রাজশক্তির কাছে উদার ব্যবহারই পেয়েছে।

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃ-প্রবর্তন করেন। ইতিপূর্বে আকবর এই কর তুলে দিয়েছিলেন। এই কর শিশু, স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস, নিঃস্ব ও অসুস্থ লোক ছাড়া প্রত্যেকের কাছ থেকেই আদায় করা হতো। এই কর দেবার সময় করদাতাকে স্বয়ং গিয়ে কর সংগ্রাহকের কাছে পায়ে হেঁটে হাজির হয়ে, মাথা নত করে, কর দিতে হতো।[১] ঔরঙ্গজেব কর আদায়ের সময় মোটামুটি আকবরের আগেকার নিয়মকানুনই বজায় রেখেছিলেন। তবে চক্ষুলজ্জার খাতিরে তিনি এই নিয়ম করেছিলেন, আগে যেমন করদাতাকে 'কাফের' বলে সম্বোধন করা হতো, তা আর করা হবে না। তার পরিবর্তে 'অ-মুসলমান' বলা হবে।[২] সপ্তদশ শতকের শেষ একুশ বছর, বাঙালি হিন্দুকে এই অপমানজনক কর দিতে হয়েছে। অন্য দিকে ঔরঙ্গজেব একবার (১৬৬৭ খ্রীঃ) মুসলীম ব্যবসায়ীদের ওপর থেকে বাণিজ্য-শুল্ক তুলে দেন।[৩] ফলে হিন্দু ব্যবসায়ীরা মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে, ব্যবসায় চালিয়ে কর ফাঁকি দেবার উপায় করে নেয়। এর থেকে বোঝা যায়, সপ্তদশ শতকের রাজশক্তির নীতি যাই হোক না কেন, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনেক সময়েই একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতো। তবে সাধারণ স্তরে যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য যে, দুটি জাতির মধ্যে তলোয়ারের সম্পর্ক যদি একবার গড়ে ওঠে তবে সেই তলোয়ারকে কোষবদ্ধ করা বড়ো সহজ নয়। তাই 'তুর্কানা পদ্ধতি' কোনদিনই একেবারে লুপ্ত হয় নি। আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু পরিচয় মেলে।

।। **সাহিত্যের ক্ষেত্রে** ।। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'গ্রন্থোৎপত্তি' অংশে রাজকর্মচারীর অত্যাচারের প্রভৃত বর্ণনা থাকলেও, হিন্দু মুসলমানের প্রত্যক্ষ বিরোধের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। উপরন্তু সেখানে এই 'তুর্কানা পদ্ধতিকে' 'প্রজার পাপের ফল' হিসাবে সহজেই গ্রহণ করতে দেখা যায়। অন্যদিকে এই বিধর্মী শাসকের সঙ্গে শাসিতের দূরত্ব লোপ পেয়ে কতকাংশে রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে সমাজে আবির্ভূত হন 'ধর্মঠাকুর'। সপ্তদশ শতকের সাহিত্যে একদিকে

১. H. O. A. V. 3 P. 306
২. Ibid. P. 305
৩. Ibid. P. 313

যেমন ধর্মঠাকুর 'যবন রূপে দিল্লীয়ে বৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালি',[১] অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-কর্তৃক নিগৃহীত নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাছে, 'বামনে যবন করে তুনিয়ার নাথ'।[২] সপ্তদশ শতকের অপর কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পরমেশ্বর অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বর রূপে মর্তে আবির্ভূত হন।

অর্দ্ধেক মাথায় কালা এক ভাগা চুড়া টালা
বনমালা ছিলমিনী তাতে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধ নীল মেঘপ্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে॥

এই সমন্বয়ের কালে মুসলমানরাও প্রচার করতে লাগলেন—'যেই রাম সেই রহিম দুন এক'।[৩]

হিন্দু মুসলমানের মিলন চেষ্টায় যে সব নতুন ভাবধারা ও দেব-দেবীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে, তার মধ্যে সত্যপীরের বিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছোটো বড়ো জানা-অজানা অসংখ্য কবি সত্যদেবের মহিমাকীর্তন করে পাঁচালী কাব্য রচনা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেই সত্যপীরের উপাসনা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। কারণ, এই শতাব্দী থেকেই 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচিত হতে দেখা যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই সত্যপীর, তথা সত্যনারায়ণের উপাসনা করতো, আজও করে। সত্যপীর সত্যনারায়ণের পূর্বরূপ, না উত্তররূপ, সে বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে, 'সত্যপীর' নামের প্রথম অংশ (সত্য) হিন্দু সংস্কৃতি থেকে এবং শেষাংশ (পীর) মুসলিম সংস্কৃতি থেকে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে সত্যপীর হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির মিলন প্রচেষ্টার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই তাঁর 'পাঁচালী' রচনা করেছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, অনেক হিন্দু লেখক[৪] যেমন সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছেন, অনেক মুসলমান লেখক[৫] বা কবিও তেমনি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছেন। আবার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব পাঁচালীকারই গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা করে তারপর পীরের বন্দনা করে পাঁচালী শুরু করেছেন।

ফকির রামের 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'তে পাই—

'জেই রাম সেই রহিম দুন এক।
রাম আর কেশন বেসন সভি হাম।

১. বা, ধ, পু, পৃ. ৭।
২. রা, প, ধ, পু। পুঁ, প, ১ম, পৃ. ৮৪।
৩. ফকির রামের সত্যনারায়ণ পাঁচালী—বি, ভা, পুঁ, সং ২৬০৪।
৪. দ্বিজ রামপ্রসাদ ও বিদ্যাপতি—বি, ভা, পুঁ, সং যথাক্রমে ১৫৯ ও ৬০৯৯।
৫. ফকির রাম, সেখ ফয়জুল্লা ইত্যাদি।

যে সব সুনহ বাবা সভি মেরা নাম' ॥[১]

অন্য দিকে বিদ্যাপতি তাঁর 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে পীরের পায়ে একাধিকবার 'হাজার সালাম' নিবেদন করে বলেছেন—

'রাম রহিমান জান কিছু ভেদ নাই।
বেদ কলেমা দেখ এক বরাবর ॥
সেই শর্ত্তপির হয় শভার ঈশ্বর'।[২]

দ্বিজ রামপ্রসাদের 'সত্যপীর ব্রতকথা'য়[৩] সত্যনারায়ণই 'ফকীর বেশ' ও 'যবন আচার' গ্রহণ করে গৌড়রাজ্যের 'বিষ্ণুব্রহ্মা'কে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন। এছাড়া, অজ্ঞাত লেখকের ভূমিকায় পাওয়া যায়[৪]—

'না মিলে পরম ব্রহ্ম হলে দ্বৈত জ্ঞান।
এক উপাসনা করে হিন্দু মুসলমান ॥
কেহ বন্দে সত্যপীর কেহ নারায়ণ।'

আরও পরবর্তী কালে দেখা যায়, মাণিক পীরের মাণিক, স্বয়ং হিন্দুর ধর্মঠাকুর ও যবনের অর্ধ-নারীশ্বর দেবতা হয়ে এই মিলনের পথই ত্বরান্বিত করেছেন—

'হিন্দুকুলে বলাইল্য স্বরূপ নারায়ণ।
জবন কুলে বলাও নাম সক্তি গুলপান' ॥[৫]

এরই পরিণতি হিসাবে আমরা অপ্রত্যাশিত ভাবে পাই আল্লার ওপরে হিন্দু-দেবতার স্থান—

প্রথমে বন্দিনু দেব গজেন্দ্র বদন।
আল্লার কদন বন্দো হয়ে একমন ॥[৬]

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রচিত জয়রদ্দির 'মানিক পীরের জহুরানামা' এই সমন্বয় সাধনের পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে।

সেখানে দেখা যায় মুসলমান এসে দেখলেন ত্রিবেণী তীর্থে 'ব্রহ্মার জননী' স্বয়ং গঙ্গাদেবী অবতীর্ণা। মুনি ঋষিগণ 'দ্বাদশ বৎসর' যাবৎ তপস্যায় মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নয়ন-মন চঞ্চল হওয়ায় গঙ্গার দর্শন মেলে না। তখন 'নেড়িয়া ফকির' রূপা আল্লার বান্দা তয় বদরের সঙ্গে হিন্দু 'পাদ্রিগণে'র বচসা হওয়ায় ক্রুদ্ধ বদর উজু করে বাঘছাল পেতে তপস্যায় বসে 'শুদ্ধমনে' গঙ্গাকে তাঁর 'বড়ভাই' রূপে ডাকতে লাগলেন। বদরের 'জাহিরিতে' গঙ্গার আবির্ভাব ঘটল এবং গঙ্গার হস্ত দর্শনে পাদ্রিগণ চতুর্ভূজ হয়ে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। তখন 'গঙ্গামাই'র পাদপদ্মের গুণ দর্শণার্থে বদর

১. বি. ভা. পুঁ, সং ২৬০০।
২. বি. ভা. পু, সং ২৬৯৯। [পৃ ৪ক]
৩. ঐ সং ১৫৯।
৪. ঐ সং ১৬৬৯। [পৃ. ৭খ]
৫. পুঁ, প, ২য়, পৃ. ৩১১।
৬. ঐ পৃ. ৩২০।

আবার আরাধনা করতে লাগলেন। কিন্তু যবনকে গঙ্গামাতা দেখা দিতে চান না। শেষে, গঙ্গার সঙ্গে চুক্তি হল, তাঁর সপ্তঢেউ-এর বেগ সহ্য করতে পারলে, তবেই দর্শন মিলবে। শেষ পর্যন্ত বদরেরই জয় হল। বদরের ঝোলায় গঙ্গা প্রবেশ করলেন এবং পরে রইলেন। এদিকে 'জহুরা জাহির কারণে' বদর দরিয়া উপরে পাট চাষ করলেন। একদিনে অঙ্কুর এবং সাতদিনে ডালে মূলে ফলে ফুলে ভরে উঠল। বদর পাট-শাক রান্না করে আল্লাকে নিবেদন করলেন। এদিকে বদরের ঝোলাতে ক্লান্ত গঙ্গা বদরকে পূর্ব জন্মের 'বড় ভাই' বলে স্বীকার করলে ঝোলার মুখ খুলে দেন এবং বদর 'সেতুবন্ধ' থেকে পাথর এনে দেবেন ত্রিবেণীতে, আর এক জহুরা জাহির করবার জন্য, এই সর্তে গঙ্গা মুক্তি লাভ করলেন। বদরের অনুরোধ এড়াতে না পেরে গঙ্গা 'সেতুবন্ধ' থেকে পাথর এনে দিলেন আর বিশ্বকর্মা রাজী হলেন 'বাড়ি মসিদ' গঠন করতে।

হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ঐতিহ্যের এবং হাজার বছর ধরে টিকে থাকা হিন্দু সংস্কৃতির বিশ্বগ্রাসী অশরীরী অধ্যাত্ম চিন্তা বিধর্মী বিজয়ী তুর্কী বীরদের আত্মকবলিত করে সমন্বয় সাধনের পথে অগ্রসরের সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় জয়রদ্দির রচিত এই অজ্ঞাত-পূর্ব আখ্যায়িকা 'মাণিক পীরের জহুরানামায়'।

ইসলামি ঐতিহ্য অনুসৃত মহরমকে কেন্দ্র করে যে 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর সাহিত্য ধারা সপ্তদশ শতাব্দ থেকে প্রবহমান, তার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ বাংলা, তেমনি পর্ব-বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ, নামকরণ, এমন কি ছন্দ-অলংকারের ওপর পর্যন্ত হিন্দু কবিকুলের প্রভাব সুস্পষ্ট। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'হরিবংশ'-এর অনুসরণে সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ', 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর অনুসরণে আলোচ্য শতকের শেষার্ধে জৈনুদ্দিন-রচিত 'রসুলবিজয়' —এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।[১] আবার এই জঙ্গনামা শ্রেণীর কাব্যের প্রভাব এড়াতে পারেন নি হিন্দু কবিরাও। তার সাক্ষী অষ্টাদশ শতকের উত্তর রাঢ়ের রাধাচরণ গোপের রচিত 'ইমামের কেচ্ছা' ও 'আফাৎনামা' এবং চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের রচিত 'চাহার চমন'। শাহজাহানের সমকালে রচিত চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের 'চাহার চমন' গ্রন্থের বিশ্বভারতী-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপিখানি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর অনুলেখন হয়েছিল সেলিমাবাদ পরগণার মাকালপুর গ্রামে। তখন সেখানকার তালুকদার ছিলেন প্রাণনাথ চৌধুরী। নাথ মন্দিরে বসে এই পুঁথি লেখা হয়েছিল নাস্তালিক ও শিকস্তা শৈলীর-ফারসী লিপিতে।[২] হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনের প্রসঙ্গে এগুলি বিশেষ মূল্যবান নিদর্শন।

যে সব বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন, তাঁদের সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে। মুসলমান কবিরা প্রতিবেশী

---

১. বা. ম. সা. পৃ. ৩৩ দ্রঃ।

২. Viswabharati Annals Vol IV 195, F. M. Asiri লিখিত প্রবন্ধ Chandra Bhan Brahman and his Chahar Chaman, P. 51-64.

হিন্দু কবিদের কাব্যের ভাব, ভাষা, শব্দ, উপমা, রূপক গ্রহণ করে বৈষ্ণব ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পদ রচনা করে, যুগপ্রভাবকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।[১]

॥ **ধর্মীয় ক্ষেত্রে** ॥ মধ্যযুগ ধর্মান্ধতার যুগ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজই ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক। তুর্কী আক্রমণের প্রথম অবস্থায় মুসলমানরা হিন্দুর এই কেন্দ্রবিন্দুটিতে প্রবল আঘাত হানে। 'গোহারের ঘায়ে', হিন্দুর মর্মস্থান 'দেউলদেহারা' ভেঙ্গে ও পাষাণ বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে সূত্রপাত করে পরস্পরের মধ্যে চরম বিরোধের। তাদের কাছে এ ছিল অত্যন্ত পুণ্যকর্ম। কারণ, আল্লাহর রোষে যারা পতিত হয়েছে, সেই দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে স্পষ্ট নিষেধ রয়েছে কোরাণে। কিন্তু এককালের এই নিষেধ হয়তো মুসলমানদের ধ্বংসকামী স্পর্ধিত ইহুদিদের সম্বন্ধে করা হয়েছিল এবং সমসাময়িক মুসলমানরা সেকথা স্পষ্ট করে জানলেও তাদের অনুগামীদল, বিধর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরাণের অভিপ্রেত নয় বলে মনে করে। হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস ও হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ, তাদের বিশ্বাসে ধর্ম যুদ্ধ।[২] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা। সেকালে বাংলা মন্দিরের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সজ্জায় স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবহার ছিল। প্রথম মন্দির ধ্বংসের কারণ ছিল এই মন্দির গাত্রের স্বর্ণ রৌপ্যের প্রতি লোভ। কিন্তু পরবর্তী কালে এই ধ্বংসলীলা হিন্দুধর্মে আঘাত হানার একটি বিশিষ্ট উপায় হিসাবেই গৃহীত হয়েছিল।

শুধু মন্দির ধ্বংস নয়, বলপূর্বক জাতিনাশ করাও তাদের আঘাতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল।[৩]

নাড়ু মল্লা : না করে আন
ভাল হিন্দুর ছেল্যাকে থুক দিয়া করে মুছলমান।

হিন্দুর জাতিনাশ করাটা এমনই নিত্যকার ঘটনায় পরিণত হয়েছিল, পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসা বিজয়ে'র হাসন, স্বয়ং মনসা দেবীরই জাতিনাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

হেড়া খাওয়াইয়া দিব দেহ পাখড়িয়া।
দরবেশে নিকা দিব কলিমা পড়াইয়া॥

আবার ধর্মান্তরিত হিন্দু সন্তানদের অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল কঠোর মুসলমানে পরিণত হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের প্রতি তাদের বিদ্বেষ, জন্ম-মুসলমানদের চেয়েও অধিক হয়ে দাঁড়াতো। হিন্দু রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইভাবে মুসলমানদের ক্ষেত্রে হিন্দুর 'জাতি-মারার' প্রবণতা যত বাড়তে লাগল, হিন্দু সমাজ ততই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মকানুনের মধ্যে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে লাগল। ফলে, যে একবার জাতিচ্যুত হতো, তার আর সমাজে প্রবেশের পথ থাকত

১. বা, মু, ভা, বৈ, ক, পৃ. ৩।
২. নি, ব, মা—হি, মু, বি.।
৩. চি প, স, চি, ১ম, অ, পৃ. ৬৫।

না। হিন্দু শাস্ত্রকারদের কঠোরতা যতই বাড়তে থাকে মুসলমানদের ইসলামীকরণ ততই দ্রুত তালে চলতে লাগল। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের যদি সমাজে ফেরার কোনো পথ খুলে দেওয়া হতো, তবে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করণের উৎসাহ অবশ্যই স্তিমিত হয়ে যেতো। কিন্তু প্রথম অবস্থার এই কঠোরতা বেশি দিন স্থায়ী হলো না। দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকার দরুণ, হিন্দু ধর্ম ও মুসলিম ধর্ম একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ধীরে ধীরে উভয়ের মানস পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একেশ্বরবাদী মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। আবার ভারতীয় সাধন-প্রণালীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক মুসলমান সাধক হিন্দু যোগশাস্ত্র অনুসরণ করে সে সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা নাথ সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' রচনা করেছেন 'শুকুর মামুদ' এবং 'গোর্খ-বিজয়' রচনা করেছেন 'ফয়জুল্লা'। বাংলার মতো বাংলার বাইরেও কায়যোগ-ধর্ম হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু গুরু-পুরোহিতের প্রভাববশতঃ মুসলমানসমাজেও সুফী, পীর ও মোল্লা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় বলে অনেকে মনে করেন। মীরজাফরের মৃত্যুর সময়ে তাঁকে কিরীটেশ্বরীর পাদোদক খাওয়ানো হয়েছিল বলে কথিত আছে।[১] ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে দুর্গা, কালী, শীতলা প্রভৃতি দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হতো।[২] আজও রাঢ়ের অনেক পীরের দরগায় ও হিন্দুর মন্দিরে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই যে সমান ভাবে পূজা দেয় তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন পীঠস্থানের পাশেই পীরস্থান দেখা যায়। একসময়ে যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ প্রশমিত হয়ে, কিছুটা মিত্রভাব গড়ে উঠেছিল উক্ত দৃষ্টান্ত একথাই সমর্থন করে।

। **সামাজিক ক্ষেত্রে**। আমাদের আলোচ্য শতাব্দে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, এই প্রসঙ্গের আলোচনা করতে গিয়ে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, আলোচ্য সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক হলো শাসক ও শাসিতের, বিজেতা ও বিজিতের। পৃথিবীর ইতিহাসে এ সম্পর্ক কোথাও নিরঙ্কুশ মধুর হয় নি; হতে পারে না। তবুও আমরা যদি আলোচ্য শতাব্দীর রাজা-জমিদারাদি অভিজাত সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে নেমে আসতে পারি, তবে সেখানে কিন্তু গ্রামীণ সম্পর্কের বন্ধনে একের দুঃখে অপরকে কাতর ও একের সুখে অপরকে সুখী হতেই দেখতে পাই। গোঁড়া মুসলমান এবং মোল্লা বা কাজি ইত্যাদির মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষ অবশ্যই ছিল। তবে হিন্দু গুরু-পুরোহিতদের গোঁড়ামিও নিতান্ত অল্প ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছ আচার সযত্নে পরিহার করতেন বটে, কিন্তু গ্রামস্থ মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক রেখে চলতেন। সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সম্পর্ক আরও গভীর ও বিস্তৃত ছিল। চাষী, জোলা, কাঁসারি, মাঝি এবং চিত্রকর, বৈষ্ণ

---

১. কমলা বক্তৃতা মালা, পৃ. ৯৮।

২. নিজাম বক্তৃতা মালা—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ।

ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির লোককে পরস্পর-নির্ভর কায়িক পরিশ্রমের ভিত্তিতেই অর্থোপার্জন করে জীবনধারণ করতে হতো। মুসলমানকে যেমন হিন্দুর সংস্পর্শে আসতে হতো, হিন্দুকেও তেমনি আসতে হতো মুসলমানদের সান্নিধ্যে। কোনো কোনো বৃত্তি মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল, এদের সংস্পর্শে সকলকেই আসতে হতো, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও।

এদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য ইত্যাদি বহু কিছুর মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের অনিবার্য ঘনিষ্ঠতার সাক্ষ্য রয়েছে।

সুতরাং দেখা যায়, একদিকে হিন্দু ও মুসলমান কবিদের দ্বারা ধর্ম, তথা ধর্মাশ্রিত কাব্যধারার খাতে যেমন মিলনধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ক্রমশঃ গড়ে উঠতে থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রাম-সম্পর্কও স্থাপিত হতে শুরু করে। সপ্তদশ শতাব্দে রচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' দেখি শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক কাজী দলনের পরে কাজী, শ্রীচৈতন্য-দেবের সঙ্গে আপোষ করবার জন্যে তাঁকে গ্রাম সুবাদে 'ভাগনে' বলে সম্বোধন করেন। একই গ্রামের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মৌখিক আত্মীয়তার সম্পর্ক আলোচ্য শতকেই গড়ে উঠতে থাকে। মুসলমানদের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা অল্প ছিল না। যবন হরিদাসের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, একজন সাধারণ মুসলমান দরজীকেও প্রভু নিজরূপ দর্শন করিয়েছেন।

"শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজ রূপ করাল্য দর্শন ॥"

এইভাবে ধীরে ধীরে সমন্বয়ের বীজ সমাজের গভীরে উপ্ত ও দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। ফলে আরও পরবর্তীকালে, আঠারো শতকের হিন্দু ও মুসলমান ভূম্যধিকারীদের ভূমিদান সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজে দেখা যায় সিদ্ধিপুরের কোনো হিন্দু তালুকদার 'পীরোত্তর' জমি দান করছেন।[১] কোথাও বা 'বঁড়খান সাহেবের' সেবান্বিত 'দুলুশাহা', 'মৌজ্‌বাদি শাহা' ও 'ইমামুদী শাহাকে' কৃপারাম গিরির পুত্র প্রসাদ গিরি 'হাজারা পট্টক' লিখে দিচ্ছেন।[২]

একদিকে যেমন হিন্দু ভূম্যধিকারীরা মুসলিম পীরদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাঁদের সেবার জন্যে অকাতরে ভূমিদান করেছেন, তেমনি আবার মুসলমান ভূম্যধিকারীগণও যে হিন্দু ব্রাহ্মণদের 'ব্রহ্মোত্তর জমি' দান করেছেন, দলিল-পত্রের সাক্ষ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন একটি দলিলে দেখা যায়[৩] শ্রীমতী জান বিবি কাশীনাথ চক্রবর্তীকে ৭ কাঠা জমি 'আমল দখল করে' ভোগ করবার নিমিত্ত ব্রহ্মোত্তর করে দিয়েছেন কেবলমাত্র মহারাজাধিরাজকে আশীর্বাদ করবার জন্যে। মুসলমানদের পক্ষে হিন্দু ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র আশীর্বাদ প্রার্থনাতে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি-পট্টক প্রদান

১. চি. প. স. চি. ১ম. অ. পৃ. ১৪৯-৫০।
২. ঐ পৃ. ৩১৩-১৫।
৩ পশ্চা' শী। ন' গ্রন্থ পুথি সং ৭৭।

এখনকার যুগে অভাবনীয় ঘটনা হলেও, তৎকালীন রাঢ়ের প্রত্যন্ত সমাজে আদৌ অভাবনীয় ছিল না। আবার নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুতে সিরাজউদ্দৌলা হিন্দু ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধ-বাসরে আমন্ত্রণ জানান সংস্কৃত ভাষায় নিমন্ত্রণ পত্র লিখে।[১] হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি মুসলিম অনুরাগের এটি বোধ হয় চরম নিদর্শন। হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংস্কৃতির মিলন প্রসঙ্গে এর মূল্য অপরিসীম। এছাড়া পুঁথিপত্রের সাক্ষ্যে অনেক সময়েই আমরা দেখি কোনো হিন্দুর জন্য ধর্মমূলক পুঁথি নকল করে দিচ্ছেন মুসলমান লিপিকর অথবা কোনো মুসলমান পাঠকের জন্য পুঁথি নকল করে দিচ্ছেন কোনো হিন্দু ব্রাহ্মণ। রমজান আলী রচিত 'আস্ত ব্যাকত' নামক একটি মুসলমানি পুঁথির[২] ছত্রে ছত্রে শিব, দুর্গা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, কালীর বর্ণনা এবং হিন্দু সংস্কৃতির উল্লেখের ছড়াছড়ি হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিলের মতোই উল্লেখযোগ্য।

সমন্বয়ধর্মী ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল কথাই হলো সাঙ্গীকরণ। বহিরাগত বিরুদ্ধ-সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাত ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সেই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত চিরকালই একীভূত হয়ে আসছে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও এই চেষ্টার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাই মুসলিম আক্রমণের প্রথম যুগের ইতিহাস অত্যাচার বর্বরতার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হলেও, সে আক্রমণের বেগ প্রশমিত হয়ে আসে যখন তারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্থিতি লাভ করে। তারপর সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দে এসে দেখা যায় মুসলমানেরা, বিশেষ করে সাধারণ মুসলমানেরা দীর্ঘকাল হিন্দু পরিবেশে থেকে হিন্দু সংস্কৃতির উদার আঙিনায় নিজেদের অনেকখানি একাত্ম করে ফেলেছে।[৩]

---

১. চি. প. স. চি।

২. বি. ভা. পুঁ. সং ৬৫৮০।

৩. বর্তমান লেখিকার প্রকাশিতব্য 'মধ্যযুগের হিন্দু মুসলমান' গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পরা

ধর্ম কর্ম করে সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।

। **সূচনা**। সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারণ অনুযায়ী এদেশের সংস্কৃতিতে আর্যপূর্ব নিষাদ-কিরাত-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। রাঢ়ের হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে এই সব আর্যপূর্ব আদিবাসীদের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে সর্ব ক্ষেত্রে। বাঙালির ধর্মচর্যার প্রাথমিক বা মূল ইতিহাসও হলো, এদেশে প্রাগার্য বিভিন্ন জন ও কোমের পূজা, আচার, ভয়, বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিহাস।[১] লোকচক্ষুর অন্তরালে অভিজাত ও লোকায়ত সংস্কৃতির এই সমন্বয় আমাদের আলোচ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও নিবিড় হয়েছে। এরই মধ্যে এসে পড়েছে বহিরাগত ইসলামি ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব।

এই সময়ের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ধর্মকথা বা দেবতার স্তবস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি ধর্ম সংস্কৃতির এই দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় সাধনের ইতিবৃত্তের ইঙ্গিতও রয়েছে। তৎকালীন সমাজের কাহিনীকার ও কবি, ধনপতি-চাঁদ সদাগর প্রমুখ অভিজাত শৈব উপাসকদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলে, উচ্চতর ধর্মান্বিত ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বৃহত্তর লোকায়ত সমাজের সংঘাত ঘটিয়েছেন। পরিশেষে দেখা যায়, লৌকিক দেব-দেবীর কাছে পুরাণাশ্রিত মুষ্টিমেয় সমাজের আত্মসমর্পণ। যে ভক্তগোষ্ঠীর মাধ্যমে এই সব দেব-দেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা, সেই ভক্তগোষ্ঠী স্বভাবতই উচ্চতর সমাজে নবাগত এই লৌকিক দেব-দেবীকে পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে বিভিন্ন দিক্ থেকে সম্পর্কযুক্ত করে, ক্রমে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলেন।

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য সপ্তদশ শতাব্দীর রাঢ়ের সাহিত্যে উল্লিখিত বৃহত্তর সমাজের বিবিধ ধর্মকৃত্য ও গ্রাম্য দেব-দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও স্বরূপ নির্ণয়ের মাধ্যমে, এই সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারাটিকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করা হবে।

। **বৃক্ষপূজা**। সপ্তদশ শতাব্দীর 'ধর্মপূজাপদ্ধতি'তে[২] ধর্মঠাকুরের পূজার অঙ্গ

১. বাঙালির ইতিহাস, পৃ ৫৭৫।
২. নকুণ্ডার আদর্শ পুথি। 'পল্লীশ্রী' সংগ্রহ।

হিসাবে অশ্বত্থ ও গামার বৃক্ষের ডাল কাটার পূর্বে, ধূপ-দীপ-মঙ্গল-গান সহযোগে 'বৃক্ষপূজা'ও 'বৃক্ষ অধিবাস' কৃত্যের বর্ণনা রয়েছে।[১]

"ভ্রমণ করি বুলে গাম্ভারি নাই মেলে
পাইল তার দরসন।
প্রদক্ষিণ করি বলে হরি হরি
বৃক্ষেরে কৈল আলিঙ্গন॥
বসিয়া তরুতল পবিত্র কৈল স্থল
পূজার করিল রচনা।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বেদেতে একমন
জ্বালিল ধূপদিপ ধূনা॥
সঙ্গে পূজাব্রত করে দণ্ডবত
অর্দ্ধাঙ্গ লোটায়্যা ক্ষিতি।
কুড়ারি হাথে করি বলে হরি হরি
বৃক্ষ কাটে সুভক্ষণে॥"

সতেরো শতকের মঙ্গলকাব্যের বিশেষ ধারা 'রায়মঙ্গলের' কাহিনীতেও দক্ষিণরায়ের পূজার সঙ্গে সঙ্গে বলি সহযোগে তাঁর 'পূজামান্য' বৃক্ষ পূজারও কাহিনী রয়েছে।[২] প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসা বৃক্ষপূজার জের হিসেবেই এগুলিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে দেখা যায়, প্রত্যেক লৌকিক দেবতারই একটি করে বিশেষ প্রিয় বৃক্ষ অথবা ফুল রয়েছে। যেমন মনসার সীজ, শিবের বেল, ধর্মঠাকুরের বটপত্র, নারায়ণের তুলসী ইত্যাদি। শতাব্দক্রমে আজও আমরা দেবতার প্রতীককল্পে দেব মহিমা-মণ্ডিত এই বৃক্ষগুলিকে পূজামান্য মনে করে থাকি। এর থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীন বৃক্ষপূজা থেকেই পরবর্তী কালে বৃক্ষ অধিষ্ঠাত্রী এক একজন দেবতার কল্পনা করা হয়েছে এবং বৃক্ষপূজার বৃক্ষ, অবশেষে দেব বা দেবীর প্রিয় আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। আদিম জন্তুপূজা থেকে যেভাবে পরে সেই সব জন্তু দেবতার বাহনে পরিণত হয়েছে এবং ক্রমে দেবতার প্রাধান্য হওয়ায় বাহন অপ্রধান হয়ে গেছে।

সতেরো শতকে আমরা 'ক্ষেত্রপাল' দেবতার উল্লেখ পাই। আলোচ্য শতকে কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর 'রায়মঙ্গল' কাব্যেও দক্ষিণরায়কে শিবসুত 'ক্ষেত্রপালের' সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন। কৃষি দেবতা রুদ্রশিবের পুত্র বলেই 'ক্ষেত্রপাল' কৃষি আধিকারিক দেবতা। আমাদের আলোচ্য সময়ে এই দেবতার পূজাপদ্ধতি কেমন ছিল জানা যায় না। তবে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে বর্তমানেও যে ক্ষেত্রঠাকুরের পূজা কোথাও কোথাও দেখা যায়, ইনি ক্ষেত্রপাল দেবতার সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে হয়।

১. পল্লীশ্রী সংগ্রহ, প. সং ৩৯ খ।
২. কৃ. রা. গ্র. পৃ. ১৬৯।

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তির দিন একটি কলসী, একটি থালা ও একটি বংশদণ্ডের সমন্বয়ে ক্ষেত্রপাল দেবতার প্রতীককল্প সৃষ্টি করে মহাসমারোহে ছাগ মেষ বলি সহযোগে এই দেবতার পূজা হয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রলেপের ফলে, এই দেবতাকে শিবসুতরূপে বা শিবের আকৃতিভেদ রূপে কল্পনা করা হলেও, এই পূজা যে আদিম কৃষি সমাজের বৃক্ষপূজারই অবশেষ, একথা অনুমান করা যায় দেবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত বংশদণ্ডটি থেকে। কলিকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে ক্ষেত্রপালের প্রস্তরময় একটি মূর্তি রয়েছে। তাতে ক্ষেত্রপালের হাতে একটি গদা দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় আদিম বৃক্ষ তথা শস্যদেবতা ক্ষেত্রপাল, পরবর্তী কালে শিবসুত দিক্-রক্ষক ক্ষেত্রপাল দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে প্রাগার্য বংশদণ্ডটি গদায় রূপান্তর লাভ করায় দেবতারও রূপ পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পল্লীবাসীর পূজায় ক্ষেত্রপাল দেবতা তাঁর বংশদণ্ডটি ত্যাগ করেন নি। ভক্তগণও দেবতার কাছে উর্বরতার কামনায় ছাগ মেষ বলি দিয়ে আজও এই উর্বরতার প্রতীক বৃক্ষদেবতা ক্ষেত্রপালকে তুষ্ট করে থাকেন। অবৈজ্ঞানিক চেতনায় বৃক্ষ উর্বরতার প্রতীক। এই উর্বরতা শস্যক্ষেত্রে অথবা জীবনের ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করার জন্যে তারা বৃক্ষের সামনে নরবলি ও তুকতাক-সম্বলিত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করতো। নরবলি বর্তমানে পশুপক্ষী বলিতে রূপান্তর লাভ করলেও, বৃক্ষপূজায় উর্বরতার কামনা করে বলি অবশ্যকৃত্য হিসাবে আজও রয়ে গেছে।

॥ লৌকিক দেব-দেবী ॥

। **ধর্মঠাকুর**। মধ্যযুগের লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে প্রধান হলেন ধর্মঠাকুর। পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে—বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, বরাভূম, মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণার কিছু কিছু অঞ্চলের নিম্নবর্ণের, বিশেষ করে ডোমকুলের লোক সম্প্রদায় প্রধানতঃ যে দেবতার বাৎসরিক গাজন উৎসব মহাসমারোহে পালন করেন, তা হলো এই ধর্মঠাকুরের। এই দেবতাটির স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য। এঁর মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভাব যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে সূর্য, বরুণ, যমরাজ প্রভৃতি দেবতার মিশ্রণ। ফসল ফলানো, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, রোগ মুক্তি, ভূত তাড়ানো ইত্যাদি কারণের জন্যে বিবিধ যাদুবিশ্বাস আশ্রিত তুক্‌তাক্ কার্যকর করার যূপরূপে আদিমতম শিকারী গোষ্ঠীর প্রস্তর খণ্ডটিকে ('ভূতের পিঁড়ি' বা 'Seat of the Spirits') বৌদ্ধরা বুদ্ধসংশ্লিষ্ট করে, শৈবরা শিবরূপে, সূর্যোপাসকরা সূর্যরূপে এবং বৈষ্ণবরা বিষ্ণুরূপে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মঠাকুরের নিজস্ব সত্তা টিকে থাকে নি। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে বিভিন্ন গবেষক[১] বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মঠাকুরকে কূর্ম মূর্তি, কোথাও বা হনুমান মূর্তি, বুদ্ধ মূর্তি, শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্টের উপর ধর্মশিলা,

১. রাঢ়ের সংস্কৃতি, দ্রঃ।

বৌদ্ধ স্তূপাকৃতি পীঠ ও শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি হিসাবে পূজিত হতে দেখেছেন। এই সমস্ত তথ্য থেকে একথা বলা যায়, আদিম লোক-সংস্কৃতির এই ধারাটি সম্ভবতঃ মধ্যযুগেই বিভিন্ন সংস্কৃতি সংঘাতের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনসমাজে একটি বিশিষ্ট দেব-ভাবনায় পর্যবসিত হয়। উচ্চবর্ণ ও অভিজাতরা যখন নিম্নবর্ণের এই ধর্ম বিশ্বাস ও পূজার অনুষ্ঠান গ্রহণ করলেন, তখনই সম্ভবতঃ শিব তথা পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতাদের সঙ্গে এই লোকধর্ম তথা লোকদেবতাটিকে একীকৃত করা হলো। পরিবর্তন সাধিত হলো ধর্মের অনুষ্ঠান এবং পূজা পদ্ধতিতেও। বিভিন্ন 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের কবিগণ যে ধর্মঠাকুর সম্পৃক্ত সাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যেও এই সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

'ধর্মপূজাপদ্ধতি', 'ধর্মপুরাণ' ও 'ধর্মমঙ্গল'—ধর্মঠাকুর আশ্রিত সাহিত্যের এই ত্রিবিধ ধারাতেই ধর্মের সঙ্গে বিভিন্ন দেবতার সাযুজ্য উল্লিখিত হয়েছে।

ধর্মঠাকুরের ধ্যানে বলা হয়েছে সূর্য ও ধর্ম অভিন্ন।

"শূন্য মার্গে স্থিতং নিত্যং শূন্যদেব দিবাকরং।
তমহং ভজামি শ্রীধর্মায় নমঃ॥"[১]

কূর্ম সূর্য দেবতার প্রতীক। কূর্ম ধর্মঠাকুরের পাদ-পীঠ, কখনও বা ধর্মরূপী। ধর্মঠাকুর উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক ও শুভ্রবর্ণ।

"সবা আগে বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন।
ধবল ঘাট বন্দিব ধবল সিংহাসন॥"[২]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"ধবল ছত্র ধরি শিরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
উলুকে করিয়া আরোহণ।
ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর
হরের আশ্রমে দরশন॥"[৩]

কোথাও পাওয়া যায়—

"ধবল আকার তার প্রকাণ্ড শরীর।"[৪]

সূর্যের মতো ধর্মঠাকুরেরও এই গুণগুলি আছে। তাঁকে আরাধনা করলে ধবল রোগ থেকে মুক্তি হয়। ধর্মঠাকুর যে সূর্য থেকে অভিন্ন তার পরিচয় ধর্মঠাকুর-সম্পৃক্ত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের গাজনের প্রাথমিক কৃত্য সূর্য-অর্ঘ প্রদান।

"হাথে অর্ঘ্য করিয়া দানপতি সূর্য পানে চাহে।
সপ্ত ঘোড়া রথ গোসাঞির অন্তরীক্ষে রহে"।[৫]

---

১. ধর্ম পূজা বিধান, পৃ. ৮৯।
২. রূ. ধ. পৃ. ১২।
৩. বি. পি. ম. পৃ. ৭।
৪. ঐ পৃ. ৮।
৫. ধ. পু. বি. পৃ. ২২৪।

এখানে পূজকের সূর্যঅর্ঘ প্রদান ও সেই দান গ্রহণের জন্যে ধর্মঠাকুরের অন্তরীক্ষে সপ্তঘোড়া রথে অর্থাৎ সূর্য রথে অবস্থানের মধ্যে দিয়ে সূর্য ও ধর্মঠাকুরের অভিন্নত্ব প্রমাণিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে' দেখা যায়, ধর্মপূজায় নিয়মভঙ্গের সময়ে "সূর্য অর্ঘ্য দিল এক মনে"[১]— আলোচ্য শতাব্দীর অপর কবি সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'জাগরণ পালায়' দেখা যায়, লাউসেন ও অন্যান্য ভক্তগণের 'হাকন্দে' প্রাণনাশ ঘটলে তার পাপ সূর্যকে স্পর্শ করে।

"স্ত্রী হত্যা ব্রহ্ম হত্যা গো হত্যা হইল।
…তিন পাপ আগুলিল সূর্জ্জের বিমান॥
রত রাখ্যা গোসাঞি পালাল রড়ারড়ি।"[২]

আবার সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সন্ধিক্ষণের কবি ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে দেখা যায়, রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরকে ধ্যান করে শালে ভর দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে,

"স্ত্রী হত্যার পাপ যায় সূর্যে গরাসিতে।"

ধর্মঠাকুর আবার "হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মৌজা"—সিপাহী বেশধারী ইরাণীয় সূর্য দেবতাও।

অথবা, ইনি বৈদিক বরুণ দেবতা। বরুণ পুত্র দান করেন। ধর্মের নিকট মানসিক করলেও তেমনই পুত্র লাভ হয়। ধর্মপূজাবিধানে ধর্মের কাছে ছাগ বলির মন্ত্রে বরুণের উল্লেখ আছে। "ওঁ পাশ তং বরুণাজ্জাত"…ইত্যাদি মন্ত্রে।

ধর্মঠাকুর যেখানে কৃচ্ছ্রসাধক ব্রাত্যদের দেবতা, সেখানে তাঁর সঙ্গে শিবের সাযুজ্য সহজেই লক্ষণীয়। ধর্মপুরাণের 'সৃষ্টিপত্তনে'র কাহিনী অনুযায়ী শিব ধর্মঠাকুরের অন্যতম সন্তান। 'অনাদ্যের পুঁথিতে[৩] ধর্মঠাকুরের রূপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা শিবস্বরূপ ধর্মঠাকুরেরই বর্ণনা। সেখানে ধর্মঠাকুরের গাত্রবর্ণ অগ্নিজয়ী, ধবল রথে উপবিষ্ট, বচনে অমৃতের ধার, হাসিতে মাণিক ঝরে, কপালে জ্বলে রত্নমাণিক, মাথায় জটা, পরনে বল্কল, পদ্মনেত্র, দীর্ঘ নাসিকা, আজানুলম্বিত বাহু, কণ্ঠে স্বর্ণোপবীত, হাতে সুবর্ণবলয়, কানে সুবর্ণ কুণ্ডল, সম্মুখে কুশাসন ও মুখ থেকে বিদ্যুৎ ও পূর্ণচন্দ্রের ছটা বিচ্ছুরিত।[৪] ধর্মের গাজনেও চড়কের অনুষ্ঠান প্রচলিত। সপ্তদশ শতকের কবি সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'জাগরণ পালায়' দেখা যায় লাউসেন 'পশ্চিম-উদয়' দিতে গেলে সেখানে লাউসেনের ধর্মপূজার কৃত্যের মধ্যে শিবের চড়ক উৎসবের আত্মনির্যাতিত আত্মনিবেদনমূলক বিবিধ কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।[৫]

১. সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য়, পৃ. ৪৩।
২. শ্রীঅক্ষয় কয়াল সংগৃহীত পুঁথি। পত্র ৫৮ খ।
৩. অনাদ্যের পুঁথি, সা. প্র. ৪র্থ সং।
৪. ঐ পৃ. ১১৮।
৫. ঐ পৃ. ৫ক।

'পাএ কোড়ে অগ্নিজ্বালে কেহ ফুড়ে জিব।'

তা ছাড়া গাজন উৎসবে বিভিন্ন কৃত্যের মধ্যে 'বোলান' ইত্যাদি প্রাচীন কৃত্যে ধর্মের সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আবার সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'জাগরণ পালায়' লাউসেন পশ্চিম উদয় দিতে গেলে ভক্তগণ ধর্মের আবাহন করতে 'শিব শিব' বলেও ডাকতে থাকেন।

"কেহ ডাকে ধর্ম ধর্ম কেহ ডাকে শিব।"[১]

বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক স্থাপনেরও নিদর্শন রয়েছে 'ধর্মপূজাবিধান'[২] ও 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে।[৩]

"তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ।
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ॥"

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"পিতামাতা দুঃখ পায় গৌড় কারাগারে।
ও দুঃখ আপনি জান কৃষ্ণ অবতারে॥"

ধর্মঠাকুর কোন্ দেবতা তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। সম্ভবতঃ সেই কারণেই বৈষ্ণবরা ধর্মদেবতাকে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন করার চেষ্টা করেন। ধর্মঠাকুরের নামাবলী অংশে দেখা যায় ধর্মঠাকুরকে নামের দিক্ থেকে বিষ্ণুর সঙ্গে এক করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। এমন কি রামচন্দ্রের সঙ্গেও ধর্মঠাকুরকে অনেক জায়গায় অভিন্ন করে দেখা হয়েছে। অনাদ্যের পুঁথিতে দেখা যায়, ধর্মঠাকুরের পাত্রত্রয়ের অন্যতম হলো হনুমান।[৪]

'ধর্মপূজাবিধানে' ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতাদের যে বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় তাবৎ স্থানীয় দেবদেবীই সেখানে জায়গা করে নিয়ে পূজার ভাগ পাচ্ছেন। বাশুলী, জাঙ্গুলী, ভগবতী, পঞ্চাম্বর, লৌহজঙ্ঘ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি যাবতীয় দেবতা এবং ডাকিনী-শাকিনী, যক্ষ-রক্ষ ইত্যাদি উপদেবতা, ধর্মের আবরণ দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এর মধ্যে উচ্চবর্ণের পুরোহিতদের কীর্তি অনেকটা থাকলেও মধ্যযুগে বাংলা দেশের একটি মিশ্র সংস্কৃতি সপ্তদশ শতকে ধর্মপূজার মধ্যে যে সুসংহতি লাভ করেছিল, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না।

প্রধানতঃ ডোমজাতি, তথা নিম্নবর্ণ পূজিত এই ধর্মঠাকুর সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে গ্রহণীয় এবং সংস্কৃত হয়ে উঠবার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এই গ্রহণ বা আত্মীকরণ খুব সহজে হয় নি। সপ্তদশ শতকে যে কয়েকজন 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কবির খবর পাওয়া যায়, তাঁদের কাব্য অন্তর্গত 'আত্মকাহিনী' পাঠে মনে হয়, ধর্মের গান লেখা ও গাওয়া তখনকার সমাজে হীনকার্য বলে গণ্য হতো। কবিগণ

---

১. শ্রীঅক্ষয় কয়াল সংগৃহীত পুঁথি, পৃ. ৫ক।
২. ধ. পূ. বি. পৃ. ১৭০
৩. ম. ধ. পৃ. ৫৭৮-৭৯।
৪. অ. পুঁ. পৃ. ১১১, সা. প্র. ৪র্থ।

তাই ধর্মঠাকুরের দর্শনলাভ, তথা গীত রচনার স্বপ্নাদেশ পাওয়ার জন্যে নিজেদের অদৃষ্টকে দায়ী করেছেন।[১]

"আমার কপাল দোষে বিধাতা নিষ্ঠুর ॥
কিরূপ তোমার দয়া বুঝা নাঞি গেল।
তুমি কি করিবে মোর কপালে আছিল ॥
কপালের লেখা কভু না যায় খণ্ডন।"

এঁদের মধ্যে সীতারাম দাসকে তো ধর্মঠাকুর নিজেই বলেছেন—

"গীত কর আমার না কর মন হীন ॥
... ...
কপালের লেখা তোর আমি কি করিব।"[২]

কবিও পরকালে কি গতি হবে ভেবে আকুল হয়েছেন—

"নরমধ্যে অধম আমার সম নাই।
তব বাক্য মহাপ্রভু লঙ্ঘা গেল নাই ॥
পরকালে কি হব কহনা মহাশয়।"[৩]

কবি শেষ অবধি ধর্মঠাকুরের পূজারী গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। ধর্মের গান রচনার আদেশ হয়েছে তাঁর ওপর, এই খবর পেয়ে কবির জনকজননী শোকাতুর হয়েছেন।

"ঘরে সমাচার পায়্যা জনক জননী।
কান্দিতে লাগিল মাতা দিবস রজনী ॥"[৪]

অবশেষে, ধর্মের জয় হলেও এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে তথাকথিত, নিম্নতর সমাজের এই দেবতাকে উচ্চবর্ণের সমাজ তখনও সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। সপ্তদশ শতকের অপর কবি রূপরাম চক্রবর্তীকে ধর্মঠাকুর পথে দেখা দিয়ে, দিশেহারা করে পলাসন গ্রামের খালে বিলে ঘুরিয়ে নানান বিড়ম্বনা ঘটিয়ে অবশেষে গান রচনা করতে বাধ্য করলেন। রূপরাম গোপভূমে গিয়ে ব্রাহ্মণরাজা গণেশ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সীতারাম দাস আপন গৃহে বসেই কাব্য রচনা শুরু করেন। তবে একটি বিষয়ে উভয় কবির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। এঁদের কারও আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। রূপরাম গৃহ হতে বিতাড়িত, সীতারাম দাসও রাজকর্মচারী কর্তৃক অত্যাচারিত।

"মহাসিংহ যেকালে লুটিল সাহাপুর।
ঘর দ্বার পোড়াইল সব কৈল চুর ॥
কুশলরাম সরকার খুড়া কহিল আমারে।
শাওড়াবনি যাই আমি কাষ্ঠ আনিবারে ॥"[৫]

১. বা. সা. ই. পৃ. ৫২৮।
২. ঐ. পৃ. ৫৩১।
৩. ঐ. পৃ. ৫৩২।
৪. ঐ. পৃ. ৫৩৫।
৫. ঐ. পৃ. ৫২৯।

এর থেকে মনে হয়, প্রধানতঃ নিম্নজন প্রিয় এই দেবতা ষোড়শ সপ্তদশ শতকে এসে সর্বজন পূজ্য দেবতায় পরিণত হন। পূজার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটলেও ধর্মঠাকুরের গান রচনা তথা সেই গান জনসমক্ষে প্রচার করবার মানসিকতা সমসাময়িক ভাবে গড়ে ওঠে নি। কিন্তু এক দিকে দেবতার স্বপ্নাদ্য রোষ, অন্য দিকে লোকপ্রিয় দেবতার মাহাত্ম প্রচারমূলক গানের দ্বারা লোকরঞ্জনের বিনিময়ে অর্থোপার্জন, তৎকালীন উচ্চ-বর্ণের কবিদের ধর্মের গীত রচনায় ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ করে। এ ছাড়া যখন দলে দলে নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামি সাম্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধায় প্রলুব্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল, তখন সেই বিপর্যয়ের প্রতিকার স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা এই সকল প্রধানতঃ নিম্নবর্ণ-পূজিত লৌকিক দেব-দেবীকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর কৃত্যতত্ত্বে এই সব লৌকিক দেবদেবীর পূজার বিধি দিয়েছেন। এই একই কারণে উচ্চবর্ণের কবিকুল এঁদের নিয়ে কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, এমনও হওয়া সম্ভব।

সে যাই হোক্, সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ধর্মঠাকুর সমাজজীবনে এত প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা রাজসভার কবি ঘনরাম চক্রবর্তীকেও ধর্মের গীত রচনায় নিযুক্ত দেখতে পাই। ধর্মঠাকুর তখন আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সর্বসাধারণের পূজ্য এক লোকপ্রিয় দেবতা। তাঁর উৎপত্তি আর্য বা অনার্য যে উৎস হতেই হোক্।

। **শিবঠাকুর**। পুরাণ আশ্রয়ী শিব, সংস্কৃতি সমন্বয়ের স্বভাব নিয়মেই রাঢ় দেশে হয়ে উঠেছেন আর এক লৌকিক দেবতা। আমাদের আলোচ্য শতকে এই দেবতাটি ধর্মঠাকুরের পাশাপাশি আপন মহিমায় সুপ্রকাশ। তাঁর স্থাপনডাক, তাম্রধারণ, বারমতি ইত্যাদি প্রথা ও রীতি পৌরাণিক শিবের মূল স্বরূপকে ক্রমশঃ আবৃত করেছে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যেমন সূর্য দেবতার সাদৃশ্য, তেমনই শিব সাযুজ্য। ধর্মঠাকুরের মতো শিবেরও গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এই গাজনের প্রধান অঙ্গ হলো 'চড়ক পূজা'। আকাশপথে সূর্যের চক্রাকারে ভ্রমণের অনুকরণে চড়ক বা চক্র ঘোরে। গাজনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান এর আত্মনির্যাতিত আত্মনিবেদন। বাণ-ফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, ঝাঁপান, ভর ইত্যাদি সবেরই মধ্যে রয়েছে জাদুবিদ্যা-আশ্রিত আধিদৈবিক ক্রিয়াকলাপ। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চৈত্র মাসে ঢাক ঢোল বাজিয়ে শিব মন্দিরে বিবিধ উপচারে শিবপূজা সমেত শিবের গাজনের বর্ণনায় বাণ ফোঁড়ার খবর পাওয়া যায়।

"চৈত্র মাসে পূজে শিবে নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥
জিব কাটে জিব ফোঁড়ে করয়ে চড়ক।"[১]

ভূতনাথ শিবের গাজন মেলায় উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অনার্য ভূতশাস্তির আঙ্গিক-

১. ক. ক. চ. পৃ. ১৩৬।

গুলি তাঁকে ঘিরে ধরে। শিবের গাজনে সাময়িক মণ্ডপ রচনা করে যে উপাসনা হয়, তাও আদিম যাযাবর সংস্কৃতির স্মৃতিবাহী হওয়া সম্ভব। পরবর্তী কালে যখন একে একে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, তখন থেকে 'গম্ভীরায়' অস্থায়ী মণ্ডপতলে প্রথাগত ভাবে তাঁর পূজা হয়।

পৌরাণিক শৈবধর্ম ও লৌকিক শৈবসংস্কৃতির এই ঘনিষ্ঠতা সপ্তদশ শতকে আরও নিবিড় হয়েছে। শতাব্দীর কবিগণ তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, পৌরাণিক শিবকে খাঁটি 'বঙ্গজ' করে অতিমাত্রায় লোকায়ত করবার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেন নি। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' শিবের যে চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে তিনি নিরন্ন, দরিদ্র, ভিক্ষামাত্র সম্বল।

'ত্রিদশের ঈশ্বর। ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর।'[১]

অন্যত্র পাই—

"আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল ॥"[২]

বাঙালি অবুঝ গৃহস্বামীর ভোজনপ্রিয়তাও সেখানে স্থানবিশেষে শিবচরিত্রে আরোপিত হয়েছে। শিব ভিক্ষা করে এনে পরের দিন গৌরীকে আহার্যের দীর্ঘ তালিকা দিলেন। কিন্তু ঘরে চাল নেই শুনে তিনি মহা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

ভিখারী শিবের লাম্পট্য তৎকালীন বাংলা কাব্যের এক সরস অধ্যায়। মুকুন্দ-রামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' কেবলমাত্র কোচনীপাড়ায় শিবের ভিক্ষা গ্রহণের বর্ণনা আছে।

"ফিরিয়ে উজান ভাটি চৌদিকে কোচের পটী
কোচবধূ ভিক্ষা দেয় থালে।"[৩]

কিন্তু রামেশ্বরের 'শিবায়নে' ও বিবিধ 'মনসামঙ্গল' কাব্যে এর আরও বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিষ্ণু পালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে শিব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"তোমার নাম বটে মহেশ্বর। ভিক্ষা মাগো ঘরে ঘর।
কুচুনি ঘরে বাঁসর স্থিতি ॥"[৪]

শিবের এই লাম্পট্য ও গঞ্জিকা সেবনের[৫] জন্যেই হর-গৌরীর মধ্যে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়। সেখানে শিব হয়ে ওঠেন কোন্দলপরায়ণ। শিব চরিত্রে এই প্রকার লৌকিক গুণাগুণ আরোপ করে কবিরা এক দিকে যেমন তাঁকে লোকপ্রিয় একান্ত কাছের মানুষ করে তুলেছেন, অন্য দিকে তেমনি সমাজের অগণিত দুঃখ-দারিদ্র-

১. ক. ক. চ. পৃ. ১১৩।
২. ঐ পৃ. ১১৭।
৪. ঐ পৃ. ১১৪।
৪. ঐ পৃ. ১১৩।
৫. 'অনুদিন কত নাকি কিনা দিব ভাঙ্গ।' ক. ক. চ. পৃ. ১১২।

পীড়িত সাধারণ জনসমাজকে, দেবতার দশাও যে তাদের চেয়ে কোনো অংশে শ্রেয় নয় এই বলে হয়তো সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন।

কৃষক শিবেরও একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে আলোচ্য সময়ের বাংলা কাব্যে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে অবশ্য হিমালয়-প্রদত্ত জমিতে ধান, কার্পাস, মাষ, সরিষা উৎপন্ন হয়, তবু শিব নির্বিকার। মেনকা গৌরীকে অভিযোগ করেন, 'মিছে কাজে ফিরে সামি নাহি চাষ বাস'। তবে, রামেশ্বর তাঁর 'শিবায়নে', দেবতার ত্রিশূল ভেঙে হাল তৈরি করে তাঁর দৈব ক্ষমতাকে কৃষিতে নিযুক্ত করেছেন। 'ধর্মপূজাবিধানে'ও শিবের কৃষি সান্নিধ্যের ছবি পাওয়া যায়।[১] এই কৃষক শিব ব্রাত্য উপাস্য কর্ষণ দেবতার প্রতিমূর্তি এবং শিবের ভিখারী রূপ বৈদান্তিক সন্ন্যাস ও বৌদ্ধ জৈন ভিক্ষুত্বের প্রভাব-জাত হওয়া সম্ভব।

। **পঞ্চানন্দ**। গ্রামে গ্রামে যে সব নিম্নমানের স্থানিক গ্রাম দেবতা সীমিত গণ্ডির মধ্যে লোকসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, তাঁরাও অনেকে কালক্রমে শিবের সঙ্গে মিলিত হন। এই রকম এক দেবতা হলেন রাঢ়ের পঞ্চানন-পঞ্চানন্দ-পাঁচুঠাকুর-পেঁচো-খেঁচো। প্রাচীন বাংলা কাব্যে পঞ্চানন্দ কৈবর্তকুল-জাত, কোথাও শিবসুত এবং কোথাও স্বয়ং শিব। ধর্ম প্রলয়ের পরে ইনি নবসৃষ্টির দেবতা। পঞ্চাননের আদি উৎস রাঢ়ের বৃক্ষ ও প্রস্তর উপাসনা। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ইনি সম্পর্কযুক্ত এবং শিবের ধ্যানে উভয়েই আহুত হয়েছেন। শীতলা-পুত্র বসন্ত রায় পঞ্চাননের সঙ্গী। মারি দেবতা শীতলার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ইনিও অন্যতম মারিদেব রূপে পরিচিত হলেন। শিবস্বরূপ এই দেবতা আবার শিশুরক্ষক রূপে পূজিত। সপ্তদশ শতকের রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে সন্তান লাভের কামনায় পঞ্চানন্দের পূজা প্রচলিত ছিল। ঐ সময়ের প্রখ্যাত ধর্মমঙ্গলকার রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের বন্দনা অংশে অপুত্রী নারীগণ কর্তৃক পুত্র কামনায় পঞ্চানন্দের 'থানে' ধর্ণা দেওয়ার বর্ণনা করেছেন।

"কামারহাটীর পঞ্চানন্দ বন্দো জোড় হাতে।
ছেলের তরে কত মেয়ে ওষুধ যায় খেতে॥"[২]

। **চণ্ডী**। রাঢ় বাংলার লৌকিক শক্তি দেবতাদের মধ্যে চণ্ডীর প্রকৃতিই সবচেয়ে জটিল। এর কারণ, বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ স্থানীয় অবস্থা হতে অনেক সময়ে পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সব স্ত্রী দেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল, কালক্রমে তা এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে এসে স্থান লাভ করেছে। বাংলা চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের আরাধ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডী রাঢ়ের প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে ইনি ব্যাধপূজিতা অর্থাৎ অনার্য দেবী, বন ও পশুর পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী। ওঁরাওদের শিকার ও যুদ্ধের দেবী 'চাণ্ডী', এই মঙ্গলচণ্ডিকার অন্যতম উৎস। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী পুরাণ, শিব পুরাণ ও কালিকা পুরাণে যে

১. 'ধর্মপূজাবিধান', পৃ. ২২৭-৩৭।
২. রূ.ধ.পৃ. ১৬।

চণ্ডীদেবীর সাক্ষাৎ মেলে, তিনি বিন্ধ্যাচলবাসিনী অর্থাৎ অবাঙালিনী আর্যেতর দেবী। রাঢ় দেশের চণ্ডীর শাস্ত্রীয় রূপায়ণে তাঁর প্রভাব কম ছিল না। চণ্ডী কাব্যের দেবী তাই এক দিকে যুদ্ধের রুদ্রা দেবী এবং পূজা গ্রহণে তৎপরা, অন্য দিকে বরদাত্রী দুর্গার মতো অভয়া ও ভক্তবৎসলা। সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী ও সীতারাম দাসের বর্ণনায়, অজয় নদীর তীরে ঢেকুরগড়ে লৌহজীবী চণ্ডালগণের গুহা ছিল। ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষের কুলদেবী সামারূপা, ইছাই ঘোষকে শিকারে ও রণে জয়পরাজয়ের অন্ধি সন্ধি আগে থেকে জানিয়ে দিতেন। রণে নিহত ভক্ত ইছাই ঘোষ কর্তিত-মুণ্ড হলে, দেবী যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন। রূপরাম বলেছেন, 'অভয়দায়িনী দুর্গা সামারূপা নাম।'[১] তিনি ভবানী, বাসলী, পার্বতী, চামুণ্ডা, কালী ও চণ্ডীকা। সীতারাম দাসও এই দেবীকে পার্বতী, হেমন্তকন্যা ও অম্বিকার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন।[২]

"সিঅরে সপন কহে স্থনরে গোআলা।
স্যামরূপা দেবি থাকে উত্তর অচলা॥"
"পাচ রসে পার্বতীর পদ পূজা কর।"
"অম্বিকা লইঞা গেল আপন আলয়।"
"দেউলে সদাই থাকে হেমন্তের বেটি।"…ইত্যাদি।

সতেরো শতকের কবিকুলের দেবীর নামের এই পরম্পরাগত উল্লেখ থেকে চণ্ডীর লৌকিক বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট রূপ আভাসিত হয়। চণ্ডীদেবীর বিবর্তনে প্রথমে কিরাত-শবর-ব্যাধ পূজিতা যাদুবিদ্যাশ্রয়ী পশুরক্ষয়িত্রী দেবতা আরণ্য চণ্ডী, পরে নারী সমাজে পূজিতা মঙ্গলদাত্রী মঙ্গলচণ্ডী এবং সর্বোপরি পৌরাণিক শিবদুর্গার সঙ্গে অভিন্নভাবে পূজিতা দেবী চণ্ডী। আমাদের আলোচ্য সময়ের মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই সমন্বয়ের অবস্থাই দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন 'চণ্ডী' নামে আরও অনেকগুলি লৌকিক দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। অনুন্নত সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণদের অনুকরণে বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে, এই অবৈদিক দেবীসকল চণ্ডী নামে পরিচিত হয়েছেন। ঢেলাই চণ্ডী, লোটাই চণ্ডী,[৩] আমতার মেলাই চণ্ডী[৪], খেপ্তের খেপাই চণ্ডী,[৫] হেটাল চণ্ডী, বেতারগড়ের বেতাই চণ্ডী[৬], নেকড়াই

১. রূ. ধ. পৃ. ৪৭।

২. বি. ভা. পু. সং ৬২১৭, পৃ. ৬ক।

৩. রূ. ধ. পৃ. ১৪।

৪. ক. ক. চ. পৃ. ২৫, রূ ধ. পৃ. ১৪, সী. ধ. 'ধর্মের বন্দনা পালা' পৃ. ৪ক, ক. বি. পু. সং ২৪৭০।

৫. ক. ক. চ. পৃ. ২৫, রূ. ধ. পৃ. ১৩।

৬. 'বেতায় বন্দিনু গৌরী চণ্ডীকা বেতাই।' সী. ধ। 'ধর্মের বন্দনা পালা'। পৃ. ৩খ। [ক. বি. পু. সং ২৪৭০]

চণ্ডী, ঝকড়াই চণ্ডী, ফেতাই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, বাঘরায় চণ্ডী, হাড়ি ঝি চণ্ডী প্রভৃতি। এই সব চণ্ডী দেবীর কারো কারো নির্দিষ্ট মূর্তি আছে, আবার অনেকেরই কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। সাধারণতঃ শিলাখণ্ডে, গাছতলায় বা শস্যক্ষেত্রে পূজা হয় এঁদের। এঁদের মধ্যে ওলাই চণ্ডী মারিদেবী। মধ্যযুগের ইসলামস্পর্শে হয়ে ওঠেন ওলাবিবি। বাঘরায় চণ্ডী শস্যদেবী। এঁর পূজা হয় ধান কাটার পরে শস্যক্ষেত্রে। আমাদের পৌরাণিক চণ্ডী এক রূপে শস্যদেবী শাকম্ভরী। হাড়ী ঝি চণ্ডীর পূজার প্রচলন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, বিশেষ করে ওঝা, গুণিন, বিষবৈদ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[১] তারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করে। বর্তমানে এই দেবীর পূজার প্রচলন বিশেষ না থাকলেও, আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন বিষ নিরাময় মন্ত্রে এই দেবীর যেমন বিশেষ অধিকার দেখা যায়, তাতে মনে হয়, এক সময়ে এই দেবীর প্রাধান্য রাঢ়ের সর্বত্রই বর্তমান ছিল। তারা, বজ্রতারা[২], বিশালাক্ষী, নীল-সরস্বতী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবীর রূপ কল্পনাতেও এই চণ্ডীর আভাস মেলে। বাংলার নিম্নবর্ণ-পূজিতা দেবীগণের মিশ্ররূপ, বৌদ্ধ ও তন্ত্রোক্ত দেবীরূপ, শাস্ত্রোক্ত চণ্ডীর পৌরাণিক রূপের সঙ্গে মিশে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য অনুমোদন লাভ করেছে। আমাদের আলোচ্য সময়ে এই দেবীর পূজা কেবলমাত্র স্ত্রী-সমাজেই প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে লহনা এই দেবীকে 'ডাকিনী দেবতা' বলে উল্লেখ করেছে।[৩] আবার ধনপতির মুখে এই দেবতার প্রতি যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে,[৪] তাতে তৎকালীন সমাজে এই দেবীর স্থান যে খুব উঁচুতে ছিল না তা দু-একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে সহজেই বোঝা যায়।

"রোষ যুক্ত ধনপতি দেখি বিদ্যমানে।
ঘট ছাড়ি মহামায়া রহিলা গগনে"।

অন্যত্র দেখি—

"বামপথি হইয়া করিস কার পূজা।
ইহা শুনি ছল করি ধরে মোরে রাজা।"

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ছাড়া, অন্যত্রও এই পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের 'বন্দনা' অংশে একাধিক চণ্ডীদেবীর বন্দনা রয়েছে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' মঙ্গলচণ্ডীর পালা গান গেয়ে নিশি জাগরণ যে তৎকালীন সমাজে

১. ধর্মদাস বণিকের 'নিরঞ্জন পুরাণ' গ্রন্থে 'হুরিক্ষা পালায়' হুরিক্ষাকর্তৃক চণ্ডীর সেবা করে যে কোন কাজ অনায়াসে সিদ্ধ করার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে সেই চণ্ডীদেবীকে 'হাড়ির ঝি' বলা হয়েছে। [বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮, প. সং ১৩২খ]। আবার বাংলায় প্রাচীন ঐন্দ্রজালিক ছড়ায়ও চণ্ডীকে 'হাড়িঝি' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হাড়ী জাতি আদিম অনার্য জাতির শাখা হতে উদ্ভূত। এর থেকেও চণ্ডীর মৌলিক অনার্য সংশ্রব সূচিত হয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

২. বজ্রতারা দেবী অষ্টবাহু বিশিষ্টা। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পক্ষেও আট সংখ্যাটি শুভসূচক। [বা. ম. কা. ই. পৃ. ৩৪৮ দ্রঃ।]

৩. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ২০৭।

৪. ঐ পৃ. ২০৯।

ধর্মকর্মের অন্যতম অঙ্গ ছিল, তা জানা যায়। কিন্তু সেখানেও সেই তথাকথিত 'ধর্ম-কর্মের' প্রতি কোনরকম উচ্চাঙ্গের শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায় নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতে' আবার মদ্যমাংস সহযোগে দেবী ভবানীর পূজার বর্ণনা রয়েছে। এই দেবীর প্রভাব, বিশেষ করে স্ত্রীসমাজে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এ ছাড়া মুকুন্দ-রামের চণ্ডীমঙ্গলে আর এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি 'বিপদনাশিনী' দেবী। সেকালের মেয়েরা বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় এই 'বিপদনাশিনী ব্রত' পালন করতেন।

"বিপদ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি"।[১]

প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, এই ব্রতের ব্রতীকে স্বয়ং দেবী চণ্ডীকা সর্ব বিপদে কর্ণ-ধারের মতো উত্তীর্ণ করেন। সুতরাং ইনিও চণ্ডীদেবী। বিপদে উদ্ধার পেলে দেবীর নিকট 'শতেক ছাগল' বলি দেবার মানসিকও করা হতো।

"সঙ্কটে তারিণী মাতা বিপদে কুশল।
উত্তীর্ণীতে গেলে দিব শতেক ছাগল।"[২]

। **মনসা** । দেবী চণ্ডীর পরেই উল্লেখযোগ্য সপ্তদশ শতাব্দীর রাঢ়ের আর এক লৌকিক দেবী 'মনসা'। পূর্ব শতাব্দীক্রমে পূজিতা এই দেবী মূলতঃ নিষাদ-কিরাত মিশ্র দেবী। এবং পরবর্তী কালে দ্রাবিড়, শবর ও আদি আর্য প্রভাবে প্রভাবিতা। 'কিরাতী মনসা' পর্বতে বাস করেন বলে তাঁর নাম 'পার্বতী' বা 'পর্বত-বাসিনী'। আদি আর্য ব্রাত্য ঋষি জরৎকারুর পত্নীত্ব স্বীকার করায় আর্য সমাজে তিনি 'জগদ্গৌরী' নামে পরিচিতা হলেন। কিন্তু আবত্বের শৃঙ্খল তিনি বেশী দিন সহ্য করতে পারেন নি।

বিশেষজ্ঞগণের মতে, বাংলার মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রাচীনতম। বাংলার গ্রামাঞ্চলের সর্প-বাহুল্য তথা সর্পভয়, সর্পদেবী মনসার লোকমানসে প্রবল প্রতাপান্বিতা হয়ে ওঠার কারণ। সাপ আদিম টোটেম, কৃষি ও প্রজননের সঙ্গে যুক্ত। মনসার কোলে শিশু[৩], এবং 'মনসা' কথার মধ্যে তাঁর কর্ষণ প্রজনন ঘনিষ্ঠতা সহজেই লক্ষিত হয়।[৪] শিবঠাকুরও সাপ, কৃষি ও প্রজননের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সহজেই মনসার নিকটতম আত্মীয় হয়েছেন। চণ্ডীর সঙ্গে মনসার ঝগড়া এবং পরিশেষে মনসার চণ্ডীকে জয়, জাতিদ্বন্দ্বে গোষ্ঠীগত ধর্মমতের বিরোধের ফলশ্রুতি হওয়া সম্ভব। রাঢ়ের লৌকিক দেবী মনসার মধ্যে বিভিন্ন আদিম গোষ্ঠীর ধর্মের দ্বন্দ্ব ও মিলন পর্বটি সুস্পষ্ট। রাঢ় অঞ্চলে মনসা পূজায় পণ্য সম্ভার পূর্ণ নৌকা

টানার ক্রিয়াটি আদিম সমাজের রোগ বিতাড়ণের একটি সুপরিচিত যাদুবিশ্বাস। ধর্মঠাকুর সম্পৃক্ত রচনাগুলির মধ্যে 'সাংজাত পদ্ধতি' (সাংজাত<সাংযাত্রিক, অর্থাৎ জল পথযাত্রী)[১] বা পূজাপদ্ধতিতে ধর্মঠাকুরের আদিপূজাস্থানে নৌকায় করে পণ্যসম্ভার নিয়ে গিয়ে পূজা ও তপশ্চরণ করার বর্ণনা রয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের রঞ্জাবতীর 'শালে ভর' কাহিনী ও লাউসেনের 'হাকন্দ সেবন' পালায় এই সংজাত পদ্ধতির বর্ণনা পাই। বর্তমান কালেও রাঢ়ের কোনো কোনো গ্রামে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে ময়ূরপঙ্খী নৌকা করে ধর্মঠাকুরকে নিয়ে চলার প্রথা প্রচলিত রয়েছে।[২] সেক্ষেত্রেও রোগ মুক্তির দেবতা ধর্মঠাকুরের উপর আদিম জনগোষ্ঠীর রোগ বিতাড়ণের উক্ত যাদুবিশ্বাসের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। উচ্চ বর্ণের পূজা লাভ করার জন্যে এই মনসা দেবীকে যে কতো কসরৎ করতে হয়েছিল, মনসামঙ্গল কাহিনীগুলিতে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবু রক্ষণশীল নারী সমাজের বাইরে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের এই দেবী কখনোই তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারেন নি।

ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে পাওয়া যায়, ধর্মের বিষ, প্রাচীনতর অর্থ রেতস্ পান করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিদেবতাকে জন্ম দিয়েছিলেন 'মনসা'।[৩] এই পৌরাণিক পরিকল্পনা রাঢ়ের জনজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ধর্মঠাকুর ও মনসা পাশাপাশি বিরাজ করছেন। ধর্মের কায়জ নারীরূপ মনসা ধর্মকামিন্যারূপে পূজিতা। সপ্তদশ শতকের জনসমাজে বিবিধ সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই 'মনসাদেবী' প্রবল প্রতাপান্বিতা গ্রাম দেবী। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বহু কবির মনসামঙ্গল কাব্য আমরা পাই দেবীর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য স্বরূপ। সতেরো শতকে বিভিন্ন কবির রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্য ছাড়াও, মনসা পূজা যে তৎকালীন সমাজে ধর্মকর্মের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল তার সাহিত্যিক উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] রাঢ়ভূমির অন্তর্গত বর্তমান বীরভূম জেলায় এখনও মনসা পূজার যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। ধর্মঠাকুরের মতো এই জেলায় প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে এক বা একাধিক মনসাদেবীরও মন্দির বর্তমান। সাধারণতঃ নিম্নজাতির মধ্যে সেখানে এই দেবী পূজিতা হয়ে থাকেন। এছাড়া বীরভূমের বিভিন্ন লৌকিক সংস্কারের মধ্যেও মনসা-দেবীর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

। **শীতলা**। এই সময়ের সাহিত্যে আর একটি লৌকিক দেবীর খবর পাওয়া যায়। ইনি মারিদেবী শীতলা। অন্যান্য অনেক লৌকিক দেবতার মতো শীতলারও জন্ম আদিম মানুষের ভয় ও অজ্ঞানতার পথে। সাধারণতঃ করপদহীন মুণ্ডাকৃতির শিলাখণ্ডেই এই দেবীর পূজা হয়ে থাকে। প্রস্তরোপাসনা অনার্য সংস্কৃতির

১. বা. সা. ই. পৃ. ৪৯৫।

২. বর্ধমান জেলার নাড়ুগ্রামে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজায় এখনও এই রীতি দেখা যায়।

৩. স্ক. ধ. ভূ. পৃ. ১।

৪. 'কুস্ত করি বিষহরি পূজে কোন জনে'। [চৈ. ভা. পৃ. ১৭]

পরিচায়ক। এই দেবীর মূর্তি পরিকল্পনা অনেক পরবর্তী কালের। কিন্তু সেখানেও অনার্য প্রভাব সুস্পষ্ট। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের বর্ণনায় এই দেবী রাসভবাহনা[১], মাথায় 'সোনার কুলো', কাঁখে 'হেমকুম্ভ' 'হাতে 'মার্জনী'।

অভয়া বরদা আপদেতে সদা
বিগুন বিনাশিনী নাম।
হেম কুম্ভ কাঁখে অবিরত থাকে
মার্জনী করে সুঠাম ॥[২]

অন্যত্র পাই—

গর্দভ উপরে সাজের আরম্ভ
মাথায় সোনার কুলো কাঁখে হেমকুম্ভ ॥[৩]

স্বর্ণ মার্জনী, সূর্যকিরণের প্রতীক। 'দক্ষিণ-রাঢ়ে এখনও সম্মার্জনীর দ্বারা অসাধ্য ব্যাধির আরোগ্য কামনায় গ্রহ বিপ্রেরা ঝাঁটা কাঠির উপচারে সূর্য পূজা করে মন্ত্র পাঠ করতে করতে ঝাঁটা কাঠির সাহায্যে রোগীর গা ঝেড়ে থাকেন।[৪] এই দিক দিয়ে শীতলা আদিম যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্তা। স্বর্ণকুলাও সূর্যের প্রতীক। আবার এই কুলার আকার অর্ধচন্দ্রের মতো। এর থেকে মনে হয় সূর্য-চন্দ্রের অনুকল্প রূপে শীতলার প্রহরণের মধ্যে ঝাঁটা ও কুলার লৌকিক রূপকল্পনা। শীতলা সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা। কারণ ইনি সবিতৃকন্যা সাবিত্রীর দুহিতা। এঁর 'অরুণ বরুণ' তারই প্রতীক। কৃষ্ণরাম দাস শীতলাকে 'ধরণীরূপা'[৫] বলেছেন। হরিদেবের মতে শীতলা রুদ্রশিবের ঘর্মজাত কন্যা।[৬] দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের ভগিনী। রুদ্রশিবের কন্যা হিসাবে ইনি আবার কৃষিদেবতা। তাই তাঁর অঙ্গ 'ধানচারা শোভিত।[৭] ইনি 'এলোকেশী'। এলোকেশ আভিচারিক ক্রিয়ার অঙ্গ বিশেষ। কবি বল্লভের মতে, শীতলা 'শিশুমুণ্ডধৃতা।

বাম হাতে ছেল্যামুণ্ড উল্লুক বাহন।[৮]

এবং ইনি কখনও কখনও 'দিগম্বরী বেশ' ধরেন।

'দিগম্বরী বেশ ধর ই বেশ ছাড়িয়া।'[৯]

অপর পক্ষে হরিদেবের শীতলামঙ্গলে দেবীর 'নাগলোক', 'ভল্লুক সহর' ও 'গন্ধর্ব রাজ্যে'

---

১. শীতলামঙ্গল' কাব্যের অপর কবি বল্লভের মতে 'রাসভ' বলদেরই এক রূপান্তর। [সা. প. প. ১৩০৫ পৃ. ৩৬]

২. কৃ. রা. গ্র. পৃ. ২৫১।

৩. ঐ পৃ. ২৭৯।

৪. সা. প্র. ৪র্থ, পৃ. ৩৭১।

৫. কৃ. রা. গ্র. পৃ. ২৫২।

৬. সা. প্র. ৪র্থ, পৃ. ২৩০।

৭. 'ধানচারা বিরাজিত অঙ্গ'। কৃ. রা. গ্র. পৃ. ২৫১।

৮. সা. প. প. ১৩০৪ পৃ. ৩৬।

৯. ঐ.

পূজা প্রচার, এই দেবীর আদিম আর্যেতর সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার রূপটি সুস্পষ্ট করে।

এই আর্যেতর লৌকিক দেবীটি সপ্তদশ শতকে এসে বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করেন। লক্ষ্মী, ষষ্ঠী ও শীতলার পাঁচালী প্রায় একই সময় রচিত হতে আরম্ভ করে। তবু কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী যেমন দ্রুত সাহিত্যে ও উচ্চতর সমাজে নিজেদের সসম্মান স্থান করে নিয়েছেন, কেবল মাত্র ব্যাধির দেবতা বলে শীতলা তেমন পারেন নি। বর্তমানেও তথাকথিত নিম্নতর সমাজেই এই দেবীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অধিক।

। **ষষ্ঠী** । রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে সন্তান জন্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা আর এক গ্রামদেবী হলেন ষষ্ঠী। কেউ কেউ[১] মনে করেন ষষ্ঠীক্ বা ষষ্ঠীকা হলো ব্রীহিধান্য বা প্রচলিত 'ষেঠে' ধান। এই ধান ষাট দিনে পাকে। ষষ্ঠীদেবীর উপাসনার মধ্যে কৃষিভিত্তিক মাতৃপ্রধান সমাজ জীবনের ইঙ্গিত রয়েছে। অপরপক্ষে, লোটন ধান থেকে 'লোটন-ষষ্ঠীর' কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল প্রধান কবিই 'জাতকর্ম-সংস্কারে' ষষ্ঠীপূজা বা সেট্‌রা পূজার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। শিশুরক্ষায় ষষ্ঠী-দেবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে দেবী ষষ্ঠীর মধুপুর গ্রামের আঁটকুড়া রাজাকে কৃপা করতে যাওয়ার কথা পাওয়া যায়। নবজাতকের ষষ্ঠ দিবসে তার রক্ষাকল্পে ষষ্ঠীদেবীকে বলিদান সহযোগে পূজার রীতির খবর পাওয়া যায় রূপরামের ধর্মমঙ্গলে।

'ছয় দিনে ষেটেরা পূজিয়ে বলিদানে'।[২]

রাঢ়-লোকধর্মে সবচেয়ে কৌতূহলজনক কৃত্য হলো, গোমুণ্ডে ষষ্ঠীপূজা। মুকুন্দরাম এর বিশেষ বর্ণনা করেছেন। ঈজিপ্সিয়ান (Hathor < সং ষট্) দেবীর নিম্নাঙ্গের গাভীরূপ, ষষ্ঠীদেবীর সঙ্গে তাঁর নাম ও ক্রিয়াকলাপ সাদৃশ্যে—এই 'গোমুণ্ড পূজা' প্রথার সঙ্গে ইন্দোমিশরীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সম্ভাব্যতা নির্দেশ করেছেন কোন কোন পণ্ডিত। অবশ্য বৈদিক জাতকৃত্য 'গোদান'-এর পরবর্তী রূপান্তর হিসাবেও এই প্রথা প্রচলিত হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৩] অনেকে অবশ্য আদি শস্যদেবী ষষ্ঠীর সঙ্গে গাভীর কৃষিকর্মজাত ঘনিষ্ঠতার প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন।[৪] ষষ্ঠীদেবীর সঙ্গে বেড়ালেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের খবর পাওয়া যায়। একটি ষষ্ঠীমঙ্গল পুঁথিতে[৫] দেবীর চৌষট্টি প্রকার বেড়াল বাহনের উল্লেখ এবং সে সম্পর্কে তত্ত্বকথাও লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে এই গ্রাম দেবীটি লোকসমাজে যে বিশেষ আদৃতা ছিলেন, সমকালীন সাহিত্যে তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

। **দক্ষিণরায়** । দক্ষিণ রাঢ়ের কোনো কোনো গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির দিন ও

১. লোকায়ত দর্শন, পৃ. ৩৫০।
২. রূ. ধ. পৃ. ৪৬।
৩. চি. প. স. চি. ১ম. পৃ. পৃ ৯০-৯২।
রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর পৃ. ৮৬।
৫. পল্লীশ্রী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ষষ্ঠী মঙ্গলের পুঁথি দ্রষ্টব্য।

পয়লা মাঘ যে লৌকিক দেবতাটির পূজা মহাসমারোহে হয়ে থাকে, তিনি ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়। সপ্তদশ শতকে এই দেবতাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের যে ধারাটির সৃষ্টি হয়, তার নাম 'রায়মঙ্গল'। সমসাময়িক বিভিন্ন কবির কাব্যে দক্ষিণরায়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় এঁর গায়ের রং সোনার বরণ, আকর্ণ বিস্তৃত লোচন, অন্যান্য অলংকারের সঙ্গে পিঠে ঢাল তলোয়ার, কোমরে ছুরি কাটারী, হাতে বাণপূর্ণ তূণ। এঁর বাহন হীরা বাঘ। বনের মাউল্যা, মলঙ্গী, নাবিক এঁর সেবা করে। এঁকে যে পূজা করে, বাঘ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। পুত্র বলিদানে পূজা দিলে ইনি তুষ্ট হয়ে মনস্কামনা পূর্ণ করেন। কোথাও ইনি দিব্য মূর্তিতে আবার কোথাও বা মুণ্ড মূর্তিতে পূজিত হন। আঠারো ভাটির অধীশ্বর এই দক্ষিণরায় ধান-চাষী ও মধুসেবী রুদ্রশিবের কামজ সন্তান রূপে ধানক্ষেত ও মধুবন রক্ষা করেন। ভাটির অধিকার নিয়ে বড়খাঁ গাজীর সঙ্গে এঁর বিরোধ বাধে।

দক্ষিণরায়ের এই পরিচয়ের মধ্যেই তাঁর আদিম অনার্য স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানব সভ্যতার উন্মেষ কাল থেকেই বৃক্ষাদি পূজার মতো মানবেতর প্রাণী পূজারও প্রচলন হয়। কোনো প্রাণী বা বস্তু বা ঘটনা রূপে গুণে উপকারিতায় সহজ ব্যাখ্যার অতীত হলেই আদিম মানুষের স্পর্শে, তা দেব ভাবনায় পর্যবসিত হতো। নিম্নবঙ্গের অরণ্যভূমির রূপে গুণে বিক্রমে ভয়ঙ্কর সুন্দর বাঘও ঐ পথে সহজেই দেবত্বে উন্নীত হয়েছিল। রাত্রিকালে বড়ো বড়ো মশাল জ্বেলে, সারারাত ধরে মহা সমারোহে ঢাকঢোল বাজিয়ে দক্ষিণরায়ের যে পূজারীতি, তা অনেকটা যেন বাঘ বিতাড়নের কথাই মনে করিয়ে দেয়। দক্ষিণরায় 'বারা প্রতীকে' 'মুণ্ডমূর্তিতেও' পূজিত।

বাঘের উপরে নাই দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায় ॥[১]

ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলেই এক সময় মুণ্ড পূজার প্রচলন ছিল। রাঢ়ের বিভিন্ন সতী পীঠ এবং অন্যান্য দেবস্থানের বিভিন্ন দেব-দেবীর মুণ্ডাকৃতি শিলা বা দারু মূর্তি, এই প্রাচীন মুণ্ড পূজার ঐতিহ্য বহন করছে।[২] কালক্রমে এই সব দেব-দেবী ব্রাহ্মণ্য পুরাণ অন্তর্গত হলেও, কোথাও কোথাও এঁদের আদিম রূপটি চিনে নিতে কষ্ট হয় না। দক্ষিণরায়ের প্রতীক-রূপে পূজিত এই মুণ্ডকেও শিবসুত গণেশের মুণ্ড বলে সমসাময়িক কবিগণ এঁর ওপর পৌরাণিক ভাবারোপের চেষ্টা করেন।

আচম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা।
দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা ॥[৩]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্যেতর জাতির মুণ্ডোপাসনা, দক্ষিণরায়ের ভাবরূপের সঙ্গে

১. কৃ. রা. গ্র. পৃ. ১৭৯।
২. সা. প্র. ৪র্থ। ভূ পৃ. ১৩৭। পা. টী. ১৩ দ্রঃ।
৩. হরিদেবের রায়মঙ্গল পৃ. ৩৯। সা. প্র. ৪র্থ।

মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অন্যদিকে, মুণ্ডরূপী দেব-দেবী মাত্রেই আবার মুণ্ড বলিদান কামনা করেন।

'কালীঘাটে মুণ্ড পূজা অঙ্গ বলি দিয়া।'[১]

দক্ষিণরায়ও তুষ্ট হন পুত্র বলিদানে। 'অখণ্ড কদলী পত্রে' 'সমাঙ্গ রুধির পূজা' কামনা করেন ইনি।[২] এই দিক্ দিয়ে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে এঁর সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। রুদ্রদেবের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়, 'রতাই বাউল্যা' পুষ্পের পরিবর্তে 'নিজ মাথা' কর্তন করে রায়ের পূজা করতে চায়। এখানেও ধর্মপূজার 'হাকন্দ সেবনের' ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দক্ষিণরায়ের স্বরূপে এই সব লৌকিক রূপ ও পরবর্তী পৌরাণিক রূপারোপ ছাড়া অন্য একটি প্রভাবেরও ইঙ্গিত মেলে। আঠারো ভাটির অধীশ্বর রায়মল্ল দক্ষিণরায়ের বাঘ সেনার বর্ণনায় মনে হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেন সমগ্র বাগ্দী সমাজটিকেই আমরা দেখতে পাই।[৩] এই কারণে আমাদের মনে হয়, দক্ষিণরায় দক্ষিণ রাঢ়ের, বিশেষ করে ভাটি অঞ্চলের ব্যাঘ্র টোটেমধারী কিরাত-রাই জাতির জাতীয় দেবতা হতে পারেন।. পরবর্তী কালে কোনো সামন্ত রাজার বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এই দেব-কল্পনায় আরোপিত হতে পারে; যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর বিরোধের অংশটুকুর মধ্যে।

শতাব্দক্রমে প্রচলিত এই লৌকিক ধর্ম-কর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপরেই রাঢ় বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ও অবৈদিক বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। যদিও আমাদের আলোচ্য সময়ে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অবিকৃত রূপে প্রচলনের কোনো প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি, তবু দেশীয় লোকাচার ও পৌরাণিক ধর্মাচরণের মধ্যে তার অবশেষ চিহ্নটুকু শতাব্দীর সাহিত্যে স্পষ্টই আভাসিত।

॥ জৈন ধর্ম ॥

রাঢ়ে জৈন ধর্ম প্রথম কখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন সূত্র গ্রন্থ থেকে মনে হয়, মহাবীর বর্ধমান রাঢ় প্রদেশে এসেছিলেন খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে।[৪] তাঁর এদেশে দীর্ঘ অবস্থান ও কেবলত্ব লাভের কাহিনী থেকে মনে হয়, ঐ সময় থেকেই রাঢদেশে জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। পরে পাল আধিপত্যের কাল থেকেই এদেশে জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।[৫] তবু এই ধর্ম কখনোই একেবারে লুপ্ত হয়ে

---

১. হরিদেবের রায়মঙ্গল, পৃ. ৭৮। সা. প্র. ৪র্থ।
২. রুদ্রদেবের রায় মঙ্গল পৃ. ১৪০। সা. প্র. ৫।
৩. ঐ. পৃ. ১২৩-৩৩।
৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৫৯৩।
৫. চিন্ময় বঙ্গ, পৃ. ১৩।

যায় নি। অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতকেও যে গৌড়ে এবং বঙ্গে জৈন সঙ্ঘের কিছু অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তার নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্তমান কালেও রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে অনেক জৈন মূর্তি, কোথাও ষষ্ঠী[২] কোথাও ভৈরব[৩] আবার কোথাও বা মনসাদেবী রূপে পূজা পাচ্ছেন। অন্য দিকে, জৈন লৌকিক দেবদেবী মণ্ডলে হিন্দুদেবতা শিব, রুদ্র, ইন্দ্র, স্কন্দ, যক্ষ ও অম্বিকা যথাক্রমে শিবমহ, রুদ্রমহ, ইন্দ্রমহ, স্কন্দমহ, যক্ষমহ ও অজ্জা-কোট্টকিরিয়া রূপে এবং নামান্তরে পূজিত হতে দেখা যায়।[৪]

সামাজিক রীতি নীতির মধ্যে নবজাতকের ষষ্ঠ দিবসে শিশুর কপালে বিধাতা পুরুষ এসে জাতকের ভবিষ্যৎ ভাগ্য লিখে দিয়ে যান, আজকের মতো সেকালেও প্রচলিত হিন্দুর এই বিশেষ বিশ্বাসটির উল্লেখ পাওয়া যায় ভদ্রবাহু রচিত 'কল্পসূত্রে'।[৫] বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ, মনসামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীতে জৈন ধর্মের প্রভাব উপলব্ধ হয়।[৬]

শতাব্দবাহিত এই ধর্মমতের একটি ক্ষীণ ধারা সতেরো শতকেও বহমান ছিল বলে মনে হয়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর প্রতিষ্ঠিত 'গুজরাট নগরে' বিভিন্ন জাতির আগমনের প্রসঙ্গে 'সরাক' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, এরা জাতিতে তন্তুবায়, জীবহিংসা করে না এবং নিরামিষাশী।

সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহি কাটে
সর্বস্থানে তার নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ি নিত্য বুনে পাট শাড়ী।[৭]

এই সরাক জাতি জৈন শ্রাবকদেরই অবশেষ বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই এখনও অল্প বিস্তর সরাকদের বসবাস আছে।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দেবী চণ্ডী বনদুর্গা। এই দেবীর কাছে বনের পশুকুল যখন কংস নদীর তীরে কালকেতুর পশুহত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে অভয় বর প্রার্থনা করে, তখন তার মধ্যে এই জৈন অহিংস ধর্ম ভাবনাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. 'বসন্ত বিলাস' গ্রন্থের দশম সর্গের বর্ণনা অনুসারে চালুক্যরাজ বীরধবলের মন্ত্রী বস্তুপাল (১২১৯-৭৩) যখন একবার জৈন-তীর্থ পরিভ্রমণে যান, তখন তাঁর সঙ্গে লাট, গৌড়, মরু, ধারা, অবন্তি এবং বঙ্গের সংঘ-পতিগণও গিয়েছিলেন···। (বা. ই. পৃ. ৬৫০)

২. বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত বেলুটী গ্রামে দিগম্বর জৈন মূর্তি ষষ্ঠীদেবীরূপে পূজিত হতে দেখেছি।

৩. রাঢ়ের বহুস্থানে জৈন মূর্তি আজও ভৈরবরূপে পূজা পেয়ে আসছেন।

৪. L. A. I. Pp. 215-225. বর্ধমান, শারদীয়, ১৩৮৪। 'জৈনগণের লৌকিক দেবদেবী'. প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫. চি. ব. পৃ. ১৪।

৬. বা. সা. ই. পৃ. ৪৯২।

৭. ক. ক. চ. পৃ. ৩৫৭।

॥ বৌদ্ধ ধর্ম ॥

সেন আমলের রাজকীয় বিরাগ, উচ্চ ও মধ্য কোটির জনগণের অনুদার দৃষ্টি এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সক্রিয় পোষকতার ফলে, রাঢ়ে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ বৌদ্ধধর্মের ক্রম-সংকোচন ঘটে। তুর্কী আক্রমণ এই সংকুচিত বৌদ্ধ ধর্মকে প্রায় বিলুপ্তির পথে নিয়ে যায়।

অবশ্য তার বহু পূর্ব থেকেই একান্ত স্বাভাবিক সমাজ নিয়মেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে একটি সংঘর্ষ ও সমন্বয় সাধনা চলে আসছিল। এরই ফলশ্রুতিতে এক দিকে যেমন বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের পদদলিত করে বজ্রযানী বিভিন্ন মূর্তি-কল্পনা[১], অন্যদিকে বেদ বিরোধী, যজ্ঞ-বিরোধী স্বয়ং বুদ্ধদেবের বিষ্ণুর দশাবতার মধ্যে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

সতেরো শতকে তারা, চামুণ্ডা, বাসুলী প্রভৃতি দেবীকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের দেবীগনের পরিণতি হিসাবে যেমন দেখতে পাই, অন্য দিকে মঞ্জুঘোষ, অপরাজিতা, যক্ষ ইত্যাদির মতো বিশুদ্ধ বৌদ্ধ দেব-দেবীর পূজারও খবর পাওয়া যায়।[২] দেবী তারা বা উগ্রতারা চীন তিব্বত অঞ্চল থেকে বৌদ্ধতন্ত্রে এবং বৌদ্ধতন্ত্রের মাধ্যমে হিন্দুতন্ত্রের দেবী রূপে গৃহীতা হয়েছেন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।[৩] দেবী চামুণ্ডাও বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত দেবী নন। বৌদ্ধ 'সাধন মালায়' যে সপ্তদেবী পরিবৃতা মহাকালের বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে 'চর্চিকা' রূপে চামুণ্ডার স্থানও রয়েছে। এই দেবীও চামুণ্ডার মতোই অস্থিসার এবং প্রসারিত শবদেহের উপর নৃত্যরতা।[৪] সর্পদেবী মনসার সঙ্গেও শুক্লাবর্ণা চতুর্ভুজা জটামুকুটিনী শুক্লোত্তরীয়া সিতরত্নালঙ্কারবতী শুক্লসর্পভূষিতা' বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবীর সমন্বয় ভাবনাটি সুস্পষ্ট।[৫] দেবী জাঙ্গুলী বিষবিদ্যা বলে বিষবৈদ্যের নাম হয় 'জাঙ্গুলিক' বা 'জাঙ্গলিক'। এই জাঙ্গুলী দেবী পরে মনসা দেবীর সঙ্গে মিশে যান, তাই মনসার নাম হয় 'জাগুলি'। মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর 'মনসা বিজয়' কাব্যে দেবী মনসার 'জাগুলি' নামের লোক ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন—"জাগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।" দেবী সরস্বতীও বৌদ্ধদের মধ্যে নানা

১. 'অক্ষোভ্যকুলের' দেবতা 'বিঘ্নান্তকের' পদতলে হিন্দুদেবতা গণেশকে নিষ্পেষিত অবস্থায় দেখা যায়। বৌদ্ধ দেবদেবী পৃ. ৫৮।

বৌদ্ধ দেবতা 'ত্রৈলোক্য-বিজয়' শিব ও গৌরীকে পদদলিত করেন। ঐ পৃ. ৫৯।

বৌদ্ধ 'অপরাজিতা' গণপতিকে পদদলিত করেন। ঐ পৃ. ৮০।

দেবী 'প্রসন্নতারার' মূর্তিকল্পনায় হিন্দু দেবতা ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্ম, 'মার'রূপে দেবীর পদতলে নিষ্পেষিত হন। ঐ পৃ. ৮১।

২. চৈ. ভা. পৃ. ১৮।

৩. ভারতের শাক্তি সাধনা ও শাক্তি সাহিত্য, পৃ. ১৩০-৩১।

৪. বৌ. দে. পৃ. ৬৮।

৫. বা. সা. ই. পৃ. ১১২।

রূপে পূজিতা।[১] এ ছাড়া, বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বরের বিভিন্ন রূপকল্পনার মধ্যে 'নীলকণ্ঠ' মূর্তিতে তিনি হিন্দু দেবতা মহাদেবের সমরূপ। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশে দেব-দেবীর সঙ্গে যে সব ডাকিনী যোগিনীর বন্দনা পাওয়া যায়,[২] তন্ত্র সাধনার সেই শক্তির সহচরী ডাকিনী যোগিনী ইত্যাদির বিকৃত ও বীভৎস মূর্তিগুলির কল্পনা, তিব্বতের মধ্যে দিয়ে চীন থেকে আগত বলে মনে করা হয়।[৩]

শুধু দেব-দেবীর মূর্তিতে সংস্কৃতির অবশেষ চিহ্নটুকু ছাড়াও, মধ্যযুগে রাঢ়ের নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু লোক যে বসবাস করতেন, তার কিছু প্রমাণ রয়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতের' বর্ণনা থেকে মনে হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। অন্য দিকে বৌদ্ধদেরও শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের বর্ণনা পাওয়া যায় 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে।[৪] অবধূত নিত্যানন্দ তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে যে সব বৌদ্ধদের দেখা পেয়েছিলেন, তাদের মাথায় ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাত করেছিলেন, তার বর্ণনা রয়েছে 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৌদ্ধদের পাষণ্ড নামে উল্লেখ করেছেন সর্বত্র। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বুদ্ধ অবতারের কথা বলতে গিয়ে বেদ বিরোধী বৌদ্ধদের মতবাদকে 'পাষণ্ডমত' বলে উল্লেখ করেছেন।

"ধরিয়া পাষণ্ড মত নিন্দা করি বেদপথ
বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ॥"

এই সব উল্লেখ থেকে সেই যুগ-মনোভাবটি অনুধাবন করলে মনে হয় রাঢ় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিছু লোক যাঁরা ছিলেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের খুব নীচুস্তরের জীব বলেই মনে করতেন।

বস্তুতঃ, সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রকৃতপক্ষে, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে, নাথপন্থী ধর্মে, অবধূতমার্গীদের ধ্যান-ধারণায় ও কৌলমার্গীদের ধর্মে ও অভ্যাসে মিশে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। আজও এই ধর্মের অবশেষ প্রচ্ছন্ন ভাবে টিকে আছে আউল বাউল দরবেশ ইত্যাদি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে।

॥ নাথ ধর্ম ॥

'নাথ' শব্দটি অতি প্রাচীন শব্দ। অর্ধ মাগধী প্রাকৃতে 'নাথ' কথাটি পাওয়া যায়। অধ্যাপক জ্যাকোবি শব্দটিকে 'জ্ঞাতৃক' শব্দজাত বলে মনে করেছিলেন।

১. বৌ দে. পৃ. ৫৬।

২. 'ডাকিনী জোগিনী বন্দো আর মুখ চুর্ণি'। সী ধ. ক. বি. পুঁ সং ২৪৭০। প. সং ৫ক। ডাকিনী যোগিনা বন্দো—। ক. ক. চ. পৃ. ২৫।

৩. ভা. শ. শা. সা. পৃ. ১৩১।

৪. চৈ. চ. (মধ্য) পৃ. ২৬৩ ৬৪।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিবর্তিত রূপান্তর 'জাতি' শব্দটি পছন্দ করেন। এই 'নাথ' শব্দটি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর 'গোর্খ-বিজয়' গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য সুনিতকুমারের অনুসরণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডঃ মণ্ডল অর্ধ-মাগধী 'নায়' শব্দজাত 'নাথ' শব্দটির পক্ষপাতী। হিমালয় শৃঙ্গের 'অছি' দেবতা (Guardian Diety) 'নাথ' এবং আযেতর জাতির নানা আদিম ভাষার মধ্যে 'নত', 'নাত', 'নাট', 'নাথ' শব্দ আছে। 'নাত' সমগ্র ইন্দোচীনীয় জাতির সুপ্রাচীন লৌকিক দেবতা।

তান্ত্রিক মহাযানপন্থী বৌদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ অনেক সিদ্ধাচার্যই ছিলেন নাথ যোগপন্থী। এক কথায়, নানা সংস্কার-সম্পৃক্ত আর্য-পূর্ব ও আর্য, তথা তান্ত্রিক ও বৈদিক ধারাবাহী যোগধর্মের সঙ্গে, বৌদ্ধ সহজযান ও বজ্রযানের মিশ্রণ হয়ে তার সঙ্গে প্রতিবেশী তিব্বতী-চীনীয় ও অষ্ট্রিক প্রভাব আংশিক যুক্ত হয়ে, সমন্বয়ধর্মী বাংলার জনপদেই নাথ যোগ পন্থের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছিল।

'গোর্খ-বিজয়' গ্রন্থে দেখা যায়, এই নাথ যোগীরা মাথায় জটা, কানে কুণ্ডল, শঙ্খ বা কড়ি; গলায় নাদবিন্দু[১]; হাতে রুদ্রাক্ষ, খন্তা, ত্রিশূল; আঙুলে লম্বা নখ, পায়ে নূপুর, পরনে কৌপিন ও গায়ে ভস্ম লেপন করতেন। উপবীত ধারণ করে ব্রাহ্মণ হবার মতো 'কর্ণে কড়ি দিয়ে' যোগী হওয়ার খবর পওয়া যায় 'গোর্খ-বিজয়' গ্রন্থে।

'পুণরুপি যোগী হইব কর্ণে কড়ি দিয়া।'

নাথ ধর্ম পুরোপুরি তান্ত্রিক ও বৈদিক ধারায় প্রবাহিত হলেও, যোগীদের বেশ-ভূষার উপকরণে ও আচার ব্যবহারে আর্যেতর প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়।

দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই এই নাথ যোগীরা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানেন। দেহ নিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেই জন্য দেহ সম্বন্ধে তাঁরা সহজেই কৌতুহলী হয়েছেন। দেহ যন্ত্রের অস্থি-সন্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ত্বে রাখা ও পরিচালিত করাই হলো তাঁদের সাধনার মুখ্য লক্ষ। তাই প্রাণ-অপান-বায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচক-পূরক তত্ত্ব; দেহদ্বার, নাড়ী, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অনু-সন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাঁদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। এই একই কারণে নানা-রূপ পরিভাষারও প্রয়োজন হয়েছে। এইভাবে দশমী-দুয়ার, চন্দ্র-সূর্য, গঙ্গা-যমুনা, ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না প্রভৃতি নানা পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে।

এই কায়া সাধনা অতি প্রাচীন তত্ত্ব ও পদ্ধতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম বাঙালি তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করে নি। তবে নেপাল, তিব্বত ছাড়া, বৌদ্ধ যুগে কেবল রাঢ় বাংলায়ই এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ করা যায়। রাঢ়েই এই সহজিয়া নাথ পন্থের উদ্ভব।

এদেশে নাথ ধর্মের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত ছিল আমাদের আলোচ্য সপ্তদশ শতাব্দীতেও। এই শতকের শেষদিকে মার্শাল ভারত পর্যটনের বিবরণে

১, 'নাদ' হলো নিরঞ্জনের পদচিহ্ন এবং 'বিন্দু' হলো কৃষ্ণবর্ণ উর্ণাসূত্র, যাতে 'নাদ' গাঁথা থাকে। গো. বি. ভূ. দ্রঃ।

বাঙালি যোগীর ব্রহ্মচর্য ও তাঁদের রাসায়নিক বিদ্যায় দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন।[১] ঐ সময় লিখিত 'দবিস্তান' নামক গ্রন্থেও নাথ যোগীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংকলিত হয়েছে।

নাথ পন্থী যোগীরা বিশেষভাবে ছিলেন পরিব্রাজক, নাস্তিক ও বেদাচার বহির্ভূত। এই কারণেই এঁরা ব্রাহ্মণ্য সমাজে নিন্দিত ছিলেন। বর্ণাশ্রমীদের দৃষ্টিতে নাথ যোগীদের আচরণ ছিল জুগুপ্সিত। এঁদের আহার-বিহারও ছিল কদর্য।[২] তাই গ্রামের বাইরে এদের বাস নির্দিষ্ট থাকতো। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'গায়ে নানা তীর্থ চিন্' পরিব্রাজক ভিক্ষাজীবী কাপালী সন্ন্যাসীদের গ্রাম প্রান্তে অবস্থানের খবর পাওয়া যায়।

এই নাথ যোগী সম্প্রদায় শিঙ্গা ডমরু বাজিয়ে শিবের গীত গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াতেন।

"শিঙ্গা সে ডমুরা বায়। শূলপতি গীত গায়।
কানে শোভে শঙ্খের কুণ্ডল॥"[৩]

নাথ যোগীদের আদিগুরু শিবকে[৪] 'গোর্খ-বিজয়ে' আমরা এই বেশভূষাতেই দেখতে পাই।

"মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা।
ঝল মল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা॥"[৫]

তবে 'নাথ' পদবী যুক্ত গৃহস্থ যোগী সম্প্রদায়ও ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁত বুনতেন।

"নগরে অনেক যোগী বসিলা ভিক্ষার ভোগী।
কেহ বুনে বসন কম্বল॥"[৬]

এদের আচার ব্যবহার কিছুটা অন্য রকম ছিল।

ধর্মমঙ্গল বা শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর, আর নাথ ঐতিহ্যের নিরঞ্জন আদিনাথ অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পুরাণ কথা ও নিরঞ্জনের সৃষ্টি বর্ণনা একই। এই কারণেই নাথ সাহিত্য ও ধর্ম পুরাণ কাব্যে নিরঞ্জনের সৃষ্টি বর্ণনা প্রধান স্থান লাভ করেছে। ধর্মঠাকুরের শিব-সাযুজ্যের সন্ধিক্ষণে ভৈরবের ভয়াবহতা নিয়ে পঞ্চানন্দের উদ্ভব। এই পঞ্চানন্দের পূজার অন্যতম প্রবর্তক নাথ যোগীরা। আমরা প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে

---

১. গো. বি. ভু. দ্রঃ।

২. 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে এরূপ একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

৩. ক. ক. চ. পৃ. ৩৬০।

৪. দেবাদিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্য-অনার্য তত্ত্ব ও ধর্ম বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। তাই যোগ পন্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথ পন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক।

৫. পৃ. ৪।

৬. ক. ক. চ. পৃ. ৩৬০।

দেখেছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একাধিক গ্রামে নাথ যোগীদের গৃহে বর্তমানেও পঞ্চানন্দ-ঠাকুর ধর্মরাজ রূপে পূজিত। কোন কোন গবেষকও এই প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন।[১] পরবর্তী কালে শিবঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের মিলন প্রতিষ্ঠার পরে নাথ যোগী সম্প্রদায়ও শিবের আরাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

নাথ পন্থী এই কায়যোগ ধর্ম মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। নাথ যোগের রূপক কাহিনী পদ্মাবতীর জায়সী মুসলমান। সুফী সাধকদের মধ্যে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ তথা কায়যোগের উদ্দেশ পাওয়া যায়। 'গোরখ-বাণীতে' সুফী রতন নাথ হাজীর পদ রয়েছে। বে-শরা, আজাদ, রসুলশাহী ইত্যাদী পন্থে যোগীদের আসন, দেহতত্ত্ব, ষট্‌চক্র ইত্যাদি সমস্ত সাধনাই প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমানে রাঢ়ের দরবেশ, বাউল, জিজিকগণ এই ধারারই ক্রম পরিণতি।

॥ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ॥

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো রাঢ়দেশেও পৌরাণিক ধর্ম সুপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারী। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রত্ন তথ্যাদি থেকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবী ও তাঁদের কেন্দ্র করে বহু আখ্যানের কথা জানা যায়। রাঢ়ে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, পৌরাণিক ধর্মের এই মূল পাঁচটি সম্প্রদায়। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ধর্মমতেরই আমাদের আলোচ্য সময়ের রাঢ়ের সমাজে, বিশেষ করে উচ্চ ও মধ্যকোটিতে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ছিল। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস এবং লৌকিক ধারার সমন্বয়, পৌরাণিক ধর্ম মণ্ডলে যে বিচিত্র দেব-দেবীর আগমন ঘটিয়েছে, আগেই সে কথা বলা হয়েছে।

মধ্যযুগীয় শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধানের কোনো রকম নির্দিষ্ট গণ্ডী ছিল না। এই দিক্ দিয়ে বিচার করলে আলোচ্য সময়ের রাঢ়ের সাধারণ বাঙালিকে পঞ্চোপাসকও বলা চলে। সাধারণতঃ ইষ্টদেবতাকে কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপন করে পূজা করার রীতি প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন ধর্ম কর্মে 'পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ' মন্ত্র পাঠ করে ফুল জল অর্ঘ্য দানে পঞ্চ দেবতার পূজা করতেন। বাংলার ধর্ম জীবনের এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক কাল পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে।

পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রকে অবলম্বন করে রাঢ়-বাংলায় যে বিশেষ মাতৃপূজা বিধি গড়ে ওঠে, দ্বাদশ শতকের আগে তা ব্যাপক ধর্মমতের আকার লাভ করে নি। অন্য দিকে, দেহ ও শক্তি আশ্রিত গুহ্য তন্ত্রসাধনাও ষোড়শ শতক পর্যন্ত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নিত্যপূজা রূপে শক্তি পূজার প্রচলন পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের আগেই যে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল, এমন কথা বলার মতো আমাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য নেই। ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে[২] মাতৃপূজা এবং শক্তি সাধনার প্রচলন বাংলায় অনেক আগে থেকে হলেও, খ্রীষ্টীয়-

১. পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি দ্র।
২. ভা. শ. শা. সা. পৃ. ১১।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সেটি এক নবরূপ লাভ করেছে, এবং এই নবরূপেই বাংলার তথা আমাদের রাঢ়ের সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

মধ্যযুগের রাঢ়ের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে সব দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাদেবীর প্রতিভূত্ব নিয়েই আবির্ভূতা হন নি, একথা আগেই বলা হয়েছে।

। **দেবী দুর্গা** । মধ্যযুগের শাক্ত দেবীগণের মধ্যে দুর্গা ও কালী প্রধান। এর মধ্যে শারদীয়া পূজা বা দুর্গাপূজা বাঙালি সমাজের সর্বপ্রধান উৎসব। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে[১] বিষুব দিনদ্বয়, অয়নাদি দিনদ্বয় ও ঋতুর আরম্ভ ইত্যাদি জ্যোতিষিক যোগ উপলক্ষে স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের অনেক উৎসবের সূত্রপাত হয়। প্রাচীন আর্যগণ ঋতু আরম্ভে যজ্ঞ করতেন। বহু সহস্রাব্দ পূর্বেকার শারদ যজ্ঞ দিনের স্মৃতিও শারদীয়া দুর্গা পূজার অনুষ্ঠানের মধ্যে এসে মিশেছে।

দুর্গাপূজা ঠিক্ কখন থেকে রাঢ় বাংলায় প্রচলিত হয়, সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকা-পুরাণ শ্রেণীর কয়েকখানি উপপুরাণ অবলম্বনে রচিত কতকগুলি দুর্গাপূজা-বিধান পাওয়া যায়। অন্যান্যদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থের অন্তর্গত 'দুর্গোৎসবতত্ত্বে' দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি বর্ণনা করেছেন। রঘুনন্দন তাঁর পূর্বতন পণ্ডিতমত ও প্রচলিত প্রবাদসমূহ থেকে উক্ত গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। সাধারণতঃ পূজাবিধি রচিত হবার কিছু পূর্ব থেকেই পূজা প্রচলিত থাকে। তবু আমাদের বর্তমান কালে যে ভাবে দুর্গা পূজার প্রচলন, তা প্রথম আকবরের রাজত্বকালে, মনুসংহিতার বঙ্গদেশী প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণের নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে, প্রতিমায় দুর্গাপূজার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছিল বলে কথিত আছে।[২] সুতরাং মনে হয় বর্তমান কালে যে পদ্ধতিতে দুর্গা পূজা হয়, তার সূচনা চতুর্দশ শতক বা তার কিছু পূর্বে হলেও, সম্ভবতঃ ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে তা ঠিক্ বর্তমান রূপ ধারণ করে নি। তবে এই দুর্গা পূজার আদিতেও একটি উৎসবের রূপ ছিল। সম্ভবতঃ দুর্গা পূজায় এই উৎসব প্রাধান্যের জন্যেই সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার পরিবর্তে কালী এবং দশমহাবিদ্যার অন্যান্য দেবীগণ প্রাধান্য লাভ করলেন।

দেবী পূজার ক্ষেত্রে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকার পূজাই[৩] বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ কর্তৃক অনুমোদিত। তবে দুর্গা পূজা প্রথম থেকেই রাজসিক সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গীয় স্মৃতি নিবন্ধসমূহে উল্লিখিত

১, পূজা পাবন দ্রঃ।

২. বা. দে. ই. পৃ. ২৭৯।

৩. সাত্ত্বিকীপূজাতে জপ, যজ্ঞ এবং নিরামিষ পূজোপকরণ থাকবে। রাজসী পূজাতে জপ যজ্ঞাদির সঙ্গে পশু বলি হবে এবং পূজোপকরণ হবে আমিষ। তামসী পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্যে। এই পূজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নেই এবং পূজোপকরণ মদ্য, মাংসা দি।

দশমী তিথিতে করণীয় শবরোৎসব ও বন্য পশু বলিদানের রীতির মাধ্যমে, এই পূজায় অনার্য প্রভাব সুস্পষ্ট। শবরোৎসবের অন্তর্গত অশ্লীল বাক্য বিনিময় বা 'ডোম-চাড়ালী'[১] এবং অশ্লীল নৃত্যগীতাদি মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত দুর্গা পূজা উৎসবের অন্তর্গত ছিল বলে জানা যায়। অনার্য প্রভাব ছাড়াও মধ্যযুগের তান্ত্রিক কদাচারের প্রভাবও এর উপর পড়তে পারে।

প্রধান সাংবাৎসরিক উৎসব হিসাবে দুর্গা পূজার এই যে প্রচলন, যার মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য এমন কি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই অংশ গ্রহণ, রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি ভাবনার মধ্যে মধ্যযুগের এবং বিশেষতঃ আমাদের আলোচ্য শতকের এটি একটি অন্যতম সংযোজন। দুর্গা পূজার বিবিধ উপাচার সংগ্রহের মাধ্যমে পুরোহিতের সঙ্গে কামার, কুমোর, মালাকার, নাপিত, তন্তুবায়, নট্ট প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা ধনী গৃহস্বামীর সঙ্গে সকলকে সাময়িকভাবে শুধু এক পরিবারভুক্তই করে না, সমাজকে দৃঢ়-সংবদ্ধ করে।

দুর্গা পূজার এই উৎসব-প্রধান রূপটির পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কাব্যে। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে দুর্গোৎসব কালে 'মৃদঙ্গ-মন্দিরা শঙ্খ' বাজাবার কথা রয়েছে।

"মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে ঘরে ঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥"[২]

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'ছাগল মহিষ মেষ' বলি সহযোগে 'ষোড়শ উপচারে' ঘরে ঘরে দুর্গাপূজার আনন্দ এবং 'উত্তম বসনে' সজ্জিত নর-নারীর উৎসবে যোগদানের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩] রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে' মহা ধুমধামে বলি সহযোগে দুর্গা পূজা এবং পূজান্তে 'জলপানে'র কথা আছে।[৪]

। **দেবী কালী**। পূজার দিক থেকে বিচার করলে কালী পূজা অপেক্ষা দুর্গা পূজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎসব হিসেবে দুর্গা পূজার ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা এবং জাঁকজমক থাকলেও, সাধনার দিক্ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে শক্তি সাধনার কেন্দ্রে রয়েছেন কালী।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক অথবা তাঁর পরবর্তী কালের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রণীত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে সংগৃহীত কালীপূজার বিধান দিয়েই রাঢ়ে বর্তমানরূপে প্রচলিত

১. আমরা প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখেছি উত্তর রাঢে ক্ষীর গ্রামে যোগাদ্যার পূজায় আনুষ্ঠানিক 'ডোম-চাড়ালী' কৃত্যের এখনও প্রচলন রয়েছে।

২. চৈ. ভা. (ম.) পৃ. ৩২৩।

৩. ক ক. চ. পৃ. ২৫৯-৬০।

৪. রূ. ধ. পৃ. ৬৯।

কালীপূজার সূত্রপাত হয়। 'তন্ত্রসারে'র মধ্যে কালী বা শ্যামা পূজার বিধি ছাড়া, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রমূখ মহাবিদ্যাসাধন বিধিও সংকলিত হয়েছে। দেবীকে অবলম্বন করে রাঢ় বাংলার যে তন্ত্র সাধনা, সেই সাধনা ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই মুখ্যভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল কালী সাধনা ও দশ-মহাবিদ্যার সঙ্গে।[১] ঐ সময় থেকেই আমরা কালী এবং অন্যান্য দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শক্তি সাধকদের কথা জানতে পারি। এঁদের মধ্যে ষোড়শ শতকের প্রসিদ্ধ সর্বানন্দ ঠাকুর ছাড়াও কালীপূজার বিধান রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি সাধকদের পরিচয় পাওয়া যায়।

চণ্ডীর মতো কালীরও প্রকৃতির মধ্যে জটিলতা রয়েছে। কালক্রমে অনার্য সমাজের অনেক ভয়ংকরী দেবীও কালী নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একীভূতা হয়ে গেছেন। রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী, মহাকালী ইত্যাদি অনেক দেবীরই উদ্ভব যেমন স্বতন্ত্র ধর্ম প্রবৃত্তি থেকে, তেমনি তাঁদের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। আবার এই কালী মুর্তির পরিকল্পনায় আসামের নরমুণ্ড শিকারী (Head-Hunter) নাগা জাতিরও প্রভাব থাকতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন।[২]

মুণ্ডমালিনী লোলরক্তজিহ্বা দেবীর শত্রুসংহার প্রকৃতি ও অনার্য রূপ-কল্পনা তাঁকে দস্যু তস্করদের উপাস্য করে তুলেছে। আলোচ্য শতকের 'কালিকামঙ্গল'-এর কাহিনী ছাড়াও, প্রায় প্রত্যেক কবির 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও দেবীর এই চৌর্য সহায়িকা রূপটি সুস্পষ্ট। বিভিন্ন 'ধর্মমঙ্গলে' দেখা যায়, শিশু লাউসেনকে চুরি করবার পূর্বে 'ইন্দামেটে' রাত্রিকালে কালীপূজা সমাপনান্তে দেবীর অভয়বাণী লাভ করে তবে চৌর্য কার্যে অগ্রসর হয়।

ষোড়শ শতক থেকে পূর্ববঙ্গে এই দেবীকে কেন্দ্র করে 'কালিকামঙ্গল' শ্রেণীর কাব্যধারার সূত্রপাত হলেও, রাঢ়ে এই শ্রেণীর কাব্য রচনার সূচনা হয় সপ্তদশ শতকে। তবে 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের সংখ্যা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অনেক কম। রাঢ়ে প্রচলিত 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় কাহিনী প্রধান স্থান অধিকার করেছে। অন্য দিকে, 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের সূচনা পর্বের প্রথম তিন কবি, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান এবং গোবিন্দদাস। এই তিন জনেরই কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে। পণ্ডিতগণ মনে করেন[৩] এঁরা সকলে উক্ত অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্রভূমি রাঢ়দেশ থেকে অনেক দূরে এই কাব্য ধারার প্রথম সূচনা হয়েছিল। এটি খুবই বিস্ময়াবহ।

১. ভা. শ. শা. সা. পৃ. ৭৬।
২. বা. ম. কা. ই. পৃ. ৬৮৪।
৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃ. ৮৯।

। **দেবী সরস্বতী** । রাঢ় অঞ্চলে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজার প্রচলন আছে। এই দেবীকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে 'সারদামঙ্গল', বা 'সারদাচরিত', 'সরস্বতীমঙ্গল', 'সরস্বতী বন্দনা' ইত্যাদি দু-চারখানি বিক্ষিপ্ত কাব্য রচিত হলেও আমাদের আলোচ্য সময়ে এই দেবীর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কোনো খবর সেখানে পাওয়া যায় না। বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক এই 'সারদামঙ্গল' জাতীয় কাব্যের প্রচার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ়ের অশিক্ষিত সাধারণ সমাজে স্বাভাবিকভাবেই দেবী সরস্বতী এবং তাঁর 'মঙ্গল কাব্যের' কোনো আবেদন ছিল না। তবে মধ্যযুগের প্রধান প্রধান কবিরা প্রত্যেকেই তাঁদের কাব্যের শুরুতে এই দেবীর বন্দনা করেছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'সরস্বতী বন্দনায়' লিখেছেন—

শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শুক্লধুতি পরিধান
কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার।
... ...
শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জপমালা
শুক শিশু শোভে বাম করে।[১]

মসীপাত্র, লেখনী ও পুস্তক এই দেবীর সঙ্গী। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, বেণুবীণা, নানা বাদ্যযন্ত্র তাঁর সেবা করে। তিনি 'বিধিমুখে বেদধ্বনি', 'বীণাপাণি,' 'বর্ণময়ী', 'বিষ্ণুমায়া'। মুকুন্দরামের বন্দনায় সরস্বতী চতুর্ভুজা। বিভিন্ন পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রে[২] এই দেবী কখনও দ্বিভূজা, কখনও চতুর্ভুজা, কোথাও দ্বিনয়না, কোথাও ত্রিনয়না। লক্ষ্মী সরস্বতী একেরই দুই অংশ। উভয়েই ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, মেধাস্মৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পরবর্তী কালে পৃথক দুই দেবীরূপে এঁরা সমাজে পূজিতা হতে থাকেন।

। **লক্ষ্মী দেবী** । রাঢ়ে প্রচলিত লক্ষ্মীর চরিত্র বা কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিক দেবী লক্ষ্মীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লক্ষ করলে দেখা যায়, যদিও শক্তি রূপে, পত্নী রূপে এই দেবী বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্তা, তবুও তাঁর অন্য একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ও রয়েছে। তিনি শস্য, সৌন্দর্য ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আপন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিতা।

গবেষক পণ্ডিতগণ ঋক্‌বেদের শ্রীসূক্তটি[৩] বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীদেবী যে শুধু সম্পদ রূপিনী ও কান্তি রূপিনী তাই নয়, পরবর্তী কালের লক্ষ্মী দেবীর পৌরাণিক উপাখ্যানের অনেক বীজ এই দেবীর রূপের ও বিশেষণের মধ্যে নিহিত আছে। এই লক্ষ্মীদেবীকে অনেক স্থানেই 'আদ্রা' বলা হয়েছে। পরবর্তী লক্ষ্মীর 'সমুদ্র-সম্ভূতত্বে'র মূল রয়েছে হয়তো এই রূপের মধ্যে। তাছাড়াও, 'পরবর্তী

১. ক. ক. চ. পৃ. ৪-৫।

২. ষোড়শ শতাব্দীর স্মার্ত রঘুনন্দন 'শারদা তিলক' নামক তন্ত্র গ্রন্থ থেকে দেবী সরস্বতীর যে ধ্যান মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন, আজ পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে তাঁর প্রচলন রয়েছে।

৩. এই শ্রীসূক্তটি ঋক্ বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তে খিল সূক্তস্থিত পঞ্চদশটি ঋক্ মন্ত্র।

কালে সমুদ্রপথে বাণিজ্য যাত্রা করে বণিকশ্রেণীকে ধন আহরণ করতে হতো। সমুদ্র গর্ভের মুক্তা-শঙ্খ-ঝিনুকাদি রত্নরাজি আহরণ করেও অনেকে ধন সঞ্চয় করতেন। এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে লক্ষ্মীকে সমুদ্র মন্থন-জাত কল্পনা করাও বিচিত্র নয়। শ্রীসূক্তে দেবীকে 'পদ্মে স্থিতা' 'পদ্ম বর্ণা' বলার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মীদেবীর পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলা রূপের উদ্ভব। লক্ষ্মীকে 'পুস্করিণীং' বলা হয়েছে। 'পুষ্কর' যেমন পদ্মকোষ বাচক, তেমনি গজ শুণ্ডাগ্র বাচকও। লক্ষ্মীর এই বিশেষণের মধ্যে রয়েছে পরবর্তী কালের 'গজলক্ষ্মী' মূর্তির বীজ। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত 'কমলে-কামিনী' উপাখ্যান এই গজলক্ষ্মীর কিংবদন্তী অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

লক্ষ্মী পূজায় আর্য বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য দেখা গেলেও, তাঁর পূজার উপকরণের মধ্যে ঘট, ধান, কড়ি, ঝাঁপির মধ্যে দিয়ে অনার্য সংশ্লেষের স্বাক্ষটি সুস্পষ্ট। মনে হয়, রাঢ়ের অন্যান্য বহু দেব-দেবীর মতো, লক্ষ্মীদেবীও মূলতঃ প্রাক্ আর্য পূজিতা এক স্বতন্ত্র কৃষি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাঢ়ের আদিবাসী অষ্ট্রিকরা অন্যান্য অনেক জিনিষের চাষ করলেও ধানই ছিল তাদের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। উক্ত কৃষি-ভিত্তিক সমাজের আদি দেবী, কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হওয়াই সম্ভব। কালক্রমে আর্য-অনার্য ভাবনার সমীকরণের সোপান বেয়ে তিনিই দেখা দিলেন লক্ষ্মী রূপে।

সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কমলামঙ্গল' কাব্যে আমরা যে লক্ষ্মীদেবীর পরিচয় পাই তিনি কৃষির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী। লক্ষ্মীদেবী সেখানে 'আভরণ ধান্যের পরিয়া নবরঙ্গে'[১] কমলদহে ভক্তকে ছলনা করেন, গরুড় তাঁর সহায় হন। কবি এই 'ধান্যাভরণা দেবীর' সঙ্গে 'ধান্যের বন্দনা'ও[২] করেছেন। কৃষ্ণরামই সর্বপ্রথম লক্ষ্মীর ব্রতকথাকে মঙ্গলকাব্যে উন্নীত করেছেন।

দ্বিজ নরোত্তমের 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যে[৩] 'পোদের নন্দন'কে দিয়ে চাষ করাবার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মীদেবীর মাধ্যমে কৃষিকার্যের প্রচারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে রচিত বিভিন্ন কবির[৪] 'লক্ষ্মীমঙ্গল' বা 'লক্ষীচরিত্র' কাব্যগুলি একান্তই ব্রতকথা মূলক। এর থেকে মনে হয়, তৎকালীন রাঢ়ের নারী সমাজে লক্ষ্মীপূজা ও ব্রত পালনের যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

। **সূর্য দেব** । রাঢ়ে সূর্য দেবের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা থাকলেও, অন্ততঃ মধ্যযুগে স্বতন্ত্র সৌর সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় না। তবে, বাংলায় নানা স্থানে প্রাপ্ত সূর্য মূর্তি এক কালে এঁর পূজার বহুল প্রচারের ইঙ্গিত করে। শাস্ত্রীয় সূর্যোৎসবের উল্লেখ রঘুনন্দনের গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু, আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে এই দেবতার পূজা বিভিন্ন লৌকিক দেবতার সঙ্গে মিশ্রিতভাবে এবং

১. কৃ. রা. গ্র. পৃ. ৩০৩।
২. ঐ. পৃ. ৩০৪।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং. ৯৩৩।
৪. বি. ভা. পুঁ. সং ৫৫৬৪, ৫৫১২. ৫৮৬৬, ৬১৪৯ ইত্যাদি দ্রঃ।

জনপ্রিয় ও আড়ম্বরপূর্ণ বিভিন্ন মেয়েলি ব্রতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ়ে সূর্য-দেবতা অনেকাংশে জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে, এই দেবতার পৃথক পূজার প্রচলন দেখা যায় না।[১] কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন না থাকায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বারব্রতের মাধ্যমে এই দেবতা তাঁর অস্তিত্ব রক্ষা করে বর্তমান রয়েছেন। তাই বৈদিক সূর্যোপাসনার সঙ্গে এর স্থূল পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য। রাঢ় অঞ্চলে সম্ভবতঃ এইজন্যেই সূর্যপূজা বেশীদিন প্রচলিত থাকে নি। এছাড়া, পদ্মের উপরে 'স্থানক' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ সূর্যদেবতা, তাঁর এক পাশে উষা ও অপর পাশে প্রত্যুষা নামে দুই স্ত্রী—এবং সম্মুখে পায়েরকাছে সারথী অরুণ—রূপকল্পনার দিক্ থেকে এই প্রতিমার সঙ্গে 'স্থানক' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণুদেবতা, তাঁর দুই পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুই স্ত্রী, এবং সম্মুখে পায়ের কাছে বাহন গরুড়—এই দুই প্রতিমার পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। এছাড়া, বিষ্ণুর সঙ্গে সূর্যের একটি সুপ্রাচীন বৈদিক সম্পর্ক তো ছিলই। অন্ততঃ মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত সাহিত্যে স্বতন্ত্র সৌর উপাসনার কোনো পরিচয় না পাওয়ায়, মনে হয়, রাঢ় অঞ্চলে একাধারে বিষ্ণুর ও ধর্মঠাকুরের পক্ষে সূর্যকে গ্রাস করে ফেলা অসম্ভব নয়।

। **পৌরাণিক শিব**। প্রাথমিক স্তরে বাংলায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন যে পাশুপত-মাহেশ্বর সম্প্রদায়ভুক্ত শৈবসাধকগণ, তাঁরা বেশীদিন তাঁদের বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেন নি। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে মিলিত হয়ে শৈবযোগ অচিরে মিশ্র-সাধনাচারে পরিণত হয়। নাথ যোগীদের কথা আমরা আগেই বলেছি। এ ছাড়াও, মধ্যযুগের সাহিত্যে বিভিন্ন শৈবযোগীর খবরও পাওয়া যায়।

"নগরে অনেক যোগী বসিলা ভিক্ষার ভোগী
কেহ বুনে বসন কম্বল।
সিঙ্গা সে ডমুরু বায় শূলপতি গীত গায়
কানে শোভে শঙ্খের কুণ্ডল" ॥"[২]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন।"[৩]

শৈবযোগ তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, এবং তন্ত্রের সহায়ে শিবশক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে দেশজ ধর্মাচারে স্থান ও প্রাধান্য লাভ করে। পরবর্তী কালে এই শৈব-শাক্ত-তন্ত্র বৈষ্ণব সাধনায় প্রবেশ করে দেহ সাধনাকে প্রবল করে তোলে।

শৈবধর্মের প্রধান উপাস্য পৌরাণিক শিব, লোকনাথ বা লোকায়ত শিবঠাকুরের

১. আমরা বর্তমান অধ্যায়ে পূর্বেই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্য দেবতার মিলন-মিশ্রণের কথা উল্লেখ করেছি।

২. ক. ক. চ. পৃ. ৩৬০।

৩. চৈ. ভা. (ম). পৃ. ২০৮।

সঙ্গে মিশে যাওয়াতে তাঁর পৌরাণিক রূপ অপেক্ষা লৌকিক রূপই সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সতেরো শতকে শিবমাহাত্ম্য মূলক রচনা 'চণ্ডীমঙ্গল' 'ধর্মমঙ্গল' ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্য হিসাবে পৃথকভাবে রচিত হতে থাকে। শিবায়ন কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীর কাব্য আঠারো শতকের প্রথম দশকের রচনা হলেও, সতেরো শতকেই এই কাব্যধারার সূচনা হয়। শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণ রায় সতেরো শতকের লোক। কবিরা শিবঠাকুরকে দোষেগুণে হতদরিদ্র সাধারণ বাঙালি করে গড়ে তোলায়, সমাজে শিবচরিত্র যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে, শিবায়ন কাব্যেরও জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

। **তন্ত্র-সাধনা**। রাঢ়ীয় ধর্মজীবনে তান্ত্রিক গুহ্যসাধনাও এই সময়ের সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পূজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, তান্ত্রিক মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার ও জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্ত রাঢ় বাংলা তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান ছিল। দেহকে যন্ত্রস্বরূপ করে এই তান্ত্রিক গুহ্য সাধনাপদ্ধতি পরবর্তী কালে লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিলে মিশে বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি করে। এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা, বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির মধ্য দিয়ে যে সহজিয়া রূপ ধারণ করেছে, তারই ঐতিহাসিক ক্রমঃ পরিণতি মধ্যযুগের রাঢ়ের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা এবং কোন কোন বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার মধ্যে দেখা যায়।

তান্ত্রিকদের বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্ত-চারী এবং কৌলাচারী ইত্যাদি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায় রয়েছে। এদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য সময়ে বামাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। বামাচারী তান্ত্রিক উপাসকদের প্রসঙ্গে চৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবনদাসের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

"নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া
... .
এগুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।

রাত্র করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমালা বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সভা সনে বিবিধ রমণ॥"[১]

মধ্যযুগের রাঢ়ের ধর্মসংস্কৃতিতে এই আপাতদৃষ্টিতে উৎকট, অশ্লীল ও ব্যাভিচারী গুহ্য তন্ত্রসাধনা যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মধ্য-

১. চৈ. ভা. পৃ. ২১৪।

যুগের বিবিধ ধর্মচর্যায় ও লোকচর্যায় এই যে কামাশ্রয়ী অশ্লীলতার প্রকাশ, যার প্রতিফলন সমকালীন সাহিত্যের গণ্ডী পেরিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত, তার অনেকখানিই এই সাধারণ বুদ্ধির অগম্য গুহ্যসাধনার আপাত বীভৎস রূপের বিকৃত ফলশ্রুতি।

মূলতঃ বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তন্ত্রের শিব ও শক্তি একই তত্ত্বের ভিন্ন দিক্ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও রাধা এবং রাম ও সীতা—এই সব যুগলও এই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কাব্যে সৃষ্টিকাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে এক আদিদেবীর উৎপত্তির কাহিনী পাই। 'শূন্যপুরাণে' দেখি, শূন্য-নিরঞ্জন ধর্মের ঘর্ম থেকে এই 'আদ্যাশক্তি'র জন্ম; বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলে দেখা যায়, সৃষ্টিকাম নিরঞ্জন আদিদেবের বাম পার্শ্বে 'আচম্বিতে' দেবীর আবির্ভাব হলো। সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গলে নিরঞ্জন নিজেই এক সুন্দরী কন্যার রূপ ধারণ করে, আবার নিজেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। 'গোর্খবিজয়ে' দেখি, সৃষ্টির পূর্বে ধর্ম-নিরঞ্জন নিদ্রাভিভূত ছিলেন, সৃষ্টিকাম হয়ে, জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাশে এক ছায়ামূর্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনিই দেবী 'আদ্যা'। কবিকঙ্কণের মতে—

"চিন্তিলে এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।"[১]

চণ্ডীমঙ্গল এবং কয়েকটি ধর্মমঙ্গলে শিব ও চণ্ডীর পৃথক্ বর্ণনা মেলে। সে সব বর্ণনার পরে, সৃষ্টি প্রকরণকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কবিগণের এই যে আদি দেব ও আদ্যা দেবী বা পুরুষ-প্রকৃতির যুগলকল্পনা, এটিকে সামাজিক ঐতিহ্য রূপে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-তন্ত্রের আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার ধারা বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন।[২]

। **রামপূজা**। আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে উচ্চবর্ণের মধ্যে রামসীতার যুগল মূর্তি বা রামমূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবাল্য সঙ্গী মুরারী গুপ্ত রামোপাসক ছিলেন। সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গলের ভণিতায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীরামচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"জয় রাম রাঘব অনাথ ভগবান।
ইন্দাসের দেহারা বন্দিব সাবধান॥"[৩]

আঠারো শতকের প্রথম দশকের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও রামোপাসক ছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ের হাওড়া অঞ্চলে, বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে অত্যন্ত জাঁকযমকপূর্ণ বারো-

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩৬।
২. ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ. ১৪৫-৪৬।
৩. সী. ধ.। ক. বি. পুঁ. সং ২৪৩৩। প. সং ১ক।

স্বারী রামপূজা।[১] এই রকম কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া রামপূজা বর্তমানে রাঢ় তথা পশ্চিমবঙ্গে একরকম লুপ্ত হয়ে গেছে বলা যায়।

। **রাধাকৃষ্ণ**। মাধবেন্দ্রপুরী এদেশে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে গোপালপূজার প্রবর্তন করেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকেই বৃন্দাবনে গোস্বামীদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির উপাসনা আরম্ভ হয়। সতেরো শতকে এই রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির আদর্শে গৌরনিতাই-এর যুগলমূর্তির পূজার প্রচলন হয়। এই পূজার প্রথম প্রবর্তক অদ্বৈত আচার্য হলেও, এর ব্যাপক প্রচলন করেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর।

॥ **বৈষ্ণবধর্ম** ॥ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মর্ত্যলীলার পরিসমাপ্তি। 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, তা শ্রীচৈতন্যের আদর্শে প্রবর্তিত। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জন্যে নামসংকীর্তন, এই মৌল আদর্শের উপরে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত এই নববৈষ্ণব ভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই এই নবধর্মের সঙ্গে বাংলার প্রথম পরিচয় হলেও, তাঁর তিরোভাবের পরে, সমগ্র বাংলায় এর সম্প্রসারণ এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক ব্যাখ্যায় এর প্রতিষ্ঠা। এই নববৈষ্ণবধর্ম শ্রীচৈতন্যের দ্বারা গড়ে উঠলেও, বাংলার সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের পরিচয় সুপ্রাচীন কালের।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, বিষ্ণুর যাঁরা উপাসক, তাঁরাই পরবর্তী কালে বৈষ্ণব নামে অভিহিত হলেও ভক্তিধর্মের পথিক ছিলেন না। কৃষ্ণ উপাসকেরা, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে ও লীলামাধুর্যে বিশ্বাসী, তাঁরাই কেবল আধুনিক অর্থে প্রকৃত বৈষ্ণব। ভারতের নানা অঞ্চলে গোপকৃষ্ণ বা বাসুদেব কৃষ্ণের এই উপাসক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের পরিচয় মহাভারতের পূর্ব কাল থেকেই পাওয়া যায়।[২] ভাগবত আশ্রিত ভক্তিধর্মের ইতিহাসও বহু শতাব্দীর। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে আল্‌বার সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিস্তৃতি, ভক্তিধর্মের ইতিহাসে একটি উল্লেখ্য বিষয়। গোপী সহ কৃষ্ণলীলার বিষয়, ভাগবতের পর এঁরাই প্রথম বর্ণনা করেছেন। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য ও বল্লভাচার্য প্রমুখ ভক্তি-তত্ত্ববাদীগণ যথাক্রমে, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী মতের সঙ্গে ঈশ্বরভক্তির সমন্বয় সাধন করে ভক্তির ধারাকে একটি তাত্ত্বিক-প্রতিষ্ঠা দান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম একদিকে যেমন এই চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মতের দ্বারা প্রভাবিত, অন্য দিকে তেমনি রসভাবপ্রবণ দ্রাবিড় দেশীয় আল্‌বার সম্প্রদায়ের ভাবপুষ্ট।

১. 'শ্রমণ', শ্রাবণ ১৩৮৪ সংখ্যায় এ সম্পর্কে বর্তমান লেখিকার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'হাওড়া জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রীঅচল ভট্টাচার্য উক্ত প্রবন্ধের উল্লেখ করে তথ্য ব্যবহার করেন। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীবিনয় ঘোষও উক্ত প্রবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করেন। কিন্তু লেখিকার নাম উল্লেখ করেন নি।

২. The Early History of the Vaisnava Sect.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের আগে, অর্থাৎ ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে, এদেশে একটি প্রাক গৌড়ীয় বহির্বঙ্গীয় ভক্তিভাব আশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের ধারা প্রবাহিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবও মাধবেন্দ্রপুরীকে ভক্তিরসের আদি সূত্রধার বলে উল্লেখ করেছেন।

"ভক্তি রসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার॥"[১]

ইনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে কথিত আছে। পুরী সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-পুরী এবং পরমানন্দপুরী—এই দুই ভক্তিভাবুকই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। এছাড়া, কেশব ভারতী, অদ্বৈত আচার্য ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে প্রেমভক্তি বিষয়ে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন। নিত্যানন্দের তিনি দীক্ষাগুরু না হলেও, তাঁকে প্রেমভক্তি বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছিলেন। অন্য দিকে, শ্রীচৈতন্যের আবাল্যসঙ্গী মুরারী গুপ্ত ছিলেন রামোপাসক। সুতরাং দেখা যায়, মহাপ্রভুর পূর্বে রামায়েৎ সম্প্রদায়ের ভক্তিভাবুকতাও এদেশে প্রচলিত ছিল। ভক্তিভাবের দিক্ দিয়ে সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও, রামানন্দ সম্প্রদায় কৃষ্ণের পূজা না করে রামের পূজা করতেন। রাঢ়-বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে, সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নববৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের সময়, এই বহির্বঙ্গীয় সম্প্রদায় আশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের প্রচলন ছিল, যা পরবর্তী শতাব্দক্রমেও চৈতন্য প্রবর্তিত নবধর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন 'শ্রীপাট' আশ্রয় করে বর্তমান ছিল। বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগে রক্ষিত 'শ্রীঠাকুর সকলের পাট' নামক একখানি পুঁথিতে[২] এরকম ৬৭টি 'শ্রীপাটের'-গ্রাম নামের একটি তালিকা রয়েছে। চৈতন্যপ্রবর্তিত নবধর্মের ভাববন্যা, পরবর্তী কালে উক্ত 'শ্রীপাট'-গুলিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। কোনো কোনোটির আবার সম্পূর্ণ রূপান্তরও ঘটায়।

ভক্তিধর্মকে পরিপুষ্ট করলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানে এবং বিস্তারে এই প্রাক-গৌড়ীয় ধর্ম বিশেষ কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি। একদিকে যেমন প্রেমের আখ্যান-সংবলিত কৃষ্ণলীলার প্রতি আগ্রহ, অন্যদিকে আ-চণ্ডাল সকলের জন্যে উন্মুক্ত পরমানন্দময় নামগানের মধ্যে দিয়ে সহজ ধর্মপালন, এই পথে সাধারণ মানুষের জীবনের পূর্ণতম বিকাশের ঔৎসুক্যই এই নবধর্ম বিস্তারের মূল স্বরূপ। এই নব মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব।

এদেশের ব্রাহ্মণ্য-পুরোহিতবাদ এবং বর্ণাশ্রমী সমাজের শাসনে নিষ্পেষিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যখন সাম্যবাদ এবং রাজনৈতিক সুবিধা লাভের উপায় হিসেবে ইসলামধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণে প্রলুব্ধ হলো, হিন্দুসমাজের সেই ভাঙনের কালে শ্রীচৈতন্যদেব জাতি, ধর্ম, উচ্চ, নীচ নির্বিশেষে সব মানুষকে তাঁর নবধর্মে স্থান দিয়ে,

১. চৈ. ভা. (আ), পৃ. ৬৯।

২. বি. ভা. পুঁ, সং ২৭৭। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই 'শ্রীপাট'-গুলির কিছু কিছু অস্তিত্ব বর্তমানেও রয়েছে।

সাধারণ মানুষের জীবনের মহত্তম মূল্য নির্ধারণ করলেন, এবং হিন্দু সমাজের সেই বিপর্যয় রোধ করলেন।

বৃন্দাবনদাস প্রমুখ সমাজদর্শী কবির চোখে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের প্রথম পাদের বাংলার সামাজিক জীবন ছিল 'কৃষ্ণভক্তিশূন্য'—'ব্যবহার রসে মত্ত',

"ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥"[১]

তখন সেই লঘু ব্যবহাররসে প্রমত্ত সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব যে ধর্মোন্মাদনা আনলেন, তাতে মূর্খ-নীচ ইত্যাদি আ-চণ্ডাল সকলেরই স্থান হলো। এই ধর্মবিপ্লবের ফলে, বহু শূদ্র এবং অল্পসংখ্যক মুসলমানের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ, জাতিভেদের শিথিলতা, এমন কি ব্রাহ্মণেতর জাতির সাধকের নিঃসংকোচে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দান, 'সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি', ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এক মহৎ সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু, সে সম্ভাবনার বিনাশও হলো এক শতাব্দীর মধ্যেই।

বৈষ্ণবধর্মে সম্প্রদায়ভেদ এবং মতভেদ, শ্রীল নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের তিরোভাবের পরে সঞ্জাত হতে থাকে। জাহ্নবা ঠাকুরাণী ও বীরচন্দ্র মহাপ্রভু এই ভিন্নমুখী ধারাগুলিকে সংহত এবং স্ব-সম্প্রদায়গত করবার জন্যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে, অন্ততঃ অষ্টম দশক পর্যন্ত, প্রচুর যত্ন ও পরিশ্রম করেন। এঁদের উদ্যোগ স্তিমিত হতে না হতেই, মধ্য বঙ্গে আচার্য শ্রীনিবাস এবং উত্তরবঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের আত্মপ্রকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সুবিন্যস্ত, সুসংহত এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসসিদ্ধান্ত এবং কাব্য, নাটক ইত্যাদি এই সময়েই রাঢ় বাংলায় প্রচারিত হয়। এই সময়ই অনেক প্রসিদ্ধ পদকর্তা মহাজনদের পদরচনার কাল এবং কীর্তনের বিস্তৃতির কাল। এ হলো ষোড়শ শতকের শেষ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের কথা। এই উজ্জীবনের প্রভাব আমাদের আলোচ্য সময়ের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। যদিও ইতিমধ্যে দল-স্বার্থবাদী কিছু মহন্ত এবং গুরুগোঁসাই যে এই লোকধর্ম মার্গ ক্ষুণ্ণ না করেছিলেন এমন নয়। এই সময় থেকেই তন্ত্রবাহিত সহজ সাধন ও শাক্তমতের প্রভাবে আধা শাক্ত, আধা বৈষ্ণব এবং আধা বৈষ্ণব, আধা সহজিয়া এক বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। একদিকে, রঘুনন্দনকে সাক্ষ্য করে সমাজের উচ্চকোটির মানুষেরা দুর্গাপূজা ও অন্যান্য স্মার্ত অনুষ্ঠানাদিতে প্রবৃত্ত হন। অন্য দিকে, বর্ণ ভেদ, উচ্চবর্ণের অহমিকা, অস্পৃশ্যতার পরিব্যাপ্তির মধ্যে আ-চণ্ডালের আশ্রয় বৈষ্ণবধর্ম এবং পরকীয়াসাধন, কিশোর-ভজন ইত্যাদি বিভিন্ন বিকৃত আচার অনুষ্ঠান সহযোগে 'শ্রীপাট' আশ্রয় করে টিকে রইলো। অবশ্য, তখনও দেশে বৈষ্ণবানুষ্ঠান হতো।

১. চৈ. ভা. (আ.), পৃ. ১৮।

"ঘরে ঘরে দেবতা সেবয়ে সর্ব জন।
নরনারী মিলে করে হরি সংকীর্তন ।।"[১]

সতেরো শতকে এই বৈষ্ণবতার প্রভাব যে কতো হাস্যকর হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের অন্যত্র—

"রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী।
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী ॥
চারা মানা হাথিকে ঘোড়াকে মানা ঘাস।
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস ।।"

এছাড়া সতেরো শতকের অন্যান্য অনেক কাব্যেই এই বৈষ্ণবতার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিভিন্ন স্থানে লক্ষ করা যায়। যেমন ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'ধন্বন্তরি' পালায় গোয়ালিনী বেশী দেবী মনসার উক্তি—

"শিশুকালে বিকে যাই মথুরার হাটে।
নন্দের নন্দন দানী যমুনার ঘাটে ॥
প্রতিদিন উষাকালে লইয়া পসরা।
সাত পাচ সখী সঙ্গে যাইতাম মোরা ।।
প্রধান গোপিনী তায় রাধা চন্দ্রাবলী।
হরিপ্রিয়া সুধামুখী কনক পুতুলি ।।"[২]

অথবা—

"বিষতাল খেয়ে মৈল যতেক রাখাল।
মন্ত্র পড়ে জীয়াইল ঠাকুর গোপাল।
তেমনি মরি আছিলু খায়্যা বিষ দধি ॥"[৩]

বিভিন্ন বিকৃত আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই সব বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অনুষ্ঠানও সমান ভাবেই হতো। 'শ্রীপাটে' দিবারাত্রি সংকীর্তন হতো এবং কীর্তনের শেষে দেবতাকে ভোগ অর্পণের পরে প্রসাদ বিতরণ করা হতো। বৈষ্ণব পণ্ডিতরা তখনও স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদের তর্কযুদ্ধে সবিশেষ আনন্দ অনুভব করতেন।[৪]

। **বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়**। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে যে পরকীয়াবাদ দার্শনিক-তত্ত্ব হিসেবে স্থান লাভ করেছিল, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে, তা পরমতত্ত্ব রূপে স্বীকৃত হলেও, পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাকে প্রাকৃত জীবনের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। তাত্ত্বিক দিক্ থেকে রাধা, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির প্রকাশ বলে স্বকীয়া এবং

১. রূ. ধ. পৃ. ৩৮।
২. ক্ষে. ম. পৃ. ১৭১।
৩. ঐ, পৃ. ১৭৮।
৪. এই প্রসঙ্গে ১১৩৭ বঙ্গাব্দের একটি পত্রের উল্লেখ করা যায়। সেখানে দেখা যায়, বৃন্দাবন থেকে আগত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর দল, গৌড়মণ্ডলে স্বকীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এসে পরাজিত হয়ে জয়পত্র লিখে দিয়ে যান। এই সাংস্কৃতিক রণ ছয়মাস ব্যাপী চলেছিল। [চি. প. স. চি. ২য়। পৃ. ১১২-১৪]।

লৌকিক দৃষ্টিতে রাধা, আয়ান ঘোষের স্ত্রী বলে পরকীয়া। ভগবানের ডাকে সাড়া দিতে হলে সংসার বন্ধন শিথিল করে পথে বার হতে হয়, এই হলো পরকীয়া অভিসার। প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বিভিন্ন কবির রচনায় রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পরকীয়াতত্ত্ব এমন প্রচার লাভ করেছিল যে, প্রাকৃত জীব জগতের আচার ব্যবহারের সঙ্গে যে এই পরমতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, এই তত্ত্বকথায় তাকে আর চাপা দেবার উপায় ছিল না। সতেরো শতকের দিকে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের আবেগ-উচ্ছল 'গৌর-নাগরভাব'। নরহরি, লোচনদাস প্রমুখ বৈষ্ণবগণ এই 'নাগরী-ভাবে'র সাধক ছিলেন। তাঁরা নিজেদের 'নাগরী' এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে 'নাগর' রূপে দেখতেন। ব্যক্তিবিশেষের কাছে আদরণীয় হলেও এই 'নাগরী' ভাবের মধ্যে যে আদিরসাত্মক সাধনার দিকটি ছিল, তার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরকীয়াবাদ যুক্ত হয়ে অনধিকারীর হাতে পড়ে এর এক বিকৃত রূপের উদ্ভব হলো।

পূর্ববর্তী বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়, (যাঁরা তখনও সমাজে কোনো রকমে আত্মগোপন করে টিকে ছিল) সেন আমলের রাজকীয় বিরোধিতায়, তুর্কী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় এবং হিন্দু সমাজের বিদ্বেষের ফলে তাঁরা তাদের গুহ্য-সাধনাকে সেন আমলে প্রসারিত বাংলার রাধাকৃষ্ণ সম্বলিত বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। এরই ফলে, বাংলায় বৈষ্ণব সহজিয়া মত গড়ে ওঠে। চৈতন্যোত্তর যুগে এই সহজিয়া মত ব্যাপক প্রসার লাভ করতে থাকে।

বৈষ্ণব সহজিয়ারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'রাধাবাদের' সঙ্গে তাঁদের 'পুরুষ-প্রকৃতি' বাদকে অভিন্ন ধরে নিয়ে এবং প্রেমকে তাঁদের ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে 'নায়িকা-ভজনে'র যে বিধি প্রচলিত করলেন, তাতে পরকীয়া নারীরই ছিল প্রাধান্য। এর ফলে তাঁদের প্রেমসাধনা শেষ পর্যন্ত একান্তই আদি রিপুর অনুশীলনে পরিণত হলো। ফলে, সমাজে যে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হলো, তার প্রতিফলন ঘটলো সমাজের সর্বস্তরে।

। **নেড়া-নেড়ী**। বৈষ্ণব সহজিয়াদের একটি শাখা 'নেড়া-নেড়ী' নামে পরিচিত ছিল। এঁরা ছিলেন বর্ণাশ্রমবহির্ভূত। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবশেষ, মুণ্ডিত মস্তক এই সম্প্রদায় 'নেড়া-নেড়ী' নাম নিয়ে সমাজে যে রহস্যময় সাধনভজন চালিয়ে যেতেন, নারী পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ও আদি রিপুর চর্চাই ছিল তার মূলকেন্দ্রে। সতেরো শতকের শেষের দিকে শ্রীল নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র এই সব 'নেড়া-নেড়ী'র দলকে দীক্ষা দিয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত করে, সংযত ও নিয়মাবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন বলে জানা যায়।[১] অসংযত জীবনাচারে অভ্যস্ত এই সব নিম্নশ্রেণীর সমাজচ্যুত জনগোষ্ঠী, যাঁরা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনকে মূলতঃ বজায় রেখেই বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়াতলে এসে আশ্রয় নিলেন—এঁদের বৈষ্ণব সমাজে স্থান দেওয়ার ফলে, বৈষ্ণব

১. চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, পৃ. ১৬৬।

সমাজের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কতকগুলি উপ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে এঁরা সম্প্রদায়গতভাবে ভিন্ন হলেও, দেহ-সাধন-ঘটিত সাধনায় ক্ষেত্রে এঁদের উপরে সহজিয়া সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

। **বাউল** । বাউলধর্ম মূলতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ত্ব ইত্যাদি মিলিত হয়ে বাউলধর্ম একটি সমন্বয়মূলক বিশিষ্ট ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাউলদের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই পরমাত্মা বিরাজমান। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলেই ঈশ্বর উপলব্ধি হয়। এই 'মনের মানুষে'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় প্রেমের মধ্য দিয়ে। এই দিক্ দিয়ে, সহজিয়া বৈষ্ণবরা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার উপলব্ধি করেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা অনুযায়ী জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফতে অদ্বৈতাচার্য শ্রীচৈতন্যদেবকে যে প্রহেলিকাপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাতে 'বাউল' কথাটি ছিল।

"বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিয় হাটে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"[১]

বাউলরা এই প্রহেলিকাটিকে নিজেদের সম্প্রদায়ের অনুকূল অর্থে গ্রহণ করেন। অনেকে আবার অদ্বৈত আচার্যকে বাউল সম্প্রদায়ের আদিগুরু বলে ভুল করেন। কিন্তু গৌড়ীয় গোস্বামীদের ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়, সেখানে 'বাউল' শব্দটি 'ভাবোন্মাদ' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া, বাতুল বা ক্ষেপা অর্থে বাউল শব্দের ব্যবহারও সুপরিচিত। মনে হয়, ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রথাবদ্ধতা, রীতিপ্রবণতা ও গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত, সাধারণের জীবনযাত্রার বাইরে অবস্থিত বলে এই সম্প্রদায় সাধারণের কাছে 'বাউল' বলে অভিহিত হয়েছিল।

বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মানুষই থাকে। মুসলমান বাউলদের বলা হয় ফকীর। বাউলরা গুরুকে সকলের উপরে স্থান দেন। এই বাউল সম্প্রদায় এখনও লুপ্ত হয় নি।

। **সুফী সাধনা** । রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সুফীসম্প্রদায়ের কথাও উল্লেখযোগ্য। এঁরা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে উত্তর ভারতের মধ্যে দিয়ে বাংলায় আগমন করেন।[২] সুফীগণ ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। শাস্ত্রানুগত ভক্তি-ভাবুকতার সঙ্গে সহজ অনুভবের যে পথ, তার ওপর সুফীসম্প্রদায়ের দান অনস্বীকার্য।

---

১. চৈ. চ (অ). পৃ. ৩৩৫।

২. বাংলা দেশের ইতিহাস. ২য়. পৃ. ২৩৪।

ভারতে এসে মুসলমানেরা এদেশীয় ধর্ম, আচার ও দর্শনের প্রভাবে পড়েছিলেন। মধ্য ও উত্তর ভারতের মুসলমানগণ রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণের রূপকে আল্লাহ্‌র, তথা ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক, ভক্তি, প্রেম, বিরহবোধ বা মিলনাকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন। কবীর, দাদূ প্রমুখ মরমিয়া সাধকদের দোঁহাবলী তার প্রমাণ। রাঢ় বাংলায়ও চৈতন্যোত্তর যুগে মুসলমানরা অধ্যাত্মপ্রেম বা হৃদয়াকুতি প্রকাশ করেছেন রাধাকৃষ্ণ-প্রতীকের মাধ্যমে। দেশজ মরমিয়া মুসলমানরা পূর্ব-সংস্কার ও চৈতন্যোত্তর যুগের সর্বব্যাপী বৈষ্ণবতার প্রভাববশতঃ সুফীতত্ত্বের রূপক হিসাবে রাধাকৃষ্ণের প্রতীক গ্রহণ করেছেন। সুফী মতের আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে রাধাকৃষ্ণ-লীলায়। তাই একেশ্বরবাদী ও অবতারবাদে আস্থাহীন মুসলমান কবিদের কল্পনায় সাধারণতঃ রাস, বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, বিপ্রলব্ধা ইত্যাদি বিশেষ স্থান পায় নি। তাঁরা কেবল রূপানুরাগ, বংশী, অভিসার, মিলন, বিরহ ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন, জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক-সূচক ও ব্যঞ্জক বলে।[১] এছাড়া, অধিকাংশ মুসলমান এদেশী হিন্দুর বংশধর হওয়ায়, পূর্ব পুরুষের সংস্কার পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি তাঁদের পক্ষে।[২] এই কারণেও তাঁরা অনেক সময়েই রাধাকৃষ্ণের রূপক গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সাধনভজনের উদ্দেশ্যে।

এদেশে তুর্কী আক্রমণের পরে, এই সুফীসম্প্রদায়ের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকলেও, তার বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আরব-তুরস্কের বাণিজ্য সম্পর্কের পথে ভাবগত আদান-প্রদানের সময়েই ভারতীয় বৈরাগ্যমূলক জীবনধর্ম ইসলামধর্মে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে, যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তাঁরাই 'সুফী' নামে পরিচিত। সুতরাং একথা বলা যায়, সুফীসম্প্রদায় ভারতীয় ভাবধারা থেকে জন্মলাভ ও পরিপুষ্টি লাভ করে, আবার বাংলায় উৎপন্ন নববৈষ্ণব সাধনাকেই সমৃদ্ধ করেছেন।[৩] এই সুফীগণ সকলেই যে সহজ ভক্তিপথের সাধক ছিলেন এমন নয়। এঁদের মধ্যে দেহতত্ত্বগত সাধন-ভজন যেমন ছিল, তেমনই ছিল দার্শনিক ভক্তিমার্গের সাধন। ভারতে তথা বাংলায় সুফী মতবাদের বিভিন্ন শাখা ভারতীয় সাংখ্য ও যোগতন্ত্রের প্রভাবে স্থানিক ও লৌকিক রূপ লাভ করেছিল। অধিকাংশ সুফী ছিলেন অদ্বৈতবাদী ও দেহতত্ত্বরসিক। তাই তাঁরা ছিলেন যোগসাধনাপ্রবণ। বৌদ্ধ চতুষ্পদ্মে ও হিন্দু ষড়পদ্মে এবং ত্রিনাড়া ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না বা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীতে আস্থা রেখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণভিত্তিক দেহচর্যাই এই পথে অধ্যাত্ম সিদ্ধির উপায় বলে তাঁরা জানতেন।[৪] অন্য দিকে, ভারতীয় সহজ ভক্তিমার্গ আশ্রিত সাধনপদ্ধতির প্রভাবও এঁদের উপরে পড়েছিল। সুতরাং মনে হয়, মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীল নিত্যানন্দের অগ্র-

১. বাংলায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পৃ. ৩।

২. "হিন্দু ঘরে জন্ম হঞা মোছলমান হৈলাম।" বি. ভা. পুঁ. সং ৬৫৮০।

৩. এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্ম বর্তমান লেখিকার প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র মানসে সুফী ও সন্ত সাহিত্যের ছায়া'—'যুবমানস' রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৩৯৪ দ্রষ্টব্য।

৪. মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ১৮৫।

কম্প-পুলক-মূর্ছাদি সাত্ত্বিকভাবজনিত প্রাক্ চৈতন্য ভক্তিমার্গের অপূর্ব অভিব্যক্তির উপর সুফীসম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে।[১]

ধর্মজীবন ছাড়া সমাজজীবনেও এই সুফীদের প্রভাব নগণ্য ছিল না। মুসলমান সমাজে রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সুফীদের সকলেই সম্মান করতেন। এঁদের প্রত্যেকেরই বহু শিষ্য থাকতো। এঁরা তাঁদের ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। সুফীদের দরগায় শিক্ষাদান ছাড়াও চিকিৎসা, দরিদ্রকে অন্নদান ইত্যাদিও চল্‌তো। ইসলামধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্য অ-মুসলমানকে ইসলামধর্মে দীক্ষা দেওয়া, এই সব সুফীদের মাধ্যমেই হতো বেশী। এঁদের সহজাত ঈশ্বরাসক্তি ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হয়ে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু, মুসলিমধর্ম গ্রহণ করে যেমন বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে, অন্য দিকে, এর ফলে হিন্দু সমাজেও ক্রমশ ভাঙ্গন দেখা দেয়। আবার, এই সুফী-পীররা অনেক সময়ে হিন্দুরাজ্য দখল করতে যুদ্ধও করতেন, এমন অনেক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও বিরল নয়।[২] সুতরাং, শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় পথেই এঁরা এদেশে ইসলাম প্রচার চালিয়েছিলেন। এই সব পীর-ফকীররা মৃত্যুর পরে সহজেই দেবত্বে উন্নীত হতে লাগলেন। সুফীদের কবর মুসলমানধর্মে পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত। হিন্দুদের গুরুবাদ মুসলমান সমাজে পীরপূজায় প্রসারিত হয়ে পীরকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক যে সব কাহিনী গড়ে উঠতে লাগলো, সতেরো শতকে তা সাহিত্যিক রূপ লাভ করে, রাঢ়ের বাংলা সাহিত্যে পীরমাহাত্ম্যমূলক পাঁচালী শ্রেণীর কিছু সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে। এই পীরপূজা ক্রমে সত্যপীর, মাণিকপীর, ঘোড়াপীর, কুম্ভীরপীর, মাদারীপীর—এই পাঁচ পীরের পূজায় পরিণত হয়। এঁদের মধ্যে সত্যপীরের সমরূপের দেবতা সত্যনারায়ণ হিন্দুদের পূজিত দেবতা। সত্যনারায়ণের পূজা কেবলমাত্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত থাকলেও, সত্যপীর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পূজিত দেবতা। বহু শতাব্দী ধরে রাঢ় বাংলায় হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করার ফলে, এই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করেছেন।[৩]

সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ ছাড়া অন্য কয়েকটি উপাস্যের উপাসনা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের বনদুর্গা, ওলাইচণ্ডী, কালুরায় ইত্যাদি দেবতাই মুসলমানদের মধ্যে যথাক্রমে বনবিবি, ওলাবিবি, কালুশাহ ইত্যাদি নামে উপাসিত হয়েছেন। উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই এঁদের প্রশস্তি বর্ণনামূলক পাঁচালী কাব্য রচনা করেন। সাধারণতঃ ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা নিজেদের বিশ্বাস ও সংস্কার বর্জন করতে না পারায়, এই সব পূজা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান

১. 'রবীন্দ্র মানসে সুফী ও সন্ত কাব্যের ছায়া'—যুবমানস, রবীন্দ্র সংখ্যা— দ্রষ্টব্য।

২. H. O. B. V. 2. P. 69.

৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখিকার প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'মধ্যযুগের হিন্দু মুসলমান' দ্রষ্টব্য।

সমাজেও প্রবেশ করেছিল। তবে, ইসলাম ধর্মের যে পাঁচটি মূল তত্ত্ব, তার মধ্যে ইমান, রোজা, হজ, নমাজ এঁরা পালন করতেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তৎকালীন মুসলমান সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, মুসলমানরা প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠে 'লোহিতপাটি' বিছিয়ে পাঁচ বার নমাজ পড়তেন।[১] সোলেমানীগণ[২] মালা ধরে 'পীর পেকাম্বরে'র জপ করতেন এবং 'পীরের মোকামে' সন্ধ্যা দিতেন। দশ-বিশ জন একত্রে বসে 'অনুদিন কেতাব-কোরাণ' বিচার করতেন।[৩] আবার কেউ বা হাট বসিয়ে পীরের শিরনির চাঁদা সংগ্রহ করতেন।[৪] ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রাণ ছাড়লেও রোজা ছাড়তেন না।[৫] তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে ধর্মের 'দোয়া' বিতরণ করতেন। মোলনাগণ বিবাহ দেওয়াতেন এবং কলিমা পড়ে 'দোয়া' করতেন।[৬] এই মোলনাসম্প্রদায় ইসলামের অননুমোদিত ধর্মযাজক। সম্ভবতঃ হিন্দুপ্রভাবে, এঁরা হিন্দু গুরু-পুরোহিতের অনুকরণে মুসলমান সমাজে প্রবেশ লাভ করেছিলেন।

সমকালীন সাহিত্যে সতেরো শতকের বাঙালির ধর্মচর্যার যে চিত্রটি পাওয়া গেল সেখানে সর্বত্রই রয়েছে একটি সমন্বয় ও সহাবস্থানের ভাব। একদিকে যেমন লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ সদাবহমান, অন্য দিকে তেমনই উচ্চ ও মধ্য কোটির ব্রাহ্মণ্য সমাজবদ্ধ স্তরে সুবিস্তৃত পৌরাণিক দেবায়তনের অসংখ্য দেবদেবীদের অপ্রতিহত প্রভাব। মুঘল বিধর্মীদের হাত থেকে ধর্মকে রক্ষাকল্পে রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্তের অনুশাসন আশ্রয়ে সেই প্রভাব আরও সংহত এবং সমৃদ্ধ। বৈদিক যাগযজ্ঞের এবং ধ্যান-কল্পনার যে সামান্য প্রভাব, তা অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ বংশে সীমাবদ্ধ। জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবশেষ চিহ্নটুকু হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে বিলীয়মান। শৈব এবং শাক্ত ধর্ম আবার তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসাচরণ দ্বারা স্পৃষ্ট। তিথি-গ্রহ-নক্ষত্র বিচার

---

১. "ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।" ক. ক. চ. পৃ. ৩৪৩।

২. "ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।" ঐ. ঐ.

৩. "দশ বিশ বেবাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরাণ।" ঐ. ঐ.

৪. "কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরনি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।" ঐ. ঐ.

৫. "বড়ই দানিসবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।" ঐ. পৃ. ৩৪৪।

৬. "মোলনা পড়ায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া।" ঐ. ঐ.

করে স্নানাহার[১], বিভিন্ন তিথিনক্ষত্র উপলক্ষে তীর্থস্নান, দান[২], পূজা, হোম, ব্রতচারণ তো ছিলই।

আলোচ্য সময়ের গ্রাম্যসমাজে, বিশেষ করে নারী সমাজে সারা বছর ধরে যে সব ব্রত অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তার বেশির ভাগই অ-পৌরাণিক ও অ-ব্রাহ্মণ্য। সেগুলি মূলতঃ আদিম যাদুবিদ্যা আশ্রিত প্রজননশক্তি ও কৃষিভাবনার দ্যোতক। যদিও আমাদের আলোচ্য সময়ে প্রচলিত বারব্রতের বিস্তৃত বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না, তবুও ষোড়শ শতকের স্মার্ত রঘুনন্দনের 'ব্রততত্ত্ব' ও 'কৃত্যতত্ত্বে' বিভিন্ন ব্রতের আলোচনা এবং পরবর্তী আঠারো-উনিশ শতকের চিঠিপত্রে পাওয়া ব্রতের উল্লেখ থেকে মনে হয়, আলোচ্য সময়েও এই সব ব্রত প্রচলিত ছিল বহুল পরিমাণে।

রঘুনন্দন তাঁর 'ব্রততত্ত্বে' সাধারণ ভাবে ব্রতানুষ্ঠানের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু কৃত্যতত্ত্বে তিনি 'একাদশী' 'চাতুর্মাস্য', 'অনন্ত ব্রত', 'বিধান সপ্তমী', 'আরোগ্য সপ্তমী', 'শিবরাত্রি', 'রাম নবমী' ইত্যাদি ব্রতের আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচ্য সময়েও প্রত্যেক পক্ষের 'একাদশী' তিথিতে উপবাস গৃহস্থের অবশ্য করণীয় কৃত্য ছিল।[৩] চাতুর্মাস্য ব্রত উপলক্ষে প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ও এক জন করে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হতো। এই ভাবে চার মাস অতিবাহিত হলে চাতুর্মাস্য ব্রত পূর্ণ হতো। সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে এই ব্রত পালনের খবর পাওয়া যায়।

"শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিনে সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে চতুর্মাস্য পূর্ণ হইল।[৪]"

শিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষে শিব-চতুর্দশীতে উপবাসী হয়ে রাত্রি জাগরণ-সহ এই ব্রত পালনের বর্ণনা করেছেন মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে।

"যদি পায় চতুর্দশী থাকে যাঁর উপবাসী
নিশা কালে করে জাগরণ॥"[৫]

সতেরো শতকের 'মনসামঙ্গলে'র কবি বিষ্ণুপাল চৈত্র মাসের বারুণী তিথিতে গঙ্গাস্নানের বর্ণনা করেছেন।[৬] সেকালের মেয়েরা বিপদে উদ্ধার পাবার আশায়

১. বি. ম. পৃ. ২৭।

২. 'জৈষ্ঠোতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা।' ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১৯৭।

৩. আমাদের আলোচ্য সময়ের অনেক কাব্যেই একাদশী ব্রত ও তার পরের দিন পারন করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪. চৈ. চ. (ম.) পৃ. ২৬৭।

৫. ক. ক. চ. পৃ. ১৪১।

৬. "চৈত্র মাসে তিথা বারুণী আছিল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তারা গঙ্গাস্নানে যায়।" বি. ম. পৃ. ২৭।

'বিপদনাশিনী ব্রত' করতেন।[১] প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, এই ব্রতের ব্রতীকে স্বয়ং দেবী চণ্ডীকা সর্ববিপদে কর্ণধারের মতো উত্তীর্ণ করেন।[২] বিপদে উদ্ধার পেলে দেবীর কাছে 'শতেক ছাগল' বলি দেবার মানসিকও করা হতো। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এই ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বাদশ বৎসরের জন্যে চণ্ডীপূজার ব্রত ধারণ করতেন সেকালের মেয়েরা। ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত দেবীর দয়া হতো না। প্রতি মঙ্গলবারে পূজারিণী রমণীগণ গঙ্গাস্নানে শুচি হয়ে পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-সহযোগে এই সর্বমঙ্গলা দেবীর পূজা করতেন।

"জদি পাএ গুনবতি মঙ্গল অষ্টমি তিথি
জদি বা নবমি চতুর্দশী।
পাইয়া এমন তিথি পূজা তার করে নিতি
উপবাসী থাকে দিবানিশি॥"[৩]

পূজান্তে দেবীকে প্রদক্ষিণ করে তাঁরা আপন আপন মনের কামনা নিবেদন করতেন।[৪] চণ্ডীর ব্রতের মতো মেয়েদের দ্বাদশ বৎসরের জন্য শিবের ব্রত করারও রীতি ছিল।[৫] বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্‌কালে বণিক্ রমণীদের মধ্যে তরণীপূজা প্রচলিত ছিল।

"লহনা বেণ্যানি শতেক এয়্য আনি
মঙ্গল দিয়া জয়ধ্বনি।
দুন্দুভি শঙ্খ বিনা বাজনা বাজে নানা
আনন্দে পূজেন তরণী॥"[৬]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"সতেক রমুনি সনকা সঙ্গতি করিয়া।
ডিঙ্গা পূজা করে রামা জয় জয় দিয়া॥
জাউ জাউ মধুকর বিদায় হইয়া।
হিরামন মাণিক্যে এস্য পূর্ণিত হইয়া।"[৭]

মেয়েদের মধ্যে 'সুযব্রত' করারও খবর পাওয়া যায়।[৮] এছাড়া, রবিবারে নিরামিষ আহার, ধর্মের নামে একাদশী ব্রত, ইত্যাদি বারো মাসে তেরো ব্রত পালনের খবর পাওয়া যায় রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে।

---

১. "বিপদ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি॥" ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ৯৯।
২. 'বিপদ সাগরে দুর্গা হবে কর্ণধার।' ঐ. ঐ.
৩. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ২০৮।
৪. 'প্রদক্ষিণ করি রামা করয়ে মাননা।' ঐ. পৃ. ২০৬।
৫. ক্ষে. ম. পৃ. ৬৬ ৬৯।
৬. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ২০৫-০৬।
৭. বি. ম. পৃ. ৬৯।
৮. যশোশ্চন্দ্রের গোবিন্দ বিলাস। বি. ভা. পু. সং ১৯০৯। পূর্ব খণ্ড। প সং ২৭ক ৩০খ

"বারমাসে রঞ্জাবতী তের ব্রত করে।
মিথুন মকর তুলা পূজে মনোহরে॥
সমাধান মকর মাসেতে ইথুরাল।
রবিবারে নিরামিষ্য আতপের চাল॥
কার বোলে করে রঞ্জা ধর্ম একাদশী।"[১]

এই ভাবে বিভিন্ন ব্রতপালন ছাড়াও, ধর্মার্থে পুরাণ[২]-ভাগবত পাঠ[৩], রামায়ণ মহাভারত পাঠ[৪], কৃষ্ণ কথা শ্রবণ[৫], কথকতা পাঠ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা[৬], ইত্যাদিও তৎকালীন রাঢ় বাংলার সমাজে ধার্মিক মনোভাবের পরিচায়ক ছিল। ধর্মার্থে সস্ত্রীক বারাণসীবাস[৭], 'গায়ে নানা তীর্থ চিন' অঙ্কিত পরিব্রাজক সাধু-সন্তের আনাগোনা[৮]—আর তারই পাশে পাশে ছিল নানা ভয় বিশ্বাসের লৌকিক দেবদেবীর পূজা, বারব্রত, পাল-পার্বণ, দোলযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদি নানা ধরণের উৎসবের সমারোহ।

এক প্রান্তে, দেহকে অস্বীকার করে, তাকে নিপীড়িত করে একমাত্র আত্মার শক্তি ও মহিমা প্রচার; অন্য দিকে, পরকীয়া দেহগত ভক্তিসাধনা। সমাজের কোথাও বেদ-স্মৃতি-পুরাণ, কোথাও তন্ত্রমতে কালীপূজা, আবার, কোথাও বা বৈষ্ণবের দিবারাত্র নাম-গান-সংকীর্তন।

"সদা লয় হরিনাম বাস্তভূমি পায় দান
বৈষ্ণব বসিলা গুজরাটে।"[৯]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"প্রতি বাড়ী দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল
দুই সন্ধ্যা হরিসংকীর্ত্তন॥"[১০]

আর এরই মধ্যে মধ্যে ধর্মঠাকুর, শীতলা, চণ্ডী, মনসা, পঞ্চানন, শিব, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ সমাজে জাঁকিয়ে বসে আছেন। অন্য দিকে, মুসলমান সমাজে তখন সত্যপীর, মাণিকপীর, কালুশাহ ও গাজী-মোল্লাদের প্রবল প্রতাপ। এই সব নিয়েই রাঢ় বাংলার সমগ্র সমাজটি ছিল পরিপূর্ণ।

১. রূ. ধ. পৃ. ৬৯।
২. 'পাঠক আসিয়া করে পুরাণ বিচার।' রূ. ধ. পৃ. ৩৮।
৩. 'মহাজন পণ্ডিত পরিছে ভাগবত।' ঐ. ঐ.
৪. 'সম্মুখে ভারত পড়ে ভাল জুড়ে ফোটা।' ঐ. পৃ. ৩৯।
৫. 'কৃষ্ণকথা ভূপতি শোনেন অবিরত।' ঐ. পৃ. ৩৮।
৬. 'পুর মধ্যে দেয় সেবা শিবের মন্দির
অভিমত বর পায় রণে হয় স্থির।' ক. ক. চ, পৃ. ১৩৬।
৭. 'জায়া-সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু
বারাণসী করিল পয়াণ॥' ঐ. পৃ. ১৮৩।
৮. 'গায়ে নানা তীর্থ চিন
ভিক্ষা মাগে অনুদিন।' ঐ. পৃ. ৩৫০।
৯. ঐ. ঐ.।
১০. ঐ. পৃ. ৩৭৮।

বন কেটে বসত

প্রথমে আছিল বন অতি ভয়ঙ্কর।
কাটিঞা বসিতে হৈল বিচিত্র নগর॥

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে গ্রাম পত্তনের ইতিহাস প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষ যখন তার কেবলমাত্র শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের স্তর অতিক্রম করে খাদ্যোৎপাদনের পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন সেই খাদ্যোৎপাদনের প্রয়োজনেই এক একটি 'কোম' বা 'গোষ্ঠী' তাদের কৃষি-অঞ্চলকে ঘিরে এক একটি বসতি গড়ে তোলে। এই বসতিস্থানগুলিই 'সন্নিবেশ' বা গ্রাম। এই সন্নিবেশ নামটি খুব প্রাচীন। স্থান-নামের উল্লেখ করতে গিয়ে সন্নিবেশ শব্দের ব্যবহার বহু জায়গায় দেখা যায়। মনে হয়, সেকালে 'সন্নিবেশ' বলা হতো নগরোপান্তে অবস্থিত ছোটো গ্রামকে। জৈন-সূত্রের টীকা থেকে জানা যায়, সেকালে বর্তমান বর্ধমান ও জৌগ্রামের কাছে 'মোরাক-সন্নিবেশ' বর্তমান ছিল। জৈনগ্রন্থে বিশেষ বিশেষ ধরনের সন্নিবেশের উল্লেখ আছে। যেমন 'মদম্ব' হলো ছোটো নগর, যার চার থেকে ছয় মাইল দূরে দূরে গ্রামের অবস্থান। 'কর্বট' হলো ব্যবস্থাপনাহীন বিশৃঙ্খল গ্রাম এবং 'খেত' হচ্ছে যে গ্রামের চারদিকে মাটির দেওয়াল আছে। প্রাচীন কালে সাধারণতঃ বড় জনপদকে 'নগর' বা 'পুর' বলা হতো। ছোটো জনপদকে বলা হতো 'নিগম'। পূর্বভারতে গ্রামগুলিকে গ্রামই বলা হতো। পালি বা প্রাকৃতে 'গ্রাম' হলো 'গাম'।

কৃষিকর্ম পরিচালনার জন্যে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন জলের। সেই তাগিদেই, গ্রামগুলির সূচনা সব সময়েই হতে দেখা যায় নদী, সমুদ্র বা জলাভূমির তীরে তীরে। এতে শুধুমাত্র কৃষিকার্য ও গ্রামের অভ্যন্তরে স্বচ্ছন্দ-বিহারেরই সুযোগ হয় না; অন্য গ্রামের সঙ্গে আদান-প্রদান হওয়ার ফলে, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সাহায্যে গ্রামেরও উন্নতি সাধিত হয়। আর্য সভ্যতার বিকাশের প্রাথমিক স্তরেও তাই দেখা যায়, তাঁরা ভারতবর্ষের প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলেন গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর উপত্যকায়।

পরবর্তী কালের নগর স্থাপনার পিছনে অন্য রকম সম্ভাবনাও থাকতে পারে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি কেন্দ্র রচনার প্রয়োজন হতো। তারপর শাসনাধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অঞ্চলকে ঘিরে বসতি গড়ে ওঠে। বাণিজ্য-কেন্দ্রাশ্রয়ী ও তীর্থ-কেন্দ্রাশ্রয়ী নগরস্থাপনা অন্য দুটি সম্ভাব্য কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলার বাণিজ্য-কেন্দ্রাশ্রয়ী নগরের মধ্যে

প্রধান নগরী সপ্তগ্রামের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা যায়। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সপ্তগ্রামের গুরুত্ব কমে যেতে থাকে এবং প্রথমে হুগলী ও পরে কোলকাতা বন্দর প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অনেক সময়ে কোনো প্রসিদ্ধ শিক্ষা স্থানকে কেন্দ্র করেও কোনো কোনো গ্রামকে গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রাচীন নগরী তক্ষশীলা, বিহারের নালন্দা, বঙ্গের নবদ্বীপও গড়ে ওঠে এই ভাবে।

এছাড়া, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অরাজকতা, ইত্যাদি নানা কারণে এক দেশের মানুষ অন্য দেশে বা এক গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে নতুন করে বসতি স্থাপন করে. ইতিহাসে এর নজীর দুর্লভ নয়। তবে সব গ্রামই যে এক একটি পৃথক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে গড়ে উঠতো এমন নয়। একটি গ্রামের উৎপত্তি একাধিক কারণেও হতে পারে।

গ্রামে যাদের বাস করতে হতো, তাদের মধ্যে প্রধান হলো কৃষক ও গার্হস্থ্যকর্ম-সম্পৃক্ত কিছু শিল্পী। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসযোগ্য ও কর্ষণ-যোগ্য এই দুই শ্রেণীর ভূমির চাহিদাই বেড়ে চলে। তাই অরণ্যভূমি পরিষ্কার করে নতুন গ্রামের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে গ্রামের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে।

। **সংগৃহীত তথ্যের আলোচনা**। গ্রাম-প্রধান বাংলায় গ্রামের একটি আদর্শরূপ গড়ে উঠেছিল খুব প্রাচীন কাল থেকেই। আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের বিভিন্ন পুঁথিতে তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

মধ্যযুগীয় শিলালিপিতে যখন অরণ্যময় প্রদেশে বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি রাজার নিকট হতে দান গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে যে বনভূমি পরিষ্কার করে নতুন গ্রামের সৃষ্টি হচ্ছে, তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। বনভূমি পরিষ্কার করে কিভাবে তাকে বাসযোগ্য করে তুলে নতুন গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়, তার একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের 'কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন' প্রসঙ্গে—

"মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুনিঞাজন
আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।"[১]

জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে কোন্ কোন্ শ্রেণীর গাছ পাওয়া যেতো এবং তাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ফল ও ফুলের গাছ এবং 'জন-বিশ্রামের' কারণে কোন্ কোন্ বড়ো বৃক্ষকে সযত্নে রক্ষা করে, অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষসকল কর্তন করে, ভূমিকে নগর নির্মাণের উপযোগী করে তোলা হলো, তারও বিস্তৃত বর্ণনা মেলে।

বন কেটে বসতের একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সতেরো শতকের শেষ-পাদের কবি যশচন্দ্রের 'গোবিন্দ-বিলাস'-কাব্যে। কংসাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ

১. ক.ক.চ. পৃ. ২৯৯।

হয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সহ গোকুলবাসীরা গোকুল থেকে বাস তুলে বৃন্দাবনে গমন করেন ও বৃন্দাবনের বন পরিষ্কার করে সেখানে নতুন গ্রামের পত্তন করেন—

প্রথমে আছিল বন অতি ভয়ঙ্কর।
কাটিঞা বসিতে হৈল বিচিত্র নগর।[১]

'নগর' অর্থে এখানে বড়ো গ্রাম। কারণ, মধ্যযুগে আধুনিক অর্থে 'নগর' শব্দের ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। তখন গ্রাম ও নগরের পার্থক্য ছিল শুধু আকৃতিতে, প্রকৃতিতে নয়।

। **শুভদিন-নির্ধারণ**। নগর নির্মাণের প্রসঙ্গে প্রথমেই শুভদিন স্থির করতে হয়। কারণ, গৃহ নির্মাণের নির্দিষ্ট মাস-দিন-মুহূর্তের উপরে গৃহবাসীর শুভাশুভ নির্ভর করে। একথা প্রাচীন কালের মতো বর্তমান কালেও বিশ্বাস করা হয়। তাই যে কোনো মাসেই গৃহারম্ভ হতে পারে না। বৈশাখ, শ্রাবণ, আষাঢ়, মাঘ, ফাল্গুন ও কার্তিক মাস গৃহারম্ভে সুপ্রশস্ত বলে বিবেচিত। পক্ষ হিসাবে শুক্লপক্ষ, শুভদায়ক। মৎস্যপুরাণে কার্তিক মাসকে ধনধান্যদায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যেও গুজরাট নগর নির্মাণ আরম্ভ হয়, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে।

শিত পক্ষ ত্রয়োদশী তাহে গুরুযুত শশী
তথি যোগ নাম আয়ুষ্মান।
সুধন্য কাত্তিক মাস বিশাই তোলে আওয়াস
সঙ্গে লৈয়া বীর হনুমান।[২]

। **নগর-বিন্যাস**। দেবতাগণের মধ্যে বিশ্বকর্মাই সুপ্রসিদ্ধ স্থপতি ও শিল্পী। হনুমান তাঁর সাহায্যকারী। তাই মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে পুরী বা মন্দির নির্মাণ কাজে দেখা যায়, বিশ্বকর্মার একচেটিয়া অধিকার।[৩] এর থেকে মনে হয়, সে যুগের বাঙালিদের মনে এই সংস্কার ছিল যে, নগরগুলির আদি স্থপতি ও শিল্পী হলেন বিশ্বকর্মা।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' নগর পরিকল্পনার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, গ্রামের দৈর্ঘ্য এক থেকে দুই ক্রোশ পরিমাণ।[৪] এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে, মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে গুজরাট নগরে কালকেতুর পুরী নির্মাণ প্রসঙ্গে এক বৃহৎ নগরের পরিকল্পনা করেছেন। কারণ সেখানে বলা হয়েছে "আওয়াস তুলিল চারি ক্রোশ পরিমাণ"।[৫]

---

১. বি. ভা. পুঁ সং ১৯০৯। পত্র সং ১১৭ক।
২. ক. ক চ. পৃ. ৩১১।
৩. 'রাজার আদেশ পায়া বিশ্বকর্মা তুষ্ট হইয়া
সুবর্ণ দেহারা গড়ে তথা।' —হ দে রা. ম পৃ. ১১৮। সা. প্র ৪৭
৪. A study on Vastu Vidya.
৫. ক ক. চ ৩০৯।

রাজকার্যের জন্যে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক নগরেই শত্রু আক্রমণের প্রতিরোধের জন্যে নগরের পরিসীমা ঘিরে উঁচু প্রাচীর ও তার বাইরে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হতো। 'শিল্প-শাস্ত্রে'র মতে, এই প্রাচীর ইট অথবা পাথরে তৈরি হতে পারে। কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মাণ প্রসঙ্গে দেখা যায়, নগরের 'পৃথক সীমা নির্ধারণ করে পরিখা সৃষ্টি করে সু-উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করা হলো। সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যেও বীরসিংহপুর নগরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে এর পরিচয় পাওয়া যায়।[১] আলোচ্য সময়ের কবি সীতারাম দাসের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

গড় গেল পার হয়্যা মায়া ধারী বিষ্ণুতিয়া
প্রবেশিল সহর ভিতরে ॥[২]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আদর্শ নগর গুজরাটে 'চতুঃশালা' বা চক্-মিলানো গৃহের উল্লেখ থেকে মনে করা যায়, বাসগৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে সেকালে এর প্রচলন ছিল। নগরের পূর্বদিকে সারি সারি বিষ্ণু মন্দির। মন্দিরের চূড়া বিচিত্র কলস শোভিত। এই কলসের সংখ্যা তিন থেকে সাতটি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে পাঠশালা স্থাপিত হতো। বাম দিকে দুর্গামণ্ডপ, তার সঙ্গে সংলগ্ন নাটশালা ও সিংহদ্বার শোভা পেতো। এই সিংহদ্বারই সম্ভবতঃ নগরের প্রধান প্রবেশতোরণ। গ্রামের পূর্ব দিকে জলাশয় ও উত্তর দিকে 'খিড়কি' ও 'জলহরি' বা পূজার জল ভরার জন্যে পবিত্র পুষ্করিণী খনন করা হতো। এছাড়া, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ সংলগ্ন কূপ খনন করা হতো। গ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত হতো শিবমন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অতিথিমণ্ডপ। সম্ভবতঃ সকলের একত্র সমাবেশের স্থান সেটি। 'বাসাড়ে'দের বা ভাড়াটে পর্যটকদের ব্যবস্থাও ছিল সেখানে সুন্দর। তাঁদের জন্যে নির্মিত হতো 'দীঘল-মন্দির'। অর্থাৎ সাময়িক বাসস্থান হবার উপযোগী বাড়ি। নগরের মধ্যেই 'হাট' নির্মিত হতো। কদম্ব-কানন-শোভিত দোলমঞ্চ নগরের শোভাবর্ধন করতো।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে মুসলমানদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা হতো। এই অঞ্চলটির নাম হতে দেখা যায় 'হাসন-হাটী'। খলিফা আলীর পুত্র, মহম্মদের দৌহিত্র, কারবালার যুদ্ধে নিহত দুই ভাই হাসন-হোসেনের নাম অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও পাওয়া যায়। মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের এই পশ্চিম পটিতে সৃষ্টি হতো সারি সারি নমাজগৃহ, মসজিদ ও বড়ো বড়ো দালান।

সাধারণতঃ কুলস্থানে[৩] বা নগরের কেন্দ্রভূমিতেই ব্রাহ্মণদের বসতি নির্দিষ্ট হতো। কারণ, সেখানে ব্রাহ্মণরা যেমন সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন, তেমনি বাসস্থান

১. 'গড় খাই দেশ বেড়ি।
মাঝেতে রাজার পুরি।' বি. ভা. পু. ২৫৮, পৃ. ৩ক।
২. বি. ভা. পু. সং ৬২১৭ প. সং ১২খ।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ৩৪৭।

হিসেবেও নগরের শ্রেষ্ঠ স্থানটি অধিকার করে থাকতেন। এ ঐতিহ্য বহু পুরানো।[১] নবনির্মিত গুজরাট নগরেরও কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত সারি সারি বিষ্ণু মন্দিরকে ঘিরে বিভিন্ন থাক ও পটীর ব্রাহ্মণদের বাস নির্দিষ্ট হলো। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার গ্রহ-বিপ্রগণ ও বর্ণ-বিপ্রগণ এবং যারা শিব, ধর্মরাজ প্রভৃতি গ্রামদেবতার পূজা করতেন তাঁদের বাস নির্দিষ্ট হলো 'কাপালী' ও 'সন্ন্যাসী'দের সঙ্গে, গ্রামের এক পাশে।

নব প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হলো। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা এলো দলে দলে। প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের বৃত্তি অনুযায়ী গ্রামের এক এক সারিতে স্থান পেতে লাগলো। নিম্নবৃত্তি অবলম্বনকারী-দের মধ্যে কেউ কেউ গ্রামের একপ্রান্তে, কেউ বা গ্রামের বাইরে বসতি স্থাপন করে, আপন আপন কাজে ব্রতী হলো।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতু কর্তৃক গুজরাট নগর স্থাপন কবি-কল্পনা মাত্র নয়। এই পরিকল্পনা ঐতিহাসিক তথ্যসিদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের মতে, কবির গ্রাম দামিন্যার পাশেই বর্তমানেও যে গুজরাট ও হাসনহাটী নামে গ্রাম রয়েছে, কবির বর্ণনা তাকেই ঘিরে গড়ে উঠেছিল।[২]

।**গৃহ নির্মাণ**। সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির কাব্যে গৃহ নির্মাণ ও দেউল নির্মাণের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান কতো গভীর ও বাস্তবানুগ ছিল।

'মানসার' শিল্পশাস্ত্র অনুসারে[৩] গৃহ সবসময় পূর্ব অথবা উত্তর-পূর্ব মুখী হওয়া দরকার। কিন্তু কখনই দক্ষিণ-পূর্ব মুখী হওয়া উচিত নয়। কারণ সেটি অশুদ্ধ বলে বিবেচিত। আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বলা হয়েছে[৪] রাজগৃহ সর্বত্র উত্তর অথবা পূর্ব মুখী হওয়া উচিত। আমরা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে দেখতে পাই কবি সর্বত্রই 'খিড়কি' উত্তর ভাগে এবং 'সিংহদ্বার পূর্বে[৫]'-এই রীতিকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

গৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ বাংলার নিজস্ব। প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] সেখানে দেখা যায়, দৈর্ঘ্য, প্রস্থের সমান থেকে দ্বিগুণ পর্যন্ত হতে পারে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুর গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে

১. Manasara Silpa Sastra, Chap. IX, P. 39-40.

২. পূর্ণিয়ার পশ্চিমে একটি বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে তা আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। বাঁকুড়ার জামকুড়ির বন, হুগলীর গড়-মান্দারনের অরণ্য এলাকাও উক্ত সময়ে পরিষ্কৃত হয় (বা. পু. পৃ. ৭৮)। সুতরাং কবিকঙ্কণের বন-কর্তনের বর্ণনায়, উক্ত পূর্বস্মৃতির পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে।

৩. Manasara Silpa Sastra, Chap. IX, P. 37.

৪. A study on Vastu Vidya, P. 12.

৫. ক. ক. চ. পৃ. ৩১৩।

৬. Manasara Silpa Sastra, Chap. XXXVIII, P. 57.

গৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাপের উল্লেখ পাওয়া যায় 'সাত। নয়া বন্ধে'[১] অর্থাৎ সাত গজ প্রস্থ ও নয় গজ দৈর্ঘ্য। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' লখিন্দরের 'লোহার বাসর' নির্মাণ প্রসঙ্গে আমরা এই একই পরিমাপের উল্লেখ পাই।

আড়ে সাত গজ নয় গজ দীর্ঘে।
প্রমাণ করিল ঘর নয় গজ উর্দ্ধে ॥

বাংলা মন্দিরের পরিমাপের অনুপাত দৈর্ঘ্যে সাত হাত, প্রস্থে তিন হাত ও উচ্চতায় দ্বাদশ হাত। দক্ষিণ রাঢ়ে 'আট পাচী'[২] ঘর নির্মাণের প্রচলন আছে। অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে আট হাত ও প্রস্থে পাঁচ হাত বিশিষ্ট এককুঠরী দক্ষিণমুখী ঘর। এই মাপে কাঁচা ঘর তৈরী দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে খুব প্রাচীন প্রথা। এই শ্রেণীর ঘরে জানালা রাখার নিয়ম ছিল না। 'যমদণ্ড' ও 'সূর্যদণ্ড' অর্থাৎ দক্ষিণে ও পূবে ঘুলঘুলি রাখতে হতো। নবজাত শিশুর জন্ম যদি মকর ও সিংহ লগ্নে হতো, তবে এই রকম আট-পাচী দক্ষিণদ্বারী সূতিকা গৃহ তৈরী হতো।[৩] চব্বিশ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে পাঁচ-পাচী অর্থাৎ ছোটো ঘর তৈরীর কথা জানা যায়। রাঢ় বাংলার বাস্তু ও মন্দিরের এই নির্মাণ-পদ্ধতি এর নিজস্ব। এই শিল্পপরিকল্পনায়, পরেবাংলা, জোড়-বাংলা, চৌচালা ইত্যাদি পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই ধারা স্বতন্ত্রভাবে বাংলা লোকশিল্পে বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করেছে।

পাকা মন্দির তৈরির ক্ষেত্রে ভিত খনন করা হতো বলে জানা যায়।

'ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা'[৪]

পঞ্চরত্ন, নবরত্ন ইত্যাদি মন্দির নির্মাণের এই নিয়মই প্রচলিত ছিল। কিন্তু মৃত্তিকার গৃহ নির্মিত হতো মাটির পিণ্ডিকার উপর।[৫] আকৃতি ভেদে মাটির ঘরের নামকরণ হতো—'লক্ষ্মীবিলাস', 'কামটুঙি' ইত্যাদি। তবে, সাধারণতঃ 'চৌআরি' ঘর ছিল গৃহস্থের ভদ্রাসন।

মুকুন্দরামের কাব্যে ভিত প্রস্তুত হয়ে গেলে গৃহের চারপাশের দেওয়াল তুলে তারপর দরজার ফ্রেমের ওপরের 'ঝনকাঠ' বা আধার-কাঠ নির্মাণ করা হতো 'রায়টী'[৬] পাথর দিয়ে। এরপর 'দাঁত্যা' বা প্রাচীর ছাউনীর প্রথম ধাপের কাঠ প্রস্তুতের ব্যাপারেও কাঠের বদলে পাথরের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার, পুষ্করিণীর সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের রাস্তাঘাট, দেবী-মন্দিরের বেদী ইত্যাদিও প্রস্তুত হতো পাথর দিয়ে। নগরের মধ্যে বাসগৃহ প্রস্তুত হতো 'চতুঃশালা' বা চক্‌মিলানো গৃহ।

মন্দিরের ওপরের দেওয়ালের শীর্ষভাগ সাধারণতঃ গম্বুজাকৃতি করে তার ওপরে

১. মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ ধরা হয়েছে 'সাতান্ন বন্ধে'। এর নির্ভুল পাঠ হবে 'সাতানয়া বন্ধে'।
২. চিঠি-পত্রে সমাজ চিত্র, ২য় খণ্ড, পত্র ৫৬১।
৩. সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য়, ভূ. পৃ. ৫২।
৪. ক. ক. চ. পৃ. ৩১১।
৫ 'বান্ধিল ঘরের পিড়া।' ক. ক. চ. পৃ. ৩১০।
৬. সাধারণতঃ রাজাদের ব্যবহৃত পাথর। Laterite Stone হতে পারে।

স্বর্ণ কলস স্থাপনের রীতি ছিল। এই কলসের সংখ্যা তিন থেকে সাতটি পর্যন্ত হতে পারতো। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে কালকেতুর গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গেও উক্ত গম্বুজাকৃতি ছাদ প্রস্তুত করে তার ওপর, 'চারি চালা খড়েতে ছাইল চারি পাট'[১]—ইত্যাদি বর্ণনা করাতে মনে হয়, কবি খড়ের চালাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। মধ্যযুগের কবিদের রাজপ্রাসাদের বর্ণনাতেও হীরে মুক্তো মাণিক্যের ছড়াছড়ির বর্ণনা যতই থাকুক না কেন গ্রাম্য কবির কল্পনার দৌড় মাটির দাওয়া, খড়ের চালার ওপরে যেতে পারে নি। যেমন দ্বিজ রামচন্দ্রের 'ধর্মপুরাণে' রাজা কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন—"জলছাড়া ঘরেতে দুহাতে কাদা কারে"[২] অথবা গৌড়েশ্বরের রাজ্যের বর্ণনায়—"দেখিতে দুগ বল বেড়া বেউড় বাঁশে"[৩]—ইত্যাদি উক্তি সেই কল্পনার দৈন্যের পরিচয় দেয়।

গৃহের অন্যান্য অংশসমূহের মধ্যে, দরজা বা দ্বার একটি প্রধান অংশ। গৃহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একমাত্র দরজারই বিশেষ উপাসনার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক্ বেদে। 'সহস্রদ্বারম্'[৪] শব্দের অর্থ বহুদ্বার-যুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায়।[৫] 'মানসার' শিল্পশাস্ত্র অনুসারে, গৃহের প্রবেশদ্বার মধ্যদেশে একটির পরিবর্তে দু-পাশে দুটি থাকতে পারে। আবার বড়ো গৃহের ক্ষেত্রে চতুষ্পার্শ্বে চারটি প্রধান দ্বার ও অপ্রধান ছোটো দ্বার, চার কোণে চারটি তৈরি হতে পারে।[৬] মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে গৃহের একাধিক 'কপাট'-এর উল্লেখ নেই। সতেরো শতকের কবি বিষ্ণুপাল, দেবী মনসার 'সিজুয়া' পর্বতে গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে চারটি দরজার বর্ণনা করেছেন।

'কাথ-পিড়া গড়িলা দুয়ার চারি খানি।'[৭]

তখনকার দিনে ধনাগৃহে একাধিক মহল তৈরি হতো। সাধারণতঃ পাঁচমহলা বাড়ী হতো ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। সতেরো শতকের বিভিন্ন কবি দেবীর মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে একাধিক মহলের বর্ণনা করেছেন। বিষ্ণুপাল তাঁর 'মনসা-মঙ্গল'-কাব্যে দেবী মনসার গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে 'বেওাল্লিস কোঠা'[৮] প্রস্তুত করিয়েছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুর গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে সপ্তম মহলে দেবী চণ্ডীর দেউল নির্মাণের বর্ণনায় কালকেতুর সাতমহলা বাড়ির খবর পাওয়া যায়।

মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে 'স্তম্ভ' নির্মাণ ছিল একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। ঋক্ বেদে

১. ক ক. চ. পৃ. ৩১০।

২. বি. ভা. পু. সং. ৬৬৬১ পত্র ৬১ খ।

৩. ঐ. ঐ. ৬২ ক।

৪. ঋক্—৭।৮৮।৫।

৫. এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের হাজার-দুয়ারী' স্মরণীয়। এতে এগার শতেরও বেশী দরজা বর্তমান। নিয়ামতউল্লার 'বার দুয়ারী চতুষ্কোণ দালানেও দ্বাদশটি দরজা রয়েছে। গৌড়ের ইতিহাস, পৃ ১১।

৬. Manasara Silpa Sastra, Chap. XXXVIII, P. 57.

৭. ঐ. পৃ. ১৩।

৮. ঐ. ঐ.

'স্তম্ভের'[১] উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও[২] আবার 'দ্বার' ও 'বলিস্তম্ভের' (sacrificial post) উপাসনা থেকে মনে হয়, ধর্ম ও স্থাপত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বৌদ্ধদের মধ্যে এই স্তম্ভ, মধ্যদেশে লিপি উৎকীর্ণ ও তাদের প্রতীকচিহ্ন উৎকীর্ণ করবার জন্যে ব্যবহার হতো। জৈনদের ক্ষেত্রে, স্তম্ভের ব্যবহার ছিল বাতিদান হিসাবে। বৈষ্ণবদের মন্দিরের মধ্যভাগের স্তম্ভের একেবারে শীর্ষ দেশে থাকে গরুড়ের মূর্তি। একে 'গরুড়-স্তম্ভ' বলা হয়। শৈবদের ক্ষেত্রে স্তম্ভ শিবের ত্রিশূলের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[৩] সতেরো শতকের কোনো কোনো কবির কাব্যে স্ফটিকের-স্তম্ভ নির্মাণের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্ফটিক হয়তো নিছক কবি-কল্পনামাত্র নয়। কবি বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গলে' চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যের বর্ণনায় কাঁচের ব্যবসায়ের খবর পাওয়া যায়।[৪]

। উপকরণ। মন্দির ও গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে কবি-কল্পনার অতিশয়োক্তি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। তাই কোথাও দেখা যায়, কেবলমাত্র স্বর্ণ দ্বারা গঠিত মন্দির।

লক্ষ মন স্বর্ণ আনে কামিলার বিগুমানে
বিশ্বকর্মে নৃপ কহে কথা
নানা অস্ত্র সঙ্গে আছে স্বর্ণ কাটে স্বর্ণ ছেঁচে
সুবর্ণ মন্দির তথা গড়ে।
সুবর্ণ করিয়া পাটা দিল চারি চোউকাটা
সুবর্ণ দেহারা চারি পাড়ে
সুবর্ণ দেয়াল দিল সুবর্ণের চাল কৈল
বিশ্বকর্ম তাহে বড় রঙ্গি ॥[৫]

কোথাও দেখা যায়, কেবলমাত্র প্রস্তর-নির্মিত মন্দির। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলা দেশে স্বর্ণ বা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত সতেরো শতকের মন্দির এত দ্রুত লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। বিশেষ করে পাথর আমাদের দেশে সুলভ ছিল না। পাথরের মন্দিরের মধ্যে গুটিকয়েক মাত্র মন্দিরের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়। কাজেই চৌদিকের প্রাচীর, গৃহের দেওয়াল, রাস্তা ঘাট, পুষ্করিণীর পাড়, ইত্যাদি সবই পাষাণে নির্মিত হওয়া কবিকল্পনা মাত্র। তবে নির্মাণ-কাযে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইঁটের[৬] ব্যবহার হলেও, পাথরের ব্যবহার একেবারে অজানা ছিল না।

১. 'উপমিত'—১।৩৯।১, ১.৫।১।
২. ঋক্—৩।৮।
৩. Aspects of Medeaval Bengali society from early literature, P 116.
৪. 'কাচের বোদলে সিলা'। পৃ ৩১।
৫. হ. রা. ম. পৃ. ১৫৮-৫৯, সা. প্র. ৮।
৬. 'কাঠ আনি বোঝা বোঝা,
পোড়াইল ইট-পাঁজা।' —ক. ক. চ. পৃ. ৩১৩।

সাধারণতঃ নগরের সীমানা জুড়ে গড়ে তোলা পরিখার পাড় বাঁধাতে ও প্রাচীর প্রস্তুত করতে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রাজ-অন্তঃপুর নির্মাণের ক্ষেত্রেও পাথরের ব্যবহার হতো বলেই মনে হয়। সম্ভবতঃ তখন নানান্ রঙের পাথরের ব্যবহার ছিল। কবির কল্পনায় যা 'হীরা', 'নীলা'[১] হিসেবে কোথাও, কোথাও 'ইন্দ্রনীল পাষাণ'[২] রূপে বর্ণিত হয়েছে। ইটের তৈরি বাসগৃহ বা মন্দিরের ক্ষেত্রে কাঠের আগুনে পোড়ানো পাতলা ইটের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই ইট প্রস্তুতের কাজ করতো গ্রামের কুমোর শ্রেণী।

'কুম্ভকার ইট গড়ে
দশ বিশ পাঁজা পোড়ে'[৩]

সাধারণ গৃহ মাটির অথবা কঞ্চির দেওয়ালবিশিষ্ট খড়ের চালাযুক্ত হতো। অনেক সময়ে এই মাটির দেওয়াল নানা ভাবে অলংকৃতও করা হতো। তার মধ্যে 'উলুটি' বা উলুখড় ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপের কাজ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই উলুটি চার ধরনের হয়।[৪] বিশেষ পদ্ধতিতে মাটির সঙ্গে খড়, তুঁষ, পাট বা তুলো মিশিয়ে মাটি প্রস্তুত করে দেওয়ালে প্রলেপ দিয়ে ছোটো কর্ণিক দিয়ে কেটে কেটে মূর্তি বা অন্যান্য কারুকায করা হতো। এছাড়া, পোড়া মাটির ফলক বা টেরাকোটার কাজ দিয়ে মন্দির-অলংকরণের রীতি ছিল।[৫] আমাদের মনে হয়, সতেরো শতকের বিভিন্ন কবি যে মন্দির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করে, মন্দিরের গায়ে 'নানা চিত্র' রচনা করার বর্ণনা করেছেন, তা এই টেরাকোটা শিল্পের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

'নানা চিত্র করে তায় বিষম অস্ত্রের ঘায়
শার্দুল জম্বুক কেশরী'[৬]

কিন্তু 'ময়ূরের পালক' দিয়ে চাল ছাওয়ার বর্ণনা 'উপরে করিলা মউর পাখের ছাওনি'[৭] নিছক কবি কল্পনা বলেই মনে হয়

নিরন্ন দরিদ্রের গৃহের উপকরণ সেকালে-একালে, চিরকালেই এক। 'ভেরাণ্ডার থাম' আর তালপাতার ছাওনী দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘর, সেকালেও ছিল, একালেও এর অভাব নেই।

মধ্যযুগীয় রাঢ়ের এই গ্রাম বা নগরের স্থাপত্যরীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩১২।
২. ঐ. পৃ. ৩১১।
৩. ঐ. পৃ. ৩১৪।
৪. খড়ুটি (খড + মাটি), তুঁষাট (তুঁষ + মাটি), পেটুটি (পাট + মাটি) ও তুটি (তুলা + মাটি)। বিশেষ আলোচনার জন্য নন্দলাল বসু রচিত 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে সংকলিত 'মাটির দেওয়ালে ও উলুটি' দ্রষ্টব্য। পৃ. ১৮৪-৯০।
৫. 'নানা চিত্রে ইট কাটে।' ক. ক. চ. পৃ. ৩১১।
৬. ক. ক. চ. পৃ. ৩১১। দ্র. বে. ব. ম. পৃ. ১২৮ ২৯।
৭. বি. পা. ম. ম. পৃ. ১৩।

সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতির অনুরূপ সাদৃশ্য খুবই ইঙ্গিতবহ। ঐ যুগের রাঢ়ের নগরের তোরণ ও মিনার, দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের তোরণ মিনার বা গোপুরমের অনুরূপ। মন্দির-অনুসারি সুন্দর বীথিকাগুলি গ্রাম বা নগরের প্রধান সংযোগ পথগুলির প্রতিরূপ. মন্দির চতুঃস্পার্শ্বস্থ চওড়া চত্বর ও পথ রাজবাড়ীর চতুর্দিকের পথগুলিকে নির্দেশ করে। ভক্ত বা তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ স্থান যে মন্দির-মণ্ডপ, সেটিই নগরের মন্ত্রণা গৃহের সঙ্গে তুলনীয়। মন্দির সীমানার এক কোণে অবস্থিত সম্পূরক মন্দিরটি, নগরের শস্যগোলা, দোকান পাট বা বাজারের সমতুল। নগরের প্রধান জলাধারটির তীরে যেমন রাজগৃহ স্থাপিত হতো, তেমনি দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখে একটি ছোট পুষ্করিণী ও স্নানঘাট আছে। যার জল 'পবিত্র বারি' (বা 'টেপ্পাকুলম্' বলে সংরক্ষিত। সর্বোপরি মন্দির চতুঃস্পার্শ্বস্থ দেওয়াল বেষ্টনীটি নগরের সীমানা ঘিরে রচিত সু-উচ্চ প্রাচীরকেই মনে করিয়ে দেয়।

জাতিভেদ প্রথা

> বল করি জাতি যদি লএছে যবনে।
> ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে।
> প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন।

বর্ণ বিন্যাস রাঢ়ীয় সমাজ বিন্যাসের মূল বনিয়াদ। বাঙালি সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে জাতিভেদ প্রথার আলোচনা অপরিহার্য ভাবেই এসে পড়ে। বলা বাহুল্য, কোনো এক বিশেষ যুগে, কোনো এক বিশেষ কারণে এর সৃষ্টি হয় নি। সমাজ বিবর্তনের সহজ পথ ধরেই এর প্রবর্তন হয়েছে। প্রাগার্য যুগে এদেশে আহার ও বিবাহ সংক্রান্ত নানা রকম বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্যগণ তাকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন। আমাদের আলোচ্য সময়ের দৃঢ়ভিত্তি জাতিভেদ প্রথা সেই ভাঙাগড়ারই অনিবার্য ফল।

অন্যান্য অনেক জিনিষের মতো এই জাতিভেদ প্রথাও আর্যরা এদেশে এসে গ্রহণ করেছেন। যদিও গুণ-কর্মগত বর্ণভেদ তাদের মধ্যে ছিল, তবু তাঁরা অনার্যদের কাছ থেকে এই জাতিভেদ ব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ করেছেন—নিজেদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করবার জন্যে। সম্ভবতঃ এই জন্যই দেখা যায়, ভারতের প্রাচীন আর্যভূমি হতে যে সব প্রদেশ যতোদূরে, সামাজিক বাছবিচারের সংকীর্ণতা সেখানে ততো বেশী। আর এদেশে আর্য আগমনের আগে নিষাদ, কিরাত, শবর, পুলিন্দ, নাগ, রাক্ষস, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সব জাতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাস করতো, তারা মূলে ভারতীয়, কি অ-ভারতীয়, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, কি দ্রাবিড়-মোঙ্গল গোষ্ঠীর মিশ্রণে গঠিত—এই জটিল নৃতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও, সাধারণভাবে বলা যায়, এরাই কালক্রমে সমাজে ব্রাত্য হিসেবে স্থান লাভ করে।

। **চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ**। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—আর্য সমাজের এই চতুর্বর্ণ বিভাগ প্রাচীন কালে কতোখানি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হতো, সে প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় অবান্তর। তবে পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণেতর যে ছত্রিশ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা বিভিন্ন বর্ণের সংসর্গে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ-জাত সন্তান থেকে সৃষ্ট। এই মিশ্রণের প্রকৃতিভেদে 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' এই ছত্রিশ জাতিকে উত্তম-সংকর, মধ্যম-সংকর ও অধম-সংকর, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।[১] কিন্তু

---

১. বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৩০৩-০৫।

সেখানে ছত্রিশ বর্ণের উল্লেখ থাকলেও, তালিকায় একচল্লিশটি বর্ণের নাম দেওয়া হয়েছে। এর থেকে মনে হয়, তখনকার সমাজেও তালিকার বাইরে আরও অনেক জাতি ছিল। এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলছিলো। সুতরাং, এই বিভাজন ছিল অনেকাংশে কৃত্রিম।

।**ব্রাহ্মণ্য-শাসন**। হিন্দুসমাজ প্রধানত: ব্রাহ্মণ্য-শাসিত। ভারতের পূব প্রত্যন্ত এই দেশে আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবিন্যাসের প্রথম পর্যায়ের শুরু। রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি পুরাণের সূত্র থেকে এই পর্বের ইতিহাস পাওয়া যায়। গুপ্ত আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বর্ণ বিন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ। প্রকৃত পক্ষে 'ষষ্ঠ-সপ্তম' শতকেই রাঢ় বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণ ব্যবস্থা স্বীকৃত ও প্রসারিত হয়েছে। এই সময় থেকেই (রীতিগতভাবে না হলেও) ব্রাহ্মণদের নামের সঙ্গে গাঞী ব্যবহৃত হতে থাকে।[১] দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে এসে এই প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পাল যুগে এসে রাঢ়ের বর্ণবিন্যাসের তৃতীয় পর্বের সূচনা হয়। তবে, পালরাজগণ বৌদ্ধ সংস্কারাশ্রয়ী হওয়ায় বর্ণ বিন্যাসের বিধিনিষেধ তখন কঠোর আকার নেয় নি। সে রূপ লাভ করে সেন-বর্মণ আমলে। বর্তমানে রাঢ় বাংলায় যে বর্ণ বিন্যাস প্রচলিত, তা প্রতিষ্ঠিত হয় এই যুগেই। দ্বাদশ শতকে বর্মণ রাজ্যের মন্ত্রী, স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট রাঢ়ের বর্ণ বিন্যাসকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন। পরবর্তী কালে জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রমুখ তাঁদের লেখা ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে এই ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজ ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলার বর্ণ বিন্যাস ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও অন্ত্যজদের নিয়ে গঠিত। শূদ্রদের দুটি স্তর। সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র। সৎ শূদ্রকে উত্তম-সংকর ও অসৎ শূদ্রকে মধ্যম-সংকর ধরা হয়। অন্ত্যজদের অধম-সংকরের পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। আর অন্ত্যজরা সকলেই অস্পৃশ্য বলে নির্দিষ্ট। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে' অনুরূপ বর্ণ বিন্যাসেরই খবর পাওয়া যায়: বাংলায় আর্য-ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতি নেই।[২] এরা হয়তো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে না পেরে অন্য জাতির সঙ্গে মিশে গেছে। তাই ব্রাহ্মণের পরেই এখানে উত্তম-সংকর জাতি করণ-কায়স্থ ও অম্বষ্ঠ-বৈদ্য।

বঙ্গের ব্রাহ্মণদের মধ্যে সাতশতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, মধ্য শ্রেণী, পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও গ্রহবিপ্র—এই কটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। এদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আগমন সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। সে প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ না করেও বলা যায়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে রাঢ় দেশে ব্রাহ্মণরা এসে বসবাস করেন এবং ব্রাত্য-প্রধান এই সমাজে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে নি। আর্য-শূদ্র বিবাহের মতো অনুলোম বিবাহ এদেশে আগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুল প্রচলিত হয়ে

---

১. বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ২৭৩।

২. বাঙ্গালার পুনরাবৃত্ত, পৃ. ৮৬।

ওঠে। শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণ, বেদবিহিত আচার অনুষ্ঠানে অক্ষম ও নিম্ন জাতির পৌরোহিত্য গ্রহণের ফলে কালক্রমে এঁরা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসেবে সমাজে স্থান লাভ করেন।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে সেকালের সমাজের বর্ণ বিন্যাসের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রীয়—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা কুলেশীলে অনিন্দ্য, তাদের উপাধি ছিল 'চাটুতি,' 'মুখটী', 'বন্দ্য', 'কাঞ্জিলাল', 'গাঙ্গুলী' ও 'ঘোষাল'। এঁরা আবার 'পুতিতুণ্ড', 'পলসাঞি', 'কুসুমগাঞি', 'রাইগাঁই', 'ঝিকরাডী', 'মাসখণ্ডী', 'হিজলগাঁই' —ইত্যাদি নানা গাঞী বা থাকে বিভক্ত ছিলেন।[১] বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরা বেদাচারী ছিলেন। ঘরে ঘরে দেবপূজারত মূর্খ যাজক ব্রাহ্মণেরও অভাব ছিল না।[১] পূজা অপেক্ষা প্রাপ্তির দিকে বেশি নজর থাকার জন্য এঁরা সমাজে মর্যাদা লাভ করেন নি। আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে ঘটক ব্রাহ্মণরা ঘটকালী ছাড়াও কুলপঞ্জী বিচার করতেন এবং উপযুক্ত দক্ষিণা না পেলে বিপর্যয় ঘটাতে কুণ্ঠিত হতেন না। গ্রহবিপ্ররা[২] বা গণকরাও ব্রাহ্মণ সমাজে খুব সম্মানিত ছিলেন না। কারণ, তাদের একদিকে ছিল বেদে অজ্ঞতা, অন্যদিকে জ্যোতিষ ও নক্ষত্র বিদ্যায় আসক্তি ও তার চর্চা করে দক্ষিণা গ্রহণ। এঁরা দীপিকা-ভাস্বতী নিয়ে ফিরতেন, শাস্ত্র বিচার করতেন ও বালকের 'জাইয়াতী' বা কোষ্ঠী রচনা করতেন।[৩] গ্রহবিপ্রদেরই একটি শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত। এঁরাও সমাজে সম্মানিত ছিলেন না। শ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করবার জন্যেই এঁরা সমাজে পতিত ছিলেন। আলোচ্য সময়ে আর একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যায়। এঁরা ভাট নামে পরিচিত। 'পিঙ্গল'-পাঠ ও নিত্য রাজার মঙ্গল চিন্তাই এঁদের কাজ ছিল।[৪] এঁরাও সমাজে নিম্ন বা পতিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। এছাড়া ছিলেন 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণগণ। এদেশে বহিরাগত ব্রাহ্মণদের বসবাসের আগে যে আদি ব্রাহ্মণদের বাস ছিল, তাঁরাই সপ্তশতী বা সাতশতী ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত।[৫]

সতেরো শতকে রাঢ়ীয় সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই কৌলিন্য প্রথার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, কুলীনদের সমাজে খুব সম্মান ছিল। যার ঘরে সব কুলীনই পান-আহার গ্রহণ করতেন, সমাজে তিনি বিশেষ মানী ব্যক্তি বলে পরিচিত হতেন।

গঙ্গার দুকূল কাছে যতেক কুলীন আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।[৬]

---

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩১০।

২. এঁরা শাকদ্বীপাগত বলে এঁদের 'শাকদ্বীপী' ব্রাহ্মণও বলা হয়।

৩. ক. ক. চ. পৃ. ৩৫০।

৪. ঐ. পৃ. ৩৫১।

৫. বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, পৃ. ৯৬।

৬. ক. ক. চ. পৃ. ৩৩৯।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' কায়স্থ ভাঁড়ু দত্ত কুলীন কন্যা গ্রহণ করে এবং কুলীন বংশে কন্যা সমর্পণ করতে পেরে নিজেকে কায়স্থ কুলের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে পরিচয় দেয়।

দুই নারী মোর ধন্যা ঘোষ বসুর কন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা সমর্পণ।'[১]

অন্যদিকে, কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাকে হীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দিলে যে সমাজে পতিত হতে হতো, তার একটি সুন্দর কাহিনী পাওয়া যায় 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-গ্রন্থে।[২] দাদের রক্ষণশীল পরিবারে কিছুকাল আগেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে ক্ষত্রিয় জাতির আগমনের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বঙ্গে আর্যক্ষত্রিয় জাতি নেই। কবি মূলতঃ ভানুবংশ ও চন্দ্রবংশজাত মহাজন ও রাজপুত অর্থে মল্লযোদ্ধাগণেরই উল্লেখ করেছেন। চন্দ্র, সোম ইত্যাদি ব্রাহ্মণের উপাধি। প্রাচীন তাম্রশাসনে ক্ষত্রিয়ের এই সব উপাধি থেকে পণ্ডিতগণ মনে করেন[৩], এঁরা আদিতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, পরে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করে সমাজে ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচিত হন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যেও ক্ষত্রিয়ের প্রসঙ্গে ভানুবংশ ও চন্দ্রবংশের উল্লেখও এই ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী হওয়া অসম্ভব নয়। অন্যদিকে, বাহুবল দেখিয়ে রাঢ় বাংলায় অনেক আদিম অধিবাসী ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা লাভ করে। পুরী রক্ষা, সৈন্যদল পরিচালনা ইত্যাদি কাজে ডোম, চোয়াড় প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর উল্লেখ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

'চৌদিকে চোয়াড় পুরী রক্ষিবার'[৪]

অথবা,— 'সত্তরা কুড়াঁমি কোল পড়িল মাদল ঢোল
কুড়ি হাজার তির ধনু হাথে।'[৫]

অন্যত্র পাওয়া যায়,

'চারি দিকে চৌকি থাকে দলুই সকল।'[৬]

আগেই বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয়ের মতো বৈশ্য বলতেও কোনো নির্দিষ্ট জাতি বাংলায় নেই। মুকুন্দরাম বৈশ্য অর্থে কৃষক, গোরক্ষক ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কথাই উল্লেখ করেছেন।

'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে' অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য দুটি পৃথক্ উপবর্ণ হিসেবে বর্ণিত হলেও, 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে' এদের সমার্থক বলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে বৈদ্যের উল্লেখ নেই।

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩৩৯।

২. 'নীচে কন্যা দিবে কুল যাইবেক নাশ।
.. ..
জ্ঞাতি লোকে কহে মোরা তোমাকে ছাড়িব।' চৈ. চ. (ম. লী.), পৃ. ১১৫।

৩. জাতি-ভেদ, পৃ. ১৩৮, ২০০ ইত্যাদি।

৪. ঘ. ধ. প. ১৩।

৫. বি. ভা. পুঁ. সং ৬২১৭। সীতারামদাসের ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১০ক।

৬. ঘ. ধ. পৃ. ১৬২।

বাংলায়ও অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের অভিন্নতা স্বীকৃত হয়েছে। এঁরা উভয়েই একই বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। এবং এই অভিন্ন চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করবার জন্যেই হয়তো কালক্রমে এঁরা একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে সেন, গুপ্ত, কর, দাস ও দত্ত পদবীযুক্ত বৈদ্যগণের বর্ণনা রয়েছে।[১] এঁদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় কবির বাস্তবতা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালে 'কায়স্থ' কোনো বর্ণ বা উপবর্ণ জ্ঞাপক শব্দ ছিল না, এটি ছিল বৃত্তিবাচক শব্দ। একশ্রেণীর লেখক ও হিসাবরক্ষকরাই 'কায়স্থ' নামে পরিচিত ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে 'করণ' ও 'কায়স্থ' ছিল সমার্থক। পরবর্তী কালে 'কায়স্থ' একটি পৃথক্ বর্ণে পরিণত হয়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' নগরের দক্ষিণদিক্ কায়স্থ মহাজনদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়। কবির মতে, এঁরা শিক্ষিত ও নগরের শোভাবর্ধক। রূপরাম ও তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে বলেছেন—'কাএত কারকুন কত করে লেখাপড়া'। এঁদের মধ্যে কুলপ্রধান 'বসু', 'মিত্র', 'ঘোষ' যেমন রয়েছেন, তেমনি অ-কুলীন 'পাল', 'পালিত' 'নন্দী', 'সিংহ', 'সেন', 'দেব', 'দত্ত', 'দাস', 'কর', 'নাগ', 'চন্দ', 'ভঞ্জ', 'বিষ্ণু', 'রাহা' ইত্যাদিও রয়েছেন।[২] কায়স্থদের মধ্যে যাঁরা রাঢের প্রাচীনতর অধিবাসী তারা 'মৌলিক' বা 'বাহাত্তুরে' নামে পরিচিত। আর নবাগত বা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে যাঁরা এদেশে এসেছেন, তারাই সমাজে কুলীন বলে সম্মানিত। রাঢীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের পরেই কায়স্থদের স্থান ছিল।

মুকুন্দরামের কাব্যে 'বণিক', 'গোপ' ইত্যাদির আগমনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 'তেলী', 'কামার', 'তাম্বুলী', 'কুম্ভকার', 'তন্তুবায়', 'মালী', 'বারুই', 'নাপিত', 'আগুরি', 'মোদক', 'সরাক', 'গন্ধবণিক', 'শঙ্খবণিক', 'স্বর্ণবণিক', 'কাঁসারি', 'পশ্যতোহর' (স্যাকরা) ও 'পল্লবগোপ' জাতির নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাপিত বা নরসুন্দরদের অপরিহার্য উপস্থিতি দেখে মনে হয়, এককালে এঁরা সমাজে খুব আদৃত ছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন জাতি কখনও তাঁদের পূব মর্যাদা হারিয়েছে, আবার কখনও বা নতুন নতুন জাতি বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সব নবাগত জাতিকেই 'নবশাখ' বলা হয়েছে। প্রথমে হয়তো এদের সংখ্যা নয়টিই ছিল। কিন্তু ক্রমেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমাদের আলোচ্য সময়ে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীরও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 'কলু', 'বাইতি', 'বাগদি', 'মাছুয়া', 'কোচ', 'ধোবা', 'সিউলি', 'ছুতার', 'পাটনী', 'চৌতুলি', 'কোরঙ্গা', 'মাঝি', 'চুনারী', 'বাউরি', 'মাল', 'চণ্ডাল', 'কিরাত'

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩৫২-৫৩।
২. ঐ. পৃ. ৩৫৪।

'কোল', 'হাড়ি', 'শুড়ি', 'চামার', 'ডোম' ইত্যাদি নাম ও এদের ভিন্ন ভিন্ন পেশার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাঢ়ীয় সমাজ-শ্রমিক জাতিগুলি প্রায়ই অধম সংকর বা অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত। তবে, 'ধোপা', 'নট' ইত্যাদি কয়েকটি অনুৎপাদক অন্ত্যজ শ্রেণীও রয়েছে। এরা সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শ্রমিক শ্রেণী হলেও এদের বাস বর্ণাশ্রমের একেবারে বাইরে।

সতেরো শতকের কবি যাদুনাথের ধর্মপুরাণে 'ডাঙ্গর' জাতির উল্লেখ[২] পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপূজা বিধানে' 'ডাঙ্গরে' নামে কৃষকশ্রেণীর খবর পাওয়া যায়।[৩] বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যেও 'ডেঙ্গালিআ' শব্দটি পাওয়া যায়।[৪] চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ-বিজয়'-কাব্যে 'ডিঙ্গল' নামে একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] এই 'ডাঙ্গর', 'ডিঙ্গল' বা 'ডাঙ্গরে' অভিন্ন জাতি বলে মনে হয়। ডিঙ্গলে বা ডাঙ্গলে পদবীযুক্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। এদের পূজিত কালী 'ডাঙ্গল কালী' নামে পরিচিত।[৬]

'রাঢ়' শব্দটি জাতিবাচক কিনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যায় পণ্ডিত মহলে। 'রাঢ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচার করলে দেখা যায় উত্তরে গঙ্গা এবং পূবে ভাগীরথী নদীর দ্বারা চিহ্নিত সমগ্র প্রাচীন বাংলার অংশবিশেষ এবং এই নদীদ্বয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ ভূভাগ রাঢ বা রাঢা নামে পরিচিত। এই রাঢা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বজ্জভূমি বা উত্তর রাঢ এবং সুহ্মভূমি বা দক্ষিণ রাঢ় এই দুই জনপদে বিভক্ত। অপর পক্ষে রাঢ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই এটি একটি জাতিবাচক শব্দ। রাঢ় জাতির বাসভূমি এই অর্থে আলোচ্য জনপদের নাম রাঢভূমি। যেমন ধবল জাতির বাসভূমি ধলভূম, মল্ল জাতির বাসভূমি মল্লভূম, বীরহোড় জাতির বাসভূমি বীরভূম ইত্যাদি। একটি পুঁথিতে[৭] রাঢ শব্দের অর্থে একদিকে যেমন ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগকে বোঝাচ্ছে, অপরদিকে আবার 'অশিষ্ট' এই অর্থও পাওয়া যায়। এই অর্থের মধ্য দিয়ে রাঢ জাতির পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। আবার O. D. B. L.-এর অর্থ অনুযায়ী রাঢ শব্দের অর্থ ইতর জাতীয় লোক, শূদ্র, উদ্ধত স্বভাব, রুক্ষ প্রকৃতির, গোঁয়ার ইত্যাদি। মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা রাঢ শব্দের একাধিক উল্লেখ পাই। প্রথমত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের উক্তি—'পাথর ধাবার রাঢ',

---

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩২৯-৩১।

২. সা. প্র. ৩, পৃ. ৯।

৩. 'নাগর জয়ানি ধান্য বাছা বুনিল ডাঙ্গরে।' পৃ. ২১৬।

৪. বি. ম. পৃ. ৪৬।

৫. 'সভাকারে বেচে নিঞা ডিঙ্গালের ঘরে।' পৃ. ৬১।

৬. বোলপুর থানার অন্তর্গত 'ত্রিশূলপটি' অঞ্চলে এবং বোলপুরের সন্নিকটস্থ মুলুক' গ্রামে এই দেবতা বর্তমানেও বীরবংশী কর্তৃক পূজিত।

৭. বি ভা. পুঁ সং ১৭৬২।

'কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়'[১], 'ব্যাধ গো হিংস্রক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়'[২] এবং ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের—'জাতি রাঢ় আমিরে করয়ে রাঢ় ভু'[৩], 'কত হবে সুজন আখের জাতি রাঢ়'[৪], 'ভু রাঢ চোয়াড় তোকে সব কর্ম খাটে'[৫]—ইত্যাদি উক্তি এবং এর সঙ্গে বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ—'ওমা রাঢে ছুঁয়ে দিলে'[৬] এবং ভাগলপুর অঞ্চলের প্রচলিত প্রবাদ[৭] ইত্যাদি সূত্র থেকে রাঢ শব্দটিকে জাতিবাচক বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

পরবর্তী কালে যে কোনো কারণেই হোক্ এই রাঢ় জাতি সমাজে হীনমান্যতা লাভ করে এবং তখন থেকেই এই 'রাঢ' জাতি সমাজে অন্ত্যজরূপে স্থান লাভ করে। মনে হয়, পশুবধ ছিল এদের উপজীবিকা। সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা বিভিন্ন 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, এরা ভালো যোদ্ধা হতো।

। **মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা**। হিন্দু সমাজের প্রভাবে আমাদের আলোচ্য সপ্তদশ শতকে মুসলমানদের মধ্যেও ভেদ-বিচার শুরু হতে দেখা যায়। বাঙালির সমাজে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক থেকেই 'নয়া মুসলমান' ও পাঠান স্থায়ী আসন পেতে বসতে থাকে প্রায় প্রতিটি বর্ধিষ্ণু গ্রামেই। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে নবনির্মিত গুজরাট নগরের পশ্চিমপটীতে এদের বাস নির্দিষ্ট হয়। বৃত্তিভেদে ও ধর্মাচরণভেদে এদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল।[৮] এদের মধ্যে ধর্মাচার বা রোজা-নমাজ-বিহীন মুসলমানেরা 'গোলা' নামে পরিচিত। ধর্মান্তরিত-হিন্দুরা পরিচিত ছিল 'গরসাল' নামে। এছাড়া তাঁত বুনে 'জোলা', পিঠা বিক্রয় করে 'পিঠারি', সানা নির্মাণকারা 'সানাকার', শর নির্মাণ করে 'তীরকর', মৎস্য বিক্রয় করে 'কাবাড়ি', কাগজ প্রস্তুত করে 'কাগজী', গোমাংস বিক্রয়কারী 'কসাই' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত জাতির সৃষ্টি হয়। এছাড়া, 'দরজি', 'বেনটা', 'রঙ্গরেজ', 'হাজাম' প্রভৃতি বৃত্তিভেদে নানা জাতির খবর পাওয়া যায়। এদেশে আগত পাঠানরা মূলে 'শেরানি', 'লোহানি', 'কুডানি' ও 'বিটুনি' এই চারশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।[৯] পরবর্তী কালে হিন্দু-সমাজের প্রভাবে তাদের মধ্যেও নানারূপ বিভেদের সৃষ্টি হয়। তাই এর সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। তবে, হিন্দুদের মতো মুসলমান-সমাজে এই জাতিভেদ কখনই কঠোর রূপ ধারণ করে নি। এই জাতিভেদ পেশাগত বংশানুক্রমিক জাতিভেদ। সপ্তদশ

১ ক. ক চ. পৃ. ২৯০ ।
২. ঐ পৃ. ২৫২ ।
৩. ঘ. ধ ম. ২০২ ।
৪. ঐ পৃ. ২৮০ ।
৫ ঐ পৃ. ২২২ ।
৬ রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃ. ২ ।
৭. 'রাঢ়কা মাফিক এয়সা বাৎচিত' ইত্যাদি ।
৮. ক. ক. চ. পৃ. ৩৪০ ২৬ ।
৯. ঐ. পৃ. ২৪৪ ।

শতকের কবি রূপরামের ধর্মমঙ্গলে রয়েছে 'এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়'[১] —এই উক্তির মধ্যে দিয়েই মুসলমান-সমাজের ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়।

। **বৈষ্ণব-সমাজে জাতিভেদ** । আমাদের আলোচ্য সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব সমাজেও জাতিভেদ অনুসৃত হতে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত অপেক্ষাকৃত উদার ধর্মনীতির প্রাঙ্গণেও বিভেদের গণ্ডী সৃষ্টি হতে থাকে। ষোড়শ শতকে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-কাব্যে দেখি শ্রীচৈতন্য শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ওপরে নয়, যতিদের ওপরেও বৈষ্ণবদের স্থান নির্দেশ করেছেন—

"শূদ্র জাতি শ্রেষ্ঠ বৈশ্য, বৈশ্য শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রি।
ক্ষেত্রিএ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তার শ্রেষ্ঠ যতি ॥
যতিএ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ সর্ব শ্রেষ্ঠ হএ।
বৈষ্ণবের সমান পদ আর কেহো নয় ॥"

অন্যত্র রয়েছে— "বৈষ্ণব প্রতি না করিহ জাতিভেদ।
বৈষ্ণব সভার শ্রেষ্ঠ কহে সব বেদ ॥"

বৈষ্ণবদের মধ্যে জাতিভেদ নেই বলে তিনি তাঁর ভক্তদের চণ্ডাল বা যবন যদি বৈষ্ণব হয়, তবে তাঁকেও সম্মান দিতে বলেছেন। জয়ানন্দের মতে তিনি নিজেও 'আচণ্ডাল আদি সভারে দিল কোল।' অপরদিকে এই জয়ানন্দই আবার তাঁর কাব্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে দিয়ে বলিয়েছেন, "অল্প ভাগ্যে নহে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম।" আবার ব্রাহ্মণ ও শূদ্রেরা নিজের নিজের জাতির আচার-বিচার লঙ্ঘন করায় জয়ানন্দ নিজেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শূদ্রদের শালগ্রাম শিলা পূজা করা 'হরিভক্তি বিলাসে' অনুমোদন করা হলেও জয়ানন্দ নিজে তা অনুমোদন করেন নি। এর থেকে সহজেই মনে করা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেও সাধারণ বৈষ্ণবরা জাতিভেদ মেনেই চলতেন।

যদিও চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে নিত্যানন্দ বলেছেন—'জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে', তবু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর অনুবর্তীরা জাতিভেদ সম্পর্কিত রক্ষণশীলতা মেনে চলতেন গোঁড়াভাবে। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্য দান করে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের উদারতাকে সীমিত করতে থাকেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র ও গোপাল ভট্টদেবের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্যের নেতৃত্বে বৈষ্ণবদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা হয়।

যতোই দিন এগিয়ে চলতে থাকে, রাঢ়-বঙ্গে জাতিভেদের ব্যাপারে কঠোরতা ততোই প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। প্রাচীন কালে যে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা পরবর্তী কালে লোপ পেতে থাকে। বিভিন্ন কারণে সমাজে পতিত জাতি বা পরিবারকে তখন সামান্য একটু প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে দেখা যায়।

১. বি. ভা. পুঁ. সং ৮১৮। প. সং ৫৭।

বল করি জাতি যদি লএ ত যবনে।
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে॥
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন।[১]

পঞ্চদশ শতকের দেবীবর ঘটকের 'কারিকায়' আমরা 'দোষ'-যুক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের যে খবর পাই, তাতে দেখা যায় রাঢ়-বঙ্গের সমস্ত ব্রাহ্মণই যেন কোনো না কোনো দোষে দুষ্ট। তবু, তৎকালীন সমাজ তাঁদের জাতিচ্যুত না করে 'মেলবন্ধনের' মাধ্যমে সমাজে স্থান দিয়েছে। কিন্তু, পরবর্তী কালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যবন-সংস্পর্শ ইত্যাদি বিবিধ কারণে হিন্দুদের জাতিচ্যুতি ঘটতো। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনী এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই অনুদারতা চরমে পৌছায় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে।

১. মধ্যযুগে বাঙ্গালা, পৃ. ২২৫।

অর্থনৈতিক অবস্থা

ধনে মানে কুলে শীলে চান্দ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে তার সাত মড়াই টাকা॥
ইহা শুনি হাসি বলে নীলাম্বর দাস।
কলঙ্ক ভাণ্ডার ধন কুলের প্রকাশ॥

শেরশাহের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করে মোগল বাদশাহগণ 'ফরমান' বা নির্দেশ জারি করেন। শেরশাহের আদর্শ ছিল জনকল্যাণ। আকবর বাদশাহ ছাড়া এই আদর্শ আর কারও ছিল না। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে সুবা বাংলার শাসন পদ্ধতির ক্রমপরিণতিতে দেখা যায়, একদিকে বিলাস-বৈভব সমৃদ্ধ রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে নিতান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে ধনবৈষম্যের প্রাচীর সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছে।

সতেরো শতকের অনেক কবির কাব্যের মধ্যেই তৎকালীন সমাজের এই আর্থিক বৈষম্যের ছবিটি সুস্পষ্ট। একদিকে যেমন—

যত ধন আছে ঘরে খায় চোদ্দ পুরুষে
তমু ধন না ছাড়িবে ভার।
নয় লক্ষ টাকার হাড়া আমার ভাণ্ডারে আছে হে
আশি লক্ষ বাখারি আছে ধান।
রাজা জোম জোম পাথর সাড়া সিংহাসন পাটের দোলা
হিঙ্গলে নির্মিত বাসো ঘর।
হীরামন মানিক আমার তালাএ সুখায় হে।
মোহলা মোহলা পাটের কাপড়॥[১]

অন্যদিকে এরই পাশে পাশে সমাজের চরম দারিদ্র্যের খবরও পাওয়া যায়—

অন্ন-বিপরীত দুঃখ তাম্বুল-বিপরীত মুখ
কলেবরে নাহি আচ্ছাদন।
তোর কেনরে শূনের দড়ি পরিধান ছেড়া ধড়ি
মাথা তোর ভেদ ভেআম্বর।

---

১. বি. ম. পৃ. ৬৮।

মনস্য জনম হয়্যা কের নানা দুঃখ পায়্য
জীবনেতে কি সুখ তোমার ॥[১]

অথবা—

সাত গাঁঠা টেনা খান টানিঞা পড়িতে
হাত ডের সোটা খানি কান্দে করি নিতে।
সুকর রাখিতে তুমি পথরে প্রথরে
বাটুল মারিঞা খগ বেচিতে নগরে॥
কুলীন ডোমের কন্যা লক্ষা ডুমনি
তোর তরে ঘরে ঘরে মাগিৎ আমানি।
ভোজনের পাত্র নাই জন্মের কাঙ্গাল।
আমানির তরে ঘরে কুড়া ছেলে পাল॥
সাত জুড়ি ছুটা মোচ বান্ধ নিঞা ঘাড়ে
আমানির চমকে কুড়ার পড় উড়ে॥
বাদল বরিসায় বৃত্তি বুলিতে না পাইবে।
উপবাস করিঞা তোমাদের দিন গেছে॥[২]

আর আঠারো শতকের প্রথম দিকে রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-কাব্যে কুলীন ব্রাহ্মণের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে, পূর্ব শতাব্দবাহিত দেশের আর্থিক দুর্গতির ধারাটিকেই সাহিত্য রূপে বিধৃত দেখি।

'কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি
কন্যায় অশেষ দোষ ক্ষমা করো তুমি।
আঁঠ ঢাক বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত[৩]

কিন্তু বাংলায় মুঘল আগমনের পূর্বে বাঙালিদের সাধারণ অবস্থা মোটের উপরে সমৃদ্ধ ছিল। তাই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের দিকে মুখ ফিরালে তৎকালীন নাগরিকের সাংসারিক জীবনের কামনা দেখি ঐশ্বর্য-উজ্জ্বল—

তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ-বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে॥[৪]

এই সময়েই আমরা 'বহুধন' ব্যয়ে 'পুত্তলি' করাবার এবং পুত্র-কন্যার বিবাহে সাধারণ নাগরিকের 'ধন নষ্ট' করবার খবর পাই।[৫]

এই সব সাহিত্য থেকে পাওয়া নজীরে দেখা যায়, মুঘল-শাসনে রাঢ়-বাংলার আর্থিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখা

১. বি ম পৃ. ৫১।
২. বি. ভা পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ১৬৭৭।
৩. রা. শি. পৃ. ৫২।
৪. মধ্যযুগে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, পৃ. ৫১।
৫. চৈ. ভা. (আ) পৃ. ১৭।

দরকার, মধ্যযুগের বিস্তৃত সাহিত্য-সম্ভারের বিচ্ছিন্ন কাব্যাংশ তুলে ধরে, নিজের সুবিধামতো এ রকম অনেক বক্তব্যকেই সপ্রমাণ করা যায়। তাই এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে দেশে দরিদ্র মানুষ ছিল না, অথবা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকেই দারিদ্র্যের সূত্রপাত। তবে, ঐতিহাসিকেরা এ কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন, মুঘল-আমলের সুবাদারী অর্থগৃধ্নুতায় দেশের ধনসম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়ার ফলে, এবং সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয়র ঘরে সম্পদলক্ষ্মীর অভিযান ও অধিষ্ঠান শুরু হওয়ায়, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। দুবেলা দুমুঠো ভাত আর পরণের এক টুকরো কাপড় পেলেই তাঁরা কৃতার্থ হতো। মুঘল আমলের এই আর্থিক অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ রাজকীয় শোষণ। প্রাক্‌মুঘল যুগে বাংলা দেশ দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বাধীন থাকায়, দেশের ধন-সম্পদ দেশেই থাকতো। ফলে, বাংলা তথা রাঢ়-অঞ্চল তখন খুবই সম্পদশালী ছিল। অন্য দিকে, মুঘল আমলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়ে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার ফলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তবু, রাষ্ট্রীয় শোষণের ফলে রৌপ্য-মুদ্রার চলন অত্যন্ত কমে যায়, এবং জিনিষপত্রের দামও কমতে থাকে। ফলে, সাধারণ লোকে টাকা জমাতে পারতো না। তাদের মূলধনও কমতে লাগলো। অন্য দিকে, জিনিষপত্রের দাম কম থাকায় কিছু সংখ্যক লোকের স্বল্পমূল্যে জিনিষ কিনে ব্যবসা করে প্রভূত ধন লাভ করার সুযোগ হলো। বিনিময়ের জন্যে কড়ির ব্যবহার বাড়লো। (অবশ্য আগে থেকেই মুদ্রা হিসেবে কড়ি ব্যবহৃত হতো।) ধনবৈষম্য প্রবল আকার ধারণ করতে লাগলো। বর্তমানে, এই প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য-অভিব্যক্ত মুঘল আমলের আর্থিক কাঠামোটির বিস্তৃত পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

মুঘল আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এদেশে বাদশাহের ফরমান নিয়ে আসতেন, এবং কাজের মেয়াদ শেষ হলে, কিংবা অনেক সময়ে ডাক পড়লে, মেয়াদ শেষ হবার আগেই রাজধানীতে ফিরে যেতেন। এই শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বাদশাহের পুত্র বা পৌত্র। এদেশে তারা বিরাজ করতেন প্রায় স্বাধীন নৃপতির মতো ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে। অন্যরা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পর্যায়ভুক্ত। তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। স্বভাবতঃই এঁদের অর্থগৃধ্নুতা ছিল শাহজাদা-দের তুলনায় অনেক বেশী। বাংলার ব্যাপারে রাজধানীতে তাঁদের দায়িত্ব ছিল শুধু সময়মতো খাজনা পাঠাবার। তাঁরা বাংলা ভাষা-ভাষী ছিলেন না, এবং বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের কোনো রকম শ্রদ্ধা বা আসক্তি ছিল না। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, বাংলার অর্থের প্রতি তাঁদের আসক্তি ছিল প্রবলতর। বাংলা যে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পন্নতম রাজ্যাংশ, এই দেশে আগমনের আগেই এ সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন থাকতেন। ফলে, এই দেশ থেকে তাঁদের আর্থিক প্রত্যাশাও মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠতো।

মোটামুটিভাবে সতেরো শতকের সূচনা থেকেই রাঢ় বাংলা সম্পূর্ণভাবে মুঘল

অধিকারে আসে। সুতরাং তার আগে বাংলা থেকে দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ বিশেষ কিছু পাঠানো হতো না। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কিছু আগে (১৬২৭ খ্রীঃ) এখানকার সুবাদার, 'প্রতি বছর বাংলা থেকে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে দশ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত উপঢৌকন হিসাবে পাঠাতে হবে', এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১] আগে তাঁরা পেতেন হাতী, ঘোড়া, মসলিন ও শীতলপাটি ইত্যাদি সূক্ষ্ম শিল্পজাত দ্রব্য। তখনও এ দেশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব পাঠানো হতো না। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুবাদার শায়েস্তা খাঁ প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টাকা করে পাঠাতেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সুবা-বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্বই ছিল সম্রাট ও তাঁর রাজন্যবর্গের প্রতিপালনের প্রধান অবলম্বন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে যখন ঔরঙ্গজেব দীর্ঘকাল ব্যস্ত ছিলেন, তখন সেই যুদ্ধের ব্যয়ের একটা মোটা অংশ শায়েস্তা খাঁ বাদশাহকে পাঠাতেন, বাংলার রাজস্ব থেকে। এ ছাড়া ঔরঙ্গজেবকে খুশী করবার জন্যে শায়েস্তা খাঁ প্রচুর অর্থ পাঠাতেন। একবার ঋণ দিয়ে ফেরত নেন নি। বলা বাহুল্য, সাধারণ নাগরিকের ওপরেই এর চাপ সৃষ্টি হতো। এইভাবে দেশের সম্পদ্ দেশের বাইরে চলে যেতো। বাকী অংশ অর্থলোলুপ সুবাদার, অসাধু রাজকর্মচারীদের উদরপূর্তিতেই নিঃশেষ হয়ে যেতো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, একা শায়েস্তা খাঁ নিজেই বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বাংলার সুবাদারী করে বাইশ বছরে প্রায় আটত্রিশ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়।[২] একমাত্র ইব্রাহিম খাঁ ছাড়া মুঘল সুবাদারদের প্রত্যেকেই এ দেশ থেকে রাজধানীতে ফিরে যাবার সময়ে বিপুল পরিমাণে সোনা রূপো চাঁদে জহরৎ সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। মুঘল সুবাদাররা যে পরিমাণ অর্থ বাংলা থেকে শোষণ করে রাজধানীতে ফিরে যেতেন, যে হারে দিল্লীর তখ্ত-তাউসের নজরাণা পাঠাতেন এবং যে অর্থ সুবাদার বা অন্যান্য শাসনকর্তারা বিলাস ব্যসনে ব্যয় করতেন, সে সমস্তই জোগান দিত এ দেশের অধিকাংশ খেটে-খাওয়া মানুষ। দেশের হাজা শুখার সমস্ত বিপদের ঝড় যাদের উপর দিয়ে বয়ে যায়, অধিকাংশ সময়েই তাদের 'শিশু কান্দে ওদনের তরে'।[৩] এবং আত করে সংগৃহীত উদর পূর্তির 'আমানি' খাবার জন্যে প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্রও ছিল তাদের কাছে দুর্লভ

ভোজনের পাত্র নাই জন্মের কাঙাল
আমানি খাবার তরে ঘরে কুড়া ছিলে থাল।[৪]

টোডরমলের সময়ে (১৫৮২ খ্রীঃ) সুবা-বাংলার সাংবৎসরিক রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়। তার মধ্যে খালসা ভূমির রাজস্ব ও জায়গীর ভূমির রাজস্ব ছিল স্বতন্ত্র। জায়গীর-জমা রাজকর্মচারীদের নির্ধারিত খরচার জন্যে, এবং খালসা-জমা রাজকোষের জন্যে। টোডরমলের

১. H. O. B. Vol II P. 218
২. বাংলা দেশের ইতিহাস ২য়, পৃ ২২৭।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ৩১।
৪. প্র ধ বি ভা. পু., সং ৪০৮, শ. সং ১১৭৭

রাজস্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী সুবা-বাংলা ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত হয়। শাহজাহানের সময়ে সুবাদারীকালে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, শাহ সুজা তোডরমলের ব্যবস্থা সংশোধন করেন। বাংলাদেশ অতিরিক্ত ১৫টি সরকার ও ৬৮৮টি পরগণায় বিভক্ত হওয়ায়, জমা অনেক বেড়ে গেল। ওড়িষ্যা থেকে কিছু অঞ্চল খারিজ করে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। আকবরের আমলে রাজস্ব-বিধি ছিল জমির উৎপাদন ক্ষমতাভিত্তিক, এখন হলো জমিদার রায়তের কাছ থেকে পাওয়া রাজস্ব-ভিত্তিক।

তোডরমল্ল, সুজা ও মীরজুমলার এই অর্থনৈতিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিলি ব্যবস্থার ফলে, রাজস্ব ও করপ্রথা মোটামুটি নিয়ম শাসনের মধ্যে এলেও, ছোটো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কর আদায় করা হতো। রাজস্ব আদায় করবার সময়ে রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে থাকতো সিপাহী। তারা হিসাবমতো রাজস্ব ও মনোমতো উপরি পাওনা না পাওয়া পর্যন্ত যদৃচ্ছ অত্যাচার করতো। মীরজুমলা (১৬৫৯-৬৩ খ্রীঃ) সওদা-ই-খাস (সমস্ত পণ্যদ্রব্য রাষ্ট্রীয়ত্তীকরণ)-এর নামে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিলেন।[১] ছোটো বড়ো সব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে যুদ্ধ ব্যয় বাবদ তিনি প্রচুর অর্থ আদায় করতেন। মীরজুমলার শাসনকালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হয়ে বহু লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু তখনও রাজকর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেন নি। মীরজুমলার মৃত্যু ও শায়েস্তা খাঁর বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করবার মধ্যবর্তী সময়ে, এদেশে এমন অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, সাধারণ রাজকর্মচারীরাও ভয়-সংকোচ পরিত্যাগ করে 'সওদা-ই-খাস'-এর দোহাই দিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য কিনে নিয়ে তাদেরই আবার চড়া দামে বিক্রি করতো।[২] ইংরাজ বণিকরাও যারা রেশম ও সুতীবস্ত্র উৎপন্ন করতো, তাদের নামমাত্র দাদন দিয়ে উৎপন্ন কাঁচামাল অল্প দামে গুদামজাত করতো। তারপর, এদেশের শ্রমিকদের দিয়েই সেই সব কাঁচামাল ঝাড়াই বাছাই করে চড়াদামে দেশ বিদেশের বাজারে বিক্রি করতো। সুতরাং দেখা যায়, 'সওদা-ই-খাস' নীতির সমস্ত ভারটা আপামর বাঙালি সাধারণকেই বহন করতে হয়েছিল।

আমাদের আলোচ্য সময়ের অর্থনৈতিক কাঠামোতে আন্তর্জাতিক শক্তির ক্রমবিকাশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।[১] বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও বিদেশী বণিকদের হাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্ষমতা বিস্তারে সেই শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে রূপোর অতিরিক্ত আমদানী, বাংলার অর্থনীতিতে সহসা গভীর পরিবর্তনের সূচনা করলো। অন্যদিকে, বাংলায় একটি সর্বদেশগ্রাহ্য বিনিময় মাধ্যম প্রচলন করে ইউরোপীয় বণিকরা আমাদের দেশ বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমতা বিশেষ বিস্তৃত করলো. আগে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিনিময়-প্রথা চলাকালীন যা সম্ভব ছিল না।

১. বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃ ৫০-৫৬
২. H. O. B. VOL. 2, P. 216

এই সময় বাংলার অর্থনীতির অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো চুঁচুড়া, কোলকাতা এবং চন্দননগরে ইউরোপীয়-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। এ ছাড়াও, ইউরোপীয় বণিকরা বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যের ওপরে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে, শ্রমিকদের দাদন দিয়ে, তাদের কুঠীতে ভারতীয় শ্রমিকদের জন্যে কারখানা স্থাপন এবং ইংল্যাণ্ড থেকে আনা বিশেষজ্ঞ দিয়ে দেশীয় কারিগরদের উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, বাংলার শিল্পোৎপাদনকে প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো ছাড়াও, তার গুণগত মানেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল।[১]

বাংলার বাণিজ্যে এবং শিল্পে ইউরোপীয়দের এইভাবে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ, বাংলার অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই প্রত্যক্ষ সম্প্রসারণ, প্রচুর মুদ্রার আমদানী, ইত্যাদি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছিল। এটা আলোচ্য সময়ের অর্থবণ্টন পর্যায়ে ঘোর ত্রুটিকেই নির্দেশ করে।

সতেরো শতকের রাঢ়-বাংলার বিভিন্ন কবির কাব্যের মধ্যে দিয়ে সেকালের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-ভিত্তিক সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। বর্তমান অধ্যায়ে পৃথক্‌ভাবে এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হবে।

।। **কৃষি** ।। রাঢ়-দেশ আবহমান কাল ধরে কৃষিপ্রধান ভূভাগ। আবহাওয়া কৃষি কাজের অনুকূল হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যই ছিল এদেশের ধনাগমের প্রধান সম্বল। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান ছিল প্রধান উৎপন্ন শস্য। এই ধান একান্তভাবে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। হয়তো সেই জন্যেই এদেশে যথেষ্ট নদী খাল বিল থাকা সত্ত্বেও দেশীয় ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে, লৌকিক ব্রত ও পূজানুষ্ঠানে মেঘ ও আকাশের কাছে জল প্রার্থনার বিরাম ছিল না।

সতেরো শতকে বার্ণিয়ার লিখেছেন[২], 'অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর দেশই সবচেয়ে শস্য-শালিনী। কিন্তু, এই খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য। এদেশে এত প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মায় যে, তা কাছে ও দূরে বহু দেশে রপ্তানি হয়। সমুদ্রপথে মসলিপত্তন ও করমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে, এমন কি লঙ্কা এবং মালদ্বীপেও চালান হয়।'

এদেশে প্রাচীন কালে যে কতো বিচিত্র নামের ধান উৎপন্ন হতো, তার বেশির ভাগই আজ আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে। আইন-ই-আকবরীর বিবরণ অনুযায়ী, এদেশে উৎপন্ন ধানের প্রত্যেকের এক একটি নিয়ে একত্র করলে একটি জালা পূর্ণ হতে পারে। রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধানে শতাধিক ধরনের ধানের উল্লেখ রয়েছে।[৩] সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কমলামঙ্গল'-কাব্যে দেবী কমলার

১. H. O. B. Vol. II, P. 219.

২. Travels in the Mogul Empire, P. 437-40

৩. ধর্মপূজা বিধান, পৃ. ২২৭-৩৭।

অঙ্গের আভরণ হিসাবে বহু রকম ধানের নাম পাওয়া যায়।[১] আঠারো শতকের প্রথম দিকের কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-কাব্যে শিবের চাষ প্রসঙ্গেও বহুতর ধানের নাম মেলে। 'ধান্য ঘর'[২] বা ধান সংরক্ষণের মড়াই-এর খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সাহিত্যে। বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে 'বাখারি'[৩]-তে ধান সংরক্ষণের খবর রয়েছে। 'মড়াই'-এর মধ্যে তিল সংরক্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন কবি রূপরাম তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে।

একালের মতো সেকালেও ধানের দর ওঠানামায় দেশের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি বা অবনতি ঘটতো। খরাজনিত ক্ষতির কারণে সাধারণ ক্ষেদোক্তি শোনা যায় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে :

দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥[৪]

ধানের পরে কার্পাসের চাষের উল্লেখ করা যায়। এদেশে কার্পাস চাষের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। কার্পাস চাষের জমিকে 'কাবাসে'-জমি বলা হতো। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'[৫] ও রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'[৬]-কাব্যে এই 'কাবাসে' জমির উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য সময়ে কার্পাসের জমিতে গরুর মাথার খুলি বা মৃত গরুর কঙ্কাল নিক্ষেপ করে বা গোমুণ্ড টাঙিয়ে দিয়ে এক ধরনের তুক্ করা হতো বলে জানা যায়।[৭] এতে নজর-দোষ লেগে শস্যের (বিশেষতঃ রবিশস্যের ক্ষেত্রে) বাড় কমে যাওয়া বন্ধ হতো। আমরা প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে জেনেছি রাঢ়ে এই রীতি আজও বর্তমান রয়েছে। এই কার্পাস বাড়ির গোমুণ্ডের আবার নবজাত সন্তানের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠী পূজায় প্রয়োজন দেখা যায়। কবি মুকুন্দরাম, রূপরাম ও যদুনাথ এর উল্লেখ করেছেন।

রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, সোমঘোষ বৎসরাধিক কাল যাবৎ বন্দী ছিল; ফলে, ধান কার্পাসের চাষ বন্ধ থাকায় তার সপরিবারে ভিক্ষুকের দশা হয়েছিল।

ধান-কাপাস বিনা মোর গ্রহ হল্য টুট।
চালু কলাই দেশের বান্দরে করে লুট॥
বিয়োগে বিপাকে দুঃখ সর্বনাস হলা।
অন্ন বিনা অকালে জুআন বেটা মল্য॥[৮]

---

১. কৃ. রা. গ্র. পৃ. ৩০৩।
২. ক. ক. চ. পৃ. ৪০৬. রা. শি পৃ. ২৩১।
৩. বি. ম. পৃ. ৬৮।
৪. চৈ ভা. পৃ. ২১৪।
৫. ক. ক. চ. পৃ. ৪৫, ১১১।
৬. রূ. ধ. পৃ. ৬২।
৭ চি প. স. চি. ১ম. পৃ. ৯১। পা. টী. দ্রঃ। বীরভূম জেলার নমদমা গ্রামে (কোপাই রেল-ষ্টেশনের দক্ষিণ পূর্ব কোণে) আমরা এই রীতির প্রচলন দেখেছি।
৮. রূ. ধ. পৃ. ৪১।

সেকালে কার্পাস সংরক্ষণের জন্যে 'ডোলে'র ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়।

'স্রোতে ভেস্যা গেল মোর কাপাসের ডোল।'[১]

অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাঢ় বাংলায় চিনি ও গুড় তৈরি হতো। এবং এই চিনি এত বেশি পরিমাণে তৈরি হতো, তা দক্ষিণ ভারতে গোলকুণ্ডা ও কর্ণাট এবং আরব, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হতো বলে সতেরো শতকের বিদেশী পর্যটক বার্নিয়ার তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন।[২]

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টির পরে, কলিঙ্গবাসী জনৈক প্রজার গৃহের সাত মণ চিনি জলের সঙ্গে ভেসে যাওয়ার বর্ণনায়, চিনি প্রস্তুতের আধিক্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ইক্ষুজাত গুড় থেকে 'গৌড়' নাম হওয়ার মতবাদ আজকাল অচল হলেও পুণ্ড্র জাত আখ 'পুঁড়ি' আখ নামে আজও সুপরিচিত।[৩]

তিল, মাষ, কলাই, গম, সর্ষে ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। আলোচ্য শতকের বিদেশী ভ্রমণকারী বার্নিয়ার লিখেছেন—'এদেশে গম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হলেও, তা এদেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সেই গম থেকে এক রকম সস্তার সুন্দর বিস্কুটও তৈরি হতো সমুদ্রগামী ইউরোপীয় নাবিকদের জন্যে।'[৪] বিভিন্ন কবির রচিত 'মঙ্গলকাব্যে' সেকালের বিনিময়-বাণিজ্য প্রসঙ্গে নারিকেল, গালা, সুপারি, পান, হলুদ, আদা, মরিচ, লবণ, লবঙ্গ, তেজপাতা, লঙ্কা ইত্যাদি নানা রকম মশলা যে প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো এবং রাঢ়ের বাইরে দেশ-বিদেশে রপ্তানি হতো তা জানা যায়।

সতেরো শতকে এমন কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানী হয় পরবর্তী কালে যার প্রচলন খুব বেশী হয়েছিল। এদের মধ্যে তামাক ও আলু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুটি কৃষিজাত দ্রব্যই আলোচ্য শতাব্দীতে প্রথম আমেরিকা থেকে পর্তুগীজগণ এদেশে আনে। সতেরো শতকের আগে রচিত কোনো কাব্যে এদের উল্লেখ নেই। এই শতকের শেষের দিকেই এদেশের কৃষিজাত দ্রব্য হিসেবে প্রথম পরিচিত হয় বলে জানা যায়।[৫]

জমি যারা চাষ করতো, সেই জমিতে তাদের স্বত্ব কেমন ছিল, রাজা অথবা জমিদারকে কি পরিমাণে, বা, কি নিয়মে খাজানা দিতে হতো সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কাব্যে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ভাবে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে বিশেষ কোনো সাধারণ সত্যে পৌছানো যায় না। তবে, রাজাই সম্ভবতঃ দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন। যাঁরা চাষ করতেন

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩৩১।

২. Travels in the Mogul Empire, P. 437-38

৩. বা. ই. পৃ. ১৮১।

৪. Travels in the Mogul Empire, P. 438

৫. বা. দে. ই. ২য়, পৃ. ২১৯।

বা অন্য কোনোভাবে জমি ভোগ করতেন, তাঁদেরও কোনো নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হতো। এই করের পরিমাণের উল্লেখ এক-এক কাব্যে এক-এক রকম পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, কালকেতু প্রজাদের বলছে 'হাল প্রতি দিবে তঙ্কা'[১]—অর্থাৎ চাষের জমির পরিমাণ যাই হোক না কেন, প্রতি হাল জমিতে এক টাকা কর দিতে হবে। মুকুন্দরাম নিজের জীবনে রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ থেকে উৎখাত হয়েছিলেন। তাই তাঁর কল্পনার আদর্শ রাজা গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি রাজাকেও আদর্শ রাজা হিসেবেই আঁকতে চেয়েছেন। হয়তো এই কারণেই তাঁর কালকেতু প্রজাকে বলে 'তিন সন বাহি দিহ কড়ি'।[২] সুতরাং কালকেতুর নির্ধারিত কর তৎকালীন সাধারণ মান থেকে যে অনেক অল্প ছিল, একথা অনুমান করা যায়। সতেরো শতকের অপর কবি রূপরামের কাব্যে দেখা যায়, বাকী খাজানার দায়ে বন্দী সোমঘোষকে দেখে গৌড়েশ্বর বিস্মিত হয়ে বলেন—

বিঘা প্রতি আনা পাটা আমার সভায়
কিসের লাগিয়া লোক এত দুঃখ পায়।[৩]

এই উক্তি থেকেও মনে হয়, প্রতি বিঘা জমির কর এক আনা-ও, সেকালে খুব নগণ্য বলেই মনে হতো।

আলোচ্য সময়ের কবি ঘনরাম বণিক তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে লিখেছেন, গৌড় নগরে প্রজাদের খাজানা বিঘা প্রতি এক পাই করে ছিল। দুর্জন মহাপাত্র মহামদ সেই খাজানা বিঘা প্রতি এক সিকি করে আদায় করে।

"পাই পাই বিঘা ছিল গৌড়ের ভিতর
সিকা সিকা করি নিল মামুদা পাত্তর।"[৪]

এর ফলে প্রজারা দেশ ছেড়ে চলে যায়। এবং লাউসেন তাঁর ময়না নগরে বিঘা প্রতি আনা খাজানা থেকে কমিয়ে আবার বিঘা প্রতি এক পাই করাতে[৫] গৌড় নগর থেকে দলে দলে প্রজা এসে তাঁর রাজ্যে বসবাস করতে আরম্ভ করে। সুতরাং, আলোচ্য সময়ের সাহিত্য থেকে আমরা জমির খাজানার এক পাই থেকে চার আনা পর্যন্ত বিভিন্ন হারের খবর পেলাম। যে সময়ে টাকায় আট মন চাল সুলভ ছিল তখনকার পক্ষে হাজা শুখার বপদ ডিঙিয়ে এই খাজানা খুব নগণ্য ছিল না।

উৎপন্ন শস্যের উপরে কর ধার্য হওয়ার খবরও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুর উক্তি—

১. ক. ক. ১. পৃ. ৩৩৫।
২. ঐ ঐ।
৩. রূ. ধ. পৃ. ৩৯।
৪. ঘ. ধ.। বি. ভা. পু. সং ৩০৮। প. সং ১৫৮ক।
৫. 'বিঘা প্রতি পাই পাই করেন নিয়ম'। ঐ. ঐ. প. সং ১২৭২

"যত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।"

ইত্যাদি উক্তি থেকে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের উপরেও যে তখন কর নির্দিষ্ট করা হতো তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-কাব্যে শিবের চাষ প্রসঙ্গে জমির মালিক ইন্দ্রের প্রতি শিবের উক্তি—

"বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী ডাট ডোট নই॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।"

এই উক্তি আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

সে সময়ে রাজকর্মচারীরাও জমি ভোগ করতেন। তাদের পদাধিকারের লঘুত্ব গুরুত্বের উপরে নিশ্চয়ই সেই প্রাপ্ত জমির পরিমাণ নির্ভর করতো। এই জমি কখনও নিষ্কর হতো,—

"রাজা বলে কোটালিয়া বৃথা খাস ভূমি।
দেশের বারতা বেটা নাহি পাই আমি॥"[১]

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে করও ধায করা থাকতো বলে জানা যায়—

"নব লক্ষ সেনা খায় সদর মাহিনা।
ঘরে বস্যা খেম খায় বিঘাপ্রতি আনা॥"[২]

অধিকৃত জমির খাজানার পরিমাণ কি হবে, তা দান গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত হতে দেখা যায়। একে বলা হতো পাট্টা।

"চাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিবে শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর।"[৩]

রাজা বা জমিদার অনেক সময়ে মন্দির বা অন্য কোনো ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে এবং ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করবার জন্যে জমি দান করতেন। একে বলা হতো 'দেবোত্তর' জমি।

"মন্ত্রী পত্র হাতে লয়্যা কশ্যপের বেটা।
লেখ্যা দিল দেবদেবে দেবোত্তর পাটা॥"[৪]

এই জমির কোনো রকম কর দিতে হতো না। গ্রহীতা পুরুষানুক্রমে সেই জমি চিরকাল ভোগ করতে পারতেন।

"যত বৈসে দ্বিজবর
কার নাহি নিব কর।"[৫]

সুতরাং এই জমি নিষ্কর ও চিরস্থায়ী বলে গণ্য হতো।

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩০১
২. ধ. ম. পৃ. ৩৮।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ৩৩৫
৪. বা. শি. পৃ. ২২৮।
৫. ক. ক. চ. পৃ. ৩০৫

মধ্যযুগের চাষের প্রণালী ছিল বর্তমান কালের একেবারে মামুলী-পদ্ধতির মতো। সেকালে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অনেকেই চাষ করতেন। সতেরো শতকের কবি, ব্রাহ্মণ সন্তান মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'দামিন্যায় চাষ চষি'[১]—বলে কাব্যের মধ্যে নিজের বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। নিত্যানন্দের পিতা হাড়াই ওঝা যজমানির সঙ্গে চাষবাসও করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে।[২] ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যেও ব্রাহ্মণ জাতির চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] তবে সেকালে ব্রাহ্মণেরা অনেকসময়েই নিজেরা কৃষিকর্মে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না করে বেতনভোগী কৃষাণ নিযুক্ত করতেন।

"চলে বৃষে চন্দ্রচূড় চণ্ডী বন চায়্যা।
পাছে ভীম চলিলা চাষের সজ্জা লয়্যা॥"[৪]

এই কৃষাণদের পারিশ্রমিক নানা রকম হতে দেখা যায়। তবে তাদের তিন-সন্ধ্যা আহার ও সেই সঙ্গে দু-এক খানি বস্ত্র ও দু-এক টাকা মাহিনা ছিল মাসিক বরাদ্দ। ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে জনৈক ব্রাহ্মণের জমিতে, বিদেশে দুর্দশাগ্রস্ত চাঁদ-সদাগরকে কৃষাণের কাজ করতে দেখা যায়।

"আজি গিয়া তুমি মোর নিড়াইবে ধান
... ...
ধান্য ঘড় নাহি চিনে চাঁদ অধিকারী।
মাড়িয়া ধান্যের গাছ রাখি যায় ঘড়।"[৫]

কৃষাণদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে গৃহস্থের অনুদারতার খবরও পাওয়া যায় সমসাময়িক সাহিত্যে

"সবকাল সারাদিন কর্ম করি তবু।
পেট ভরা ভাত মোরে দিলে নাই কভু॥"[৬]

চাষের কাজে কৃষাণ নিযুক্ত হলেও গৃহস্থ সবসময়ে তাদের উপরে নির্ভর করে থাকতেন না।

"কত চাষ চাষবে, চাকার দিবে চষ্যা
ভার দিয়া আপনি ভবনে থাক বস্যা।"[৭]

কিন্তু সকলেই যে অপরের উপরে নির্ভর করতো এমন নয়। তাই অভিজ্ঞ গৃহস্থের মুখে শোনা যায়—

---

১. ক. ক. চ. পৃ. ২৯।
২. চৈ. ভা. ম. পৃ. ৩৭৪।
৩. ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, পৃ. ২০০।
৪. রা. শি. পৃ. ১৩১।
৫. ক্ষে. ম. পৃ. ১০৯।
৬. রা. শি. পৃ. ২৩৪।
৭. ঐ পৃ. ২৩২।

"গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বৃথা ॥
আঁতে পুতে ভাল চাষ অভাবে সোদর।
অন্যথা হা ভাত হাল্যা বিকায় সত্বর ॥"[১]

সেকালের চাষের প্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-কাব্যে। রামেশ্বর সতেরো শতকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'শিবায়ন'-কাব্য সতেরো শতক অতিক্রান্ত হবার এগারো-বারো বছর পরেই রচিত হয়। সুতরাং রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-কাব্যে যে চাষের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকে সতেরো শতকেরই প্রচলিত কৃষিকাযের একটি নির্ভরযোগ্য ছবি বলে গ্রহণ করতে পারা যায়।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি হলে শুভক্ষণে চাষ আরম্ভ হতো। জলসেচের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির জলই ছিল একমাত্র ভরসা। কৃষিক্ষেত্রে আল বেঁধে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হতো।[২] এ ছাড়া কৃষিক্ষেত্রের কাছেও সাধারণতঃ নদী নালা থাকতো। জমির মধ্যে জল নিকাশের জন্যে নালা রাখা হতো :

"মধ্যখানে খানিক ঘুচায়্যা দিল চেলা।"[৩]

অথবা—

"দক্ষিণে মোহানা রাখে জল যাত্যে নালা ॥"[৪]

চাষবাস সম্পর্কে সেকালের লোক যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। কোন্ দিন কর্ষণ করতে নেই, নিষিদ্ধ দিনে কর্ষণ করলে কি ক্ষতি হয়,—সে-সম্পর্কেও তাঁরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

"হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্য যো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো॥
সেই সেই কালে যার হয় হল-যোগ।
ধরা শস্য হরে ধান্যে ধরে নানা রোগ॥
বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মী ছাড়া॥"[৫]

কিন্তু, কর্ষণ বন্ধ থাকলেও কৃষাণের বিশ্রাম থাকতো না। সেই দিন তাকে আগাছা পরিষ্কার করতে হতো।[৬] তারপর জমিতে মই দিয়ে মাটি সমান করতে হতো।[৭] এইভাবে চলতে থাকে অক্লান্ত পরিশ্রম।—

১. রা. শি. পৃ. ২৩২।
২. 'বন্ধ আল বৈকালে বান্ধিল এক পরে।' ঐ. পৃ. ২৩৪।
৩. ঐ. পৃ. ২৩৭।
৪. ঐ. পৃ. ২৪৩।
৫. ঐ. পৃ. ২৩৭।
৬. "গাছি মার্যা হড়া গাছি পাড়ে রাখে তুল্যা।" ঐ. পৃ. ২৩৪।
৭. "মাঠ কর্যা মই দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ।" ঐ. ঐ.

"চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব।
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব।"[১]

এর পরে বৈশাখে বীজ বপণ করা হতো।—

"বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার্যা সব ভূমি বাতে বুনে॥"[২]

এত কষ্টের পরে অগ্রাণ মাসে যে ফসল ফলতো, তা দেখে গৃহস্থ-চাষীর আনন্দের অন্ত থাকতো না।—

"মাস মধ্যে মাইশর আপনি ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥"[৩]

ফসল যেমনই হোক্ না কেন, তবু সেকালের চাষীদের সাধারণ অবস্থা মোটের ওপর খুব ভালো ছিল না। শস্যের দাম অল্প হওয়াতে এবং শস্যের পরিবর্তে শস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থে রাজস্ব দেওয়ার রীতির প্রবর্তনের ফলে, কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে; এবং এই পথেই ধীরে ধীরে 'মধ্য-স্বত্বাধিকারী' তথাকথিত ভদ্রলোক প্রজার সৃষ্টি হতে থাকে।

॥ **শিল্প** ॥ রাঢ় দেশ প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানে শিল্পচর্চারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বয়ন, তক্ষণ, মৃৎ, ধাতু, প্রস্তর, নৌ ও অন্যান্য শিল্পে বাঙালি খুব প্রাচীনকাল থেকেই গৌরবের অধিকারী ছিল। প্রাচীন মিসর ও ব্যাবিলন, পরে, গ্রীস ও রোম ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করতো। এ-প্রসঙ্গে বাংলা ও বাঙালির অবদানও অল্প ছিল না; ঐতিহাসিক প্লিনী উল্লেখ করেছেন, 'রোমক-ললনা প্রাচ্য সুচিক্কন বস্ত্রের অন্তরাল থেকে স্বীয় অঙ্গরাগ প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন।' বলা বাহুল্য, এখানে বাঙালি তাঁতীর হাত সুস্পষ্ট। অতি সূক্ষ্ম রেশমী ও সূতী বস্ত্রের নির্মাণে বাঙালিরা সেকালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে অগ্রণী ছিল।

। **বয়ন-শিল্প** । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম, দুকুল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক এই চার ধরনের বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে, ক্ষৌম হচ্ছে শণের সুতো দিয়ে তৈরি মোটা কাপড় বিশেষ। এক রকম সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রের নাম দুকুল। রেশম জাতীয় এক ধরনের কীটের লালায় তৈরি হতো পত্রোর্ণ বস্ত্র, এবং কার্পাসিক বা কার্পাস তুলার কাপড় ছিল বিখ্যাত। বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র, বিশেষ করে, জগৎ-বিখ্যাত 'বঙ্গালমসলিন' বিদেশে রপ্তানি হতো। এ দেশের সূতী ও রেশমী কাপড়ের আদর উত্তর ভারতের সর্বত্রই ছিল। চতুর্দশ শতকে মিথিলার জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য পট্টাম্বরের মধ্যে বাংলা দেশের মেঘ-উদুম্বর (মেঘডম্বুর), গঙ্গাসাগর, লক্ষ্মীবিলাস এবং গাঙ্গোর, শিলহটী, দ্বারবাসিনী ইত্যাদি পট্টাম্বরের ও বঙ্গাল

১. রা. শি. পৃ. ২১৭।
২. ঐ. পৃ ২৬৮।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ২৩০।

প্রভৃতি নির্ভূষণ বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[১] এদেশের কার্পাসের চাষ ও বস্ত্র বয়নের পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় 'চর্যাপদের' কয়েকটি পদে। কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সবচেয়ে প্রশস্ত শিল্প এবং ধন উৎপাদনের প্রধান উপায়।[২]

আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের বিভিন্ন কাব্যে খুঞা,[৩] খাসা-জোড়া,[৪] নেতের বসন,[৫] পিরান,[৬] পাছুরি,[৭] খোসলা,[৮] ধড়ি,[৯] ইত্যাদি নানা রকমের বস্ত্র ছাড়াও পট্টবস্ত্র[১০], পাটনেত বসন, শুক্ল ধুতি, পাট শাড়ী, তসর বসন ইত্যাদি বহু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বসনের খবর পাওয়া যায়। এছাড়া, মুড়া ধুতি, খাদি ধুতি, ভুনি ধুতি ইত্যাদি নানা ধরনের ধুতি ও মেঘডম্বুর[১১], লক্ষ্মীবিলাস, নয়ন সুখ[১২], গুয়াগুটি[১৩] ইত্যাদি বহু সুন্দর সুন্দর শাড়ীর খবর পাওয়া যায়।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী, গুজরাট নগরের তাঁতী সম্প্রদায় খাদি (খদ্দর ধুতি?), ভুনী-ধুতি এবং গড়া অর্থাৎ মোটা কাপড় প্রস্তুতে বিশেষ পারদর্শী ছিল।

> "শতে শত এক জায় বৈসি তথা তন্তুবায়
> ভুনী খাদি ধুতি বুনে গড়া।"[১৪]

বস্ত্রশিল্প তখন খুবই উন্নত ছিল। এর মাধ্যমে বহু লোকে জীবিকা অর্জন করতো। বাংলার বহু অঞ্চলেই বস্ত্র-বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল। সতেরো শতকের প্রথম দিকে মীর্জা নাথান চার সহস্র টাকা মূল্যে একখণ্ড বস্ত্র ক্রয় করেন বলে ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫] এর থেকে সে আমলের কাপড়ের উৎকৃষ্টতা, চাহিদা এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্রের অসাধারণ মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।

১. ম. বা. বা. পৃ ৪৩।
২. বা. ই. পৃ. ১৮০।
৩. শণের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড় বিশেষ। ক ক. চ. পৃ. ৪০৯।
৪. উৎকৃষ্ট মলমল বিশেষ। ঐ. পৃ. ৩৬৯।
৫. সূক্ষ্ম বস্ত্র বিশেষ। ঐ. পৃ. ১৫৪।
৬. খাটো মোটা কাপড় বিশেষ।
৭. মোটা চাদর বা বস্ত্রাঞ্চল। ক. ক. চ. (ধ. উ) পৃ ১১৪।
৮. মোটা কোষজাত শীতবস্ত্র বিশেষ। ঐ. পৃ. ১৫১।
৯. চীর বস্ত্র খণ্ড বা পরিধেয় বস্ত্র। এগুলি লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙের হতো। ক ক. চ পৃ ১৭১, ১৭৯।
১০. প্রায় সব মঙ্গল কাব্যেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়।
১১. 'কেউ মেঘডম্বুর পরে কেউ লক্ষ্মীবিলাস।' বি. ম. পৃ. ১৩০।
১২. সাধারণ মলমল বিশেষ। আবুল ফজল এর মূল্য সেকালে চার টাকা থেকে আশি টাকা পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন। ম. বা. পৃ. ৩১৪।
১৩. বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।
১৪. ক. ক. চ. পৃ. ৩৫৬।
১৫. বা. দে ই. ২য়. পৃ ২১৮।

মালদহ ও মুর্শিদাবাদে মধ্যযুগে রেশম শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ইউরোপীয় বণিক্দল রেশমের ব্যবসায়ে প্রভূত লাভের আশাতেই কাশিমবাজার ও অন্যত্র কুঠী স্থাপন করেছিল। রঙিন রেশমী ও সূতী-কাপড় মুসলমান অধিকারেই বিশেষ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা কাপড় রঙ করতো তাদের 'রঙ্গরেজ' জাতি বা সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার উল্লেখ আছে। 'রঙ্গরেজ' নামে রঙ ব্যবসায়ী এক মুসলমান সম্প্রদায়কে এখনও মুর্শিদাবাদ এবং অন্য অনেক অঞ্চলে দেখা যায়। স্বাভাবিক রঙের রেশমী কাপড়ের নাম 'কোরা' এবং ধোয়া হলে তার নাম হতো 'গরদ'। সতেরো শতকের বিভিন্ন কাব্যে এই গরদ বা পট্টবস্ত্র ব্যবহারের অনেক উল্লেখ রয়েছে।

বাঁকুড়া, মানভূম ইত্যাদি অঞ্চলের তসর, ক্ষৌম বা নেত-বস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শতাব্দীর কাব্যে এর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব বস্ত্র যে কতো সূক্ষ্ম ছিল তাও জানা যায়। সতেরো শতকের কবি রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের বর্ণনায় দেখা যায়, বাইশ গজ শাড়ী এক হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যায় অবলীলাক্রমে।

'বাইশ গজ বসন বাঁ হাতে লয় মুঠি।'[১]

আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কবির লেখা মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায়, সেকালে ঘরে ঘরে মেয়েরা কাট্না কাটতো। যদিও বৈদেশিক ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ণনা থেকে জানা যায়, কাপড় বুনতো পুরুষরাই, মেয়েরা নয়। তবে ঘরে বসে সূতো তৈরী করা হয়তো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মেয়েদের অবসর সময়ের উপার্জনের উপায় ছিল।

সতেরো শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ'-কাব্যে মেনকাবতী ধাই-এর কাট্না কাটার বর্ণনা রয়েছে।[২] বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে স্বয়ং দেবী দুর্গাকেও আমরা 'নেতের কাটন' কাটতে দেখি। ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মপুরাণ'-কাব্যে দেখা যায় লাউসেন গৌড়েশ্বরের দরবারে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার জন্যে পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করলে, রাণী রঞ্জাবতী তাকে যেতে নিষেধ করে। এবং পরিবর্তে প্রয়োজন হলে কাটনা কেটে হাটে সূতো বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

এত ধনে যদি বাছা তোর নাহি আঁটে।
কাটন কাটিঞা সুতা বিচা দিব হাটে॥[৩]

সতেরো শতকের একেবারে শেষের দিকের কবি সীতারাম দাসের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের 'হাসন-হোসেন' পালায়[৪] 'পাঠান পাড়ার' বর্ণনায় মুসলমান রমণীদের সূতা কাটার বর্ণনা পাওয়া যায়—

১. পৃ. ১০৮।
২. বা. ধ. পৃ. ৬৯।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ৯৫ক।
৪. ঐ. সং ৬২১৭।

"লাল চরকা সুতা কাটেন
ছেল্যা পিঞে মাঞি।
ফটক দুয়ার ফাক পড্যাছে
তাহে খবর নাঞি ॥"[১]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"নকড়ী বিবি কাটন কাটেন
ছকড়ি আছেন খাড়া।"[২]

কোথাও পাওয়া যায়—

"কীসের কাজে দুখের কামাই
সুতার উপর কড়ি।
পোনের সুতায় দু পণ লাভ
কি করেঙ্গা খুড়ি ॥"[৩]

এইসব উক্তি থেকে মুসলমান রমণীদের মধ্যেও সুতো কাটার যথেষ্ট প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। সীতারাম দাসের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে গৌড়েশ্বর কর্তৃক লাউসেনের প্রতি বার বার অবাঞ্ছিত আদেশ হতে থাকলে, রাণী রঞ্জাবতীর খেদোক্তিও উল্লেখযোগ্য—

দূর কর চাকরি তুরঙ্গ দেহ লয়্যা।
রাজকর দিব আমি ময়না মাগিয়া ॥
... ...
সুতা কাটা পুষিব মুলুক ছাড়া দিব।
সদাই রাজার আজ্ঞা কতেক জোগাব ॥[৪]

এখানে ভিক্ষাজীবী হবার বিকল্পে সুতো কাটার কথা উল্লিখিত হওয়াতে মনে হয়, দরিদ্র রমণীদের মধ্যেই কাটন কাটা বৃত্তি হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

সমকালীন সাহিত্যের বর্ণনা থেকে সেকালের সূচীশিল্পের কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। দেবী বা অভিজাত রমণীদের কাঁচলীর উপরে পুরাণ ভাগবতের নানারূপ কাহিনী লিখনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা সম্ভবতঃ সূচীশিল্পের সাহায্যেই করা হতো।

বুকের উপরে রামা পরিল কাঁচুলি
কাঁচুলি উপরে কত অপরূপ লেখা ॥[৫]

১ বি ভা. পুঁ. সং ৬২১৭। প. সং ১৩গ।
২ ঐ. প. সং ১৬খ।
৩. ঐ. প. সং ১৪ঘ।
৪ ক বি. পুঁ সং ২৪৬০। প. সং ৮ক।
৫. রূ. ধ পৃ ৬২।

সীবন শিল্প সম্ভবতঃ মুসলমানদেরই একচেটিয়া বৃত্তি ছিল। চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত 'শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন'-এ অথবা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে মুসলমানদের শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘটা'[১] ইত্যাদি উক্তি আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

। **মৃৎশিল্প** : স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশের মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে মৃৎপাত্র তৈরি করে আসছে। আর স্বভাবের প্রেরণায় তাকে কারুকার্যময় করে তুলে শিল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে। প্রাচীন কালে রাঢ়ের মৃৎশিল্প যে কতো উন্নত ধরনের ছিল, তা বর্তমান কালে বিভিন্ন অঞ্চলের ভগ্নাবশেষের ভিতর থেকে পাওয়া মৃণ্ময় পাত্রের আদর্শেই দেখা যায়।

বাংলায় পাথরের যথেষ্ট অভাবের জন্যে মাটির গঠনের কাজই সভ্য সমাজের প্রয়োজনের অনুরূপ হয়ে উঠেছিল। মুসলমান অধিকারে রঙিন হাঁড়ি বা কলসীর প্রচলন ছিল। মীনে করা পাত্র, ইটের টালি ইত্যাদির সুন্দর সব নিদর্শন রাঢ় অঞ্চলে আজও রয়েছে। বর্ধমানের কোনো কোনো অঞ্চলের জালা, হাড়ি, বাঁকুড়ার ঘোড়া, কৃষ্ণনগরের পুতুল, জীবজন্তু ও খেলনা তৈরির ঐতিহ্যও খুব প্রাচীন।

সতেরো শতকের সাহিত্য থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজস পত্রের মধ্যে, কলসী[২], হাড়ি[৩], সরা[৪], হোলা[৫], খাপরা ইত্যাদি মৃৎপাত্রের ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। তবে সমসাময়িক সাহিত্যের বর্ণনা থেকে মনে হয়, মৃৎপাত্র তখনও জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। 'মাটিয়া পাথরা' দরিদ্রেরই সম্বল ছিল। তবে এমন দরিদ্রেরও অভাব ছিল না যারা আবার ঐ মাটির বাসনই বন্ধক দিয়ে ধারে চাল নিয়ে আসতো।

"চালু সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা।"[৬]

কারোর কারোর আবার সেই সম্বলটুকুও ছিল না। যেমন—

"ভোজনের পাত্র নাই জন্মের কাঙ্গাল
আমানির তরে ঘরে কুড়্যা ছিলে থাল॥"[৭]

প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য সময়ের গৃহ নির্মাণ শিল্পের উল্লেখ করা যায়।[৮] সে সময়ে সাধারণ গৃহস্থের বাসগৃহ মাটি দিয়েই তৈরি করা হতো। তাই সেকালের কবির কল্পনার সীমা এই ঐতিহ্যপূর্ণ মাটির বাড়িকে অতিক্রম করতে পারে নি। সেই কারণেই কবির বর্ণনায় 'ইন্দ্রনীল পাসাণে' ভীত্ রচনা করেও সেই ঘর যেমন খড় দিয়ে ছাওয়াতে দেখা যায়, তেমনি মাটির ঘর, মাটির দাওয়ায় সোনার

---

১. ক.ক ১ পৃ ৩২১
২. ধ.ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮, প. সং ৩০ক।
৩. ক.ক.চ. পৃ. ১৭৫।
৪. ঐ ঐ. বি.ম.প. ১১৮।
৫. ক্ষে ম.। বি. ভা. পুঁ. সং ১০৯৪। প. সং ১১খ।
৬. ক ক.চ. পৃ ২৬২।
৭. ধ.ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ১৬৭খ।
৮. এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে 'বন কেটে বসত' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ছিটকিনি ব্যবহারের অসঙ্গতিও লক্ষ্য করা যায়। সেকালের সাহিত্যের যত্রতত্র এর নজীর মেলে। সাধারণতঃ 'চৌচালা বাঙলা'[১] ঘর ছিল গৃহস্থের ভদ্রাসন। এরই সঙ্গে সংলগ্ন থাকতো অন্দর মহল[২], পাঠশালা[৩], নাটশালা[৪], রন্ধনশালা[৫], দুর্গামণ্ডপ[৬] ইত্যাদি। গৃহস্থের আর্থিক স্বচ্ছলতার তারতম্যের ওপরেই এসব নির্ভর করতো। আলোচ্য সময়ে দোচালা, চৌচালা ঘরের যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি আকৃতি ভেদে 'লক্ষ্মীবিলাস', 'কামটুঙি' ইত্যাদি গৃহের নানারকম সুন্দর সুন্দর নামকরণেরও কৌতূহলজনক খবর পাওয়া যায়।

সেকালে মাটির দেওয়াল অলংকৃত করা হতো নানাভাবে। তার মধ্যে 'উলুটি' বা উলুখড় ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপের কাজ যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটার কাজ করে মন্দির গাত্রের বহিরাঙ্গিক অলংকরণের রেওয়াজ ছিল। পৌরাণিক দেবদেবীর আখ্যান ছাড়াও, সমাজ জীবনের অনেক দুর্লভ চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। রাঢ়ের বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া এবং অন্য অনেক অঞ্চলে সতেরো শতকে নির্মিত বহু টেরাকোটার মন্দির ভগ্নপ্রায় অবস্থায় আজও বর্তমান। এই সময়ের তৈরি অনেক মন্দিরে তৎকালীন সমাজের পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়ের অনেক মূল্যবান নিদর্শন আজও বর্তমান রয়েছে। এইসব পোড়ামাটির ফলক যারা তৈরি করতো, তাদের শিল্পচেতনা ও সমাজচেতনা কতো গভীর ও ব্যাপক ছিল, তা বিভিন্ন শতাব্দীতে রচিত মন্দির-গাত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলেই উপলব্ধি করা যাবে।

। **ধাতুশিল্প**। রাঢ় অঞ্চলে খুব ভালো দু-মুখো বা দু ধারি তরোয়াল তৈরি হতো। এর মধ্যে দিয়ে লৌহ ইত্যাদি ধাতু শিল্পের কৃতিত্বেরই পরিচয় প্রকাশ পায়। মাটিতে লৌহমলের আধিক্যের জন্য রাঢ় অঞ্চলে লৌহ শিল্পের প্রচলন ছিল বিশেষ ভাবে। কৃষি কার্যের সহযোগী উপাদান হলো—কোদাল, কুড়ুল, খন্তা, দা, লাঙল ইত্যাদি। এ ছাড়া, শাক্তপ্রধান এই দেশে বলিদানের বিশেষ প্রচলন থাকায়, কর্মকাররা যে খাঁড়া, রামদা ইত্যাদি তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। লোহার তীর, বর্মা, তরোয়াল ইত্যাদি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও এদেশে তৈরি হতো।

রাঢ়ে ধাতুশিল্প ছিল প্রধানতঃ কর্মকারদের একচেটিয়া বৃত্তি। পরবর্তী কালে এদেশের কর্মকাররা বোনপেসে, ঢ্যাকুরা ইত্যাদি গাঞীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্ধমান জেলার বোনপাস, কামারপাড়া ও অন্যান্য অঞ্চলের এবং মালদহের কর্মকাররাই খাঁড়া,

১. রূ. ধ. পৃ. ৭৮।
২. ঐ. পৃ. ৬৪, ক. ক. চ. পৃ. ৩১১।
৩. ঐ. ঐ. বি. ম. পৃ. ৫৪।
৪. বি. ম. পৃ. ৫৪; ক. ক. চ. পৃ. ৩১৩।
৫. ক. ক. চ. পৃ. ৩১৩।
৬. ঐ. ঐ.।

দা, ছুরি ইত্যাদি নির্মাণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আঠারো শতকে বিদেশী লেখকদের বিবরণে রাঢ়ের লৌহ শিল্পের বহু উল্লেখ রয়েছে।[১] উত্তর রাঢ়ের বীরভূম জেলায় লোহার খনি ছিল। রেনেলের বর্ণনা অনুযায়ী সিউড়ী থেকে ১৬ মাইল দূরে, খনি থেকে লৌহপিণ্ড নিষ্কাশিত করে দামরা ও ময়সারাতে কারখানায় লোহা তৈরি হতো।[২] মল্লারপুর পরগণায় এবং কৃষ্ণনগরে লৌহখনি এবং দেওচা ও মুহম্মদবাজারে লোহা তৈরির কারখানা ছিল। কোলকাতা ও কাশিমবাজারে এদেশী লোকেরা কামান তৈরি করতো।

সতেরো শতকের বিভিন্ন সাহিত্য থেকে কাটারি[৩], কোদালি[৪], করাত[৪], যাঁতা[৪], সাঁড়াসী[৪], নরুণ[৪], হাতকড়া[৪], খুর[৫], বঁটি[৫], টাঙ্গি[৫], শাল[৫], লোহার ফলা[৬], তোক[৭], ভাঁড়ুকা[৭], শক্তিসেল[৭], লোহার শিকল[৮], লৌহবর্ম[৯] ও বন্দুকের[১০] ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে কর্মকারদের কাজের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র মেলে।

আজ্ঞা পেয়ে কামার করাতে কাটে গিয়া।
তিন জাতি পরিসর উভে পাঁচ পোয়া॥
যাঁতাটানে মণ্ডল ভাগিনা সহচরি।
অঙ্গারে আগুন জলে দপ দপ করি॥
সাড়াসীতে ধরিয়া সঘনে লোহ পোড়ে।
কালির করাতে কাটে শালকাট গড়ে॥
গড়িতে গড়িতে রাত্রি হইল তিন পর।[১১]

লোহার কাজ ছাড়াও কাঁসা পিতলের নিত্য ব্যবহার্য বাসনপত্র ও পিতলের সূক্ষ্ম

১. বা. দে. ই. পৃ. ২১৮।
২. ঐ. ঐ।
৩. চৈ. ভা.।
৪. রূ. ধ. পৃ. ৩৯, ৫১, ৭৩।
৫. ধ. ধ.। বি. ভা. পুঁ. ৪০৮। প. সং ৬২খ।
৬. ঐ. ঐ. ঐ. ঐ ৯৩খ।
৭. ঐ. ঐ. ঐ. ঐ. ১২৫খ।
৮. সী. ধ। ক. বি. পু. সং ২৪৬০। প. সং ৬ক।
৯. 'লোহা রণ জামা'—সী. ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৬২১৭। প. সং ২ক। 'চেকুর পালা'।
১০. 'ধনুর্বান ক্ষয় হল্য জুরিল বন্দুক।...
...এক বারে গুলিলে গোলা পড়ে সয় সয়।'
'বান ফুরাইঞা গেল পাতিল বন্দুক'। ধ. ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ১৬৮ক।
আমাদের আলোচ্য সময়ে ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলদস্যুরা বন্দুক ব্যবহার করতো। কিন্তু বাঙালিরা তখনও বন্দুকের ব্যবহার শেখেন নি। তাই, এখানে মনে হয় বাঙালির হাতে বন্দুক দিয়ে কবি খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।
১১. রূ. ধ. পৃ. ৭৩।

কারুশিল্পে এ-দেশের খ্যাতি ছিল। বর্ধমান জেলার দাঁইহাট (সতেরো শতকে এর নাম ছিল ইন্দ্রানী), বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাঁসা পিতলের বাসনপত্রের পুরোনো ঐতিহ্য আজও বর্তমান। তবে প্রাচীন কালে এই সব জিনিষ ছিল অনেকটা সাদা-মাটা ধরনের। মুঘল আমলে এর বিশেষ উন্নতি হয়।[১]

সতেরো শতকের বিভিন্ন কাব্যে কাঁসা পিতলের অনেক রকমের বাসনপত্রের ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। ঝারি[২], খুরি[২], থালা[২], বাটি[২], খোরা[২], হাঁড়ি[২], কোষা[২], সাঁপুড়া[২], চূণা-বাটা[২], ঘণ্টা[২], পঞ্চপ্রদীপ[২], সিংহাসন,[২] জলঝারি[২], ঘট[৩], ধুচুনি[৩], পানের বাটা[৩], ডাবর[৪], গাড়ু[৪], পিকদানি[৫], পিতলের ঘড়া[৫] ইত্যাদি কাঁসা ও পিতলের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ ব্যবহারের খবর পাওয়া যায় অভিজাত পরিবারে।

। **দারুশিল্প**। প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রধর বলতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি সকলকেই বোঝাতো।[৬] এদেশে দারু শিল্পের প্রচলন ছিল খুব প্রাচীন কাল থেকেই। প্রাচীন কালের রথ ইত্যাদি তৈরির মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে। সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির কাব্যে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত নানা ধরনের যান-বাহন ব্যবহার ও তৈরির প্রসঙ্গে কাঠের কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেকালে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মালপত্র নিয়ে স্থলপথে যাতায়াতের জন্যে উট-গাড়ী,[৭] বলদ-শকট[৮] ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। ধনী ব্যক্তিদের গমনাগমনের জন্যে পালকি[৯], চন্দন কাঠের দোলা[১০], সুকপাল[১১], চৌদল[১২], ডুলিচা[১৩] ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। জলপথে যাতায়াতের জন্যে ছিল, ডিঙ্গা, নৌকা ও জাহাজ[১৪]। এ সমস্তই ছিল দারু নির্মিত। এ ছাড়া খাট, পালঙ্ক, পীঁড়ি, কাঠের পাদুকা, ঘরের খুটি, দরজা ইত্যাদি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের উল্লেখ তো সর্বত্রই রয়েছে। এই সময়ের বিভিন্ন

---

১. মধ্যযুগে বাঙ্গালা পৃ. ৩১১।
২. ক. ক. চ পৃ. ৩৩৮।
৩. ক. ধ. পৃ ৮৩, ১০৮, ১১৭।
৪. সা. ধ. ৮১, ৪৩।
৫ বি ম পৃ. ৬৭, ১৩০।
৬. বাঙালির ইতিহাস পৃ ১৮২।
৭. রূ. ধ. পৃ ৬৬।
৮. ঐ. পৃ ৬৪।
৯. ঐ. ঐ.।
১০. ক ক চ. পৃ. ২৯৭, বি ম. পৃ. ২২।
১১. বি. ম. পৃ. ৮২।
১২. ঐ. ঐ.।
১৩. ক. ক. চ. পৃ. ২৯৭।
১৪. 'নৌকা জাহাজ ডিঙ্গা জলে নহে স্থির'। ধ. ম। বি. ভা পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ১৬৪ক। অথবা—'জাহাজ দিগুণ দেখি তরণীর আড়া'। ঘ ধ. পৃ. ১১২।

কবির কাব্যে মন্দির বা রাজপ্রাসাদ নির্মাণ প্রসঙ্গে কাঠের দরজা ও চৌকাঠের ওপর নানারকম সূক্ষ্ম কারুকার্য করবার বর্ণনা পাওয়া যায়।

ছন গুড়া পাখি টাল নির্মান করএ ভাল
দুন্দরা সাজাএ দুই সারি।
গাছ বান্ধে পাখি টালে আওয়াস তুলিল ডালে
চৌকাট নগর আওআরি।
দুন্দরার চৌকাঠে সূত্রধার চিত্র গঠে
সবপু সমান কপাট।[১]

এই দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে, কাষ্ঠশিল্পের সমৃদ্ধি ও সমাজের মধ্যে সেই শিল্পীদেরও যে একটা বিশেষ স্থান ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নদ-নদীগামী ছোটো বড়ো নৌকা ও সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণের একটি সমৃদ্ধ শিল্পের ব্যবসায় প্রাচীন বাংলায়ও ছিলো।[২] সতেরো শতকে রচিত বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যের নায়কের বাণিজ্যে যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে বাণিজ্য তরীরও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই সব নৌকার মধ্যে প্রধানটির সাধারণ নাম পাওয়া যায় 'মধুকর'। এটিতে সওদাগর নিজে যেতেন বলে মনে হয়।

আগু ডিঙ্গা মিলে রাজা নামে মধুকর।
যার উপরে শোভা করে ভানু ভাস্কর॥
... ...
সভার সংগতে রাজা বিদায় লইয়া।
মধুকরে চাপে রাজা আনন্দ হইয়া॥[৩]

এই সমস্ত বাণিজ্য তরী একদিকে যেমন বিভিন্ন মাপের ও আকারের হতো, অন্য দিকে তেমনি এতে নানা ধরনের কারুকার্যও করা হতো। হয়তো এই জন্যই তখনকার নৌকার নামকরণের মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। 'বিশহাথী'[৪], 'বাইশা'[৪], 'পচিশা'[৪], 'আঠাইশা'[৪] ইত্যাদি দৈর্ঘ্য পরিমাপক নাম যেমন ছিলো, তেমনই নৌকার গলুইয়ে বিভিন্ন জন্তুর মুখ খোদাই করা থাকতো বলে, সেই অনুসারে নাম হতো— 'সিংহমুখী'[৫], 'ব্যাঘ্রমুখী'[৫], 'ঘোড়ামুখী'[৬], 'শঙ্খচূড়'[৬], 'মইসামুড়া'[৭], 'দুর্গাবর'[৭], 'ছুটিমাটি'[৭] ইত্যাদি। এছাড়া, চন্দ্রচূড়[৮], চন্দ্রকলা[৮], গুয়ারেখি[৮] ইত্যাদি সাধারণ

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩১৪।
২. বা. ই. পৃ ১৮৪।
৩. বি. ম পৃ ৬৯।
৪. ম. বা. বা. পৃ. ৪৭।
৫. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ ২৯৫।
৬. ম. বা. বা. পৃ. ৪৭।
৭. বি. ম. পৃ. ৬৯।
৮. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ২৯৫।

নৌকার নাম যেমন ছিল, তেমনি আবার রণজয়া[১], রণভীমা[২] ইত্যাদি বহু রণতরীর নামও পাওয়া যায়। সতেরো শতকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের কবি রূপরাম[২] ও ধর্মদাস বণিকের[৩] কাব্যে জাহাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এঁরা ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজ দেখেছিলেন। অবশ্য মুসলমানদেরও জাহাজ ছিল। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, সতেরো শতকের বাংলার সওদাগরেরা সমুদ্র পার হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুদের বহির্বাণিজ্য কয়েক শতাব্দী আগেই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে, অতীত কালের সমুদ্র বাণিজ্যের কতকটা বিকৃত ও অতিরঞ্জিত স্মৃতি বাঙালির মনে বর্তমান ছিল। সতেরো শতকের মঙ্গলকাব্যগুলিতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে ডিঙ্গা নির্মাণের বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গে শতগজ দীঘ ও বিশগজ প্রস্থের সুদীর্ঘ ডিঙ্গার বর্ণনা রয়েছে।

প্রথমে করিল সজ্জ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ।
আড়ে গজ বিংশতি প্রমাণ।[৪]

। **বাঁশ ও বেত শিল্প**। বাংলায় বাঁশের প্রাচুর্যের জন্যেই সম্ভবত বাঁশের তৈরি নানান জিনিষকে কেন্দ্র করে একটি হস্তশিল্প গড়ে উঠেছিল খুব প্রাচীন কাল থেকেই। ঝুড়ি, চুনারি, চাঙারির উল্লেখ মেলে চর্যাপদে। তবে এই শিল্পটি প্রথম থেকেই নিম্ন-শ্রেণীর লোকের হাতেই ছিল।

বিয়ণী চালুনী ঝাঁটা ডোম করে টোকা ছাতা।
জীবিকার হেতু এক চিত্তে॥[৫]

ইত্যাদি উক্তির মাধ্যমে মুকুন্দরাম ডোম জাতির বৃত্তির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যেও ডোমেদের এই একই বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের খবর পাওয়া যায় কালু ডোমের উক্তির মধ্য দিয়ে।

ঝুড়ি পেড়ি, চুপড়ি ধুচুনি কুলা ডালা
বৃত্তি বেচে বরঞ্চ করিব পেট পালা॥[৬]

বাঁশ ও বেতের তৈরী কুলো[৭], ডালা[৭], ধুচুনি[৭], চুপড়ি[৭], ছাতা[৭], বায়নী[৮], চালুনী[৮],

১. ক. ক চ. (ধ উ) পৃ ২৯৫।
২. 'জাহাজ দ্বিগুণ দেখি তরনীর আড়া'। ধ ধ পৃ. ১১২।
৩. 'নৌকা জাহাজ ডিঙ্গা জলে নহে স্থির'। ধ ধ। বি. ভা পুঁ স° ৪০৮। প সং ১৬৪ক।
৪. ক ক. চ (ধ উ.) পৃ ২৯৪।
৫. ঐ. পৃ. ৩৬১
৬ ঘ ধ. পৃ. ২৮৯।
৭. ঐ. পৃ ১৬১।
৮. ক ক. চ. পৃ. ৩৬১।

টোকা[১], ঝাটা[১], রঙ্গণ-চুপড়ী[১], শীতলপাটী[২], শীতল বিউনী[৩], দলজ পাটী[৪], লোহিত-পাটী[৫], কারুকার্যখচিত বিউনী[৬], পেটরা[৭] ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি করতো ডোমেরা। আজও এই শিল্প ডোমজাতির বৃত্তিবিশেষ হয়ে রয়েছে।

। **কাগজ শিল্প** । চীন পর্যটকরা লিখেছেন যে, এ-দেশে গাছের ছাল থেকে উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি হতো। এর রং খুব সাদা এবং মৃগচর্মের মতো মসৃণ হতো। সতেরো শতকের কবি মুকুন্দরাম, ধর্মদাস বণিক প্রমুখের কাব্যে কাগজের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে মুসলমানদের মধ্যে কাগজ প্রস্তুত করে 'কাগজী' নাম ধারণের বর্ণনা রয়েছে।

কাগজী ধরিলা নাম করিয়া কাগজ।[৮]

আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কাব্যে তুলট, তেরেট, তালপত্র, ভূর্জপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাগজ ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

। **শর্করা শিল্প** । রাঢ়-বাংলায় প্রচুর পরিমাণে আখ তৈরি হওয়ার জন্যে, আখের রস থেকে গুড়, চিনি ইত্যাদি তৈরি হতো খুব প্রাচীন কাল থেকেই। চিনি তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন সতেরো শতকের কবি মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে।

মোদক প্রধান জনা করে চিনি কারখানা
খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্মান।[৯]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-কাব্যে নবাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নবাত খেজুর গুড় জাত মিষ্টান্ন বিশেষ। এ দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি বিদেশে রপ্তানি হবার খবর পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে আগত বিদেশী ভ্রমণকারীর বর্ণনা থেকে।[১০]

। **লবণ শিল্প** । লবণের ব্যবসা নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বিরোধের ইতিহাসের মধ্যে লবণের ব্যবসা যে খুব লাভজনক ছিল, তা অনুমান করা যায়। এ-দেশের লবণ ছিল সামুদ্রিক লবণ। এ-দেশী বণিকেরা খনিজ লবণ আমদানী করে আনতেন বলে সমসাময়িক বাংলা-সাহিত্য থেকে জানা যায়।[১১]

১. ক. ক. চ. পৃ. ২৫৯।
২. রূ. ধ. পৃ. ১০৬।
৩. বি. ম. পৃ. ২৩।
৪. ঐ. পৃ. ৬৮।
৫. ক. ক. চ. পৃ. ৩৪৩।
৬. বি. ম. পৃ. ১২৭, ১২৮।
৭. মধ্যযুগে বাঙ্গালা, পৃ. ৩২৬।
৮. ক.ক. চ. পৃ. ৩৪৬।
৯. ঐ পৃ. ৩৫৭।
১০. Travels in the Mogul Empire. P. 438.
১১. বি. ম. পৃ. ৭১। ক. ক. চ. (খ. উ.) পৃ. ২০৫, ২৯৯।

। **মোমবাতি শিল্প** । আর একটি অর্থকরী শিল্পের মধ্যে মোমবাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

চারি দিগে জ্বলে ঘৃত মোমের দিউড়ি।[১]

এই মোমবাতির আন্তর্দেশীয় ব্যবহার ছাড়াও, সমুদ্রপথে বহু অঞ্চলে চালান হতো।[২]

। **শঙ্খ শিল্প** । রাঢ়ের বণিকেরা সিংহল থেকে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ আমদানী করতেন বলে আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য, এই বর্ণনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করা কঠিন। কারণ, সিংহলদেশের ভূ-প্রকৃতি ও লোকজনদের নাম ও আচার আচরণের যে বর্ণনা তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। শঙ্খ থেকে শাখা প্রস্তুত করতেন এ দেশের শঙ্খ বণিকেরা।[৩] শাঁখায় নানারকম কারুকার্য খচিত থাকতো। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে, রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে 'কুলুপিয়া শঙ্খ' বা খিলান বসানো শঙ্খের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় আল্না, ঝাঁপি, ইত্যাদিতে কড়ি বসিয়ে নানা ধরনের কারুকার্য করাও সে যুগে শিল্প রীতির অন্যতম ছিল। কিছুকাল আগেও এই সব দ্রব্য সামগ্রী বাঙালির গৃহ সজ্জার অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যেতো। এ ছাড়া, সোনা-রূপো ও দামী পাথরের অলঙ্কার নির্মাণেও যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল, মধ্যযুগের বিস্তৃত সাহিত্যের অন্তর্গত প্রাসঙ্গিক অলঙ্কারের বর্ণনায় তার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় মেলে।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুর মৃগয়া, ও সেই মৃগয়া-লব্ধ দ্রব্য নিয়ে ফুল্লরার হাটে পসরা দেবার বর্ণনায় যে 'হস্তিদন্ত', 'মহিষশৃঙ্গ', 'ভল্লুকচর্ম', 'গণ্ডারের খড়্গ', 'বাঘের নখ' ইত্যাদির কেনাবেচার খবর পাওয়া যায়, তার থেকে মনে হয়, ঐ সব জিনিষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ছোটো-বড়ো শিল্পেরও প্রসার হয়েছিল।

। **নন্দন শিল্প** । আলোচ্য শতকের বিভিন্ন কাব্যে মন্দির স্থাপত্য, মন্দিরে সুন্দর ফলকের কাজ, পটুয়াচিত্র ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রাপ্ত পুঁথির পাটায় পৌরাণিক চিত্র, পুঁথির পাতায় ফুল, লতা, পাতা, দেবদেবীর মূর্তি, কোথাও বা পুঁথির বর্ণনীয় বিষয়ের ব্যাখ্যাকর ও শোভাবর্ধক চিত্র, জীব জন্তুর রেখা চিত্র ইত্যাদি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাবতই এই সব শিল্প নন্দনশিল্পের পর্যায়ভুক্ত। তবে, সম্পূর্ণভাবে অর্থকরী না হলেও সমাজের এক শ্রেণীর লোক এই সব শিল্পকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে যে জীবিকা অর্জন করতেন, তা সহজেই অনুমান করা চলে। টেরাকোটার কাজ এবং মৃৎপাত্রে অলংকরণের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বাঙালির অন্তরের শিল্পচেতনা আবহমানকাল ধরে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সব সময়েই যে তা বৃত্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে এমন অবশ্যই নয়। পুঁথির পাটা

১. বি. ম পৃ. ৫, ৮৫।
২. বা. দে. ই. পৃ. ২১৯।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ১৮৪।

অলংকৃত করার জন্যে এক শ্রেণীর শিল্পী সমাজে ছিল ধরে নিলেও, এমন অনেক প্রাচীন পুঁথি রয়েছে যেখানে দেখা যায়, লিপিকরের কোনো রকম ভুল হয়ে গেলে, তিনি সেই অংশটুকু কেটে দিয়ে লাল কালি দিয়ে সেখানে মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই সব ক্ষেত্রে মানুষের মনের সহজাত শিল্পবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা পুঁথির চিত্রণের বিষয়টি এ পর্যন্ত কোথাও আলোচিত হয় নি বলে বর্তমান অধ্যায়ে এটি নিয়ে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো।[১]

। **পুঁথি-চিত্রণ শিল্প** । ছাপার হরফ আবিষ্কারের আগে হাতে লেখা পুঁথির যে প্রচলন ছিল, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই রঙে রেখায় অলংকৃত করা হতো। গ্রাম্য কবি বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিপিকর তাঁদের প্রাণ-প্রিয় এই পুঁথিগুলির পাতার চারপাশে লতাপাতার রঙিন আলপনা দিতেন, কখনও প্রিয় বিষয়বস্তুটিকে শুধু ভাষায় নয়, ছবি এঁকে বর্ণনা করতেন। আবার কোনও সময় পুঁথির পাতাগুলি ওপর নীচে যে দুটি কাঠের লম্বা ফলক বা পাটা দিয়ে বাঁধা থাকতো, সেই পাটাটিকে বিভিন্ন চিত্রে সুশোভিত করতেন। লোকশিল্পের এই হারিয়ে যাওয়া ধারাটির মধ্যে যে শিল্প সুষমার অনবদ্য প্রকাশ, তা যে কোনো সৌন্দর্য সচেতন মানুষকেই চমৎকৃত করবে।

গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষ একদিন তার মনের আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখকে ব্যক্ত করেছে গান ও ছবির মধ্য দিয়ে। এই প্রকাশ তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজনের নয়, তদতিরিক্ত কিছু। মনের যে ক্ষুধা মেটাতে মানুষ পাথর কুঁদে মূর্তি তৈরী করে, গুহাচিত্র আঁকে, নিত্য ব্যবহারের মাটির বাসন, কাঁসার থালা, ফুল লতা পাতায় অলংকৃত করে, নিজেকে অসংস্কৃত সামান্য আভরণে সাজায়, ঘরের মাটির দাওয়ায়, মাটি লেপা বেড়ার গায়ে, মেঝেতে আলপনা দেয়, নিতান্ত প্রয়োজনের শীতের কাঁথাটিতে নক্সা তোলে, সরা ও পটের ওপর রঙিন ছবি আঁকে—সে ক্ষুধা তার এই তদতিরিক্তের। যার আবেদন অবশ্যই তার নান্দনিক চেতনার ক্ষেত্রে। পুঁথি-চিত্রণ শিল্পেরও গোড়ার কথা এই।

প্রাচীন বাংলা পুঁথিগুলির সঙ্গে যাঁরা অল্পবিস্তর পরিচিত তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন যে, পুঁথি যাঁরা নকল করতেন সেই গ্রাম্য লিপিকররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন অল্পশিক্ষিত। সেই অল্প শিক্ষার সাক্ষ্য রয়ে গেছে পুঁথির যত্রতত্র ভুল বানানের প্রাচুর্যে।

বানান শিখিলে কিছু নাহি অগোচর।
অবহেলে চালাইবে পুঁথির অক্ষর ॥

ইত্যাদি উক্তিই তার প্রমাণ। পুঁথি নকল করা এঁদের পেশা হলেও, পুঁথিকে এঁরা ভালোবাসতেন পুত্রস্নেহে। সেই পুঁথি যদি কেউ অপহরণ করে, সেই অনির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্বাহ্নেই শাপশাপান্ত করতেও তাঁরা দ্বিধা বোধ করতেন না। পুঁথির

---

১. বর্তমান লেখিকার প্রবন্ধ, 'বাংলা পুঁথির অলংকরণ'—সাপ্তাহিক দেশ, ৪ জুন, ১৯৮৮-তে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

মধ্যে নানা সাংকেতিক চিহ্ন রাখতেন, যা দেখে নিজের নকল করা পুঁথিখানি চিনতে কষ্ট না হয়। বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি বিভাগে সংরক্ষিত চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথির পুষ্পিকা অংশে লিপিকর লিখছেন, "... এই পুস্তক লিখিলাম আমি বহু যত্ন করি/সম্পূর্ণ বিলাতি কাগজ দিয়াছে বেপারি/দাম দিতে হয় নাঞী/বেদামিতে পাওয়া কাগজে চিনিব পুথি জদি জায় খোওয়া/এই পুস্তক যদি কেহ চুরি করে মাতৃগমন সুরাপান গুরুদ্বারি হবে হবে এই দিব্য থাকিল পুস্তকে...।"[১]

হয়তো এই পথেই পুঁথি-চিত্রণের প্রথম সূত্রপাত। অলংকরণের বিশেষ নক্সাটি আপন কারুকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুঁথিখানির স্বকীয়তা রক্ষা করবে—এরকম একটি মনোভাব হয়তো ছিল। কারণ যাই হোক, দৈনন্দিন জীবনের মুহূর্তগত আনন্দ-বেদনার বিচিত্র গতি ও স্থিতির যে অনুভূতির আবেগ সমস্ত লোকায়ত শিল্পের গোড়ার কথা, মনের সেই সূক্ষ্মতর মানবিক প্রেরণা এই পুঁথি-চিত্রণ শিল্পেরও উৎস, একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। পুঁথির পাটায় ও পাতায় উজ্জ্বল স্পষ্ট রঙে তাৎক্ষণিক দৃঢ় তুলির টানে আঁকা ফুল, লতাপাতা, পাখি, কখনও বা দেবদেবীর মূর্তির বর্ণনাত্মক শৈলীতে যে বহিরাঙ্গিক অলংকরণ, তার মধ্যে লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত এই সূক্ষ্মতর অনুভূতি বা আবেগের একটি দেশজ প্রকাশভঙ্গি স্পষ্টই চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে চিত্রিত ভ্রম সংশোধন দেখে আমরা সকলেই মুগ্ধ হই। অথচ আমাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই যে, আজ থেকে তিন-চারশো বছর আগে নিতান্ত গ্রাম্য অর্ধশিক্ষিত লিপিকর পুঁথি নকল করতে গিয়ে কোনো রকম ভুল হয়ে গেলে, সেই অংশটুকু শুধু কেটে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, তাঁর সহজাত শিল্পবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লাল, কালো অথবা হলুদ রঙের কালি দিয়ে সেখানে ফুল, লতাপাতা, ছোটো ছোটো পাখী, কোথাও বা একটি ছোটো হাতী এঁকে দিতেন। বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি বিভাগে মহাভারতের এই রকম একখানি চিত্রিত পুঁথি আছে। সেখানে শুধুমাত্র চিত্রিত কারিকরিতে ভ্রম সংশোধন নয়, প্রত্যেক শব্দের আ কার উ কার ইত্যাদির লম্বা টানের শেষে একটি করে ছোট্ট ফুল, লতা, পাখী আঁকা রয়েছে নানা রঙে। এরকম উদাহরণ বাংলা পুঁথির জগতে নিতান্ত অল্প নয়।

এতো গেল ছোটো ছোটো ছবির প্রসঙ্গ। এমন অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে যার প্রায় প্রতিটি পাতায়ই পুঁথির বিষয়ের বর্ণনাত্মক ও শোভাবর্ধক চিত্র করা রয়েছে। কোলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, উড়িষ্যা স্টেট মিউজিয়াম, বিশ্বভারতী পুঁথি বিভাগ ইত্যাদি সংগ্রহশালায় এই ধরনের কিছু চিত্রিত পুঁথির সংগ্রহ রয়েছে।

১. পড়বার সুবিধার জন্য উদ্ধৃতির মাঝে বিরাম চিহ্নগুলি লেখিকা কর্তৃক সংযোজিত।

২. 'মালতী পুঁথি' নামে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ২৩১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি আজ পর্যন্ত পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রাচীনতম। এর ১৩।৭ক সংখ্যক পত্রে তিনটি মানুষের মুখ আঁকা রয়েছে। এটি শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিল্প চর্চার নিদর্শন।

আশুতোষ মিউজিয়ামের 'রামচরিতমানস' বা তুলসীদাস-বিরচিত হিন্দী রামায়ণের পুঁথিখানার ৩৪২ পত্রের মধ্যে ১৫২টি পত্রই বহুবর্ণের চিত্র বিশিষ্ট। মেদিনীপুর জেলার মহিষদল রাজ এস্টেটের রাণী জানকী দেবীর অধ্যয়নের জন্য দ্বিজ ইচ্ছারাম মিশ্র কর্তৃক অনুলিখিত এই পুঁথিখানিই সম্ভবত বাংলায় প্রাপ্ত সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত বা অলংকৃত রামায়ণের একমাত্র পাণ্ডুলিপি। পুঁথিখানি হিন্দীতে লেখা হলেও এর অলংকরণের কাজ মেদিনীপুরের স্থানীয় শিল্পীদের বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।[১]

কোন্ পুঁথিতে কতকগুলি চিত্র থাকবে তা সাধারণভাবে পুঁথির বর্ণনীয় বিষয়ের ওপর নির্ভর করলেও, পুঁথিটির ভবিষ্যৎ মালিক কে হবেন, তাঁর আর্থিক সংগতির কথা মনে রেখেও শিল্পীরা চিত্রের সংখ্যা কম বেশি করতেন। তাই একই বিষয়ের এক একটি পুঁথির চিত্র সংখ্যা ভিন্ন হতে দেখা যায়। বাংলা পুঁথিতে সাধারণত যে ধরনের চিত্র পাওয়া যায় তা কেবলমাত্র প্রথম অথবা প্রথম ও শেষ পত্রেই থাকে। তাই এদের বর্ণনীয় বিষয়ের ব্যাখ্যাকর ও শোভাবর্ধক চিত্র না বলে অলংকরণ বললে ভালো হয়।

পুঁথি-চিত্রণ শুধু বাংলার নিজস্ব সম্পদ নয়। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলেই হাতে লেখা পুঁথিতে চিত্রণের প্রথা প্রচলিত ছিল। মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের জন্য রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম লিপিকর ও শিল্পীদের দিয়ে রামায়ণ (১৫৮৬ খ্রীঃ) ও মহাভারতের (১৫৮৮ খ্রীঃ) ফারসী অনুবাদ করান। আকবরের জীবনীকার আবুল ফজলের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির প্রাবল্য লক্ষ্য করে এবং এর মূল কারণ যে পরস্পরের সম্পর্কে গভীর অজ্ঞতা—এই সিদ্ধান্তে অটল থেকে মহামতি আকবর হিন্দুদের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি মুসলমানদের কাছে সহজবোধ্য ও গ্রহণীয় করে তুলবার জন্য হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতের ফারসী অনুবাদ করার ভার উভয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানী গুণী ও সেই সঙ্গে নিরপেক্ষ পণ্ডিতদের উপর আরোপ করেন।[২]

আকবরের অমাত্য, সুহৃদ ও জীবনীকার আবুল ফজল আরও জানিয়েছেন, "আকবরের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী প্রতিটি অনুবাদ গ্রন্থ দেশের সেরা লিপিকরদের দিয়ে চমৎকার নাস্তালিক লিপিতে লিখিয়ে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পীদের আঁকা ছবিতে সাজিয়ে, যোগ্য দপ্তরীদের দিয়ে বাঁধিয়ে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হতো। সম্রাট যেখানে যখন যেতেন—যুদ্ধক্ষেত্রে, শিকারে, তীর্থযাত্রায় অথবা দেশ ভ্রমণে—বাছাই করা কিছু বই সব সময়েই তাঁর সঙ্গে থাকতো। এই বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের দুটি উজ্জ্বল রত্নের নাম 'রজমনামা' ও 'রামায়ণ'।" সৌভাগ্যক্রমে এই দুটি গ্রন্থই এদেশে জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মান সিং সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

১. ভারতীয় শিল্পধারা, পৃ. ৩৯।
২. **Ain-I-Akbari, P. 115.**

এই রামায়ণ পুঁথিটিতে ১৭৬ খানি বহুবর্ণে চিত্রিত ছবি রয়েছে। আর চার খণ্ডে সম্পূর্ণ মহাভারতখানির চিত্র সংখ্যা ১৬৮।[১] প্রত্যেকটি ছবিই পুরো পাতা জুড়ে আঁকা এবং নীচে বিখ্যাত বিখ্যাত সব শিল্পীদের নাম লেখা আছে। এই রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও রয়েছে হরিবংশ, যোগবশিষ্ট, নলদময়ন্তী কথা, পঞ্চতন্ত্র, বত্রিশ সিংহাসন, মাধবানল কামকন্দলা আখ্যান, মধুমালতী কথা, হিতোপদেশ, রসিক প্রিয়া ইত্যাদি হিন্দু ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ। সব পুঁথিই বহুবর্ণে চিত্রিত।[২]

তালপাতার ওপরে লেখা পুঁথি ও পুঁথির মলাটের কাঠের পাটায় আঁকা ছবি প্রচুর পাওয়া যায় উড়িষ্যায়। তালপাতার ওপর সুচিত্রিত ওড়িষি রামায়ণের একটি পুঁথি কোলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে রয়েছে। এছাড়া, হাতীর দাঁতের পুঁথির পাতায় সুদৃশ্য চিত্রাবলীও রয়েছে উড়িষ্যা স্টেট মিউজিয়ামে। তবে সতেরো শতকের আগের চিত্রিত কোনো ওড়িষি পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।[৩] ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে আঁকা সচিত্র গীতগোবিন্দের একটি পুঁথি আছে ভুবনেশ্বর মিউজিয়ামে। উড়িষ্যার প্রায় সব অঞ্চলেই এই ধরনের চিত্রিত গীতগোবিন্দের পুঁথি পাওয়া গেছে। কল্পসূত্র বা জৈন শাস্ত্রমূলক পুঁথিতে চিত্র রচনাই ছিল গুজরাটের শিল্পীদের প্রধান উপজীবিকা। তালপাতার ওপর লেখা ও চিত্রিত 'কল্পসূত্র' মাত্র একটি পাওয়া যায়। ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এই গুজরাটি চিত্রিত পুঁথিটিই সম্ভবত এ পর্যন্ত পাওয়া চিত্রিত পুঁথির প্রাচীনতম নিদর্শন।

তালপাতায় উৎকীর্ণ চিত্রময় এই পুঁথিটির বৈশিষ্ট্য, যে পাতায় ছবি আঁকা আছে, সেই পাতার লেখার বিষয়ের সঙ্গে ছবির বিষয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো মিল নেই। এর থেকে অনুমান করা যায়, লিপিকর পুঁথি নকল করতে গিয়ে ছবির জায়গা ছেড়ে রেখেছিলেন, পরে উপযুক্ত শিল্পীকে দিয়ে সেই স্থান পূরণ করা হয়েছে। এটাই ছিল সাধারণ রীতি। কারণ চিত্রকর ও লিপিকর ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মধ্যযুগের অনেক বাংলা পুঁথি পাওয়া যায়, যার প্রতি পাতার ঠিক মাঝখানটিতে অনাবশ্যকভাবে শূন্য স্থান পড়ে রয়েছে। মনে হয়, পরে অলংকরণের জন্য রাখা এই জায়গাগুলি কোনো কারণে চিত্রিত করা সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে উল্লিখিত গুজরাটি পুঁথিতেও বাংলার পুঁথির মতোই পাতায় পাতায় চৌকো চৌকো জায়গা ছেড়ে দিয়ে পুঁথি লেখা শেষ করা হতো এবং ঐ ফাঁকা জায়গায় পরে উপযুক্ত শিল্পীকে দিয়ে ছবি আঁকানো হতো। এই জন্যই শিল্পীরা অনেক সময়েই চিত্রের মূল বক্তব্য বা পরিচয় ছবির নীচে লিখে রেখেছিলেন। আবার পাতার কোণে কোণে মূল চিত্রের একটি অতি ছোট স্কেচ অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া আছে। তুলট কাগজের ওপর 'কল্পসূত্রে'র

১. দুটি পুঁথিই জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মান সিং সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে।
২. Ain-I- Akbari, P. 110-12.
৩. Chitra pothi, illustrated Palm leaf Manuscript from Orissa, P. 107.

একটি সুচিত্রিত গুজরাটী পুঁথি রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামে।

এমন অনেক চিত্রিত পুঁথি পাওয়া যায়, যেখানে কাব্যের বিষয় অর্থাৎ কবিতা ও ছবি যেন পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ধরনের একটি চিত্রিত পুঁথি হলো গুজরাটি কাব্য 'বসন্ত বিলাসে'র পুঁথিখানি। বাংলার জড়ানো পটের মতো এই পুঁথিটি ৭৯টি ছবিতে অলংকৃত। বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্যের সমারোহের বর্ণনাময় চিত্রণ এই পুঁথিটিকে ছন্দোময় সচিত্র গীতিকাব্যের মর্যাদা দান করেছে। এই ধরনের আর একটি পুঁথি হলো 'রাগমালা'। রাগমালা পর্যায়ের চিত্রগুলি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীকে এক একটি চিত্রময় রূপে দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলে—এক একটি রাগ বা রাগিণীকে এক একজন দেব-দেবী অথবা মনোরম নর-নারীর মূর্তি কল্পনার মধ্য দিয়ে। 'রাগমালা'র একটি তালপাতার পুঁথি রয়েছে ন্যাশনাল মিউজিয়ামে।

এতক্ষণ যে ধরনের চিত্রিত পুঁথির কথা বলা হলো সেগুলি মুখ্যত অভিজাত বা সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সুসংস্কৃত লোকায়ত চিত্র। এদের খবর একটু কৌতূহলী ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু এছাড়াও এমন অনেক চিত্রিত পুঁথির পাতা রয়েছে যা একান্তভাবেই গ্রামীণ চিত্রের পর্যায়ভুক্ত। যা ঠিক কোনো শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো নয়। সেই সব চিত্র খুব সম্ভবত লিপিকর, বা কখনও কখনও পুঁথির মালিকেরই অপটু হাতের চিত্রণের সাক্ষ্য বহন করছে। খুব দৈবাৎ কোনো চিত্রকরকে দিয়ে আঁকানো হতো। এতে সাধারণত পুঁথির মলাট অর্থাৎ প্রথম পত্র অথবা শেষ পত্রটি চিত্রিত থাকে। কখনও বা এই দুটি পত্রই। খুব অল্প ক্ষেত্রেই প্রতিটি পত্রে চিত্র বা বর্ণনাময় চিত্র থাকে। কোনো কোনো পুঁথিতে আবার ঠিক ছবি বলতে যা বোঝায় তা না থাকলেও, গোটা পুঁথিটিই অলংকৃত থাকে ছোটো ছোটো ফুল-লতা-পাতার বর্ডার লাইন দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই পুঁথি লেখার কালো কালিটিই ব্যবহৃত হলেও, লাল, হলুদ বা সবুজের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

এই ধরনের পুঁথি চিত্রণকে আমরা মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। কতকগুলি চিত্রিত পুঁথি পাই, যেখানে পুঁথির অন্তর্গত কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে চিত্রের বিষয়বস্তুর কোনো মিল নেই। আবার কোনো কোনো পুঁথিতে চেষ্টা করলে মিলের সন্ধান পাওয়া যায়। খুব স্বল্প সংখ্যক বাংলা পুঁথিতেই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের ব্যাখ্যাকর ও শোভাবর্ধক চিত্রণ রয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কাশীরামদাসের মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের তিনটি চিত্রিত পুঁথি রয়েছে। এর মধ্যে একটি পুঁথির শেষপত্রে কালো কালিতে আঁকা একটি রথের ছবি রয়েছে। এই প্রধান রথের ছবিটি ছাড়াও আলোচ্য পুঁথিটির প্রতিটি পাতাতেই লতাপাতার সঙ্গে ছোটো ছোটো রথের ছবি আঁকা রয়েছে। অন্য একটি পুঁথির প্রথম পত্রেও কালো কালি দিয়ে একটি রথের ছবি আঁকা। রথের ওপরে পতাকা উড়ছে। ভেতরে বেশ কয়েকটি মানুষের মুখ আঁকা। এই প্রসঙ্গে মনে হয় যেহেতু এগুলি স্বর্গারোহণের পুঁথি হয়তো সেই জন্যই এতে স্বর্গযাত্রার একমাত্র যান হিসেবে পুষ্পক রথের ছবি আঁকা হয়েছে। এই একই বিষয়ের অন্য

পুঁথিটির প্রথম পাতায় কালো কালি দিয়ে তিনটি ঘোড়ার ছবি আঁকা রয়েছে। ওই ঘোড়াগুলিও কি পুষ্পক রথের একমাত্র বাহক হিসেবেই আঁকা হয়েছিল ?

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'রথযাত্রা ও মথুরা বিরহ' নামের একটি বাংলা পুঁথির প্রথম পাতায় পুরীর জগন্নাথের সুদৃশ্য একটি ছবি আঁকা রয়েছে। লাল হলুদ ও ফিকে সবুজের ব্যবহারে তুলট কাগজের ওপর আঁকা। বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি বিভাগের মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি পুঁথির প্রথম পাতার একদিকে সুন্দর একটি রথের ছবি অন্যদিকে একটি হাতী। হলুদ, উজ্জ্বল লাল ও কালো রঙের ব্যবহারে আঁকা ওই ছবি দুটিতে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রয়েছে।

সমগ্র মহাভারত কাব্যখানিই যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ঘটনার ঘনঘটায় ভরভরাট। বিশ্বভারতীর সংগ্রহে কাশীরামদাসের মহাভারতের একটি পুঁথির প্রথম ও শেষ পত্রটি জুড়ে দুটি যুদ্ধের ছবি আঁকা রয়েছে।

প্রথম পাতায় ঘোড়ার পিঠের ওপর একটি লোক। আর ঘোড়ার পায়ের তলায় পদদলিত একটি মনুষ্যমূর্তি। ঐ একই পত্রের ডানদিকে অপর একজন ঘোড়-সওয়ার। উভয়েরই যোদ্ধবেশ। অনলোপক তেজস্বী ও প্রাণবান যুদ্ধাশ্ব এদেশের লোক-শিল্পের একটি প্রিয় মোটিফ। শেষপত্রে সারিবদ্ধ বীরদর্পে দণ্ডায়মান পাঁচটি মনুষ্যমূর্তি। আর তাদের সম্মুখবর্তী অশ্বারূঢ় ব্যক্তির ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের তলায় শায়িত পরাজিত এক মনুষ্যমূর্তি।

পুঁথির পাতায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ বা শিবদুর্গার ছবি থাকলেও সবচেয়ে বেশি আছে সরস্বতী ও গণেশের ছবি। মহাভারতের আদি পর্বের একটি পুঁথিতে প্রথম পত্রে কালো কালি দিয়ে আঁকা রয়েছে একটি গণেশের মূর্তি। সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করে শুভকাজ আরম্ভ আমরা আজও করে থাকি। সুতরাং সেই চিত্রটিকে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না। বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি বিভাগের এই পুঁথিটি বীরভূম জেলার কোঙরডিহি অঞ্চলে বসে অনুলিখিত এবং লিপিকর ও পাঠক শ্রীভগবতীচরণ মিস্ত্রি। এই প্রসঙ্গে এই একই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এবং শ্রীভগবতীচরণ মিস্ত্রির অনুলিখিত আরও চারখানি পুঁথির উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি কাশীরামদাসের মহাভারতের শান্তি পর্বের পুঁথি। পুঁথিটির প্রথম পত্রে কালো কালি দিয়ে মহিষাসুর-মর্দিনীর ছবি আঁকা গোটা পাতা জুড়ে। দ্বিতীয়টি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'নারদ সংবাদ'। পুঁথিটির শেষপত্রে তুলি হাতে চেয়ারে বসে এক সুঠাম পুরুষ। তার তলায় একটি ছুটন্ত ঘোড়া। তৃতীয় পুঁথিখানির নাম 'দুর্গাপঞ্চরাত্র'। পুঁথিটির প্রথম পত্রের চারপাশে লতাপাতার বর্ডার, তার মাঝখানে গোটা পাতা জুড়ে কালো কালি দিয়ে আঁকা একটি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। চতুর্থ পুঁথিখানি কাশীরামদাসের মহাভারতের আশ্রমিক পর্বের। পুঁথির প্রথম পত্রে কালো কালি দিয়ে আঁকা শ্রীকৃষ্ণের ছবি। এটিও গোটা পাতা জুড়ে কালো কালি দিয়ে রেখা চিত্র। এই সব কটি ছবিতেই যে একই ধরনের বলিষ্ঠ টানের ছাপ রয়েছে, একটু লক্ষ্য করলেই তা যে

কোনো লোকের চোখে ধরা পড়বে। এই পাঁচটি ছবি মিলিয়ে দেখলে একই হাতের আঁকা বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। কারণ আলোচ্য পাঁচটি পুঁথির লিপিকর এবং পাঠক বা মালিক একই ব্যক্তি। এবং তিনি তাঁর সব কটি পুঁথিই সযত্নে অলংকরণ করে রেখেছিলেন কালো কালি দিয়ে, রেখা চিত্রের মাধ্যমে। হয়তো এরকম পুঁথি তাঁর কাছে আরো ছিল। প্রতিটিই সুচিত্রিত ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জল। ঠিক একই রকম আরও চারখানি চিত্রিত পুঁথির উল্লেখ করা যায়। এই চারখানি পুঁথিও বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগে সংরক্ষিত। প্রতিটি পুঁথিরই লিপিকর শ্রীপঞ্চানন দাস পালিত এবং পাঠক শ্রীরামকানাই কুণ্ডু। চারটি পুঁথিই মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের। প্রথমটি মহাভারতের কর্ণ পর্বের পুঁথি। পুঁথিটির প্রথম পত্রের মলাটে লাল ও কালো কালি দিয়ে একটি খুব সুন্দর তালগাছ আঁকা রয়েছে। আর শেষ পত্রে একটি ছোটো ফুল আঁকা লাল ও কালো কালিতে। মাঝে মাঝে অনেকগুলি পত্রে ফুল-লতা-পাতা আঁকা রয়েছে। একটি পত্রের তলায় একটি ময়ূর আঁকা রয়েছে, যার পুচ্ছটি সরু হতে হতে গোটা পাতা জুড়ে একেবারে পাতার ডানদিকের শেষ পর্যন্ত গিয়ে অনেকটা বর্ডারের কাজ করেছে। সবই লাল ও কালো কালিতে আঁকা।

দ্বিতীয় পুঁথিখানি স্বর্গারোহণ পর্বের। প্রথম পত্রটি নেই। মনে হয় সেখানেও একটি সুন্দর ছবি ছিল। আলোচ্য পুঁথিটিরও মাঝের দুটি পত্রে পূর্বোক্ত পুঁথিটির মতোই দুটি ময়ূর আঁকা রয়েছে লাল ও কালো কালি দিয়ে। পত্র দুটির বাঁদিকের বর্ডারটি জুড়ে দুটি ময়ূরই অভিন্ন রকম ভাবে সূক্ষ্ম তুলির টানে আঁকা।

তৃতীয় পুঁথিখানি মহাভারতের স্বস্তিক পর্বের। পুঁথিটির প্রথম পত্রের মলাটে লাল ও কালো কালি দিয়ে আঁকা একটি সর্পবন্ধের চিত্র। মাঝের একটি পত্রের তলায় গোটা পাতা জুড়ে রেখা চিত্রের মতো করে একটি লতা আঁকা ও তার মাঝে মাঝে লাল কালির বিন্দু এঁকে ফুলের মতো আঁকা এবং সব মিলে দেখলে একটি প্রস্ফুটিত বৃক্ষের কথাই মনে হবে। অন্য একটি পত্রের বাঁদিকে একটি জ্যামিতিক লতা ও লতার মাঝে মাঝে জ্যামিতিক ফুল আঁকা লাল ও কালো কালি দিয়ে। অপর একটি পত্রের বাঁদিকে সমগ্র পাতাটি জুড়ে লাল ও কালো কালি দিয়ে বর্ডারের মতো করে খুব সুন্দর একটি অলংকৃত সর্প আঁকা রয়েছে।

চতুর্থ পুঁথিটি অশ্বমেধ পর্বের। পুঁথিটির প্রথম পত্রের মলাটের সাদা পাতাটিতে লাল ও কালো কালি দিয়ে একটি ফুল আঁকা রয়েছে। শেষ পত্রের অর্থাৎ পুষ্পিকার পত্রের তলার দিকে পূর্বোক্ত পুঁথি তিনটির মতোই একটি ময়ূর আঁকা রয়েছে। পত্রের তলায় বাঁদিকে ময়ূরটি আঁকা, আর বাকি অংশ জুড়ে ময়ূরের পুচ্ছটি আঁকা রয়েছে। একই রকম ময়ূর আঁকা রয়েছে আলোচ্য পুঁথির আরও তিনটি পত্রের বিভিন্ন জায়গায়। একটি পত্রে লাল ও কালো কালি দিয়ে আঁকা ময়ূরটির পায়ের তলায় ঐ একই কালি দিয়ে আঁকা একটি সাপ। এই ময়ূর এবং সাপ লোকশিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের মতো পুঁথির পাতায়ও যে বারে বারেই আসছে, এটি খুবই ইঙ্গিতবহ। এছাড়া পাখি ও ।

রয়েছে তিনটি পত্রে। তার মধ্যে একটি পত্রের বাঁদিকে আঁকা একটি গাছের ডাল আর তার ওপরে একটি ছোটো পাখি।

একই লিপিকরের অনুলিখিত এই চারখানি পুঁথিতে একই ধরনের চিত্র দেখে সহজেই মনে হয় আলোচ্য লিপিকরের অনুলিখিত আরও হয়তো অনেক পুঁথি ছিল। যেগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলি একত্রিত করতে পারলে লোকশিল্পের অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। এর প্রতিটি চিত্রই সুচিত্রিত ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য। শিল্পশাস্ত্রের ষড়ঙ্গ এতে নেই, আছে ছন্দ ও রস, মানুষের মনকে যা কান্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। শিল্পীর অশিক্ষিত পটুত্বে সমসাময়িক সমাজের মন কতোটা সজীব হয়ে উঠেছে, সেইটুকুই এই সব পুঁথিচিত্রের তথা লোকশিল্পের বিচারের মাপকাঠি। একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এরকম একই শিল্পীর আঁকা একাধিক পুঁথির পাতা আরও মিলবে।

এই সব পুঁথির পাতায় দেবদেবার চিত্রই সবচেয়ে বেশি। শিল্পজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, 'ভূত-প্রেত, দেবতা ও অপদেবতাদের রূপায়ণ থেকেই, অর্থাৎ ধর্মীয় প্রেরণা থেকেই মানুষ শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল।' তাই বিকল্পহীনভাবেই প্রাচীন লোক-শিল্পে দেবদেবী একটা বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে। তবে দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন বা পৌরাণিক বিষয় বহির্ভূত চিত্রের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়।

বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিবিভাগের অন্নদামঙ্গল-কাব্যের একটি পুঁথিতে মুঘল চিত্র-কলার অনুসরণে আঁকা দুটি উচ্চাঙ্গের ছবি পাওয়া যায়। প্রথম ছবিটিতে দেখা যায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম দর্শন দৃশ্য। বিদ্যার নির্দেশমতো হীরা মালিনী সুন্দরকে সংকেত স্থানে দাঁড় করিয়ে সে খবর বিদ্যাকে দিতে এলে—

আথিবিথি সুন্দরে দেখিতে ধনি ধায়।
অঙ্গুলি হেলায়ে হীরা দুঁহারে দেখায়।
অনিমেষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ।।

আলোচ্য চিত্রটিতে এই মুহূর্তটিই ধরা পড়েছে। এবং চিত্রটির তলায় প্রথম দুটি পংক্তি লেখা রয়েছে।

দ্বিতীয় ছবিটিতে চৌর্য অপরাধে ধৃত সুন্দরকে মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর অন্তঃপুরের অলিন্দ থেকে দেখছেন সুন্দরী সুবেশী বিদ্যা। আলোচ্য চিত্রিত পুঁথিখানির চিত্র সংখ্যা মাত্র দুটি হলেও একে আমরা কাব্যের বিষয়বস্তুর বর্ণনাময় ও শোভাবর্ধক চিত্র বলতে পারি। পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থে এই ধরনের দুটি চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া কালিকামঙ্গলের একটি পুঁথিতে দেবী কালীর ছবি আঁকা রয়েছে কালো কালিতে।

আমরা আগেই বলেছি যে, বাংলা পুঁথিতে কাব্যের অন্তর্গত বিষয়ের ব্যাখ্যাকর ও শোভাবর্ধক চিত্র খুব অল্প ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। আর সে চিত্র বহুবর্ণে রঞ্জিত হয় খুব দৈবাৎ। এরকম একটি পুঁথি বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি বিভাগে রয়েছে। পুঁথিখানি

বীরভূম জেলা থেকে সংগৃহীত। কিন্তু এতে গ্রামের নাম বা সময়ের কোনো উল্লেখ নেই। আলোচ্য পুঁথি থেকে দুটি চিত্র এখানে উল্লেখ করবো। প্রথমটি পাটকেল রঙের জমির ওপরে গাঢ় সবুজ, লাল, হলুদ ও কালো রঙের ব্যবহারে রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের চিত্র। দ্বিতীয়টি ফিকে হলুদ রঙের জমির ওপর উজ্জ্বল সবুজ, গাঢ় লাল, গাঢ় হলুদ ও কালো রঙে আঁকা রামসীতার বিবাহ চিত্র। সালঙ্কারা, লজ্জাবনতা সীতার সম্প্রদান দৃশ্য। বীরভূমের পটের ছবির সঙ্গে এই চিত্রের খুব মিল লক্ষ্য করা যায়। অঙ্কন রীতি ও পদ্ধতি, তুলির টান, রঙের প্রয়োগে সবুজের প্রাধান্য, অলঙ্করণ, সব কিছুতেই আঞ্চলিক প্রভাব চিত্রটিকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে।

'রায়মঙ্গল'-কাব্যের মূল বিষয়বস্তু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের এলাকা আঠারো ভাটী অঞ্চল থেকে মৌলা ও মলঙ্গীদের মোম ও মধু সংগ্রহ করা এবং সেই সূত্রে উক্ত অঞ্চলের অধিকার নিয়ে বরখা গাজীর সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ও শেষে পরস্পরের মিলন। হাওড়া জেলা থেকে সংগৃহীত একটি প্রাচীন পুঁথির পাতায় একদল চলমান শিকারী বেশী পুরুষের ছবি আঁকা রয়েছে। হাতে তাদের তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি। এখানে লোকায়ত জীবন যেন এক বিচিত্র শোভাযাত্রায় চলেছে। এক অদম্য গতিশীলতা এই চিত্রটিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে।

দক্ষিণরায়ের বাহন বাঘ। মানকর অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত রায়মঙ্গলের একটি পুঁথির শেষ পত্রটির চারপাশে সুন্দর বর্ডার। আর তার মাঝে একটি বাঘের ছবি। অন্য একটি পুঁথির প্রথম পাতায়ও দুটি ছুটন্ত বাঘের ছবি আঁকা রয়েছে। আর একটি পুঁথির একটি পাতার মাঝখানে ঢাল তলোয়ার হাতে দুটি ছোটো মনুষ্য মূর্তি আঁকা।

'মনসামঙ্গল'-কাব্যের চাঁদসদাগর শিবভক্ত। 'চ্যাংমুড়ি কানি' মনসাকে তিনি কিছুতেই ফুল জল দিয়ে পূজো করবেন না। এই নিয়েই আলোচ্য কাব্যের কাহিনীর বিস্তার। বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের একটি পুঁথির প্রতিটি পাতার মাঝখানে লাল ও কালো কালির ব্যবহারে শিবলিঙ্গের নানান ধরনের ছবি আঁকা রয়েছে। বিশ্বভারতী-সংগ্রহের এই পুঁথিটি চৌরঙ্গী রোড কোলকাতা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ময়ূর আঁকা রয়েছে অনেক পুঁথির পাতাতেই। ময়ূর ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে খুব প্রিয় ও পরিচিত মোটিফ। এই ময়ূরই ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকশিল্পীর প্রিয় পাখি। হরপ্পার লোকশিল্পের সর্বত্র ময়ূরের ছড়াছড়ি। চীনের ফিনিক্স পাখির মতো, ইজিপ্টের শকুনির মতো, গ্রীস-রোমের ঈগল পাখির মতো, হরপ্পা যুগে ময়ূর ছিল তেজোময় অন্তরীক্ষের ও মহাকাশের প্রতীক। প্রাগৈতিহাসিক বঙ্গে-অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব হাজার বছর আগেকার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত একটি মৃৎপাত্রে দেখি চিত্রিত ময়ূর ও তার মুখে প্রলম্বিত একটি সাপ, জল ও উর্বরতার প্রতীক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহের বাণীকণ্ঠ-বিরচিত, 'মোহ মোচনে'র একটি পুঁথির প্রথম পাতায়, দুটি শিবলিঙ্গ, কিছু লতাপাতা, দুটি সাপ ও একটি ময়ূর আঁকা রয়েছে। অনেকটা সেকালের সর্পবন্ধের[১] মতো এই ছবিটি খুবই ইঙ্গিতবহ। কালের অবিশ্রাম গতি ও পার্থিব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে পাণ্ডুরাজার ঢিপির প্রায় তিন হাজার বছর পরে সতেরো আঠারো শতকের বাংলার নানা মন্দিরের গায়ের নক্সাকাটা পোড়া মাটির টালিতে, বাংলার কাঁথা ও আলপনার রূপসজ্জায়, পুঁথির অলংকরণে, ময়ূর ও সাপের চিত্রটি সযত্নে ধরে রেখেছেন লোকশিল্পীর দল। ময়ূরের ছবি আঁকা পুঁথির পাতা অনেক পাওয়া যায়। ময়ূরের মুখে প্রলম্বিত সাপের চিত্রও রয়েছে বেশ কয়েকটি পুঁথির পাতায়।

বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক পুঁথিগুলির বিষয়বস্তু প্রথমে রাধাকৃষ্ণ, পরে শ্রীচৈতন্য কেন্দ্রীক। এই শ্রেণীর পুঁথির অলংকরণে প্রায়ই কৃষ্ণমূর্তি, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, শ্রীকৃষ্ণের চরণ এবং নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যের আভাষ মেলে। আর এই সব ক্ষেত্রে শিল্পী-মনকে অতিক্রম করে আমাদের কাছে ভক্ত হৃদয়টিই যেন ধরা দেয় সহজে।

লোকসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান খুব বেশি। চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম লোক জীবনের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবনের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা যেমন পুষ্ট হয়ে উঠেছিল সহজেই, তেমনই লোকশিল্পও পুষ্ট হয়ে উঠেছিল সমান ভাবেই। পট যেমন, তেমন পুঁথির পাতা ও পাটায় চৈতন্যদেবের জীবন-নাট্যের কাহিনীকে অবলম্বন করে বহু শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কোলকাতা থেকে সংগৃহীত 'রাধাকৃষ্ণ বিলাস' নামক পুঁথিটির শেষ পত্রে দুটি নৃত্যরত মনুষ্য মূর্তি আঁকা রয়েছে। এদের মধ্যে একটিকে শ্রীচৈতন্যদেব বলে মনে হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক পুঁথিতে, বিশেষ করে চৈতন্য-চরিতামৃতের বা চৈতন্য-ভাগবতের পুঁথি যদি একটু প্রাচীন হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু অলংকরণের সাক্ষ্য মেলে। সব সময় কোনো রকম বিশেষ ছবি না এঁকে, পুঁথির পাতার বর্ডার হিসেবে কেবল লতাপাতা আঁকার ক্ষেত্রে, পদ্মফুল, নানা ধরনের জ্যামিতিক ফুল এবং বিভিন্ন লতাপাতার সংগঠিত ও সরলীকৃত অলংকারধর্মী রূপায়ণ এদের মধ্যে প্রধান। পাখী ও ফুলগাছ সর্বত্রই চোখে পড়ে। এই সব লতা-পাতা ফুলের মাঝে মাঝে পাখির ব্যবহার করতে দেখা যায়, ছন্দ ও মাত্রা বজায় রাখতে। যে পুঁথিতে কিছু নেই, সেখানেও দেখা যায় পুঁথিটি অপূর্ব সুন্দর হাতের লেখায় প্রতিটি ভণিতার জায়গায় লাল, কালো কালি দিয়ে অলংকরণ করা, প্রতিটি

---

১ শব্দালঙ্কারে সর্পাকারে রচিত বর্ণ সমূহের চিত্রকাব্য বিশেষ। সেকালে সর্পবন্ধ, নৌকাবন্ধ, পদ্মবন্ধ ইত্যাদিতে কবিতা রচনা করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হতো শ্রাদ্ধ বাসরে। যার অর্থ নির্ণয় করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। উপেন্দ্র ভঞ্জ রচিত 'চিত্রকাব্য বন্ধোদয়ে'র তালপাতার পুঁথিতে এরকম পঁচাশী প্রকার বন্ধের চিত্র সহ কবিতা রয়েছে।

পত্রার সংখ্যা, সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাদি লাল কালিতে সযত্নে অলংকরণ করা, যা অবশ্যই লিপিকরের শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে।

দেবদেবীর মনোরম চিত্র ছাড়াও প্রাকৃতিক জগৎ থেকে কতো মনোরম আকৃতি, কতো সুন্দর অঙ্গবিন্যাস, কতো সুঠাম অঙ্গভঙ্গি, কতো বিচিত্র গমন-মুদ্রা, আপনার শিল্পকলার আলোকে উদ্ভাসিত করে পুঁথির পাতাকে অলংকৃত করা হয়েছে। এছাড়াও এক ধরনের অলংকরণ নানান বিষয়ক পুঁথির পাতায়ই লক্ষ্য করা যায়। তা হলো পুঁথির প্রথম পত্রে লাল কালো ও হলুদ রং-এর ব্যবহারে চিত্রিত তিনটি বা চারটি ফুল, যা পুঁথির সুঅলংকৃত মলাটের কাজ করেছে। এই ধরনের নক্সাগুলি সাধারণত দু-রকমের হয়। জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক। জ্যামিতিক বলতে অনন্যচ্ছেদ বৃত্ত, ত্রিভুজ চতুর্ভুজকে কেন্দ্র করে নক্সা। প্রাকৃতিক অর্থে ফুল, বৃক্ষ, লতা, জীবজন্তু, মাছ, পাখি ইত্যাদি। আর আশ্চর্যের বিষয় এই সব চিত্র ও নক্সা আধুনিক বাংলার কাঁথায় ও আলপনায় এখনও চলে আসছে।

সেকালে পুঁথিকে সংরক্ষিত করে রাখা হতো পুত্র স্নেহে। সযত্নে রাখবার জন্য পুঁথির দুদিকে দুটো কাঠের পাটা দিয়ে তার ওপরে কাপড় জড়িয়ে রাখার প্রচলন ছিল। আমাদের হাতে পুঁথিগুলি এইভাবেই এসেছে। এই কাঠের পাটাগুলি অনেক সময়েই চিত্রিত করে রাখা হতো। বইএর মলাটের মতো পুঁথির এই কাঠের পাটার গায়ে রঙ, তুলি দিয়ে আঁকা এই সব ছবির মধ্যে রীতিমতো শিল্প নৈপুণ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। সে ক্ষেত্রে কে বা কারা এই সব ছবি আঁকতেন সে সম্পর্কে আজ আর তেমন কিছুই জানা সম্ভব না হলেও অনুমান করা যায় যে, কোনো কোনো পুঁথির পাতার অলংকরণের মতো এখানে লিপিকর, পাঠক বা সংগ্রাহকের অপটু হাতের কাজ এগুলি মোটেই নয়। পূর্বোক্ত সুসংস্কৃত লোকায়ত চিত্রের মতোই এগুলি উচ্চাঙ্গের। তাই কল্পনা করা চলে যে হয়তো কোনো পটুয়া, যার কারুশিল্পের দক্ষতা গ্রামে ছিল সর্বজন বিদিত, তাকে দিয়ে এ ছবি আঁকানো হতে পারে। অথবা এক শ্রেণীর শিল্পী হয়তো ছিল, পুঁথির পাটার অলংকরণই ছিল যাদের পেশা। তবে সতেরো শতকের আগের কোনো বাংলা পুঁথির চিত্রিত কাঠের পাটা পাওয়া গেছে বলে নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। যদিও ওড়িষি চিত্র সংবলিত কাঠের পাটা পাওয়া গেছে পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষের দিকের।[১]

পুঁথি যেহেতু কেনা-বেচা চলতো, তাই তার বহিরঙ্গের অলংকরণের দিকে নজর দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। যাতে করে পুঁথিটি পাঠকের মনোরঞ্জন করে সহজেই মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। সেকালে শিক্ষিত লোকের আগ্রহ ছিল হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহে ও সংরক্ষণে। অলংকৃত সুদৃশ্য পুঁথি সংগ্রহ ছিল আভিজাত্যের পরিচায়ক।

১. 'The land of wrestlers'—by J. C. French, in Indian Art and letters. Vol. I No. 1 (1927)

কিন্তু পুঁথির পাটার ছবি যেই আঁকুক, তার কালজয়ী শিল্পকর্ম আজ যেভাবে আমাদের হাতে এসে পৌছেছে তাতে দেখা যায়, যথাযথ মোটা ও দৃঢ় তুলির টানে, সহজ ছন্দে, অল্প কয়েকটি রেখায়, অমিশ্র দুই বা তিন রঙে ছবিগুলি আঁকা। বাংলার শিল্পের অন্যতম অনুরাগী গুরুসদয় দত্ত বাংলার পটচিত্র সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা এই সব পুঁথির পাটার চিত্র সম্পর্কেও সমান সত্য। তিনি বলেছেন—"এই চিত্র-কলার ভাষার অক্ষর প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। পরিমাপ কাঠির খুটিনাটি ও আলোছায়ার লীলাখেলার চতুরতা ও বাহুল্য মিলাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষ বিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাবে পরিপূর্ণ।"

কাঠের পাটার ওপরে একদিকে, কখনও বা দুদিকেই (যে সব ক্ষেত্রে উভয় দিকই চিত্রিত) একটি বস্ত্র খণ্ড আটকে তার ওপর প্রথমে কোনো এক ধরনের আঠার প্রলেপ দেওয়া হতো, যা একদিকে বস্ত্র খণ্ডটিকে কাঠের সঙ্গে আটকে থাকতে সাহায্য করতো, অন্যদিকে জমির রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতো। পাটা চিত্রণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির রঙ আঠারো শতকের পটচিত্রের মতো টকটকে লাল। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে, বিভিন্ন রূপ ও রঙের প্রতিফলনে পাই স্থানীয় লোকশিল্প-রীতি। কাঠের পাটার চিত্রণের কতকগুলি নিজস্ব বিষয় রয়েছে। দশাবতার, রামের অভিষেক, কৃষ্ণলীলা, সমুদ্র-মন্থন, সর্পযজ্ঞ, শিবের ভিক্ষা সংগ্রহ ইত্যাদি। সতেরো শতকের পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চৈতন্যলীলার বিষয়। পুঁথির বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে পাটার বিষয় ছিল সম্পর্কহীন। পাটা চিত্রণের শিল্পীও ছিল আলাদা। পুঁথির চিত্র যাঁরা আঁকতেন তারা কেবলমাত্র সূচীমুখ লেখনীর সাহায্যে কালো কালি দিয়ে চিত্র আঁকতে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু পাটা চিত্রণের সঙ্গে পটের ছবির অঙ্কন পদ্ধতি ও রঙ নির্বাচনের, টান ও টোনের মিল দেখে মনে হয় এগুলি তৎকালীন পটুয়াদের হাতের কাজ। সাধারণভাবে এরা চিত্রকর নামে পরিচিত ছিল।

বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত একটি পাটায় রামের অভিষেক দেখানো হয়েছে। রাম চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে পীঠ আকৃতির এক সিংহাসনে বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁর প্রসারিত এক হাতে বাণ ও অন্য হাতে ধনুক। পাশে আছেন সীতা। পিছনে রাজকীয় পাখা হাতে লক্ষ্মণ। দুপাশে ভরত ও শত্রুঘ্ন। সামনে ভক্তিভরে দণ্ডায়মান অনুচরদ্বয়। রাম ও লক্ষ্মণের গায়ের রঙ নীলাভ সবুজ, সীতা, ভরত ও শত্রুঘ্ন ফিকে লাল।

বীরভূম ও বাঁকুড়া থেকে সংগৃহীত এবং আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের দুটি পাটার তুলনামূলক আলোচনা করলে একই বিষয়কেন্দ্রীক এই পাটায়, দুটি প্রতিবেশি জেলার শিল্পবৈশিষ্ট্য ও রঙ নির্বাচনের ধরন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-নাট্য বাংলার লোকসাহিত্যে যে কতো গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সতেরো শতকের পয়ের পট ও পাটার অলংকরণে তার খানিকটা ছায়া রয়ে গেছে। এর মধ্যে প্রধান হলো শ্রীচৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডন ও নগর সংকীর্তন। এছাড়াও রয়েছে, নীলাচলের সমুদ্রতীরে চৈতন্যদেব, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ ইত্যাদি। চৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডনের চিত্র অঙ্কিত একটি পাটা রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামে, দুটি রয়েছে বিশ্বভারতী পুঁথি বিভাগে। এই তিনটি পাটায়ই চৈতন্যদেবের গায়ের রঙ ফিকে লাল। চৈতন্যদেবের গুরু কেশব ভারতী, একটিতে উজ্জ্বল নীল, অপরটিতে নীলাভ সবুজ। ক্ষৌরকার কোথাও হলুদ বর্ণের কোথাও নীলাভ সবুজ। তার পিছনে জলের ঘটি হাতে এক ব্যক্তি রয়েছে তিনটি পাটাতেই। একটি পাটায় ক্রন্দনরত শচী দেবী। এই তিনটি পাটাতেই চৈতন্য জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত যেন ধরা রয়েছে।

নগর সংকীর্তনের একটি পাটা রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামে। একটি আছে বিশ্বভারতীর সংগ্রহে। এই দুটি পাটাতেই চৈতন্যদেবের গায়ের রঙ লাল। এদের প্রত্যেকটি নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করবার সুযোগ এখানে নেই। তবে, বিভিন্ন জেলা থেকে পাওয়া পুঁথির পাতা ও পাটার রঙ ও রেখার টানের ও টোনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভাষা এক হলেও তার উচ্চারণে যেমন বিভিন্ন জেলায় একটা চলিত ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিমা রয়েছে, ঠিক তেমনই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে বিভিন্ন জেলার পুঁথি ও পাটার চিত্রশৈলীর মধ্যে, অঙ্কন পদ্ধতির আঙ্গিকে, রঙ নির্বাচনে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বীরভূম ও বাঁকুড়া দুটি জেলায়ই গাঢ় সবুজের ওপর ঝোঁক লক্ষ্য করা গেলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুষ্প অঙ্কিত শাড়ী এবং তাতে ঝালরের বিনুনীর মতো ভাঁজে রেখার অল্প ব্যবহার, বাঁকুড়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সবুজ রঙ-এর প্রাধান্যের জন্য বাঁকুড়ার পাটায় শ্রীকৃষ্ণের বর্ণও গাঢ় সবুজ। কিন্তু বীরভূমে সর্বত্র গাঢ় নীল। এই সব সূক্ষ্ম বিষয়গুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তুলনামূলক আলোচনা করলে অভিজ্ঞ চোখে সহজেই ধরা পড়বে বিভিন্ন জেলার নিজস্ব অভিব্যক্তি আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই সব পাটাচিত্রে। দুঃখের বিষয় লোকশিল্প সংরক্ষণ ও প্রচার বিষয়ে বর্তমানে নানামুখী সচেতনতার প্রকাশ হলেও বাংলার লোকশিল্পের অধুনা বিলুপ্ত এই ধারাটির প্রতি বিশেষজ্ঞদের নজর আজও তেমনভাবে পড়ে নি।

। পট-শিল্প। সংস্কৃত 'পট্ট' কথাটি থেকে উৎপন্ন 'পট' একখণ্ড চিত্রিত বস্ত্র বিশেষ। পট বলতে সাধারণত কাপড়ের ওপর হাতে আঁকা ছবিকেই বোঝায়। প্রাচীন কালে কাপড়ের ওপর ছবি আঁকার রীতির প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকেও সিংহলের রাজপথে উৎসব উপলক্ষে টাঙানো বুদ্ধের ছবি আঁকা কাপড়ের পট দেখতে পান বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। আবার সংস্কৃত 'পট্ট' নয়, দ্রাবিড় 'পত্তম' শব্দ

থেকেই বাংলা পট শব্দের উদ্ভব হয়েছে—এ রকম একটি মতও প্রচলিত রয়েছে। এই পট যারা আঁকতো তাদের বলা হতো 'পটকার', 'পটীকার' বা 'পটুয়া'।

এই পটুয়াদের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী থেকে জানতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অধিবাসী, বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক গোশাল মস্খলিপুত্ত নিজে শুধু আজীবিক সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নালন্দা গ্রামের একজন সামান্য পটুয়া 'মস্খের' পুত্র। পট দেখানোই যাদের জাত ব্যবসা। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পূর্বে পযন্ত তিনি পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করে, পট দেখিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে জীবিকা উপার্জন করতেন।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে লেখা পানিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' থেকেও এই পট ও পটুয়াদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। পানিনি শিল্পীদের গ্রামশিল্পী ও রাজশিল্পী, এই দুটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে যাঁরা কেবলমাত্র গ্রামের লোকেদের প্রয়োজনমতো ছবি আঁকেন বা পোড়ামাটি, কাঠ, পাথর কিম্বা ধাতুতে মূর্তি তৈরি করেন তাঁরাই গ্রামশিল্পী। আর যাঁরা রাজার নির্দেশ ও রুচি মতো তাঁর চিত্ত বিনোদনের জন্যে শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন, তাঁরাই রাজানুগ্রহপুষ্ট সভাশিল্পী বা রাজশিল্পী।

পতঞ্জলীও তাঁর 'মহাভাষ্যে' বর্ণনা করেছেন, লোকশিল্পীরা কিভাবে রাস্তার ধারে কংস বধের পালা চিত্রিত পটের সাহায্যে দেখাচ্ছেন। এবং এই সব শিল্পীর আঁকা চিত্রকেই তিনি 'শৌভিক' বা 'শোভনিক' চিত্র বলে বর্ণনা করেছেন, যা দিয়ে গৃহ ও মেলা প্রাঙ্গন শোভাযুক্ত করা হতো। আবার সপ্তম শতকে রচিত বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিতে'র বর্ণনা থেকেও জানা যায়, রাজা প্রভাকরবর্ধনের পীড়ার খবর পেয়ে হর্ষবর্ধন শিকার বাসনা ত্যাগ করে রাজধানীতে প্রবেশ করবার পথে দেখেন, একটি দোকানের সামনে একদল বালকের ভীড় এবং সেখানে জনৈক পটিকার গান গেয়ে পট দেখাচ্ছেন। লম্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে ধরেছেন, ডান হাতে একটি বেতের ছড়ি দিয়ে তিনি চিত্র দেখাচ্ছেন।

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পটুয়াদের শিল্পরীতির চলন ছিল সেই প্রাচীন কাল থেকেই। আবার আধুনিক বাংলার পটুয়াদের মতো প্রাচীন ভারতের পটিকারও একাধারে ছিলেন কবি, শিল্পী, গায়ক ও প্রদর্শক।

কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, শিব-গৌরী সংবাদ, বেহুলা-লখিন্দর কাহিনী, গৌরাঙ্গ জীবন-নাট্যের নানা কাহিনী—ইত্যাদি সব বিষয়ই পটে আঁকা হতো। কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ গানের প্রধান ঐতিহ্যের সঙ্গে পরবর্তী চৈতন্যোত্তর যুগেই সম্ভবত চৈতন্যচরিত গ্রন্থ-গুলির অংশ বিশেষ অঙ্কিত করে গান করার রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল। ক্ষেমানন্দ তাঁর 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের হাসন-হোসেন পালায় এই পটুয়াদের বৃত্তির ও জীবনযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

পটিদার পটিবায় আর লেখে পটি।
ঘরের কাজ সাইরা বুলে পটি হাসনহাটি॥

প্রমান জুড়িয়া দেয় ধান মাসা তোলা।
পটিদার সানা বান্ধে কিনে জোগি জোলা ॥
পট লয়্যা মেগ্যা খায় নাই ভূমি ভাগ।
তাহারে খাইতে গেল বিঘতিয়া নাগ ॥[১]

সেখানে দেখা যায়, কবি পটুয়াদের ভূমিহীন মুসলমান হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। এরা পট আঁকে, সেই পট নিয়ে বাড়ী বাড়ী গান করে চাল-ডাল সংগ্রহ করে। আবার সানা বেঁধে তা জুগি-জোলাদের নিকট বিক্রিও করে। বাস করে মুসলমান পটী, হাসন-হাটীতে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যেই একশ্রেণীর লোক সানা বেঁধে 'সানাকর' নামে অভিহিত হয়।[২] বর্তমানেও রাঢীয় সমাজে এই পটুয়ারা এমন এক শ্রেণীভুক্ত, যারা না-হিন্দু, না-মুসলমান হিসেবেই বিবেচিত। রোজা-নামাজ করার জন্যে হিন্দুদের কাছে এরা মুসলমানরূপেই চিহ্নিত। আবার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন আচার আচরণ হিন্দুদের মতো করার জন্যে মুসলমান সমাজেও এরা অপাংক্তেয় রয়ে গেছে। আনুমানিক দুশো বছরের পুরোনো একটি পুঁথির[৩] পুষ্পিকায় দেখা যায়, লিপিকর নিজ-বৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন,—'চৈতন্যমঙ্গলের ছবিতে গান করি'। এই গান যে পট দেখিয়ে গান করা, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

অন্যান্য কারু শিল্প। সেকালে শাঁখাতে নানারকম কারুকায খচিত থাকতো। রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-কাব্যে এই কারুকায খচিত শঙ্খ বা বাই-শঙ্খের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

দিব্য দুটী বাই শঙ্খ করিলে সৃষ্টি।
... ... ॥
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন কৈল তায়।
স্থাবর জঙ্গম চরাচর সমুদায়।
আগে আঁকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মধ্যে মহেশ্বর।
রক্ত পীতাম্বরে শঙ্খ সাজিল সুন্দর ॥
বিষ্ণু চতুর্বিংশতি বিচিত্র চিত্র তায়।
গোপ গোপী গোপাল্যা গোকুল সমুদায় ॥
কোথাহ পূতনা বধ শকট ভঞ্জন।
কোন খানে উদুখলে বান্ধা দামোদর ॥
... ...

১. ক্ষে. ম.। বি. ভা. পুঁ. সং ৯৮৬। প. স. ১০৮খ।
২. 'সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম।' ক. ক. চ. পৃ. ৩১৫।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং ৫৮৩০।

দান খণ্ড নৌকা খণ্ড বৃন্দাবনে বাস।
কংস ধ্বংস কৈরা কৈল দ্বারকানিবাস॥
... ...
পিসিকে দেখেন কৃষ্ণ পাণ্ডবের ঘরে।
মহাভারতের কথা লিখি তার পরে॥
... ...
চণ্ডীর চরিত্র চিত্র হয়্যাছে সুন্দর।
শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ মহিষ শঙ্করে॥
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণিবার নয়।
সোম সূর্য সহিত সকল রত্নময়॥[১]

মেয়েদের কাঁচুলীর কারুকার্যের কথা আগেও বলা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের প্রায় সব কবির রচিত কাব্যেই এই কারুকার্য-খচিত কাঁচুলীর বর্ণনা পাই।

"নানা বর্ণ অবতার কাঁচলি লিখন।
লিখিয়াছে সমুখে কালার নিধুবন॥
চারিদিকে লিখন গোপীগণ নাচে।
রাধা চন্দ্রবলী লেখা শ্রীকৃষ্ণের কাছে।
তরুলতা বিস্তর শোভিত কুঞ্জবনে।
দান খণ্ড লেখা আছে তাহার দক্ষিণে॥"[২]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"লক্ষ টাকার কাঁচুলি করিল পরিধান।
বিচিত্র লিখিল তায় ভারত পুরাণ॥"[৩]

সেকালে এইভাবে কাঁচুলীতে রামায়ণ, মহাভারত, বিশেষ করে কৃষ্ণলীলার কাহিনী চিত্রিত করতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ উচ্চাঙ্গের সূচী-শিল্পের সাহায্যেই এই কাজ সম্পন্ন করা হতো। বিবাহ উপলক্ষে ব্যবহৃত টোপরে একালের মতো সেকালেও নানারকম কারুকার্য করা হতো।

কাজলা মাল্যানী করে টোপর নির্মাণ।
নানা চিত্র লিখে তাহে লিখে নানা ফুল॥[৪]

ডোমেদের তৈরি বাঁশবেতের কাজের মধ্যেও ফুল লতা পাতা ইত্যাদি নানারূপ কারুকার্য খচিত থাকতো। ডোমেদের তৈরি বিউনী বা পাখার উপরে নানা ধরনের

১. রা. শি. পৃ. ৩০২-৩০৪।
২. রূ. ধ. পৃ. ১০৭।
৩. ঐ. পৃ. ১১৬।
৪. কে. ম. পৃ. ২৩৫।

চিত্র অঙ্কিত করার খবর পাওয়া যায় সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির রচিত 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে।

চিত্র করিতে রে কামিলার গেল মন।
একদিগে লিখিছে কানাঞি বৃন্দাবন॥
হংসে ব্রহ্মা লেখিলা গড়ুরে নারায়ণ।
মইসে যম লিখে কিবা সূর্য্যের নন্দন॥
হরিণে পবন লেখে কিবা মাছেতে বরুণ।
ঝাটা বাহনে আলিক্ষি ছাগলে হুতাশণ॥
সিংহবাহনে লেখে অভয়া পার্ব্বতী।
জআ বিজআ লেখে লক্ষ্মী সারস্বতী।
মোড়ে কার্ত্তিক লেখিছে মুষায় লম্বোদব।
ঢেঁকি বাহনে লেখিছে নারদ মুনিবর॥
বৃষবাহনে লিখিছে ভোলা মহেশ্বর।
উনকুটী দেবতা লেখে বানকুটী তপসী॥
চিত্র করিতে রে কামিলার গেল মন।
আর দিগে লেখে রাজ উজানি নগর॥

... ...

ধন্য ধন্য বাছা তোর সাফল জীবন।
ভাগ্য খেনে বেনা আমার কর‍্যাছ গঠন॥[১]

প্রতিটি 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যেই লাউসেনের দেবদত্ত অসির ফলায় নানারকম কারুশিল্পের বর্ণনা পাওয়া যায়।

আসি মোন লোহার ফলা জোগবলে উঠে॥
সুরঙ্গ বসন দিঞা ফিরি আচ্ছাদিল।
হিঙ্গুল হত্যাল দিঞা মিস্যাল গুলিল॥
সুবর্ণের কলম দক্ষিণ করে লঞা।
লেখিতে লাগিল বিসাই ঈশ্বর ভাবিয়া॥[২]

এ সবই সেকালের অত্যুৎকৃষ্ট কারুশিল্পের নিদর্শন। এ ছাড়া, টেরাকোটার কাজের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। ঘরের বা মন্দিরের দরজায় ও চৌকাঠেও নানা রকম ফুল-লতা-পাতা ও পৌরাণিক কাহিনী চিত্রণের খবর পাওয়া যায় আমাদের আলোচ্য শতকের সাহিত্যে।

'সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।
নানা চিত্র লিখে বিশাই লিখে নানা ফুল॥'[৩]

১. বি ম. পৃ ১২৭।
২. ধ ধ। বি ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প সং ৯৩থ।
৩. ক. ক. চ. পৃ ৩১১।

কোথাও রয়েছে—

ছন গুড়া পাখি টাল নির্ম্মান করএ ভাল
হুন্দরা সাজাএ দুই সারি।
গাছ বান্ধে পাখি টালে আওয়াস তুলিল ভালে
চৌকাট নগর আওআরি ॥
হুন্দরার চৌকাঠে সূত্রধার চিত্র গঠে
সবপু সমান কপাঠ।[১]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"নানা চিত্র করে তায় বিষম অস্ত্রের ঘায়
শার্দ্দুল জম্বুক কেশরী।
নানা রঙ্গে চিত্র করে দেখি অতি মনোহরে
স্বর্ণময় নৃপতির পুরী ॥
বিশ্বকর্ম্ম চিত্র করে দেখিয়া সে নৃপবরে
সন্তোষ হইল বড় মন।"[২]

আবার, ফুলের মালা গাঁথা[৩], বা পাতা দিয়ে নানারকম কারুকার্যময় তৈজসপত্র নির্মাণেরও বর্ণনা রয়েছে বিভিন্ন কবির রচিত 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের 'সুরিক্ষা-পালায়'।

তেতলির পত্রগুলি লইল তুলিঞা।
সিআতে বসিলা রামা সুঁচি বাট্যা দিঞা ॥[৪]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

"সুক্ষ্মতর তৎপর আনিয়া খড়িকা
হাতাহাতি পত্র সিঞে সুরিক্ষা নায়িকা।
পরিসর পত্রের রচিল দুই থাল।
খুরি বাটী ব্যঞ্জন যোগাতে ঝোল ঝাল ॥
নানা চিত্র বিচিত্র নির্ম্মান পরিপাটী।
পঞ্চম ব্যঞ্জন সাজে শতাধিক বাটী ॥"[৫]

এই সব সূক্ষ্ম মনোরম কারুকার্য এক শ্রেণীর নন্দনশিল্পেরই বিশিষ্ট উদাহরণ। সে সব ক্ষেত্রে কারুকার্যের উৎকৃষ্টতার ওপরে যেমন মূল্য নির্ধারণ হতো, তেমনি এই ধরনের নন্দনশিল্পকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর লোক যে জীবিকা অর্জন করতো তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর সে ক্ষেত্রে মানুষের মনের সহজাত শিল্প বোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

---

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩১৪।
২. হরিদেবের রায়মঙ্গল, পৃ. ১৫৮-৫৯।
৩. ক্ষে. ম. পৃ. ১৭০।
৪. ধ. ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ১৭৭ক।
৫. ঘ. ধ. পৃ. ১৩৯।

। **মন্দির শিল্প** । রাঢ় বাংলায় মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব একটি স্থাপত্য শৈলী প্রাচীন কাল থেকে প্রকাশ পেলেও রাঢ় দেশ সংলগ্ন অন্যান্য প্রদেশের প্রচলিত মন্দির নির্মাণ পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে কোথাও কোথাও।

ভারতীয় দেবালয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি শৈলী প্রচলিত রয়েছে। 'নাগর', 'বেসর' ও 'দ্রাবিড়'। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে মন্দির স্থাপত্য রীতিটি দীর্ঘ সময়ের অনুশীলনের ফলে বিকশিত হয়েছে, তারই নাম 'নাগর' শৈলী। আবার কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণভাগে অনুশীলিত রীতিটির নাম 'দ্রাবিড়' শৈলী। এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশে প্রচলিত দেবালয় স্থাপত্য রীতিটিকে 'বেসর' শৈলী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য এই 'বেসর' শৈলী কোনো স্বতন্ত্র রীতি নয়। বিশেষজ্ঞের মতে এটি নাগর ও দ্রাবিড়ের মিশ্ররূপ মাত্র।

রাঢ় অঞ্চলে তার নিজস্ব 'বাংলা মন্দির' পদ্ধতিটি ছাড়াও উত্তর ভারতের 'নাগর' শৈলী কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু অতি দূরত্বের কারণে 'বেসর' বা 'দ্রাবিড়' শৈলীর প্রভাব একেবারেই নেই। উত্তর ভারতের দেবালয় স্থাপত্যের অন্যতম সর্ব প্রাচীন নিদর্শন বুদ্ধ গয়ার মন্দির নির্মাণ রীতি, একদা রাঢ় বাংলার মন্দির স্থাপত্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করলেও ক্ষণস্থায়ী উপকরণের জন্য তার আর বর্তমানে কোনো চিহ্নই নেই। তবে বুদ্ধগয়ার অনুসরণে 'নাগর' শৈলীর প্রাচীন রূপের কোনো নিদর্শন রাঢ় দেশে না থাকলেও বাংলার নিজস্ব শৈলী 'রত্ন মন্দিরের' ক্ষেত্রে, মন্দিরের প্রথম তলের শীর্ষদেশে মূল শিখরটিকে ঘিরে তার চতুর্স্পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার চারটি চূড়া বা শিখর স্থাপনের ক্ষেত্রে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের দৃষ্টান্তটি কার্যকর হতে পারে।

রাঢ় বাংলায় আধুনিক কাল পর্যন্ত টিকে থাকা কোনো মন্দিরে বুদ্ধগয়ার বিশেষ প্রভাব দেখা না গেলেও, পরবর্তী কালের উত্তর ভারতীয় 'নাগর' রীতিটি যে বাঁকুড়ার মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একসময় সাগ্রহে গৃহীত হয়েছিল তার বাস্তব নিদর্শন এখনও যথেষ্ট সংখ্যায় বর্তমান। এই 'নাগর' শৈলীটি কোনো নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় স্থাপত্য রীতি নয় বলেই অঞ্চল ভেদে এর প্রয়োগেরও তারতম্য ঘটেছে।

মন্দির গাত্রে তিনটি উদ্গত অংশের (ত্রিরথ) বিন্যাস ও 'বাঢ়' অংশটির তিনটি পৃথক অঙ্গে বিভক্তি—এই 'ত্রিরথ ত্রিয়ঙ্গ বাঢ়' রীতিই ছিল প্রাথমিক মূল 'নাগর' শৈলীর নির্ণায়ক। পশ্চিম ভারতে এই রীতির পরিবর্তন ঘটে 'পঞ্চরথ ত্রিয়ঙ্গ বাঢ়' রূপ লাভ করে।

উত্তর ভারতের সনাতন 'নাগর' শৈলী যেমন একদিকে রাঢ়ের মন্দির স্থাপত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি অব্যবহিত সংলগ্নতার জন্য উড়িষ্যার আঞ্চলিক রীতিটিও রাঢ়ের দেবালয় নির্মাণ কলাকে কিছুমাত্র কম প্রভাবিত করে নি। উড়িষ্যার সঙ্গে রাঢ় বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দীর্ঘ কালের। এই কৃষ্টিগত আদান প্রদানের ফলে উড়িষ্যার আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্য রীতিটি রাঢ় দেশে সহজেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

দেবালয়ের যে আকৃতি 'নাগর' শৈলীতে সবচেয়ে বেশি অনুসৃত হয়েছে, তা

'শিখর-দেউল', 'রেখ-দেউল' ইত্যাদি নামে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত। রেখদেউল নামটির ব্যবহার প্রধানত উড়িষ্যায়।

পণ্ডিতদের মতে রাঢ় বাংলায় চার প্রকার রীতিতে মন্দির নির্মিত হতো। (১) ভদ্র বা পীঢ়া দেউল, (২) শিখর বা রেখ দেউল (৩) স্তূপশীর্ষ পীঢ়া দেউল, এবং (৪) শিখর শীর্ষ পীঢ়া দেউল। এদের মধ্যে প্রথম দুটি স্থাপত্য রীতি র কোনো নিদর্শন বর্তমানে রাঢ় বাংলার কোথাও নেই।

পীঢ়া দেউল রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ক্রমশ সরু আকৃতিতে ওপরের দিকে উঠে সর্বোচ্চ ও ক্ষুদ্রতম স্তরের ওপরে আমলক এবং চূড়া সংস্থাপনই সাধারণ নিয়ম। বিশুদ্ধ পীঢ়া দেউলের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে রাঢ়ে না থাকলেও, অন্য একদিক দিয়ে পীঢ়া দেউলের প্রভাব শিখরযুক্ত অধিকাংশ বাংলা মন্দিরের ওপর পড়েছে। ছাদের ক্রম-হ্রস্বমান কার্নিসগুলিকে সুকৌশলে বিন্যস্ত করে আলোছায়ার সমন্বয়ে অনেকগুলি সমান্তরাল রেখার সৃষ্টি করা হয়েছে। একের পর এক বহু কার্নিসের বিন্যাসে আলো-ছায়ার পর্যায়ক্রমিক সমান্তরাল রেখার সাহায্যে যে রূপসৃষ্টি হয়, বাঙালি স্থপতিরা তার বহুল ব্যবহার করেছেন তাঁদের নির্মিত 'চারচালা একচূড়' ও 'রত্ন মন্দির'গুলির শিখরে। রত্ন মন্দিরগুলির চূড়ায় উচ্চাবচ কার্নিসের ব্যবহারে সেকালের বাঙালি স্থপতিরা ছায়া-লোক, রেখার অতি মনোহর নক্সা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাঢ় বাংলার অগণিত চারচালা একচূড় ও রত্ন মন্দিরে অনুসৃত এই একই অলংকরণ পদ্ধতি যে উড়িষ্যার পীঢ়া দেউল শৈলীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

বহিরাগত এই 'নাগর' শৈলী ছাড়া বাঙালি স্থপতির মনীষা সম্পূর্ণ অন্য এক মন্দির নির্মাণ শৈলীর প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিল। বাংলার এই নিজস্ব রীতিটিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) বাংলা মন্দির, (২) চালা মন্দির ও (৩) রত্ন বা বহু শিখর যুক্ত মন্দির।

মন্দির স্থাপত্যের একেবারে প্রাথমিক যুগে, পাথর এমন কি ইটের ব্যবহারও যখন অপ্রচলিত ছিল, তখন সেই সেকালের দেবালয়গুলি যে চালাঘরের আদর্শে কাঠ-খড়-বাঁশ-মাটির উপকরণে নির্মিত হতো, তার প্রমাণ স্থপতিদের এদেশে আজও সূত্রধর বলা হয়। এবং ইটের ব্যবহারের যখন থেকে শুরু হয়, তখন মন্দিরগুলি প্রথম বাংলার কুঁড়ে ঘরের সর্বাপেক্ষা সরল রূপ, দো-চালার অনুকরণে যে নির্মিত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এঁরা একাধারে কাঠ, পাথর, মাটি ও চিত্র—এই চার রকমের মাধ্যমেই কাজ করতেন। এই দো-চালা কুঁড়ে ঘরের হুবহু অনুকৃতি রয়েছে বীরভূমের মূলুক গ্রামের রামকানাই প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরটিতে, হুগলী জেলার চন্দন-নগরের নন্দদুলালের মন্দিরে এবং বর্ধমান জেলার কাঁইতি-শ্রীরামপুরের কবি রূপরামের স্মৃতি বিজড়িত শিব মন্দিরটিতে।

স্থাপত্যের ভাষায় এই সরলতম দেবায়তনগুলির নাম 'এক-বাংলা' মন্দির। 'দুই-বাংলা' বা 'জোড়-বাংলা' নামের অন্য একটি উন্নত রীতিও পরে অনুসৃত হয়। দো-চালা কুঁড়ে ঘরের সঙ্গে হুবহু মিলই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'এক-বাংলা' মন্দিরকেই আরও দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলবার প্রয়াসেই হয়তো 'জোড়-বাংলা' মন্দিরের পরিকল্পনা হয়েছিল পরবর্তী কালে। প্রথম দিকের সব জোড়-বাংলা মন্দিরগুলি কেবলমাত্র দুটি এক-বাংলা মন্দিরের একত্র সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই বৈশিষ্ট্য ছিল না। পরে শীর্ষদেশে একটি চূড়া স্থাপন করে চালা দুটিকে একত্র গ্রথিত করে দেওয়া হতে লাগলো। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত জোড়-বাংলা মন্দিরটি এর নিদর্শন।

এই দো-চালা বা জোড়-বাংলা ছাড়া বাংলার নিজস্ব রীতির চারচালা, আটচালা বা রত্ন মন্দিরের স্থাপত্য বাংলার বাইরে তেমন জনপ্রিয় হয় নি।

রাঢ়ে সেকালে যতো বিভিন্ন রকম আকারের বাঁশ-কাঠ-খড়ের চালা নির্মিত হতো, মন্দির শিল্পীরা তার সব কটিকেই অনুসরণ করে ভিন্ন ভিন্ন শৈলীর পত্তন করেছিলেন।

দো-চালা মন্দিরের অস্থায়িত্বের কথা ভেবেই হয়তো পরে চূড়াবিহীন ও চূড়াযুক্ত জোড়-বাংলা মন্দির এবং চারচালা ও আটচালা মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কুঁড়ে ঘরের অনুকৃতিতে গর্ভগৃহের চার দেওয়ালের ওপরে চারটি ত্রিকোণ চালা এক শীর্ষ-বিন্দু থেকে চতুর্দিকে প্রলম্বিত করা এবং বাঁকানো কার্নিসযুক্ত চারটি চালার কেন্দ্র-স্থলে একটি চূড়া স্থাপন করাই এই 'চারচালা' মন্দিরগুলির বিশেষত্ব। আবার 'চারচালা' মন্দিরেরই একটি পরিবর্ধিত এবং পরবর্তী রূপ হলো 'আটচালা' মন্দির। মাঝখানে কিছু ব্যবধান রেখে নীচের চারচালার ওপরে আর একটি চারচালা স্থাপন করাই এ ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল। এই চারচালা এবং আটচালা উভয় রীতির শিব মন্দিরই বাংলায় অনেক আছে।

চারচালা একচূড় বাংলা মন্দিরের শীর্ষদেশের চূড়ার চারপাশের জায়গা অনলংকৃত ফাঁকা ফাঁকা দেখাতো বলেই হয়তো পরবর্তী কালে ঐ অংশগুলি ভরাট করার পরিকল্পনায় 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের উদ্ভব। এই শ্রেণীর মন্দিরের কোণের শিখরগুলির আয়তন কেন্দ্রীয় চূড়াটির থেকে অল্প ছোটো হয় এবং প্রান্তবর্তী শিখরগুলি মন্দিরের বিভিন্ন তলের ছাদের কোণায় এমনভাবে স্থাপিত হবে যে, তাদের দুটি দেওয়াল যেন মন্দিরের সেই কোণ উৎপাদনকারী দুটি দেওয়ালের সমান্তরাল হয়। এইভাবে দ্বিতল বিশিষ্ট 'নবরত্ন', ত্রিতল বিশিষ্ট 'ত্রয়োদশ রত্ন' মন্দির প্রস্তুত হয়।

রাঢ়ে প্রচলিত রত্ন মন্দিরগুলি পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশ রত্ন বা বহুরত্ন ইত্যাদি নানা প্রকারের হতে দেখা যায়। এই রত্ন মন্দিরগুলির চূড়ায়, উত্তর ভারতের, বিশেষ করে, উড়িষ্যার 'নাগর' শৈলীর 'পীঢ়া-দেউল' ও 'রেখ-দেউলে'র বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমান জেলার দিগনগর গ্রামের তাঁতি পাড়ায় এরকম একটি নবরত্ন মন্দির বর্তমান রয়েছে, সতেরো শতকের কবি রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে যার বিস্তৃত বর্ণনা মেলে। এছাড়াও আলোচ্য সতেরো শতকের রাঢ় বাংলায় বিশুদ্ধ পীঢ়া-দেউল এবং রেখ-দেউলও নির্মিত হয়েছিল। সে সব ক্ষেত্রে মন্দিরের গঠন-রীতি, দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতা ইত্যাদির পরিমাণ ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

মন্দির-গাত্র অলংকরণের প্রসঙ্গে টেরাকোটার কাজের কথাও আগেই বলা হয়েছে।

টেরাকোটা শিল্প যে তখন কতো উন্নত ধরনের হতো, তা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে অলংকৃত টেরাকোটায় পৌরাণিক নানা কাহিনীর চিত্র, রামায়ণ, মহাভারতের অংশবিশেষ, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক চিত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদির নিখুঁত বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ষোড়শ শতাব্দী এবং বিশেষ করে, সপ্তদশ শতাব্দীতেই বিষ্ণুপুরের রাজসভার পোষকতায় এই শিল্পের ব্যাপক প্রচলন হয়। এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ইত্যাদি রাঢের বিভিন্ন স্থানে, ছোটো ছোটো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কাদায় ছাপ দিয়ে আঁকা পোড়ামাটির ইট দিয়ে, তাদের বহির্ভিত্তি-চিত্রণ সপ্তদশ শতাব্দীতেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল।[১]

॥ বাণিজ্য ॥

রাঢ-দেশের ভূমি জাত ও শিল্প-জাত যে সব দ্রব্যের খবর পাওয়া গেল, সে সবই ছিল তৎকালীন ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপকরণ। ফল-মূল, শাক-সব্‌জি বা মৎস্যাদি স্থানীয়-উৎপন্ন ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সকলকে কেন্দ্র করে ক্রয়-বিক্রয়, এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামের হাটে হাটে অবশ্যই চলতো, এগুলিকে কেন্দ্র করে ছোটো-খাটো ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালিত হলেও ভূমিজাত ও শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়ই বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ রাঢের অভ্যন্তরে ও পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলিতে যে রপ্তানি হতো, সমকালীন সাহিত্যের বর্ণনা থেকেই সে বিষয়ে জানা যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল', বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল' ইত্যাদি কাব্যে লেখা আছে, বাঙালি বণিকেরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে যেতেন এবং যে সব দেশে যেতেন সেখানে নারিকেলের বদলে শঙ্খ[২], পাট-শনের পরিবর্তে ধবল-চামর[২], চিনির বদলে কর্পূর[৩], পাটীর বদলে কম্বল[৪], বিড়ঙ্গ বা কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত একপ্রকার ফলের পরিবর্তে লবঙ্গ[৫], সুঁটের বদলে লঙ্কা[৬], সিন্দুরের বদলে হিঙ্গুল[৭], জোয়ানের

—

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম। অ. পৃ ৬।
২. ক ক চ পৃ ২০৪ বি. ম পৃ. ৭১।
৩. বি. ম. পৃ. ৭১।
৪ ক ক চ পৃ. ২০৫। বি. ম. পৃ ৭১।
৫. ঐ পৃ ২০৪, ঐ ঐ
৬ ঐ ঐ, ঐ. ঐ।
৭. ঐ পৃ ২০৫, ঐ. ঐ.।

বদলে জিরে[১], লবণের পরিবর্তে সৈন্ধব[১], ভেড়ার বদলে ঘোড়া[১], হরিণের বদলে হাতি[২] ইত্যাদি দ্রব্য বিনিময় করতেন। যদিও এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে।

গুয়া বা গুবাক যে ভাবে সুপারি নাম নিয়েছে, তার ইতিহাসের মধ্যে রাঢ়ের এই দ্রব্যটির বহির্বাণিজ্যের ইতিহাসও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।[৩] আমাদের আলোচ্য সময়ে সুপারির ব্যবসায় খুব প্রশস্ত ছিল এবং এর মাধ্যমে দেশে প্রচুর অর্থাগমও হতো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুপারি এ দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল।[৪] লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যায়। এখানকার লবণ ছিল সামুদ্রিক লবণ। বাঙালি বণিকেরা এই লবণের পরিবর্তে পাথুরে লবণ বা সৈন্ধব লবণ নিয়ে আসতেন। আমাদের আলোচ্য সময়ের কবি বিষ্ণুপাল ও মুকুন্দরাম এর উল্লেখ করেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই লবণের ব্যবসায় নিয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে এই ব্যবসায়ে যে প্রচুর লাভ হতো, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এ-ছাড়া, পান, নারকেল, তেজপাতা ও পিপ্পলির ব্যবসায়েও প্রচুর লাভ হতো। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে পর্তুগীজ বণিকেরা এ দেশে প্রথম তামাকের আমদানি করে। ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে আমরা প্রথম বিনিময় দ্রব্যের মধ্যে এই তামাকের উল্লেখ পাই।

আর বেটা চিবাইল তামাকের পাতা।
লাল গিলি নেশা লাগি ঘুরি গেল মাথা ॥[৫]

এর আগে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসাবিজয়'-কাব্যের কোনো কোনো আধুনিক পুঁথিতে তামাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তা পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত বলেই ধরে নেওয়া যায়।

তখনকার দিনে কোন্ দ্রব্যের কি রকম বাণিজ্য-মূল্য ছিল, এই সব বর্ণনা থেকে তা জানতে পারা যায় না। তবে, আমাদের আলোচ্য সময়ের কাব্যে বর্ণিত বিনিময়-বাণিজ্যে যথেষ্ট অতিরঞ্জন থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাঢ়ের অর্থোপার্জনের

১. ক. ক. চ. পৃ. ২০৫, বি. ম. পৃ. ৭১।
২. ঐ পৃ. ২০৪।
৩. বর্তমান গৌহাটি শহরের নাম হয়েছে গুয়া থেকে। গুবাক ক্রয়-বিক্রয়ের হাট (গুবাহাটি—গুয়াহাটি—গৌহাটি)। এই গুবাক প্রাচীন কালে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হতো। ঐ দেশীয় বণিকগণ জাহাজে গুবাক বোঝাই করতেন বাংলা দেশের কোনো বন্দর থেকে নয়, পশ্চিম ভারতের বন্দর শূর্পারক থেকে। তাঁরা একে (শূর্পারক—সুপ্পারক—সোপারা) সোপারার ফল বলেই জানতেন। পরবর্তী কালে এই গুবাক সহজেই সুপারী নামে ভারতের সর্বত্র পরিচিত হয়।
—বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ১৮৫ দ্রঃ।
৪. ঐ. ঐ.
৫. ক্ষে. ম. পৃ. ৪৫৮।

অন্যতম প্রধান উপায় ছিল বাণিজ্য। এই সব বাণিজ্যে রাঢ়ে যে অর্থাগম হতো, তাতে মুদ্রা লাভ হতো, না তা বিনিময় দ্রব্যাদিতে রূপান্তর লাভ করতো, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের ঐতিহাসিক প্লিনির বর্ণনানুযায়ী বিদেশী বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মুদ্রাই নিয়ে আসতেন।[১] এবং সে মুদ্রা ছিল দিনার (Dinarius) বা স্বর্ণমুদ্রা ও দ্রম্ম (Drachm) বা রৌপ্যমুদ্রা। খৃষ্টীয় শতকের পূর্ব থেকে প্রচলিত সমৃদ্ধ মুদ্রা-প্রচলন থেকেও মনে হয়, বিনিময় বাণিজ্য সাধারণ নিয়ম ছিল না। অন্য দিকে, আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কাব্যে এই বিনিময় প্রথারই সর্বত্র উল্লেখ পাওয়াতে মনে হয়, এই বর্ণনা কতকটা প্রাচীন রীতিরই জের। কারণ ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে আসার আগে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিনিময় প্রথাই প্রচলিত ছিল। মুদ্রা ছিল অত্যন্ত অল্প এবং তা সাধারণভাবে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল না। সুতরাং প্রাদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই কোনো রকমে কাজ চলতো। কিন্তু বিদেশী বণিকেরা যে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য অপেক্ষা মুদ্রাই অধিকতর পছন্দ করতেন, তা সহজেই বোঝা যায়। এইভাবে ধীরে ধীরে দ্রব্যের পরিবর্তে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার প্রচলন ব্যাপকতর হয়। ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য, দেশে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্যের আমদানী করে এবং দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমের যোগান দিয়ে, এদেশীয় বণিকদের অন্যদেশে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা দিয়েছে।[২] এইভাবে রৌপ্যের প্রচলনে টাকার মূল্য এবং চলন সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই বাড়তে থাকে।

আমাদের আলোচ্য শতকের সাহিত্যিক উল্লেখ থেকে এদেশের আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পর্যটকগণের বর্ণনা থেকে এদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি সাধারণ বিবরণও পাওয়া যায়। বার্ণিয়ারের বর্ণনা[৩] অনুযায়ী এদেশের ধান আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়ে, নিকট ও দূরবর্তী দেশ-সমূহে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হতো ; এবং সমুদ্রপথে মসলিপত্তন, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও অন্যান্য বন্দরে চালান হতো। প্রচুর পরিমাণে আখ জন্মানোর জন্যে বাংলার চিনি গোলকুণ্ডা, কর্ণাট, আরব, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হতো। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রতিবছর ৫০,০০০ মণ চিনি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হতো।[৪] এদেশে উৎপাদিত গম থেকে সমুদ্রগামী ইউরোপীয় নাবিকদের জন্যে একপ্রকার সস্তার বিস্কুট প্রস্তুত হতো।[৫] সুতো ও রেশমের কথা আগেই বলা হয়েছে। এদেশের এই দুটি শিল্পজাত দ্রব্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ও তার প্রতিবেশী দেশগুলিতে নয়, সুদূর ইউরোপ ও জাপানেও

১. বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ১৮৬, ১২৮।
২. H. O. B. V. 2, P. 218.
৩. Travels in the Mogul Empire, P. 437-40.
৪. বা. দে. ই. ২য়, পৃ. ২১৯।
৫. Travels in the Mogul Empire, P. 438.

এদেশের বস্ত্র রপ্তানি হতো।[১] এদেশীয় বস্ত্র দুই বিঘৎ লম্বা একখণ্ড সাধারণ বাঁশের চোঙার মধ্যে ভরে নিয়ে খোরাশান, পারস্য, তুর্কী এবং অন্যান্য স্থানে নিয়ে যেতো বলে বিদেশী ভ্রমণকারী সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক বর্ণনা করেছেন।[২] ম্যানরিক সতেরো শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রাঢ়ে এসেছিলেন। বস্তুতঃ বাংলার বহির্বাণিজ্যকে এদেশীয় সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বস্ত্র সম্ভারই বাঁচিয়ে রেখেছিল। তবে, রাঢ়ে এই জাতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হতো কিনা অথবা হলে কি পরিমাণে হতো, সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। মোটামুটি যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তার থেকে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে এবং পূর্ববঙ্গেই সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রধানতঃ তৈরি হতো। মোমবাতি, মৃগনাভি, ঘি, মাখন, লঙ্কা, গালা, আফিম, নানারকম মসলা, পান, লবণ ইত্যাদিও বাংলা থেকে জল ও স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলিতে এবং সমুদ্রপথে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চালান যেতো।[৩] বর্তমান কালের বাংলার একটি সুপরিচিত রপ্তানী-দ্রব্য পাট, সতেরো শতকের শেষভাগেই প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত হয়। নীলের রপ্তানী আরম্ভ হয়েছিল আরও পরে, আঠারো শতকের শেষের দিকে। সতেরো শতকের কোনো কোনো বাংলা কাব্যে দাসদাসী কেনা-বেচার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] রাঢ়ের হুগলী অঞ্চলে পর্তুগীজদের যে বাণিজ্যের ঘাঁটি ছিল, সেখানে তারা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর একটি বড়ো বাজার খুলেছিল। বহু দাস-দাসী সেখানে কেনাবেচা হতো। শাহ্‌জাহান তাঁর প্রজাদের প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করায় অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তিনি কাশীম খাঁকে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। কাশীম খাঁ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হুগলী জয় করেন। এই অভিযানের ফলে বহু পর্তুগীজ নিহত হয় ও অন্যান্যদের বন্দী করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয় (১৬৩২ খ্রীঃ)। এর ফলে রাঢ়, তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পর্তুগীজরা একেবারে উচ্ছেদ হয়ে যায়।[৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের আলোচ্য সময়ে বাংলা তথা রাঢ়ের বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বিভিন্ন বিদেশী ভ্রমণকারীর বিবরণ থেকে এ দেশের তৎকালীন ব্যবসায়-বাণিজ্যের যেমন খবর পাওয়া যায়, তেমনি সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বন্দরগুলিরও বর্ণনা পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩ খ্রীঃ) সপ্তগ্রামকে খুব সমৃদ্ধ বন্দর হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৬] তিনি বেতড় বন্দরেরও উল্লেখ করেছেন। নদী অল্প গভীর ও জল কম বলে তখন বেতড় বন্দরে জাহাজ যেতো না। প্রতি বছর

১. Travels in the Mogul Empire, P. 439.
২. History of Bengal (Mugal period), P. 479.
৩. Travels in the Mogul Empire, P. 410.
৪. 'খাট পালঙ্ক কেনে দাস-দাসী'। ক. ক. চ. পৃ. ২৯৯।
৫. H. O. B. V. 2, P. 321-23.
৬. বা. দে. ই. ২য়. পৃ. ২২৩।

এই বেতড় বন্দরকে কেন্দ্র করে একটি সাময়িক গ্রাম প্রস্তুত হতো। যতদিন বেতড়ে জাহাজ থাকতো, সেখানে কেনাবেচা চলতো। জাহাজ চলে গেলে বণিকেরাও অস্থায়ী ঘরগুলি পুড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যেতেন। তবে ছোটো জাহাজ অনেক সময়ে বেতড় থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত গিয়ে মাল বোঝাই করতে পারতো। এ ছাড়া, সপ্তগ্রাম বন্দরে প্রতি বছর ৩০।৩৫ খানি জাহাজে চাল, চিনি, লাক্ষা, কাপড় ইত্যাদি নানা প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য চালান হতো। সেখানে প্রতিদিন হাট বসতো। বণিকেরা নৌকো করে এসে সস্তায় বেচাকেনা করতেন।

রাল্‌ফ ফিচ[১] (১৫৮৩ খ্রীঃ) সপ্তগ্রাম বন্দরের উল্লেখ করেছেন। তিনি হুগলী, সপ্তগ্রাম ও হিজলী বন্দরের কথা বলেছেন। সতেরো শতকে হ্যামিলটন[২] (১৬৮৮-১৭২৩ খ্রীঃ) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন। এই শতকের শেষ-দিক (১৬৯০ খ্রীঃ) থেকে হুগলা নদীর তীরে কোলকাতা নগরীর উন্নতি আরম্ভ হয় এবং শতকের শেষ দশকে ইংরেজরা কোলকাতায় কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করার পরে কোলকাতা নগরী বাণিজ্যিক গুরুত্ব লাভ করে। উন্নতির প্রথম ধাপে কোলকাতা দেশের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের শহরে বাজার ছিল। এবং ধীরে ধীরে এই বন্দরটি ইংরেজদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সেকালে চৌম্বক দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন না হওয়ায়, সূর্য ও গ্রহ-তারা ইত্যাদির সাহায্যে দিক নির্ণয় করা হতো। যে সব নাবিক রাত্রিকালে সমুদ্র পথে দিক নির্ণয়ের কাজে দক্ষ হতেন, তাঁদের বলা হতো 'তারাবিদ্‌' ও 'দিশারু'।[৩] এ ছাড়া 'পবনবেত্তা'[৪] বা যাঁরা বায়ুর গতি নির্ণয়ে দক্ষ ছিলেন, 'বাহক', 'কর্ণধার'[৫] বা প্রধান নাবিক, 'গাবর'[৫] বা 'নাউড়্যা' অর্থাৎ সাধারণ নাবিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নাবিকের সঙ্গে পাইক,[৬] সূত্রধর, ডুবারী, কর্মকার ইত্যাদিও থাকতেন সমুদ্রগামী বড়ো নৌকোতে।

বাঙালি বণিকের সমুদ্রপথে বাণিজ্য-যাত্রার বর্ণনা সতেরো শতকের অনেক কবিই করেছেন। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বর্ণনাতেও বাংলাদেশ থেকে বিবিধ বাণিজ্য-সম্ভার পারস্য, ইউরোপ প্রভৃতি দূরবর্তী দেশসমূহে যাবার কথা বলা হয়েছে। তবে, এই সমুদ্র-বাণিজ্যে যে বাংলা তথা আমাদের আলোচ্য রাঢ়ের বাঙালি বণিকেরা অংশ গ্রহণ করতেন,—বিদেশী ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় তার স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। মনে হয়, বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বণিকেরাই বাংলার বন্দর থেকে দেশীয় বণিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। তবে, নদীমাতৃক

---

১. বা. দে. ই. ২য়, পৃ. ২২৩।
২. ঐ. ঐ.
৩. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ২৯৫।
৪. মধ্যযুগে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী পৃ. ৪৭।
৫. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ৩২৩, ক্ষে. ম. পৃ. ২০৭।
৬. ঐ. পৃ. ৩২৩; ২৩৭।

দেশের নৌ-শিল্পের প্রচলন ও প্রসার, সেই চর্যাপদের কাল থেকে নদনদী ও নৌকো সংক্রান্ত এতো উপমা রূপকের ছড়াছড়ি এবং সর্বোপরি শতাব্দীর সাহিত্যে বিস্তৃত নৌবাণিজ্যের উল্লেখ থেকে মনে হয়, বহির্দেশীয় সমুদ্র-বাণিজ্য না হলেও আন্তর্দেশীয় নদীপথ-বাণিজ্যে বাঙালি বণিকেরা অংশ গ্রহণ করতেন।

আমাদের আলোচ্য সময়ের 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে সিংহল পাটনে বাণিজ্য-যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। আগেই এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, এই বর্ণনা কতকটা পূর্ব স্মৃতির রোমন্থন জনিত বর্ণনা বলেই মনে হয়। কারণ সপ্তদশ শতকে নানা কারণে সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে উপকূল-বাণিজ্য ভালোভাবে চললেও ব্যাপকভাবে সমুদ্র-বাণিজ্য বলতে যা বোঝায় তা হতো না বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন।[১] যেটুকু ছিল, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে গঙ্গার মোহনা অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে ধনপতি ও শ্রীপতির বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে কবি তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'ফিরিঙ্গির দ্বীপখান বাহে কর্ণধারে
রাত্রে বায়্যা জায় ডিঙ্গা হারমাদের ডরে॥'[২]

সেকালে পর্তুগীজ বণিকেরা ব্যবসায়ের নামে ভারত-মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে ভারতীয়দের বাণিজ্য-জাহাজের ওপরে অনেক সময়ে দস্যুবৃত্তি করবার জন্যে, ক্রমশঃ এদেশের জলপথের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কুল্লুকভট্ট-কৃত মনুসংহিতার টীকায় দেখা যায়, 'সমুদ্রযায়ী', 'বন্দী', 'ভাট' ও 'তেলী'কে মনু পতিত করেছেন। মনু এদের পতিত করুন বা না করুন, অন্ততঃ কুল্লুকভট্টের সময়ে এরা পতিত বলেই যে বিবেচিত হতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে, ষোড়শ শতকের স্মার্ত রঘুনন্দনও সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।[৩] মনে হয়, সমুদ্রযাত্রায় পর্তুগীজদের লুঠপাট এবং সেই সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা প্রবলতর হওয়াতে, জাতি নাশের ভয়ে প্রথমে ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং পরে সকল হিন্দু বাঙালির পক্ষেই এই বাধা নির্দেশিত হয়েছিল।[৪]

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের ধনপতি-উপাখ্যানে, শ্রীমন্তের বাণিজ্যে যাত্রার প্রসঙ্গে সপ্তগ্রাম সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে—

সপ্তগ্রামের বেণে কোথাও না জায়
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥[৫]

হঠাৎ সপ্তগ্রামের বণিকেরা এমন অলস হয়ে পড়লেন কেন? জলপথে পর্তুগীজদের দস্যুতা এর একটি কারণ হলেও, আমাদের মতে, বিদেশী বাণিজ্য-তরীর আগমন

১. মধ্যযুগে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, পৃ. ৪৬
২. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ৩৩৮।
৩. মধ্যযুগে বাঙ্গালা, পৃ. ৩৪৩।
৪. ঐ. ঐ.
৫. ক. ক. চ. (ধ. উ.), পৃ. ৩১৭।

এবং তাদের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করার সুযোগ পাওয়ার জন্যেই রাঢ়ের বণিকেরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে যাবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করতেন না। সুতরাং, সপ্তগ্রামের এবং বৃহৎ অর্থে রাঢ়ের বণিকেরা বিদেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া অপেক্ষা, ঘরে বসে পাইকারবৃত্তি বা ফড়েগিরি করে যা পেতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু, ধনপতি বণিকের মতো দুঃসাহসিক বণিকও তখন রাঢ় অঞ্চলে কিছু কিছু ছিলেন না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তবে, আমাদের আলোচ্য শতকের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের বর্ণনায়, যে বাঙালি বণিকের ডিঙা ভাসিয়ে সমুদ্রে বাণিজ্য-যাত্রা করতে যাওয়ার কথা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই কবি-কল্পনা বলে মনে হয়। বাঙালি কবিরা তাঁদের কাব্যের নায়কদের সিংহলে নিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু, সেখানে যাবার পথের যে বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। সিংহল যেতে গেলে উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন বন্দর ছুঁয়ে যেতে হয়। কিন্তু, ঐ তিন রাজ্যের কোনো স্থানের নামই এই সব কাব্যে উল্লিখিত হয় নি। এ ছাড়া, সিংহল রাজ্যের যে ছবি বাঙালি কবিরা এঁকেছেন, তাতে তাকে বৌদ্ধদের দেশ বলে মনে হয় না। মনে হয় বাঙালি হিন্দু-কর্তৃক অধ্যুষিত একটি রাজ্য। ঐ রাজ্যের রাজকন্যার নামও বাঙালি নাম, সিংহলী নাম নয়। যাই হোক, অনেক আগে যখন বাঙালি বণিকেরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে যেতেন, সেই সময়কার কিছু স্মৃতি হয়তো পুরুষ থেকে পুরুষান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে সতেরো শতকের বাঙালির মনে স্থান লাভ করেছিল। সুতরাং বাঙালির বহির্বাণিজ্যের প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য শতকে রচিত কাব্যের বর্ণনায় অতীত কালের স্মৃতির স্থানই বেশি।

বিচার ব্যবস্থা

কোটাল লইয়া গেলা বধিতে মশানে।
মজাড়ে মরলগুলি সিমুলের কাঠে।
চাপায়ে চোরের কান্ধে চলে দিব্য ঠাটে।
বাজে কাড়া জোড়া সিঙ্গা করতাল কাঁসি
দেখিতে যাইল যত নগর নিবাসী।

সেকালের সমাজ সচেতন কবিদের কাব্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তৎকালীন বিচার ব্যবস্থারও সামান্য খবর পাওয়া যায়। অবশ্য তা এতই অকিঞ্চিতকর যে, তার সঙ্গে বৈদেশিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ঐতিহাসিক সূত্র এবং পূর্বাপর শতাব্দীর সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্যের একীকরণ করলে তবেই তা থেকে আলোচ্য সময়ের রাঢ় অঞ্চলের বিচার ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট ধারণা হতে পারে।

॥ শাসন-ব্যবস্থা ও বিভাগ ॥ মুঘল আমলে সাধারণ প্রশাসক ও বিচারকের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট ছিল না। বিভিন্ন পদাধিকারী মুঘল শাসনকর্তাগণ সকলেই নিজের নিজের সীমার মধ্যে প্রয়োজনে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এজন্যে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার আগে তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শাসন ও বিচার যন্ত্রের চূড়ায় বসে থাকতেন দিল্লীশ্বরোবা-জগদীশ্বরোবা-বাদশাহ স্বয়ং। তাঁর ফরমান নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে সুবা বা প্রদেশ শাসন করতেন 'সুবাদার'। সুবার রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন 'দিওয়ান'। সুবার অন্তর্গত 'সরকার'-এর প্রধান শাসনকর্তা হলেন 'ফৌজদার'। আরক্ষ সংক্রান্ত কাজের জন্যে ছিলেন 'কোতোয়াল'। 'সরকার'-এর 'ফৌজদারে'র মতোই ছিলেন সরকার অন্তর্গত 'পরগণা'-র 'শিকদার'।

॥ বিচারক বা দণ্ডদাতা ॥ শিকদার, ফৌজদার, সুবাদার সকলেই নিজের নিজের শাসন সীমায় এবং প্রয়োজনে বাদশাহ স্বয়ং প্রধান বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করলেও, নির্দিষ্ট বিচার ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যের মুখ্য বা প্রধান কাজী কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে প্রাদেশিক কাজীরা স্থানে স্থানে বিচারের জন্যে নিযুক্ত ছিলেন; এবং তাঁরা ঐস্লামিক বিধান অনুসারে বিচার করতেন।[১] কাজীরা প্রধানতঃ ধর্মীয় অপরাধের বিচার করতেন। তবে প্রয়োজনে অনেক সময়েই তাঁরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্র-

১. Mughal Administration, P. 73.

ন্যায়ের দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগেরও বিচার করতেন।[১] রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচারের এবং জমির স্বত্ব ইত্যাদি নির্ধারণের জন্যে ছিলেন 'আমিন'। এ সম্পর্কে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন 'কানুনগো'। এছাড়া গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত 'সমিতি' বা 'পঞ্চায়েৎ' বা 'গ্রাম ষোল আনা', স্থানীয় বিবাদ-বিসম্বাদ ও সমাজ বিরুদ্ধ কর্মজাত অপরাধের বিচার করতো। সমাজে চলিত ও স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত আচরণের ওপর ভিত্তি করে পঞ্চায়েতী বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সব কেন্দ্র-অনুমোদিত সাধারণ আইনগত বিচার-ব্যবস্থা ছাড়াও হিন্দু জনসাধারণের শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্মজাত পাপের দণ্ডদাতা ছিলেন সমাজের ব্যবস্থাপক গুরু, পুরোহিত ও ভট্টাচার্য সম্প্রদায়।

সতেরো শতকের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ও চরিতগ্রন্থে আমরা দণ্ডদাতা হিসাবে কাজীর উল্লেখ পাই। সে সময় এই কাজীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। ষোড়শ শতকের কবি বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে'[২] যবন হরিদাসের মুসলমান হয়ে হিন্দু-য়ানির বিচারের প্রসঙ্গে দেখা যায়, স্বয়ং 'মুলুকপতি' সেখানে উপস্থিত ও গুরুতর শাস্তি-দানে অনিচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত কাজীর বিচারে হরিদাসের প্রতি 'বাইশ-বাজারে' নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাতের আদেশ হলো। সতেরো শতকেও কাজীদের প্রতিপত্তি যে একই রকম ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্য থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য ছাড়া ইতিহাস প্রমাণেও দেখা যায় যে, এই ধরনের ধর্মীয় অপরাধের ক্ষেত্রে কাজীর সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘ রাজত্বের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে ছোটো বড়ো সব বিষয়ে তিনি কাজীদের এতো কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন যে, তা বড়ো বড়ো আমীর এবং মন্ত্রীদেরও ঈর্ষার বিষয় হয়েছিল।[৩] এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়—'একজন ফকির চুনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চাওয়ায়, তিনি বিরক্ত হয়ে তাকে বাড়ী থেকে বার করে দেন। ফকির তখন কতকগুলি ইঁট কুড়িয়ে এনে বৃন্দাবনের যাতায়াতের পথের ধারে সাজালো। তার নাম দিল মসজিদ। যখনই বৃন্দাবন এই পথে চলতেন, ফকীর উচ্চৈঃস্বরে আজান পড়তো। বৃন্দাবন বিরক্ত হয়ে একদিন ইঁটগুলো ফেলে দিয়ে ফকীরকে গালি-গালাজ করে তাড়িয়ে দিলেন। ফকীর গিয়ে মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে নালিশ করলো। বিচারক কাজী 'আলেম'দের সঙ্গে আলোচনা করে বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ এই হত্যায় অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাঁর, এমন কি সুবাদার শাহজাদা আজীমুস্সানের অনুরোধ পর্যন্ত বাদশাহ গ্রাহ্য করলেন না। বাদশাহ শাহজাদার পত্রের উত্তরে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন—"কাজী শরফ্ খোদাকি তরফ্।"[৪]

১. Mughal Administration, P. 71.
২. চৈ. ভা. (আ), পৃ. ১১৮-১২২।
৩. যদুনাথ সরকার কর্তৃক 'সীতারাম'-এর ভূমিকা, পৃ. ৬২।
৪. ঐ. ঐ. পৃ. ১২-১৩।

বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত ১১৬৬ বঙ্গাব্দের মাঘের বর্ধমান অঞ্চলের 'মোকাম পানা-গড়ের' একটি পত্রে, বিবাদে কাজীর বিচার-বাবদে বিভিন্ন খরচের হিসাব পাওয়া যায়।[১] পত্রে দেখা যায়—"বর্ধমানে কাজীর পেয়াদা খরচ মাহ কার্তিক অবধি মাঘ সন্ধা ইস্তকে এক টঙ্কা'—এবং 'মাউড়ি কাজিকে দং গুরু গৌর্চ্চরন সিংহ সলাৎ চারি টঙ্কা'—'কাজির পেয়াদার জন্যে গুরু গোবিন্দ মণ্ডলকে সিক্যা-৫', 'বিচারে পেয়াদা খরচ এক টঙ্কা'—'পেআদা খরচ জয়ে ভজ্জিত সিক্যা এক"—ইত্যাদি কোন্ তারিখে কতো খরচ হয়েছিল তার বিস্তৃত হিসেব রয়েছে। বিবাদ-বিসম্বাদে কাজীর দ্বারস্থ হলে কি ধরনের খরচের দায়ে পড়তে হতো তার একটি বাস্তব প্রতিলিপি এই পত্রখানি থেকে পাওয়া যায়। এই কারণেই ঈষৎ পরবর্তী কালের হলেও শতাব্দ-বাহিত সমাজ-দর্পণ হিসেবে এটির অংশ বিশেষ উল্লিখিত হলো।

সমসাময়িক সাহিত্যে পঞ্চায়েতী বিচার ব্যবস্থার বিশেষ কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে, পূর্ব-প্রতিশ্রুত ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্রাহ্মণের বিচার করতে গ্রামের লোকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং অবশেষে সমস্যার সমাধান করার খবর পাওয়া যায়, 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-গ্রন্থে।[২] এ যেন অনেকটা 'গ্রাম ষোল আনা'র ব্যবস্থাই মনে হয়।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের ধনপতি পাখ্যান অংশে বর্ণ-পঞ্চায়েতী (caste-court) বিচার ব্যবস্থার খবর পাওয়া যায়। ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত জ্ঞাতিকুটুম্বরা খুল্লনার সতীত্বের প্রশ্নে সংশয় নিরসনের জন্য পরীক্ষা চায়, বিকল্পে, অর্থ-দণ্ড কামনা করে।

'পরিক্ষা করিতে যদি করিবেক শঙ্কা।
নহিলে ইহার দণ্ড এক লক্ষ তঙ্কা॥'[৩]

এর উত্তরে ধনপতি সদাগর রাজার দোহাই দিলে, তারা ধনপতির জাতিপাত ঘটাবার এবং তার জন্যে প্রয়োজন হলে রাজার কাছে গিয়ে 'উচিত-বিচার' প্রার্থনা করবার ভয় দেখায়।

'ধন লয় নৃপবর প্রাণ লয় যমবর
জাতি লয়, দেয় বন্ধু জন।
মেলিয়া সকল ভাই যাইব রাজার ঠাঁই
রাজা করে উচিত বিচার॥'[৪]

১. বি. ভা. প. সং. ২১৭৭।
২. চৈ. চ. (ম), পৃ. ১১৬-১৯।
৩. ক. ক. চ. (ধ. উ.), পৃ. ১৭৫।
৪. ঐ. পৃ. ১৭৬।

শেষ পর্যন্ত সেখানে দেখা যায়, বর্ণ-পঞ্চায়েতের কথা মেনে খুল্লনাকে পরীক্ষা দিতে হয়। এছাড়া, হিন্দু জনসাধারণের শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্মজাত পাপের বিচারে ব্যবস্থাপক গুরু-পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ-ভট্টাচার্য সম্প্রদায়ের বিধান দানের খবরও পাওয়া যায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে।

'সাধু ধনপতি দত্ত আনিয়া পণ্ডিত মত
সবারে বৈসায় দিব্যাসনে।
হয়্যা সবে এক বুদ্ধি বিচারে পরীক্ষা শুদ্ধি।'[১]

কিছু পরবর্তী কালের চিঠিপত্রেও এই সব গুরু-পুরোহিতের প্রতাপ শতাব্দক্রমে শুধু অব্যাহত দেখা যায় না, তা যেন ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

॥ অপরাধ ও দণ্ডবিধি ॥ নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ, পতিত বা যবন-সংসর্গ, অবৈধ প্রণয়, নিষিদ্ধ যৌন ব্যভিচার, গো-হত্যা ইত্যাদি শাস্ত্র ও সমাজনিষিদ্ধ অপরাধ এবং সেই সব অপরাধে অপরাধীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করতেন এই সকল স্থানীয় গুরু-পুরোহিত বা পণ্ডিত-ভট্টাচার্য সম্প্রদায়। অপরাধের ক্ষালনের উদ্দেশ্যে পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা প্রার্থনা করে লিখিত নিবেদন হলো হকিকত (বা Plaint), এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্যে সে বিষয়ে ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রদত্ত শাস্ত্র-বিহিত ব্যবস্থা সংবলিত উত্তরের প্রচলিত নাম 'ভাষ'।[২]

গুরুতর পাপীর উদ্ধারের জন্যে স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভাষপত্র নানা জায়গার চতুষ্পাঠীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মণ্ডলীর কাছে পাঠাতেন এবং সে বিষয়ে একমত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ দণ্ড দানের ব্যবস্থা করতেন। স্মার্ত ভট্টাচার্যগণ সাধারণের অবোধ্য শাস্ত্রের ভাষা বা বচন উদ্ধার করে সেগুলি মূল সংস্কৃত ভাষায় লিখে বা ব্যাখ্যা করে এক বা একাধিক স্বাক্ষরে প্রকাশ ও প্রচার করতেন বলে, একে বলা হতো 'ভাষ-চালানো'।[৩] আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে কিছু পরবর্তী কালের একটি ভাষের উল্লেখ করছি। এর মধ্যে দিয়ে তখনকার গ্রাম সমাজটি যেমন ছবির মতো ফুটে উঠবে, তেমনি একটি নিটোল ছোটগল্পের উপাদানও পাওয়া যাবে।

"মহামহিম শ্রীযুক্ত ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীপরীক্ষিৎ শৌ হকীকত সওয়ালবন্ধ পত্রমিদং সন ১১১১ সাল লিখনং কার্যঞ্চ আগে আমার কন্যা শ্বশুরালয়ে গণ্ডগোল করিয়া দূর করিয়া দেয়াতে ঐ গ্রামেই কোন কুটুম্ব বাটীতে গোসাভাবে ছিলা কেহ সেদিন অন্বেষণ করিল না আর সেই কুটুম্ব সুপারিষ করিলে তাহাতেও ডাকিয়া লইলে না মতে আমার বাটী আসিয়া বিস্তারিত কহিলা জে ভাসুর হইয়া যথোচিত ফজিয়ত করিয়া দিয়াছে আমী এ প্রাণ রাখিব না আমরা নানামত বুঝাইলাম ভাল ঘর করিতে সকল্পি হয় সেই ঘর পুনর্বার

১. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১৮৩।
২. চি. প. স. চি. ১ম. পূ. পৃ. ২০৯।
৩. ঐ. ঐ.

জাইতে হইবে পরে কয়েক দিবস বাদে জামাতারা কয়েকজন লইতে আইল সন্ধ্যার সময় কাছারিতে ডাকাইল আমার কন্যা কহিলেক জে ভাসুর হইয়া আমার নাক কাটিতে চাহিলে তাহার কেহ কীছু উত্তর করিলে না আমী আর সে ঘরে জাইব না শুনিয়া অনেক কথান্তে তাহারা ক্রোধ করিয়া ইত্তরা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল আমী সেখানে ছিলাম না সেই অবধি কন্যা ঘরে আইল না রাত্রে তত্ত করিয়া কাহকে দেখিতে পাইলাম না পরে দিনান্তরে বেক্ত হইল জে জবনায় স্বীকার করিয়াছে ধিকার প্রযুক্ত প্রাক্তন বশতোই বা করিয়াছে কিম্বা কোন লিপ্সাতেই বা কিন্তু আমার গৃহে থাকীতে কোন বিষয় নাহি যদি কোন পাপী থাকে এই সন্দেহক্রমে গ্রামস্থ লোকে আমাকে স্বকিত করিয়াছে অতএব তৎসম্বন্ধ পাপ নিমিত্তক পূর্ব্বকালীন তৎসংসর্গে আমাকে শাস্ত্রানুসারে জে ব্যবস্থা আজ্ঞা হইবেক ইতি"—

এক্ষেত্রে সংসর্গশূন্য পিতাকে জাতে তুলবার জন্যে 'সার্দ্ধ সপ্ত ধেনু মূল্য' প্রদানের বিধান দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে সমাজ প্রধান ও হিন্দু প্রধান গণ্ডগ্রামে আজও এই ধারা বহমান আছে।[১]

মানব চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্যের জন্য অপরাধও যেমন অসংখ্য, তার প্রায়শ্চিত্ত বিধানও তেমনি অফুরন্ত। অপরাধের লঘুগুরু বিচারে উপবাস থেকে শুরু করে গোময়, গোমূত্র সেবন ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত নানা ধরনের কৃচ্ছ্র-সাধন এবং গুরুতর অপরাধে তপ্তজল, তপ্তদুগ্ধ, এমন কি, তপ্তঘৃত সেবনে প্রাণত্যাগেরও বিধান দিতে এই সব গুরু গোঁসাইরা কুণ্ঠিত হতেন না।

যবনের স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে হিন্দুর জাতিপাত হতো। সে সব ক্ষেত্রে অনেক সময় তপ্তঘৃত সেবনে প্রাণ ত্যাগ করার বিধান দেওয়া হতো। সতেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'-বর্ণিত সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনী এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক সুবুদ্ধি রায়কে 'করোয়ার পানি' (বদনার জল) মুখে দিয়ে জাতি নষ্ট করা হলে, সুবুদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রার্থনা করলেন।[২] পণ্ডিতদের মধ্যে একদল বিধান দিলেন, 'তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে'।[৩] আর একদল বললেন, অল্পদোষে এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধেয় নয়।[৪] অবশ্য এই ধরনের প্রাণঘাতী প্রায়শ্চিত্ত অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব হওয়ায় ধেনুসংকলন অর্থাৎ পরিবর্তে, ব্রাহ্মণকে বা সম্ভবতঃ সেই ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্য মহাশয়কে ধেনুদান বা তার মূল্যদানের বিধিই অধিক প্রচলিত ছিল। একথা আমরা জানতে পারি আমাদের আলোচ্য শতক অতিক্রান্ত

১. মাত্র ৩০।৪০ বছর আগেও হাওড়া পণ্ডিত-সমাজের অগ্রগণ্য ও বনামধন্য পণ্ডিত, কাহুন্দিয়া নিবাসী ৺যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহোদয় স্থানীয় সামাজিক অপরাধের ক্ষেত্রে এই 'ভার' দিতেন।

২. 'প্রায়শ্চিত্ত পুছিল পণ্ডিতের স্থানে'। চৈ. চ. (ব. সী), পৃ. ৮৫৪।

৩. চৈ. চ. (ব. সী), পৃ. ৮৫৪।

৪. 'কেহ কহে এত নহে অল্পদোষ হয়'। ঐ. ঐ।

হবার সামান্য পরের একটি চিঠিতে। আবার অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে আমরা যবন-স্পর্শে জাতি নাশের অন্য ধরনের প্রায়শ্চিত্তের খবর পাই।

"বল করি জাতি যদি লএত যবনে।
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে॥
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে।"[১]

সেকালের সমাজের ভাগ্যবিধাতা পণ্ডিতদের দেওয়া বহু 'ভাষ' এবং তাঁদের কাছে নিবেদিত বহু 'হকিকত' রয়েছে। কিন্তু এগুলি সবই পরবর্তী কালের। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের। কিন্তু সে যুগের সমাজে পরিবর্তন সংগঠিত হতো খুব ধীরে ধীরে। সেইজন্য অন্ততঃ ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'হকিকত'টি যে অনেকাংশে সতেরো শতকে রচিত 'হকিকত' গুলির অনুরূপ তাতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। এই 'হকিকত'টি নীচে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো।

"শ্রীগোপাল খাঁএর গরু মরনের হকিকত গোপাল খাঁর গরু একটি ছালা বাহিতে দিয়াছিলেন শ্রীসন্তোষ কুণ্ডুকে সন্তোষ কুণ্ডু ছালা হাটাইয়া পথেতে আনিতেছিল এহার মর্দ্ধে তল্যাড়ার বসন্ত পাল সেই ভিড়নে ছীল গরু তাড়াইতে গরুর পাএ ঠেঙ্গা মারিলেক তাহাতে গরু পড়িল্য পুনসৃছ শকা বিধাই অগড়ে করিয়া গরু আনা গেল তাহার পরে এক মাস বাচিয়াছিল্য ঘাস খড খাইত তাহার পাএ পুকা হইল্য তাহাতে মরিল—।"[২]

এর অর্থ করলে অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়—"শ্রীগোপাল খাঁ-এর গরু মারা যাবার হকিকত। শ্রীগোপাল খাঁ-এর গরুটি দেওয়া হয়েছিল সন্তোষ কুণ্ডুকে, একটি বস্তা বহন করবার জন্য। সন্তোষ কুণ্ডু বস্তা সমেত গরুটিকে পথে হাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সেখানে বসন্ত পালও ছিল। সে গরু তাড়াতে গিয়ে তার পায়ে লাঠির বাড়ি মারে। তাতে গরুটি পড়ে যায়। তাকে বাড়ি আনা হয়। এর পরে গরুটি একমাস বেঁচেছিল। ঘাস খড় খেতো। পরে পায়ে পোকা হয়ে মারা যায়।"

সেকালের হকিকতগুলিতে দেখা যায়, বেশীর ভাগ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাওয়া হয়েছে স্থানীয় সভাকর, ব্যবস্থাপক, বিধিকর্তা, রাজসভা পণ্ডিত এবং ভট্টাচার্য প্রমুখদের কাছ থেকে। কোথাও কোথাও পঞ্চগ্রামী ও সপ্তগ্রামী ভট্টাচার্য মহাশয়দের আহ্বান করা হয়েছে।[৩] গ্রামস্থ বা ভিন্ন গ্রামের মণ্ডল বা মুখ্য পরমানিকদেরও বিধান নেওয়া হয়েছে।

'গুরুদণ্ডী' ব্যক্তিকে সমাজে অচ্ছুতের মতো সাজা দেবার জন্যে গুরু তদ্বির করছেন একটি পত্রে[৪]—'আপন কারদের গ্রামের শ্রীকাসীনাথ মণ্ডল আমার সীষ্য আমাকে মানে না অনেক ক্রুটী করিয়াছে তাহা সাক্ষাতে নিবেদন করিব আমী ওহাকে নিগ্রহী-

১. ম. বা. পৃ. ২২৫।
২. বি. ভা. প. সং. ৯২৪।
৩. ঐ, সং. ৪৩১, ৩৪২৯।
৪. ঐ. সং ২৯১২।

পত্র আপন কারক্ষের নিকটকে পাঠাইয়া ছীলাম তাহাতে মুণী জে গুরুদ্রহী লোককে লইয়া তোমাদের গ্রামের লোকে বেবহার করেন আপনারা বিজ্ঞ বটেন সকলকে কহিবেন জেন মণ্ডল মজকুরকে লইয়া লোক বেবহার না করে।'[1]

এই 'লোক বেবহার না করা' দণ্ড বড়ো ভয়ানক। আবার, 'গেআতদণ্ডী' পতিতকে বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি সামাজিক কাজে বর্জন করে দণ্ড দেবেন জ্ঞাতিরা। সামাজিক রীতি লঙ্ঘনের এবং অন্যান্য সাধারণ অপরাধে গ্রামের প্রধানরা একত্র হয়ে অপরাধের বিচার করতেন। অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীর ধোপা, নাপিত ও হুঁকো বন্ধ হতো। অর্থাৎ একঘরে করা হতো। আবার এঁরাই প্রসন্ন হলে পতিতকে এক ঘটি জল স্পর্শ করবার অধিকার দিয়ে, বা স্বজাতির বিভেদনাশক হুঁকো বাড়িয়ে দিয়ে জাতে তুলতে পারতেন সহজেই।

সমকালীন সাহিত্যে সে যুগের কয়েক রকম শাস্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন আটক, জরিমানা প্রভৃতি। রাজস্ব সংক্রান্ত এবং সাধারণ অপরাধে এই শ্রেণীর দণ্ড প্রয়োগের বিধি দেখা যায়। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে দেখি বাৎসরিক খাজনা পঞ্চাশ কাহনের মধ্যে সাত কাহন কানা হওয়াতে প্রজা সোমঘোষকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল বৎসরাধিক কাল পর্যন্ত।

বৎসর দিবস হৈল দুই পাএ বেড়ি।
পঞ্চাশ কাহন কড়ি বৎসরের বাড়ি ॥
পঞ্চাশ কাহন দিনু সাত কাহন কানা।
তার পাকে মহাপাত্র দিল বন্দিখানা ॥[2]

আবার কোথাও দেখা যায়—

'খাসা দই সহিত কিঞ্চিৎ ছিল জল।
এই হেতু পাত্র দিল চরণে সিকল ॥'

অন্য দিকে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের আত্মকাহিনী অংশে বর্ণিত গোপীনাথ নন্দীর 'বিপাকে বন্দী' হওয়া রাজস্ব-সংক্রান্ত রাজদণ্ড হওয়াই সম্ভব।[3]

চুরি ডাকাতির অপরাধে অপরাধীর চক্ষু-উৎপাটন, কর্ণ-ছেদন, বা হস্ত-ছেদন করা হতো[4], এবং অনেক সময়েই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। মৃত্যুদণ্ড সাধারণতঃ মশানে নিয়ে গিয়ে শূল-প্রদানে, বা মস্তক-ছেদন দ্বারা কার্যকর করা হতো। রাজদ্রোহিতা বা রাজ আজ্ঞা অমান্য প্রভৃতি অপরাধে বিষাক্ত সাপ দিয়ে দংশন করানো বা মত্তহস্তীর পায়ের তলায় পিষ্ট করানো ইত্যাদি প্রথারও সংবাদ পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্য থেকে। ব্যভিচারজনিত অপরাধেও মৃত্যুদণ্ডের বিধি ছিল। মুসলমানদের পক্ষে

---

১. প্র. প. পৃ. ৪০-৪১।
২. দ্বিজরামদেবের ধর্মমঙ্গল—বি. জা. পু. সং ৬৫৩৯।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ৩০।
৪. Mughal Administration, P. 78.

ধর্মত্যাগও মৃত্যুদণ্ডোপযুক্ত অপরাধ বলে বিবেচিত হতো।[১] অবিবাহিত অবস্থায় যৌন সহবাসে, মদ্যপানে, বিবাহিত স্ত্রীলোকের প্রতি মিথ্যা দুর্নাম দেবার জন্যে, বেত্রাঘাতের বিধি ছিল। এই সব অপরাধের বিচার ঈশ্বর-কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতায় বা রাজকীয় অনুশাসনের (canan law) বলে করা হতো; এবং এর শাস্তি রদ করার ক্ষমতা কোনো মানব বিচারকের ছিল না।[২]

এই সব রাজকীয় অনুশাসন বা ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়াও, সাধারণ নিয়মে অনেক সাধারণ অপরাধের বিচার করা হতো। একে বলা হতো 'তাজির' (Tazir).[৩] আটক, জরিমানা, বেত্রাঘাত, কানের ওপর ঘুষি মারা ইত্যাদি শাস্তি এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়ী, শ্রমিক ইত্যাদি শ্রেণীর জনসাধারণের ক্ষেত্রে আটক এবং বেত্রাঘাত, আর অভিজাত শ্রেণীর অপরাধীর ক্ষেত্রে লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।[৪]

নরহত্যার মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়ের ইচ্ছা অনুসারে অনেকক্ষেত্রে কাজী বিচারের রায় দিতে বাধ্য হতেন। সে সব ক্ষেত্রে সেই আত্মীয়ের ইচ্ছা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড, অথবা রক্তের মূল্য (Price of blood) হিসাবে অর্থদণ্ড অথবা সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রদর্শনও চাইতে পারতেন। এবং বিচারকালে সেই নির্দেশই মেনে নিতে হতো।

জনসমক্ষে অসম্মান করা, যেমন মস্তকমুণ্ডন করে তাতে নরুণের দাগ দিয়ে উল্টো গাধায় চড়িয়ে নগর-পরিভ্রমণ করানো, মস্তক মুণ্ডন করে ঘোল বা দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ, মুখে চুন-কালি লেপা, জুতোর মালা পরানো, ওড়ের (জবাফুলের) মালা পরানো, গলায় দড়ি বেঁধে নগর-পরিক্রমণ ইত্যাদি অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হতো অনেক ক্ষেত্রেই। নৃপতি, কাজী এমন কি জনসাধারণকেও অনেক সময় এই ধরনের শাস্তি-দাতা হিসাবে দেখা যায়। স্ত্রী-অপরাধীকে অনেক সময় জনসাধারণ কর্তৃক পাথর নিক্ষেপ দ্বারা মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হতো। অ-মুসলমান কর্তৃক স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রীতি ছিল। বিধর্মীরা যদি জিজিয়া কর না দিতো তবে, যে কোনো মুসলমান তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতো এবং সেক্ষেত্রে সেই মুসলমান ব্যক্তি কোনো প্রকার দণ্ড প্রাপ্ত হতো না।[৫] 'ফতেওয়া-ই-আলমগিরি' বা ঐস্লামিক বিচার আইন, যা ঔরঙ্গজেব শেখ নিজামের নেতৃত্বাধীনে আইন বিশারদদের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়েছিলেন, সেটি ছাড়াও ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন গুজরাটের দেওয়ানকে প্রেরিত ফরমানে বিভিন্ন অপরাধে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে

১. Administration and Justice of Seventinth Century of India, P. 59.

২. Mughal Administration, P. 59.

৩. Ibid. P. 80.

৪. Ibid. P. 80.

৫. Ibid. P. 82-83.

দিয়েছিলেন, যাতে অযথা কাউকে কারাধীন থাকতে না হয়।[১] এটি গুজরাট ছাড়া অন্য সুবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

সতেরো শতকের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে আমরা মোটামুটিভাবে এই সকল দণ্ডনীতির কিছু কিছু খবর পাই। আলোচ্য সময়ের কবি বিষ্ণু পালের 'মনসামঙ্গলে' দেবী মনসার কঙ্কণ কেড়ে নিয়ে মালিনী 'গাঙ্গ চান্দ' বেনের কাছে দিলে, বণিক সেই অপূর্ব সুন্দর কঙ্কণ নিলেও, রাজা এবং তাঁর কোটালের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে।

রাজা বড় দুরাচার কোটাল খুরের ধার
বুঝি মজাবে বেন্তার গারি ঘর ॥[২]

এর থেকে মনে হয় চুরির শাস্তি বেশ কঠিনই ছিল। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে মিথ্যাবাদী ঠগ ভাঁড়ু দত্তকে কালকেতুর আদেশ মত মাথা মুড়িয়ে মাথায় অশ্বমূত্র এবং দুই গালে চুন-কালি মাখিয়ে নগর থেকে বহিষ্কার করতে দেখা যায়।

মুডাহ ভাঁড়ুর মুণ্ড অভক্ষ্যে পূরিয়া তুণ্ড
দুই গালে দেহ কালিচুণ ॥[৩]

অন্য দিকে কলিঙ্গরাজের কাছে ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর নবলব্ধ বৈভব সম্পর্কে সংবাদ দিলে, রাজা ভাঁড়ুর কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেবার হুকুম দেন।

ভাঁড়ু দত্ত যত কয় এক যদি মিথ্যা হয়
কর তবে প্রাণবধ দণ্ড ॥[৪]

আবার সীতারাম দাসের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে ভাট গঙ্গাধরকে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে রাজকন্যা কানড়া কর্তৃক অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞাই দেওয়া হয়, গঙ্গাধরের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নগরের বার করে দেবার জন্যে।

তখনি ধুমুসী দাসি তারে লয়্যা গেল।
বাহির দলিজে গিয়া দরসন দিল ॥
নাপিত ডাকিয়া কৈল পঞ্চম অবস্থা।
কালিচুণ দিয়া নথ মুড়াইল মাথা ॥
চেড়ি মারে ধুমসি পশ্চাত মারে হোই।
ঘাড় ধাক্কা দিএ সহর করে বোই ॥[৫]

এছাড়া, মিথ্যা কথা বলার অপরাধে কারাদণ্ড দেওয়া হতো।

'যদি মিথ্যা হয় রাজা আমার বচন।
...বন্দিশালে বন্দি করি রাখিবে আমারে।'[৬]

১. Mughal Administration, P. 88.
২. বি. ম. পৃ. ৪৪।
৩ পৃ. ৪৪১।
৪. পৃ. ৩৭০।
৫. ক. বি. পুঁ. সং ২৪৭৩। প. সং ৩৭।
৬. ধ. ম., চ, পৃ. ২৫৬।

এমন কি, শূলে পর্যন্ত দেওয়ার খবর পাওয়া যায় আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন সাহিত্যে।

'যদি মিথ্যা এক হয় আমার বচন।
দক্ষিণ মশানে নিয়া বধিহ জীবন॥'[১]

তবে, অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এই সব ক্ষেত্রে শাস্তি গুরুতর হতো না।

'মিথ্যাবাক্য হৈল তোর রাজ বিদ্যমানে।
অপরাধ মাগীয়া লেহ নৃপতি চরণে॥
নহে মিথ্যা বচনের পাবে প্রতিকার।'[২]

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে কালকেতুর সম্পর্কে 'চোড়-খণ্ড'[৩] বলে অভিযোগ করাতে কলিঙ্গরাজ গুজরাট নগর আক্রমণ করেন এবং তাকে বন্দী করে এনে 'কোন্ সাধুজনে বধি নিলি বেটা ধন'[৪] এবং একই সঙ্গে কলিঙ্গ-রাজকে অমান্য করবার অভিযোগে 'আমারে না চেন ব্যাধ হইয়া প্রবল'[৫] বলে মত্ত হস্তীর দ্বারা পিষ্ট করে প্রাণনাশ করার আজ্ঞা দেন। সেকালে এই সব শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধু অপরাধীর নির্যাতন নয়, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ অপরাধ থেকে জনসাধারণ বিরত থাকে তারও শিক্ষা দেওয়া। এই জন্যই লাঞ্ছিত অপরাধীকে নগর পরিক্রমণ বা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীর কাঁধে শূল চাপিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে তারপর তাকে মশানে নিয়ে যাওয়া হতো।

'অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে।
এমন বচন যেন কেহ নাহি বলে॥'[৬]

রাজদ্রোহিতা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। রাজ আজ্ঞা অমান্য করলেও গুরুতর শাস্তি দেওয়া হতো। সতেরো শতকের কবি বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, চাঁদ-সদাগরের অধীনস্থ জেলে, জালু-মালু চাঁদের অমতে মনসাদেবীর 'বারা' পূজা করে। সেই অপরাধে 'চান্দরাজা' সেই রাজাজ্ঞা অমান্যকারী জেলে দুজনকে বন্দী করেন। সেখানে দেখা যায়, নগরকোটাল কর্তৃক তাদের হাত বেঁধে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাওয়া হয় বন্দীশালায়। বন্দীশালায় যে শাস্তি তাদের দেওয়া হয়, তা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়।

'জেল্যার হাথে হাতকড়ি পাএ দিল বেড়ি।
জেল্যার মুখে ভাঙ্গে দিল গরল বিষের বড়ি॥

১. ক. ক. চ. পৃ. ৩৬৫।
২. ঐ. পৃ. ৩৬৮।
৩. ঐ. পৃ. ৩৬৯।
৪. ঐ. পৃ. ৪১৩।
৫. ঐ. ঐ.
৬. ঐ. পৃ. ৪১৪।

খণ্ড রে তুসের ধুয়া সিঅরে জাগায়া।
পাষাণ জগদল দিল বুকেতে তুলিয়া ॥
মুণ্ড নাড়িতে জেল্যার সেলে মুণ্ড ফুটে।
পাশমুড়া দিতে রে করাতে মাংস কাটে।'[১]

পথে একা পেয়ে রমণীকে বল পূর্বক লাঞ্ছনা ইত্যাদি অপরাধে ধরা পড়লে বিচারের পূর্বে সাময়িক ভাবে অপরাধীকে বন্ধ ঘরে রাখা হতো এখনকার মতোই :

'রাজ আজ্ঞা হলো লয়ে কারাগারে থো ॥
আপনি বিচার কালি বুঝিব সকালে।
সেনেরে বন্ধন দিয়া রাখিল কোটালে ॥
হাতে পায়ে বন্ধন নিগড় গলে তোক।'[২]

অন্যদিকে দুষ্টা স্ত্রীলোকের শাস্তি ছিল নাক কান কেটে দেওয়া। শতাব্দীর সব কবির ধর্মমঙ্গল-কাব্যের 'সুরিক্ষা পালায়'ই এর বর্ণনা মেলে।

চৌর্যাপরাধে অনেক সময়েই প্রাণদণ্ড দেওয়া হতো। এই শ্রেণীর অপরাধে প্রাণদণ্ড হলে সাধারণতঃ শূলে দেওয়ার খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সাহিত্য থেকে. আবার ভবিষ্যতে যাতে সকলে এই শ্রেণীর অপরাধ থেকে বিরত থাকে তার জন্যে চোরের কাঁধে শূল চাপিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে অপরাধীকে মশানে নিয়ে যাওয়া হতো

'কোটাল লইয়া গেলা বধিতে মশানে ॥
সাজায়ে সরল শূলি সিমুলের কাঠে।
চাপায়ে চোরের কান্ধে চলে দিবা ঠাটে ॥
বাজে কাড়া জোড়া সিঙ্গা করতালি কাঁশি।
দেখিতে ধাইল যত নগর নিবাসী ॥'[৩]

ঠগ বা প্রতারকের শাস্তিও ছিলমৃত্যুদণ্ড। অনেক সময় তার মাথা কামিয়ে, গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা অথবা জবা ফুলের মালা পরিয়ে, গালে চুণকালি মাখিয়ে মারতে মারতে সমস্ত নগর পরিক্রমণ করিয়ে বিতাড়িত করা হতো।

'ছেঁড়া জুতা গলায় গাঁথিয়া দিল মালা ॥…
এক গালে চুন দিল আর গালে কালি।
কেহ মারে নাথা মুথা কেহ দেয় তালি।
ঠক বলে মাথায় ঠেকার কেহ মারে।
গলায় বাঁধিয়ে দড়ি ফিরায় সহরে ॥'[৪]

দুষ্টা স্ত্রীলোককে নাক কান কেটে শাস্তি দেবারও খবর পাওয়া যায়। ব্যভিচারের

---

১. বি ম পৃ. ৫২৭
২. ঘ. ম. পৃ. ১২২।
৩. ঐ. পৃ. ৩২৮।
৪. ঐ. পৃ. ৩০২।

অপরাধে ধৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত শাস্তি বলে বিবেচিত হতো। সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গলে'-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। সেকালে মৃত্যুদণ্ড বলতে প্রধানতঃ মশানে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়ানো হতো। এছাড়া, তীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়ে কাটা, বুকে বর্শা বিঁধিয়ে মারা এবং মত্ত হাতীর পায়ের তলায় বা কামানের মুখে মৃত্যু ঘটাবারও খবর পাওয়া যায়।

'কেহ বলে তিগন খড়্গ দিয়া কাট ॥
কেহ বলে বড়শা হানিয়ে ইহার বুকে।
নহে বা এখনি দিব কামানের মুখে ॥'[১]

॥ অপরাধী-নির্ণয়-পদ্ধতি ॥ সঠিক অপরাধী নির্ণয়ের জন্যে বিভিন্ন মন্ত্র বা দিব্য-বিধানের ('তুক' বা 'তুক্-পরীক্ষা') খবর পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে। বিভিন্ন কবির 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যেও সম্ভাব্য অপরাধীর ক্ষেত্রে তুক্-পরীক্ষার বর্ণনা আছে। চরিত্রহীনতার সামাজিক অপরাধের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত খুল্লনার ক্ষেত্রে এরকম বিবিধ তুক্ পরীক্ষার বর্ণনা রয়েছে। অষ্ট-পরীক্ষা বা অষ্ট-তুকের কথা আমাদের আলোচ্য যুগের কোনো কোনো কবি বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে ধর্মাধর্ম পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, আসনপরীক্ষা, অঙ্গুরীপরীক্ষা, সর্পপরীক্ষা, লৌহপরীক্ষা, তুলাপরীক্ষা ও জৌঘর পরীক্ষার নাম উল্লেখযোগ্য। রঘুনন্দনের 'দিব্যতত্ত্বে'ও এর বিস্তৃত পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য সমকালীন সাহিত্যে এর উল্লেখ থাকলেও এই সব বর্ণনাকে সর্বাংশে তথ্য বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই, কারণ এদের অনেকখানিই অবাস্তব ও অতিপ্রাকৃত।

॥ বিচার-রীতি ॥ আগেই বলা হয়েছে যে, সমসাময়িক সাহিত্য থেকে নির্দিষ্ট কোনো বিচার-রীতি বা পদ্ধতির খবর পাওয়া যায় না। তবে বিচার-রীতির মধ্যে যে সাক্ষ্যদানের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সে খবর পাওয়া যায়। সতেরো শতকে রচিত বিভিন্ন 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে দেখি গৌড়েশ্বরের দরবারে হরিহর বাইতি সাক্ষ্য দিচ্ছে। সাক্ষ্যদানের বিষয়, লাউসেন পশ্চিমদিগন্তে সূর্যোদয় ঘটিয়েছিলেন। সেকালে সাক্ষ্য-গ্রহণের সময়ে সাক্ষীর সম্মুখে বিভিন্ন ধরনের পবিত্র দ্রব্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত রেখে, মিথ্যা কথা বললে 'নরকে গমন' বা 'কুলধ্বংস' হবে, এমন সাবধান বাণী ঘোষণা করে, তারপর সাক্ষ্য গ্রহণের রীতি ছিল।

'গোবিন্দ গণ্ডকী শিলা গব্য গঙ্গাজল।
সম্মুখে তুলসী তলা তাম্র তীর্থ স্থল ॥
ব্রাহ্মণ বিগ্রহ এই দেখ বিষ্ণু অংশ।
সভামাঝে বল মিথ্যা হবে কুল ধ্বংস।
মিথ্যা সাক্ষী দিলে বাপু হয় সর্ব্বনাস।
শতেক পুরুষ তার নরকে নিবাস ॥

১. কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, পৃ. ১০৫।

পিতৃলোক তোমার আছয়ে মুখ চেয়ে।
তা সবাকে উদ্ধারহ সত্য সাক্ষী দিয়ে॥
মনেতে ভাবিয়া দেখ ধর্ম বড় ধন।
সত্যকথা সংসারেতে আপনি নারায়ণ॥
এক জনা সত্যবাদী বংশে থাকে যার।
গয়াগঙ্গা ঘরেতে বিরাজ করে তার॥
অর্থলোভে রাজভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে।
সর্ব্বনাশ হয় তার নরক ত্রিকুলে॥[১]

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের সময় শপথ গ্রহণের এই রীতির কথা ইতিহাস থেকেও জানা যায়।[২] এখনও প্রথাগত ভাবে এই রীতিই চলে আসছে। তবে অন্য আকারে। বিচারে দিব্য-প্রমাণের প্রয়োজন হলে, সর্বাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের ব্যবস্থা শূদ্রের জন্যে এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য দিব্য প্রযোজ্য হতো ব্রাহ্মণদের প্রতি। যারা সাক্ষ্য দিতো, তারাও নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণে অনেক সময়েই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেও নানান দিব্য-দোহাই দিতো।

'ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই।
মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই॥'[৩]

সেকালের ধর্মান্ধ জনগণের কাছে এই প্রথা যথেষ্ট কার্যকর ছিল বলেই মনে হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা সাক্ষ্যের খবরও যেমন পাওয়া যায় তেমনি অপরাধীকে 'ধুতি খেয়ে' অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দেওয়ার রীতিও সেই তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই সাক্ষীকে ঘুষ দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী করাতে দেখা যায় একালের মতোই।

'পাত্র ভাবে হরিহর করিব নেহাল।
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যদি ধন পেয়ে ধৃতি॥'[৪]

আবার নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি ধনলোভে প্রলুব্ধ হয়ে ধর্ম পরিত্যাগ করে মিথ্যা সাক্ষী দিতে দ্বিধা করতো না, সেই ধর্মান্ধতার যুগেও এমন উদাহরণেরও অভাব ছিল না। আবার অপরাধ সচেতন মনে নিজেকে অনেক সময় সান্ত্বনাও দিতো।

'মিথ্যা সাক্ষ্য বলিলে মজিবে পরকাল।
মলে কে দেখিতে যাবে করি ঠাকুরাল॥

১. ম. ধ. পৃ. ১২৫।
২. Mughal Government and Administration, P. 204.
৩. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।
৪. ম. ধ. পৃ. ৩২৫।

কত কষ্ট পাব নিত্য কাঁধে বহে ঢাক
বসে করি বিলাস বাড়াই নাম ডাক ॥[১]

রাজদরবারে সাক্ষ্য গ্রহণ কালে একদিকে যেমন রাজাকে 'সর্বদেবময়' বলে উল্লেখ করে তাঁর সম্মুখে সত্য কথা বলতে বলা হয়, অন্যদিকে আবার সাক্ষী সত্য ভাষণ করলে রাজদরবারের ধর্মাধিকরণকে রাজা সেই উক্তির সাক্ষী রাখেন

'রাজা বলে সাক্ষী হয়ো ধর্মাধিকরণ।'

এছাড়া, সাক্ষ্য গ্রহণের সময় বিভিন্ন পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ, পূর্বপুরুষ এবং দেবদেবীর দোহাই দেওয়া, পরকালের ভয় দেখানো ইত্যাদিও ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অব্যাহতই রয়েছে।

এক আদালতে বিচার-ব্যবস্থা মনঃপূত না হলে অন্য আদালতে বা শাসনকর্তার নিকট অথবা স্বয়ং বাদশাহের নিকটেও গমনে কোনো বাধা ছিল না। এটি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতার উপরে। প্রথম আদালতের বিচারের রায় সে সকল ক্ষেত্রে, অপর আদালতের বিচার-ব্যবস্থায় কোনোই প্রভাব বিস্তার করতো না। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'-রচনা আরম্ভ সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে। সেখানে দেখা যায়, বাকী খাজনার দায়ে আটক সোমঘোষ, গৌড়েশ্বর শিকারে যাচ্ছেন শুনে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁর গমন পথের ধারে কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে এসে, পাত্র মহামদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে রাজার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করছেন

'বন্ধনে রেখেছে পাত্র দারুণ কুটিল
... .
সম্প্রতি সামর্থ নাহি রাজকর দিতে
গতবর্ষে মহারাজে গোচর করিতে ॥
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দী খানা ॥'[২]

সে ক্ষেত্রে রাজাকে যথোপযুক্ত বিচার করে তাঁকে মুক্তি দান করতেও দেখা যায়। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা রাজকীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে (canon-law) বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকের রায় দুর্লঙ্ঘ্য ছিল বলেই জানা যায়।

॥ **বিচার-বৈশিষ্ট্য** ॥ মুঘল বিচার-ব্যবস্থায় বিচারকেরা আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র সাক্ষ্য-প্রমাণেই বিচারকার্য সমাধা করতেন না। সত্য ঘটনা আবিষ্কারের জন্যে এবং সঠিক অপরাধী নির্ণয়ে তাঁরা নিজের বুদ্ধিমতো অনুসন্ধানে রত হতেন।[৩] অপরাধী নির্ণয়ে এবং বিচারে কোনো বিচারক পূর্ববর্তী কোনো বিচার বা অনুসন্ধান পদ্ধতির

---

১. ঐ. ধ পৃ. ৩২৫।
২. ক ক. চ.। ধ. উ.। পৃ ১৭১।
৩. ঐ. ধ.
৪ Mughal Government and Administration. P. 201, 202

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন না। তবে, এই অনুসন্ধান বা বিচার-পদ্ধতি ঠিক্ কিরকম ছিল, সে-বিষয়ে সমকালীন সাহিত্য থেকে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

ব্যবহারজীবী বা উকিলদের মধ্যস্থতায় রাজদ্বারে উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন ছিল না। যদিও উকিল নামধারী এক সম্প্রদায়ের খবর পাওয়া যায় মধ্যযুগের বিচার পর্বে। কিন্তু তারা তখনও বর্তমানের মতো বিচার কার্যে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন নি। মধ্যযুগের সাহিত্যে উকিলদের সততার একান্ত অভাব দেখা যায়। অর্থাৎ উপযুক্ত টাকা পেলে, মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এদের দ্বিধা হতো না।

'উকিল আমার পতি কিল খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে॥'

এই উক্তি পরবর্তী আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যের হলেও, একথা অনুমান করা কঠিন নয় যে আমাদের আলোচ্য সময়ের উকিলরাও নিশ্চয়ই এই অপবাদের বাইরে ছিলেন না। কারণ উকিলদের সম্পর্কে এই ধারণা এক দিনে গড়ে ওঠে নি। এই সব উকিলদের মধ্যস্থতা ছাড়াও বাদী-প্রতিবাদী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আপন আপন মুখেই বক্তব্য নিবেদনের সুযোগ পেতেন। বিচার খুব শীঘ্র নিষ্পন্ন হতো। এজন্য বর্তমান কালের মতো দীর্ঘকাল অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় কাটাতে হতো না। এই প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত ঔরঙ্গজেবের ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফরমানটি স্মরণীয়। তবে, পূর্ব-বিচারের কোনোরূপ সূত্র-গ্রাহ্যতা না থাকায়, বিচার-পর্বের অনেকটাই বিচারক বা কাজীর খেয়াল খুশির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই স্যার টমাস রো, রেভারেণ্ড টেরি, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের প্রমুখ মুঘল আমলের বিভিন্ন সময়ে আগত বিদেশী পর্যটকগণের ধারণা হয়েছিল যে, 'মুঘল আমলে কোনো বিচার ছিল না।'

Mughal Goverument and Administration, P. 204

Sir Thomas Roe—Purchas Pilgrim , Vol. IV, P. 437.

Terry—Early Travels in India by Foster, P. 326.

Bernier—Travels in Mogul Empire—Translated by Constable

জাত-কর্ম সংস্কার

"আটদিনে শিশুগণে সন্ধ্যায় ডাকিল।
আট কড়াইয়া কইল কুলায় দিয়া বাড়ি।
চাওয়ালে নিছনি দিল একইশ পণ কড়ি॥"

সপ্তদশ শতাব্দীর বিবিধ মঙ্গলকাব্যে ও চরিত-গ্রন্থে হিন্দু সমাজে আচরিত জন্ম-কৃত্যের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে', যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে', যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাসে' জাতকৃত্যের বর্ণনা প্রায় অনুরূপ। শ্রীচৈতন্যদেবের 'জাতকর্ম' বর্ণনা প্রসঙ্গে অনেক বাস্তব সংবাদ দিয়েছেন বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে। সনাতনী হিন্দু সমাজে আজও এই ধারারই জের অব্যাহত রয়েছে।

বর্ণাশ্রমি সমাজে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনকাল নানা সংস্কারে আবদ্ধ। প্রাচীন কাল থেকে সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো। 'স্মৃতিভাষ্যকারদের মতে, জন্মগতভাবে অর্জিত পাপ হতে মুক্ত হয়ে সদ্‌গুণ অর্জন দ্বারা যোগ্যতা লাভই প্রকৃত সংস্কার।' সংস্কারের সংখ্যা নিয়ে স্মৃতিকারদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। দুই থেকে শুরু করে চল্লিশ পর্যন্ত সংস্কার সংখ্যার কথা জানা যায় বিভিন্ন স্মৃতি-সূত্রে। তার মধ্যে বর্ণাশ্রমি হিন্দুসমাজে প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মের অঙ্গ হিসেবে দশ সংস্কারের প্রচলন দেখা যায়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন ও বিবাহ। এই সকল সংস্কারের তালিকা লক্ষ করলেই দেখা যায়, এর উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী। সাধারণ ভাবে আত্মিক বিকাশ ঘটানোই এর উদ্দেশ্য হলেও, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক সংস্কারেরই তাৎপর্য রয়েছে। যেমন—নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সংস্কার লৌকিক এবং এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো স্নেহ ও প্রীতি সহ সামাজিক সম্মেলনের আনন্দ লাভ। উপনয়নের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নতি বিধান। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি সংস্কারগুলিও প্রতীকধর্মী ও নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জক। বিবাহের উদ্দেশ্য হলো সংযম, আত্মোন্নতি, আত্মত্যাগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ-বিস্তার।

কিন্তু যে সমাজে এই সব কৃত্যের ধারা প্রচলিত ছিল, সে সমাজ বর্তমানে শিথিল বন্ধন। ফলে পুরোনো দিনের নিয়ম যেমন ভাঙে, নতুন দিনের নতুন নিয়মও তেমনি গড়ে ওঠে। তবু একথাও ঠিক্ যে, জন্ম-বিবাহ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মানুষের সমাজের

মূল কৃত্যাগুলিতে দু-এক শতাব্দীতে কোনো পরিবর্তনের ঢেউ দেখা দেয় না। তাই দেখা যায়, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সকল ছোটো বড়ো মঙ্গলকাব্যেই আলোচ্য সামাজিক কৃত্যাগুলির বর্ণনা প্রায় একই রকম ভাবে পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য সপ্তদশ শতকের প্রধান প্রধান কবিদের রচনায় ও প্রাপ্ত চিঠি-পত্রে জাত-কর্মের পূর্ববর্তী পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে সাধভক্ষণের তিনটি স্তরের বর্ণনা পাওয়া যায়। পঞ্চম মাসে 'পঞ্চামৃত', সপ্তম মাসে 'সাতামৃত' ও নবম মাসে 'সাধান্ন' খাওয়ার বিস্তৃত বর্ণনা মেলে।

সন্তান জন্মের পরবর্তী বিধিমত বৈদিক সংস্কারের নাম জাত-কর্ম। তবু, ব্যাপক অর্থে দেখতে গেলে 'গর্ভাধান' থেকে 'অন্নপ্রাশন' পর্যন্ত এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য সমাজে আচরিত এই সব প্রথা পূর্বাপর প্রায় সব কবির কাব্যেই কমবেশী বর্ণিত হয়েছে।

।। **গর্ভাধান** ।। বিবাহিতা নারীর প্রথম রজোদর্শন উপলক্ষে এই উৎসব প্রচলিত ছিল। এই উপলক্ষে পরিহাসীজন কর্তৃক জল ও কাদা নিয়ে পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপের মাধ্যমে 'কাদাখেউড়' উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এই উৎসবের সময় কুলোপুরোহিত মঙ্গল-পাঠ করতেন। উৎসবের শেষে বর-কন্যার পুনর্বিবাহের আয়োজন করা হতো। মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানে এর বর্ণনা করেছেন।[১] আধুনিক কালে কন্যাগণের অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার ফলে এই সংস্কার একেবারেই লোপ পেয়েছে।

।। **সাধভক্ষণ** ।। গর্ভ সঞ্চারের পঞ্চম মাসে পারিবারিক উপাস্য দেবতার পূজা করে দুধ, দই, ঘি, মধু ও গঙ্গাজল দেবতাকে নিবেদন করে গর্ভিণীকে দেওয়া হতো। সপ্তদশ শতকের কবি রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে ও যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ'-গ্রন্থে এর উল্লেখ মেলে।

'পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খায় পঞ্চ মাসে।'

এবং

'পঞ্চামৃত মদনারে দিল পঞ্চ মাসে ॥'[২]

বর্তমানেও এই রীতির প্রচলন দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই।

গর্ভের সপ্তম মাসে সাধভক্ষণ উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করা হতো ও গর্ভিণীর ইচ্ছানুযায়ী তাকে মুখরোচক খাদ্য দেওয়া হতো। এই সময় সাত রকমের কলাই ভাজা, গুড়-পিঠে ইত্যাদির উপচারে ষষ্ঠীপূজা ও এয়ো আমন্ত্রণ করে সাধান্ন দেওয়া হতো। মুকুন্দরাম, রূপরাম ও যাদুনাথ তাঁদের 'মঙ্গলকাব্যে' এর বর্ণনা করেছেন।

---

১. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১৫৮-৬৩ (ড সুকুমার সেন-সম্পাদিত)

২. ক. ধ. পৃ. ১২৩।

'সপ্তমাসে বন্ধুজনা দিল নানা সাধ।'[১]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'ছয় মাস নিবড়িল সাতে পরবেশ।
নানা সাধ খায় রানী অপূর্ব সন্দেশ।'[২]

অথবা—

'মদনা হরিষে সাধ সপ্ত মাসে
নিজ ইচ্ছাময় খায়।'[৩]

বর্তমানেও এর জের রয়েছে রাঢ়-বঙ্গের সর্বত্র।

নবম মাসে সাধান্ন খাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকের বিভিন্ন কাব্যে কাব্যে। সেকালের প্রায় প্রত্যেক কবিই এই উপলক্ষে নায়িকার বিভিন্ন প্রকারের আহারের বাসনার খবর দিতে গিয়ে এমন বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে সেকালের রন্ধন ও ভোজন পর্বের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এই উপলক্ষে অনেক সময় মা ও শিশুর কল্যাণ কামনায় ব্রাহ্মণ ভোজনও হতো।

॥ জাত-কর্ম ॥ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বিধিমত বৈদিক সংস্কারের নাম 'জাত-কর্ম'। ভারতীয় বেদমার্গী আর্য সমাজে এই সংস্কার সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। মহাভারতের সমাজে জাত-কর্ম অনুষ্ঠিত হতো এবং সেখানে পুত্রসন্তান ও কন্যা-সন্তানের কৃত্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। নবজাতকের কল্যাণ কামনায় সাধ্যমতো দান ধ্যানেরও প্রচলন ছিল প্রাচীন কাল থেকেই।

আমাদের আলোচ্য সময়েও জাতকের কল্যাণ কামনায় দান ধ্যানের এই রীতি অব্যাহত ছিল। বর্তমান কালেও অনেক অঞ্চলে এই রীতির খবর মেলে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, যে সব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ও শিল্পপ্রসারের ফলে সমাজে আমূল পরিবর্তন এসেছে, সে সব ক্ষেত্র বাদ দিলে, সাধারণতঃ মধ্যযুগীয় বাঙালির জীবন যাত্রার ধরনধারণ অনেকক্ষেত্রেই বর্তমান কালের গ্রামীণ জীবন যাত্রারই অনুরূপ ছিল।

হিন্দু সংস্কারে 'জাত কর্ম' কৃত্যের প্রধান অবলম্বন বৈদিক নয়, লৌকিক তুকতাক ও মন্ত্রতন্ত্র। এই কৃত্য শুরু হয়ে যায় শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে থেকেই। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, সুপ্রসবের বিভিন্ন তুক্-মন্ত্রের কথা। 'মন্ত্রিত জলের দ্বারা যে সেকালের সুপ্রসবের ব্যবস্থা করা হতো, তার উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডী-মঙ্গল'-কাব্যে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রসূতির কষ্ট লাঘব করবার জন্য অভিজ্ঞা ধাত্রী প্রথমে এসেই—'কপট মন্ত্রিত করি খাওয়াইল জল।'[৪]

১. ক. ক. চ. পৃ. ১১৫।
২. রূ. ধ. পৃ. ১২৩।
৩. বা. ধ. পৃ. ৩৮।
৪. ক. ক. চ. পৃ. ২৫৮।

এছাড়া সুপ্রসবের মন্ত্রতন্ত্র সম্পর্কিত প্রাপ্ত পুঁথির প্রাচুর্যই এর বহুল ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুপ্রসবের একটি তুক্ ও মন্ত্র—

'পিড়ার উপরে কাট-খড়িতে লিখিয়া বাম হাতের কোণে তিন চাপড় দিবে সেই পীড়া প্রসূতি গতায়াতে তিনবার ডেঙ্গাবে দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখেয়া নজর করিবে।

বন্দ মাতা কামরক্ষা শ্বেত করবীর ফুল।
ধুতুরার বিচ পানের সিকুটি তাহে দিবে সমভুল।
আছ লঙ্কায় শ্রীরামের দোহাই হনুমান মহাবীর।
কামরক্ষা রাড়ে কালিকা মা হন হন মথ মথ পড়
অমুকার বক্তির নাড় ছিড়ে পড়॥'[১]

সুখ-প্রসবের অনেক তুক্-মন্ত্র সেকালের ধাত্রীগণের আয়ত্বে থাকতো। সেকালে সাধারণতঃ হাড়ী-জাতীয়া স্ত্রীলোকগণই ধাত্রীর কাজ করতো এবং 'শবরী-বিদ্যা' এদের ভালোই আয়ত্তে ছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে রচিত যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে' দেখা যায়—

'মনকারতো ধাই আসি পাতাইল জায়ন।[২]
ক্ষণেক বিলম্বে রাণী প্রসবে কুমার।'[৩]

আবার কোথাও পাওয়া যায়—

'ঘরবারি সনকা করিতে লাগিল।
গ্রামে ছিল ধাএ মাকে ডাকিয়া আনিল।
বাড়িতে ছিল রথার মূল[৪] উপাড়িআ দিল।'[৫]

এ সবই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেকার তুক্ কৃত্য। এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রস্থ তুক্ আরম্ভ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই খানিকটা গোবর আঁতুড় ঘরের সম্মুখে ফেলে দিতে দেখা যায়। সাধারণের বিশ্বাস, এতে নবজাতক কোমল প্রকৃতির হবে। তারপর কাঠে চোট দেওয়ার রীতি কোনো কোনো স্থলে দেখা যায়। এতে নাকি সন্তানের চমক লাগার ভয় থাকে না। সন্তান ভূমিষ্ঠের আনন্দে এবং সেই সঙ্গে কু-তাড়ানোর উদ্দেশ্যেও শাঁক বাজাবার ও হুলুধ্বনি দেবার পর্ব চলে। এরপর ধাই কর্তৃক নাভিচ্ছেদ করাবার রীতি ছিল।

'ধাই নাই সুতা দিয়া বান্ধে দড় করে।
নাভিচ্ছেদ করিলেক সোনার ঝিনুকে॥'[৬]

১. পুঁ. প. ১ম. পৃ. ১৯৬।

২. জায়ন—সুপ্রসবের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠী পূজার জন্যে বিশেষ লতাগুল্ম সহকারে মন্ত্রত তুক্ দাওয়াক এর পরে 'জাং' পাতা অর্থাৎ জানু পেতে প্রসূতিকে প্রস্তুত করিয়ে বসানো।

৩. বা ধ. পু. পৃ. ৬৯।

৪. 'রথার মূল' সম্ভবতঃ সু-প্রসবের কোনোরূপ তুক্-দাওয়াই।

৫. বা. ধ. পৃ. ৬৯।

৬. রা ধ পৃ. ১২৪।

অন্যত্র রয়েছে—

'দুর্ব্বাধানা প্রদীপ মঙ্গল আয়োজন।
সরসোভা নাড়ীচ্ছেদ করিল তখন ॥'[১]

অতঃপর নবজাতককে মুক্ত করে স্নান করাবার ব্যবস্থা রয়েছে।

'স্বর্ণ ডাবরে স্নান করাইল শিশুকে।'[২]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'সুবর্ণের খালে শিশু করাইল স্নান।'[৩]

এর পরবর্তী কৃত্য সূতিকা গৃহের সম্মুখের চাল হতে খড় টেনে প্রসূতিকে 'তাতাই' সেঁক' দেওয়া। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে এবং যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে'-এর বর্ণনা রয়েছে—

'চালি ফেডি অগ্নি জ্বালে সূতিকা ভবনে।'[৪]

কোথাও পাওয়া যায়—

'আড়াই গড়ের খড়ে আতড়ি জ্বালিল।
অল্প তাপ দিআ শিশু তেজময় কৈল।'[৫]

এই সময় অপদেবতা বিতাড়ণের জন্যে নানারকম মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাকের রীতি প্রচলিত ছিল। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই আরম্ভ হয় এই অপদেবতার অশুভ-অধিষ্ঠানের ভীতি। নবজাত শিশুর কল্যাণ কামনায় যে সমস্ত কৃত্যাদি পালন করা হতো তার মধ্যে অপদেবতার দৃষ্টি থেকে শিশুকে রক্ষা করবার তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র ছিল অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সেকালে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে সূতিকা গৃহের চারদিক ঘিরে নানারকম মন্ত্র পাঠের রেওয়াজ ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া সূতিকা গৃহের দরজায় শাবল[৬], জুতো[৭], ঝাঁটা[৮], মাছের আঁশ[৯] ইত্যাদি স্থাপনের রীতিও প্রচলিত ছিল। সরষে পড়ে[১০] ঘরের চারিদিকে ছড়ানো হতো। দরজার ওপরে লিখে দেওয়া হতো 'রাম রাম'।[১১]

---

১ যা. ধ. পৃ. ৬২।
২ ক. ধ. পৃ. ১২১
৩ যা. ধ. পৃ. ৬২
৪ ক. ক. চ. পৃ. ২১৮।
৫ যা. ধ. পৃ. ৬৯। 'আড়াই গড়'—আড়াই হালা বা গোছ খর হতে পারে।
৬ সম্ভবতঃ ভূত এসে লোহাতে আটকে পড়বে মনে করা হতো।
৭ পুরান পানই থুইল আগড়ে খাটাইয়া। যা. ধ. পৃ. ৬৮।
'পুরান পানই' অর্থে পুরাতন পাদুকা অর্থাৎ ছেঁড়া জুতো।
৮ ভূত বিতাড়নে ওঝাদের অব্যর্থ অস্ত্র বিশেষ।
৯. মাছের আঁশের গন্ধ পেয়ে তার লোভে ভূত সেখানেই আটকে যাবে, আর এগোবে না বলে মনে করা হতে পারে।
১০. 'সরষে পড়ে' ভূত ছাড়ানো সু-প্রসিদ্ধ প্রবাদ।
১১. ভূতের ভয়ে 'রাম নাম' অব্যর্থ দাওয়াই বলে এখনও পরিচিত।

পুত্র-সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে বেদগান, ভাগবত-পাঠ, নানাবিধ মন্ত্রোচ্চারণ ও সাধ্যমত দানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। ধনীগৃহে পুত্রের জন্মের পর প্রচুর দানের রীতি ছিল। সতেরো শতকের কবি যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যে এর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

'পুত্রের অভীষ্টে দান সংকল্প করিঞা।
দান দেই ব্রজরাজ আনন্দিত হঞা।
কাঞ্চন বসন ধেনু রতন জতনে।
যতেক দিলেন দান কে করে গণনে।
দানের অধিক দিল ব্রাহ্মণে দক্ষিণা।'[১]

সতেরো শতকের অপর কবি রূপরামও তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ঘোষ কত করে দান।'[২]

এই দান কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকেই নয়, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোককেই বিভিন্ন ধরনের দান দেওয়া হতো। প্রথমতঃ ধাত্রীকে[৩], রজক ও নাপিতকে[৪], বাজন্দারকে[৫], ভাটগণকে[৬] ও এয়োগণকে এবং সর্বসাধারণকেও পুত্রের জন্মোপলক্ষে মাছ, তেল, খই, দই বিতরণের খবর পাওয়া যায় আমাদের আলোচ্য শতাব্দীর বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে।

'তৈল হরিদ্রা আর সিন্দুর গুয়াপান।
পূর্ণিত করিঞা দিল আইয়গণে দান।'[৭]

অথবা অন্যত্র পাওয়া যায়—

'ভারে ভারে মৎস্য বিলাইল সর্বজনে।'[৮]

কোথাও পাওয়া যায়—

'খই দই কল্যাণী বিলায় ভাল মাছ।
পথে বসা চৌকি পথিক ধর‍্যা আনে।
তেল মাখাইয়া তার সোনা দেই কানে।'[৯]

শুধু ধনীগৃহে নয়, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারেও এই রীতি ছিল। শিশু চৈতন্যদেবের

---

১ বি. ভা. পুঁ. সং ১৯০১, পৃ. ৪৬খ।
২ রূ. ধ. পৃ. ৪৬।
৩ 'ধাত্রীকে বিদায় কর দিয়া নানা ধন'। ঐ ঐ।
৪ 'রজক নাপিতে কত ভাণ্ডার বিলান'। ঐ ঐ
'নাপিতের পুরস্কার দিলেন রাজন'। ঘা. ধ. পৃ. ৭০
৫. 'বাজন্দারে কহে রাজা পুরস্কার কর‍্যা'। ঐ ঐ
৬ 'ভাটকে ইনাম দিল চড়নের ঘোড়া।' রূ. ধ. পৃ. ১২৫
৭. ঘা. ধ. পৃ. ৭০।
৮ ঐ. ঐ.।
৯. রূ. ধ. পৃ. ১২৫।

জন্মের পরে তার দরিদ্র পিতার দানে অক্ষম বলে দুঃখ করার বর্ণনা রয়েছে 'চৈতন্য-ভাগবত'-গ্রন্থে।[১]

হিন্দুগৃহে সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতকের জন্মমুহূর্তের গ্রহাদির সংস্থান নির্ণয় করে 'জাত-পত্রিকা' রচনার জন্যে গ্রহবিপ্রগণের ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ছিল অবাধ অধিকার। খুব প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সনাতনী হিন্দু সমাজে এই রীতিরই অনুসরণ অব্যাহত রয়েছে। আমাদের আলোচ্য শতকের কবি যশশ্চন্দ্র তাঁর 'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মমুহূর্তের বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"ভাদ্রমাস কৃষ্ণাষ্টমী রোহিনী সংযুতা॥
অন্ধকার দূরে গেল নির্মল আকাশ।
উচ্চ ঘরে গ্রহ সব করিঞাছে বাস॥
অষ্টমী নবমী সন্ধি বেলা শুভক্ষণ।
সুমুহূর্ত অভিজিত শুভ গ্রহগণ॥
হেন শুভক্ষণে কৃষ্ণ ভুমিষ্ট হইল।"[২]

হিন্দুঘরের সংরক্ষণশীল বনেদী পরিবারে সন্তানের জন্মের সাল, মাস, পক্ষ, বার, তিথি, দিন, রাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল, অনুপল লিখে রাখা হতো। এখনও হয় না এমন নয়।

পরবর্তী কালের চিঠিপত্রে কোন দ্বারী ঘরে, কোন্ দিকে শিয়র করে, শিশু ভূমিষ্ঠ হলো, প্রসবের সময় প্রসূতির কাছে কোন্ পাড়ের কাপড় পরে কতোজন সধবা, কতোজন বিধবা উপস্থিত ছিলেন—জন্মক্ষণ-সংক্রান্ত ইত্যাদি প্রকার খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করার কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পাওয়া যায়[৩], জাতকের নির্ভুল লগ্ন নিরূপণ করে অভ্রান্ত কোষ্ঠী প্রস্তুতের জন্যে।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, শ্রীমন্তের জন্মের পরে গণকেরা 'দীপিকা' শাস্ত্রের সাহায্যে 'শিশুর জাওআতি'[৪] রচনা করেছিলেন। আবার জন্ম-পত্রিকা রচনায় অনেক সময়ে জ্যোতির্বিদদের নানারকম প্রতারণা সেকালেও চলতো। সতেরো শতকের শেষ দশকের রচনা যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে' জ্যোতির্বিদদের এই প্রতারকরূপ সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, 'জাতপত্রী' রচনা করবার জন্যে গণক খড়ি পেতে গণনা করে দেখলেন, জাতকের অতি দুর্লক্ষণ, কিন্তু সে সংবাদ মোটেই প্রকাশ না করে, রাজাকে প্রতারণা করে সুলক্ষণ বলে নানাবিধ পুরস্কার নিয়ে বিদায় হলেন।

---

১. পৃ. ২৮
২. বি ভা. পুঁ সং ১৯০৩, প. সং ২৩৪ ২৪ক।
৩. চি. প. স. চি. ২৯। প সং ৩ ক্র:।
৪. ক. ক চ. পৃ. ২৫৯।

গণিয়া দেখিল গণক বড় দুরাচার।
বার বৎসরের কালে মরণ ইহার॥
ধর্মরাজ পূজা নিতে জন্মাইল তনয়।
বুঝিয়া রাজারে গণক প্রতারণী কয়॥[১]

আলোচ্য সময়ে মুসলমান সমাজেও জ্যোতিষের চর্চা, তিথি-নক্ষত্রের বিধানিষেধ, গ্রহবিপ্র অথবা স্মার্ত-ভট্টাচার্য কর্তৃক জাতকের লগ্ন-নিরূপণ ইত্যাদি বনেদি মুসলমানেরা মেনে চলতেন বলে মনে হয়। আমাদের আলোচ্য সময়ে এরকম কোনো খবর পাওয়া না গেলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি কড়চাতে দেখা যায়, শ্রীসেখ আমিরদ্দীর লগ্ন করা হয়েছে শ্রীদুর্গা ও শ্রীহরি স্মরণ করে।[২]

নবজাতকের জন্মলগ্ন নির্ণয়ের পরেই জন্মের শুভ সংবাদ আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হতো, তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

'জ্ঞাতি বন্ধু আমার কুটুম্ব কত আছে।
অবশ্য পাঠাবে পত্র তা সভার কাছে॥'[৩]

এ কাজ ছিল রজক ও নাপিতের। একে বলা হতো 'বাধাই সাধা'।

রামদাস নাপিত রজক শ্রীনিবাস।
বাধাই সাধিতে যায় পরম উল্লাস॥'[৪]

সন্তান জন্মের খবর পেয়ে আত্মীয় বন্ধুরা আবার সংবাদবাহককে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করতেন।

শিশুজন্মের প্রথম দিনে প্রসূতি উপবাস করে। পরবর্তী তিন দিন তাকে ঝাল শপুলের পাচন দেওয়ার রীতি ছিল।

"তিন দিনে করাইল সুপাথ্য পাচন।'[৫]

চতুর্থ দিনে ভাত দেওয়া হতো।

'চারি দিনে সনকা রাণী ঝাল ভাত খায়।'[৬]

পঞ্চম দিনে 'পাঁচুটে' করার কথা প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যের কবিই বর্ণনা করেছেন। এই দিন প্রসূতি ও শিশু স্নান করে শুদ্ধ হলে, এয়োগণ মিলে নানা ধরনের কৃত্যপালন করতেন ও সন্ধ্যায় হরির-লুট দেওয়া হতো।

'পঞ্চম দিবসে সব নারীগণ মেলে।
পাঁচইত বিধিমত কৈল কুতূহলে॥'[৭]

---

১. ধ্বা. ধ. পৃ. ৭০।
২. চি. প. স. চি. ২য়। প সং ৫
৩. রূ ধ. পৃ. ১২৫।
৪. ঐ. পৃ ১২৬।
৫ ক. ক. চ. পৃ. ২৫০।
৬. বি. ম. পৃ. ৭৫।
৭ য গো. পৃ. ৪৯৭।

ষষ্ঠ দিনে সূতিকা-ষষ্ঠী পূজা অনুষ্ঠিত হতো। সতেরো শতকের প্রত্যেক কবিই এর বিশেষ বর্ণনা করেছেন। এই দিন বিধাতাপুরুষ এসে নবজাতকের কপালে ভাগ্য-লিখন লিখে দেবেন, এই রকম একটা বিশ্বাস সেকালে তো ছিলই, বর্তমান কালেও সাধারণের মধ্যে কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। এই দিন তাই জাতকের শিয়রে কালিকলম, তালপত্র ইত্যাদি রেখে দেওয়া হতো।[১] এই দিন নবজাতকের কাছে প্রসূতি ও অন্যান্য অনেকেরই সারারাত জেগে কাটানোর রীতি ছিল।[২] অনেক ক্ষেত্রে মঙ্গলগীত গাওয়া হতো। আমাদের আলোচ্য সময়ের কাব্যে ষষ্ঠ দিনে নবজাতককে ঘিরে কেবলমাত্র রাত্রি-জাগরণ নয়, সেখানে অনেকটা যেন সশস্ত্র পাহারার হদিস পাওয়া যায়। কোথাও দেখা যায়, 'হাথে খড়্গ লৈয়া রহিল জাগিয়া'[৩] আবার অন্যত্র পাওয়া যায়—'নানা অস্ত্রধারী বেড়ি রহে নিকেতনে'[৪] ইত্যাদি। মঙ্গলগীত সহযোগে নবজাতককে ঘিরে সশস্ত্র প্রহরায় এইভাবে রাত্রি জাগরণের কারণ মনে হয়, অপদেবতা বিতাড়ণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এই দিন সূতিকাগৃহে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হতো। জাতকের পিতা অথবা অন্য কোনো পুরুষ-আত্মীয় সন্ধ্যা-স্নানান্তে গণেশ-বন্দনা করে, 'জন্মদা' নামক এক দেবীকে পূজা করেন। এরপর ষষ্ঠীদেবীর পূজা হতো মহা সমারোহে রাত্রিকালে। আলোচ্য শতাব্দীর কবি রূপরাম বলিদান সহযোগে এই ষষ্ঠীপূজার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে।

'ছয় দিনে ষেটেরা পূজিয়ে বলিদানে।'[৫]

এর থেকে মনে হয়, এই রীতির প্রচলন বর্তমানে না থাকলেও, তখন অবশ্যই ছিল।

শিশু রক্ষায় ষষ্ঠীদেবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেবীভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়, শ্মশানে নিক্ষিপ্ত মৃত শিশুকে রথে করে তুলে নিয়ে প্রস্থানোদ্যতা দেবীরূপে। বিভিন্ন মাসে পূজিতা ষষ্ঠীদেবীর মেয়েলী ব্রতকথাতেও দেবীর যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে একদিকে তিনি যেমন শিশুর মঙ্গলদাত্রী, রক্ষা-কর্ত্রী অন্য দিকে আবার তিনিই শিশু-অপহরণকারী রূপে প্রকাশমানা। সম্ভবতঃ ষষ্টি-দেবীর এই ভয়দাত্রীরূপকে অভয়দাত্রী করে তুলবার জন্যেই, তাঁকে শিশুর ধাত্রীরূপে বর্ণনা করে, তাঁর কাছে শিশুর দীর্ঘজীবন ও সর্ব মঙ্গল কামনা করা হয়ে থাকে।

সতেরো শতকের অনেক কবি, বিশেষ করে মুকুন্দরাম, রূপরাম ও যাদুনাথ তাঁদের কাব্যে 'গোমুণ্ডে' ষষ্ঠীপূজার বিশেষ বর্ণনা করেছেন। এমন কি, রূপরাম ও মুকুন্দরামের উদ্দিষ্ট অঞ্চলে এখনও আঁতুড় ঘরে গোমুণ্ড আনা হয় বলে আমরা প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে জানতে পারি। বর্তমানে সূতিকাগৃহের বহির্দ্বারে গোময়নির্মিত পুতুলের ওপর কড়ির

১. 'মসী পত্র থুয়্যা কাছে'। হ. রা. পৃ. ১৬৩, সা. প্র. ৪।

২. 'সিঅরি পহরি সব জাগিতে লাগিল'। বি. ম. পৃ. ৭৫।

৩. হ. রা. পৃ. ১৬৫। সা. প্র. ৪।

৪. ক. ক. চ. পৃ. ২০৯।

৫. ক. ধ. পৃ. ৪৬।

চোখ বসিয়ে যে ষষ্ঠীপূজা করা হয়, তা 'গোমুণ্ডে'রই প্রতীক বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।[১] রূপরাম আবার তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে এই 'গোমুণ্ড' আনিয়েছেন 'কাপাস বাড়ী' বা দোফসলের ক্ষেত্র হতে।

'আনিল গোমুণ্ড ছাড়ি কাপাস বাড়ী হতে।'[২]

এটি আরও কৌতূহলোদ্দীপক। এই গোমুণ্ড বা মৃত গরুর সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর সম্পর্ক কোনো সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অবশেষ হতে পারে। তবে এই কৃত্য সম্পূর্ণ লৌকিক বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, হিন্দু 'জাত-কর্ম' সংস্কারের অধিকাংশ কৃত্যেরই উৎস লৌকিক।

শিশুজন্মের অষ্টম দিনে 'আটকলাই' অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন সন্ধ্যায় ছোটো ছোটো ছেলেদের আমন্ত্রণ করে আনা হতো। তারা এসে কুলো বাজিয়ে ছড়া কাটতো।

'আট দিনে শিশুগণে সন্ধ্যায় ডাকিল ॥
আট কড়াইয়া কইল কুলায় দিয়া বাড়ী।
ছাওআলে নিছনি দিল একইশ পণ কড়ি ॥'[৩]

তারপর তাদের খই, বাতাসা ও আটকলাই ভাজা দেওয়ার রীতি [illegible] অনেক সময় 'হরির-লুট' দেওয়ারও প্রচলন দেখা যায়।

'আট কলাইয়া কৈল অষ্ট দিবসে।
বালক ডাকিঞা নন্দ পরম হরিষে ॥
কাঞ্চন রতন ধন কড়ি খই সনে।
লুটায় কৌতুকে নন্দ ডাকি শিশুগণে ॥'[৪]

সতেরো শতকের কবি যাদুনাথ তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' ও যশশ্চন্দ্র তাঁর 'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যে এর বর্ণনা করেছেন।

নবম দিনের কৃত্য হিসেবে অধিকাংশ কবিই 'নত্তা'র বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এই উৎসবকে পঞ্চম দিনের উৎসব বলে বর্ণনা করেছেন। তাই 'নত্তা' বা 'লতা' ঠিক কোন দিনের কৃত্য স্থির করা কঠিন। মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে অবশ্য বলেছেন—'নত্যা কৈল নয় দিনে'।[৫] মুকুন্দরামের পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রখর বাস্তব দৃষ্টি থাকার ফলে, সমকালীন সামাজিক খুঁটিনাটি কোনো আচার-অনুষ্ঠানই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তাঁর কাব্যের মধ্যে যেন সমগ্র সমাজটাই ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। এই দিক দিয়ে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যকে আকর গ্রন্থও বলা যায়। সেই জন্যে নত্তা

১. ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ৭. ৯২ দ্রষ্টব্য।

২. রূ. ধ. পৃ ৬১।

৩. যা. ধ. পৃ. ৭০।

৪. য. গো. পৃ ৪৯খ।

৫. ক. ক. চ. পৃ. ২৬০।

নবম দিনের কৃত্য বলেই আমরা মনে করছি। এই আচারের কোনো শাস্ত্রীয় মূল্য পাওয়া যায় না। কবিরাও একে লোকাচার বলেই বর্ণনা করেছেন।

॥ নামকরণ ॥ 'জাত-কর্মের' একটি বিশিষ্ট অঙ্গ উত্থান কৃত্য। এই অনুষ্ঠানটি হতো শিশুর শয্যা হতে উত্থান দিবসে। সতেরো শতকের কবি যশশ্চন্দ্র তাঁর 'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যে এর বর্ণনা করেছেন।

"উত্থান দিবসে মনের হরিষে
ডাকি নন্দ কুলবতী নারী।
মঙ্গলপূর্ব্বক ঘৃত অভিষেক
বিপ্রগণে লঞা সারি সারি॥
নানাবিধ বাজনা হইতেছে কতন
ব্রাহ্মণ করএ বেদপাঠ।
আইয় সয় মেলি দেই হুলাহুলী
কত রায়বার পড়ে ভাট॥"[১]

শিশু জন্মের পর একুশ দিনের দিন এটি অনুষ্ঠিত হতো বলে কবিগণ একে 'একুস্যা', 'একোস্যা' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন। এইদিন হোম, বেদপাঠ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাবার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এই দিনই নামকরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোনো কোনো কবি আঁতুড় ঘরেই, আবার কেউ কেউ বা অন্নপ্রাশনের দিন নামকরণের উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে অন্নপ্রাশনের দিনেই নামকরণের প্রচলন দেখা যায়।

॥ অন্নপ্রাশন ॥ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান কবিদের কাব্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের চিঠি-পত্র থেকে জানা যায় অন্নপ্রাশনে বচকনি চেলির 'জোড়'[২], ও 'হাঁশুলি', খেড়ুয়া[৩] দিয়ে শিশুকে সাজানো হতো। আত্মীয়-বাড়ী থেকে 'আশীর্বাদী' ও 'লৌকুতা'[৪] আসতো। এই উপলক্ষে, আত্মীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণের রীতি তখনও ছিল, এখনও আছে।

বাংলায়, বিশেষ করে রাঢ়-অঞ্চলে রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রই বিশেষভাবে প্রচলিত। সুতরাং আমাদের আলোচ্য যুগের অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানই রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে'র বিধানে আচরিত। এই স্মৃতিশাস্ত্র আবার প্রচলিত নানা আচার, অনুষ্ঠান ও পূর্বসূরীদের বিধি-বিধান অবলম্বনে সংকলিত। সুতরাং রাঢ় দেশের বাঙালি সমাজে ধর্মে-কর্মে আচরিত কৃত্যের মধ্যে প্রবাহমান লৌকিক ধারার পরিমাণও নিতান্ত নগণ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের, বিশেষ কোনো সময়ের সামাজিক রীতিনীতি আলোচনা

১. য. গো. পৃ. ৫৮২
২. বি. ভা. প. সং ১।
৩. ঐ. সং ৩০২।
৪. ঐ. সং ৫০১।

করে, তা-থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়। তবুও রাঢ়ীয় বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের এই সব ধর্মকর্মের বৈদিক সূত্রানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক যোগ-সূত্রটির অনুসন্ধান করাও বোধহয় যুক্তিযুক্ত। কারণ, বাঙালির ধর্মেকর্মে আচার-আচরণে আর্য ও আর্যেতর প্রভাব সমান ভাবেই পড়েছে, একথা সর্বজনবিদিত। আমাদের আলোচ্য 'জাত-কর্ম' সংস্কারের যে সব রীতি-নীতির আলোচনা করা গেল, তাতে দেখা যায়, এই সব অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় ও শাস্ত্র বহির্ভূত বহু কৃত্য প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এদের মধ্যে, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দেশ-কাল-ভেদে সমানভাবে চলে আসছে। তার কোনো মৌলিক পার্থক্য ঘটে নি। কিন্তু ঐতিহ্যমূলক এই সব শাস্ত্রীয় কৃত্যাবলী ছাড়াও অধুনাতন 'জাত-কর্ম' সংস্কারের মধ্যে লৌকিক ধারাটির স্থান-কাল-ভেদে নানা বৈচিত্র্য ঘটে গেছে। সাধারণতঃ এই লৌকিক রীতিনীতিগুলিকে 'মেয়েলী-শাস্ত্র' বা 'স্ত্রী-আচার' বলা হয়। কিন্তু এই 'মেয়েলী-শাস্ত্র' তথাকথিত শাস্ত্র না হলেও, একে আমরা কখনোই উপেক্ষা করতে পারি না। এই সব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি সম্ভবতঃ আর্যেতর ব্যবহার-প্রসূত। আর্যেতর স্ত্রী-গণের মাধ্যমে আর্যসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আবার মেয়েরা স্বভাবে রক্ষণশীল বলেই, এই সব পুরোণো আর্যেতর আচার আর্যসমাজে গৃহীত হবার পর থেকেই হয়তো স্ত্রী-সমাজ সংস্কার-বশতঃ একে সযত্নে লালন করে এসেছেন। আজও রাঢ় বাংলার প্রাচীন গ্রামগুলির রক্ষণশীল বাড়ীতে অনুষ্ঠিত, প্রচলিত মেয়েলী আচার অনুষ্ঠান সংগ্রহ করে তুলনামূলক আলোচনা করলে, বিচিত্র বাঙালি-সংস্কৃতির এমন এক মৌলিক প্রেক্ষাপট আবিষ্কৃত হতে পারে, যার বেশির ভাগই অন্-আর্য আচারের ছাঁচে ঢালা।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

"অষ্টাদশ ছাওয়াল পড়িছে নিরন্তর।
অষ্টশব্দি আদি পড়িল অমর॥
বিবিধ প্রকারে শিখিয়াছে সভে।
অষ্ট কোঠা অষ্টপর শিক্ষা করে ইবে॥
সরকার বেড়িয়া সভে বস্তে জানি ব।
অধ্যয়ন করাইছে সুখী রাম খাঁ॥"

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্নটি আদিস্থানের অনেকগুলিই বিদ্যানগরী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সতেরো শতকে বিদ্যাপীঠ হিসাবে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের ছিল পূর্ণ গৌরবময় যুগ।[১] এছাড়া, রাঢ়ের প্রায় প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু গ্রামেই টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল। এই সময় বিখ্যাত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের টোল ছিল শান্তিপুরে।[২] দেশ বিদেশ থেকে বিদ্যার্থীর সমাগম হতো তাঁর কাছে, ভারতীর পাঠ নেবার জন্য। বর্ধমান জেলার জোগ্রামে বিখ্যাত কলানিধি ভট্টাচার্যের বিদ্যাপীঠ ছিল। তাঁর গৌরব শান্তিপুরের বিদ্যানিধি অপেক্ষা বেশী ছিল। এই জেলারই কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর টোল ছিল খুব বড়ো। এই টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল 'একশত কুড়ি'। শ্রীরামপুরের কাছে পাষণ্ডা গ্রামে এবং আড়ুই গ্রামেও টোল ছিল। সপ্তদশ শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তী সেখানে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সেখানে রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলেও শতাধিক ছাত্র পাঠগ্রহণ করতো। এছাড়া, ভাটপাড়া, কালনা, আন্দুল, উত্তরপাড়া, বীরনগর, কামালপুর, কাউগাছি, কুমারহট্ট, কুশদ্বীপ, কোন্নগর, গুপ্তিপাড়া, পুঁড়া, নৈহাটী, বালী, বাঁশবেড়িয়া, বেলপুখরিয়া, মুর্শিদাবাদ, মূলাজোড়, শালিকা, চাতরা, ত্রিবেণী, বালিগড়ি, দশঘরা, ভদ্রেশ্বর, ছোটবৈনান, দামিন্যা, শাদিপুর, মির্জাপুর, সিঙ্গুর,

১. ফুলিয়া নিবাসী কৃত্তিবাস ওঝা 'বড় গঙ্গা' পার হয়ে উত্তরবঙ্গে গিয়ে নানা গুরুর কাছে পাঠ গ্রহণ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন বলে তাঁর রামায়ণের 'আত্মকাহিনী' অংশে বর্ণনা করেছেন। এর থেকে মনে হয় বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপের উদ্ভব তখনও হয় নি। তা যদি হতো, তবে কৃত্তিবাস উত্তরবঙ্গে না গিয়ে নবদ্বীপেই পড়তে যেতেন। কারণ নবদ্বীপ তাঁর গ্রাম ফুলিয়া থেকে অনেক কাছে হতো।

২. রূ. ধ. পৃ. ১৯।

ভুরশুট ইত্যাদি বহু সমৃদ্ধ নগরীতে তখন এক বা একাধিক বিদ্যায়তন বর্তমান ছিল'।[১] এর থেকে তখনকার রাঢ় বাংলায় শিক্ষার কতোদূর প্রসার ঘটেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সময়কার বাংলায় সংস্কৃত-চর্চার প্রধানতঃ তিনটি ধারা ছিল। নব্যস্মৃতি, নব্যন্যায় ও তন্ত্র। স্মৃতি-নিবন্ধকারদের মধ্যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ষোড়শ শতকে বর্তমান ছিলেন। স্মার্ত রঘুনন্দনের পরেও বাংলায় অনেক স্মৃতিকারের আবির্ভাব হয়। তবে তাঁদের মধ্যে মৌলিকতার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। ফলে, সতেরো শতক থেকেই বাংলায় স্মৃতিশাস্ত্রের অবনতি শুরু হয়। এই সময়ের স্মৃতিকারদের মধ্যে কাশীরাম বাচস্পতি ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার নৈয়ায়িকদের মধ্যে ষোড়শ শতকের রঘুনাথ শিরোমণি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

সতেরো শতক বাংলার নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রে 'শিরোমণি উত্তর যুগ' বলে চিহ্নিত। এই যুগে মৌলিক গ্রন্থ কিছু রচিত হলেও শিরোমণি যুগের নৈয়ায়িকদের প্রতিভার মতো, এই যুগের নৈয়ায়িকদের প্রতিভা তেমন উচ্চশ্রেণীর ছিল না। এই যুগকে 'টীকা যুগ' ও 'পত্রিকা যুগ'—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। টীকা যুগের লেখকদের মধ্যে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, রামভদ্র সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং গদাধর ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হয় পত্রিকা যুগ। পত্রিকা যুগের নৈয়ায়িকরা প্রধানতঃ মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-সমূহে অনুপপত্তি উত্থাপন করে তার সমাধান করতেন।[২] তাঁদের এই শ্রেণীর রচনাগুলিই 'পত্রিকা' নামে পরিচিত। রাঢ় বাংলার পূজাপার্বণ ও স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে তন্ত্রের প্রভাব খুব বেশী। এদেশে বাঙালি পণ্ডিতরা তন্ত্রের চর্চা এবং অনেক তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। এঁদের মধ্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিক্ষণের তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই শাস্ত্রে যুগন্ধর পুরুষ ছিলেন। বাংলায় প্রচলিত কালীপূজার মূর্তি-কল্পনা ও পূজাবিধির প্রবর্তন ইনিই করেছিলেন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। এঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তন্ত্রসার'।

সপ্তদশ শতকে রাঢ় দেশে ছাত্রদের মধ্যে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। (ক) সংস্কৃত টোলের শিক্ষা, (খ) বাংলা পাঠশালার শিক্ষা এবং (গ) আরবী-ফারসী মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ছাত্ররা সংস্কৃত টোলে শিক্ষালাভ করতো। ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুছাত্র বাংলা পাঠশালায় পড়তো এবং মুসলমানরা আরবী-ফারসী বিদ্যায়তনে পড়তো। প্রথমে এরা মক্তবে, তারপর

১. বাংলার সারস্বত অবদান, পৃ. ২৮৪-৩১৫; প্রবাসী জ্যৈঃ ১৩৫৩, পৃ. ১১৩ ১৭।
২. বা. দে. ই. ২য়, পৃ. ৩৪০।

মাদ্রাসায় পড়তো। বর্তমান অধ্যায়ে এই তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

॥ **সংস্কৃত-শিক্ষা** ॥ সংস্কৃত-শিক্ষার বিদ্যায়তনগুলি 'টোল' নামে পরিচিত। কখনও একে 'চতুষ্পাঠী'ও বলা হতো। সাধারণতঃ ব্যাকরণ, স্মৃতি (আইন), পুরাণ ও দর্শন এই চার রকমের শাস্ত্র যেখানে পড়ানো হতো তাকেই 'চতুষ্পাঠী' বলা হতো।

সংস্কৃত বিদ্যায়তনে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ সন্তানদের প্রবেশাধিকার ছিল। তবে ধনাঢ্য বণিক সন্তান বা সংশূদ্ররাও অনেক সময় এই শিক্ষা লাভ করতে প্রয়াসী হতো। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত সদাগরকে আমরা 'দলাই ওঝার' নিকট সর্বশাস্ত্র বিশারদরূপে পাঠ গ্রহণ করতে দেখি। এই উচ্চতর শিক্ষণপদ্ধতিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। এই শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে পুঁথিগত শিক্ষা। তবে, এর সঙ্গে ছাত্রদের আচার-বিচারের ব্যবহারিক শিক্ষাও অভিভাবকরা গুরুর কাছে আশা করতেন।

আচার বিচার দীক্ষা জতনে করাও শিক্ষা।
জাকু ছিরা তোমার নিলয়।[১]

টোলে পাঠক্রম কেমন ছিল, মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য ও রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের বাস্তবধর্মী বর্ণনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যারম্ভের একেবারে প্রথম পর্বে 'রামখড়ি' হাতে নিয়ে আচার্য ক-খ আদি চৌত্রিশ অক্ষর লিখে দেখান।

'খড়ি হাতে দ্বিজ তবে দেখান অক্ষর।'[২]

তারপর কিছুদিন গুরুর লেখা অক্ষরের ওপর দাগা বুলিয়ে অক্ষর পরিচয় জ্ঞানের প্রাথমিক সূচনা হয়। এই শিক্ষা চলতো দশ থেকে বারো দিন পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে অষ্টশব্দী, আঠারো ফলা, আঙ্ক-আঙ্ক, বানান ইত্যাদির পাঠ সমাপ্ত হতো। এরপর শুরু হতো ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদির পাঠ। ব্যাকরণের মধ্যে 'জুমর' বা জুমর নন্দীর টীকাসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, মম্মথ ভট্ট রচিত অলংকার-শাস্ত্র 'কাব্যপ্রকাশ', ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্যতম শাখা 'সুবন্ত', 'নিরুক্ত' বা শব্দপ্রকরণ, পতঞ্জলি 'মহাভাষ্য', পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-ব্যাকরণ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অভিধানের মধ্যে অমর সিংহের তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ সংস্কৃত অভিধান ছিল পাঠ্যতালিকাভুক্ত। ইতিমধ্যে আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' শেষ করে, পিঙ্গল রচিত 'ছন্দসূত্র', বিশ্বনাথ কবিরাজের কাব্যশাস্ত্র-বিচার-বিষয়ক অলংকার-শাস্ত্র 'সাহিত্য দর্পণ' আয়ত্ত করে নিতে হতো কাব্যপাঠের পূর্বেই। এরপর বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানবার জন্যে সেই সম্পর্কিত বিবিধ মতামত জানতে হতো। এই পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে সময় লাগতো ছয়-সাত মাস।

১. ক. ক. চ. পৃ. ২৭০।
২. রূ. ধ. পৃ. ১৪৪।

'সাতমাসে সাত টীকা পড়াইল গোসাই।'[১]

এইভাবে ব্যাকরণবোধ সম্পূর্ণ হলে পড়ুয়া কাব্যপাঠের অধিকারী হতো। রস-কাব্যপাঠের অনুমতি লাভ করলে পড়ুয়াদের আর দিবারাত্র জ্ঞান থাকতো না।

'বিদ্যাবিনু ক্ষুধাতৃষ্ণা মনে কিছু নাই।'[১]

অথবা—

'দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেত মুনি।'[২]

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবিরাজ পণ্ডিতের 'রাঘব-পাণ্ডবী', ভারবী-রচিত 'কিরতার্জুনীয়' মাঘ-রচিত 'শিশুপাল বধ', নলচরিত্র অবলম্বনে 'শ্রীহর্ষ'-রচিত মহাকাব্য 'নৈষধ', কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'রঘুবংশ', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', জৈমিনির 'ভারতকথা', ভবভূতির 'মালতীমাধব', বিশাখ দত্তের 'মুদ্রা-রাক্ষস', মুরারির 'অনঘ রাঘব' ইত্যাদি একে একে অধীত হতো।

নাটকের মধ্যে শ্রীহর্ষ-রচিত 'রত্নাবলী' ও সুবন্ধু-রচিত নায়িকা বাসবদত্তার চরিতকথা-মূলক গদ্যগ্রন্থও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শাস্ত্রের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র প্রধান ছিল। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু শর্মা-রচিত 'হিতোপদেশ', শ্বেতমুনি-রচিত 'পুরাণ-পঞ্চরাত্র', রঘুনাথ শিরোমণির 'নব্যন্যায়', জৈমিনির 'মীমাংসা দর্শন' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে চলতো জ্যোতির্বিদ্যা ও বৈদ্যক-শাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রীনিবাস-রচিত গ্রন্থ 'দীপিকা' ও 'ভাস্বতীকরণ' এবং ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে 'গণবৃত্তি' ইত্যাদি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জানা যায়।

সর্বদা-পাঠরত মেধাবী ছাত্রের প্রতিভায় তুষ্ট হয়ে অধ্যাপকগণ অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে তাকে সর্বাগ্রে পঠন-পাঠনের অধিকার দিতেন।

'বিশাসয় পড়ুয়া মধ্যে আমি পড়ি আগে।'[৪]

এরপর, অধ্যাপক ও ছাত্র আরও গভীরভাবে বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করতেন। টোল বসতো সকালে ও বিকালে। কোনো দিন গুরু পাঠ করে চলতেন, ছাত্রগণ বসে শুনতো, আবার কোনোদিন ছাত্র পাঠ করে চলতো, আর গুরু শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। কোনও বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে গুরুকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাবার রীতি ছিল। অধ্যাপকরাও এই সব সমস্যার সমাধান করতে কোনো রকম অবহেলা করতেন না। এইভাবে পুঁথিগত পাঠ সমাপ্ত হলেও পড়ুয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতো না। তাকে নিজের পাঠ সমাপ্ত করে দিনের পর দিন অন্যান্য পড়ুয়ার পাঠ শুনতে হতো।

১. ক্ব. ধ. পৃ. ১৮।
২. ঐ. ঐ.।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ২৭৩।
৪ ক্ব. ধ পৃ. ১৮।

"সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন।
কৌতুকে শুনেন জত পড়য়ে ব্রাহ্মণ॥"[১]

এবং কোনো রকম ভুলভ্রান্তি হওয়ামাত্র 'পূর্বপক্ষ' অবলম্বন করে তর্ক করবার রীতিও প্রচলিত ছিল। অনেকটা যেন একালের সেমিনার পদ্ধতির মতো, সেকালেও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মৌলিক গবেষণা চলতো। কিন্তু, এই প্রশ্নোত্তরের প্রসঙ্গে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো মেধাবী শিষ্য বারংবার পূর্বপক্ষ গ্রহণ করলে, এই শিক্ষকই আবার চরম অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতেন। কখনও বা 'শিশুর' সঙ্গে টীকার বিচার করতে চরম অপমানিত বোধ করতেন

"শিশু বুঝাবারে মোর টীকার বিচার
ইহার অধিক অপমান কিবা আর॥"

আবার কখনও বা অপর পড়ুয়াদের প্রতি নজর দিতে পারলেন না বলে রুষ্ট হয়ে উঠতেন

"বিদ্যাশয় পড়ুয়া থাকে মোর মুখ চায়া
দুই প্রহর বেলা যায় এহার লাগিয়া॥"[২]

অধ্যাপক ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক সময় শিষ্যকে পুঁথির বাড়ি মেরে প্রহার করতেন বলেও জানা যায়

"ঐস না পুথির বাড়ি বসাইল গায়।

তারপর শিষ্যকে একদিন যেমন সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন, তেমন হঠাৎ একদিন প্রয়োজনবোধে অবহেলায় বিতাড়ন করে দিতেও বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করতেন না।

আমাদের আলোচ্য শতাব্দীর সংস্কৃত বিদ্যায়তনের পাঠক্রমের এই তালিকা দীর্ঘ মনে হলেও, মেধাবী ছাত্ররা এই শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারতো মাত্র এগারো বছর বয়সের মধ্যেই।[৫]

॥ বাংলা শিক্ষা ॥ এদেশে সংস্কৃত ভাষা যখন থেকে সাধারণের ব্যবহার্য ভাষার মর্যাদা হারাতে শুরু করলো, বাংলা শিক্ষার প্রাধান্য শুরু হতে আরম্ভ করলো তখন থেকেই।

আমাদের সমীক্ষিত সতেরো শতকে প্রত্যেক বড়ো বড়ো গ্রামেই এক বা একাধিক পাঠশালা বর্তমান ছিল। পাঠশালায় বাংলা শিক্ষা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির সন্তানরাই গ্রহণ করতো।[৬] আর শিক্ষকরা হতেন প্রধানতঃ কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়।

---

১ ক, ধ, চ, ...
২ ঐ পৃ ১৭৭
৩ ক, ধ পৃ ১৯
৪ ঐ ঐ
৫ ঐ পৃ ১৪০
৬. এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সর্বসাধারণের জন্যে অবারিত এই বাংলা পাঠশালাকে অনেক সময়ে সংস্কৃত টোলের অনুসরণে 'চৌপাড়ী' নামেও অভিহিত করতে দেখা যায়, কিছু পরবর্তী কালের নিদর্শনে।[১] সেকালের এই পাঠশালার শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিমূলক। একটি সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলেকে ব্যাবহারিক জ্ঞানের দিক্ দিয়ে সম্পূর্ণ যোগ্য করে তুলতে এই সকল পাঠশালার পাঠ্যতালিকা ছিল পর্যাপ্ত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলা পাঠশালাগুলি নিজেদের শিক্ষা প্রণালীকে যুগোপযোগী করে তুলতে চেষ্টা করেছে। এই বিন্যাসতনে শিক্ষাপদ্ধতির মোটামুটি চারটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে অক্ষর পরিচয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষর লিখন, তৃতীয় পর্যায়ে শব্দপ্রস্তুত প্রণালী, শব্দজ্ঞান, ব্যাকরণ, গণিত এবং কথ্য ও লেখ্য ভাষার পার্থক্য বোধ ও চতুর্থ পর্যায়ে চলতো উন্নত ধরনের গণিত ও পত্র লেখার ধারা শিক্ষা।

"শ্রীগুরুচরণ বন্দ করিয়া মস্তকে।
পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে॥"[২]

গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সমীক্ষিত যুগে 'স্যাখত' বা গণিতের সমস্যামূলক কবিতার প্রচলন ছিল। সতেরো শতকের একটি পুঁথিতে[৩] এই শ্রেণীর অনেক অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠি, ঋণ-সংক্রান্ত চিঠি, আইন-আদালত-সংক্রান্ত চিঠি, ব্যক্তিগত চিঠি, দরখাস্ত, কবুলতি পত্র ইত্যাদি যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ই সেকালের বাংলা পাঠশালার পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। রাঢ়ের সর্বত্র পাঠশালায় এই একই ধরনের শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সেকালে শিক্ষা প্রণালীতে প্রথমে লেখা ও পরে পড়া শেখানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

পাঠশালায় সাধারণত গরীবের ছেলেরাই পড়তো। তবে গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী বা জমিদারের ছেলেকেও অনেক সময়ে পাঠশালায় পড়তে দেখা যেতো। সে সব ক্ষেত্রে সাধারণত ধনীসন্তানের জন্যে গুরু নিযুক্ত হতেন এবং অন্যান্য পড়ুয়াদেরও সেখানে অবারিত দ্বার থাকায়, কালক্রমে সেটি একটি সাধারণ পাঠশালায় পরিণতি লাভ করতো।

হিসাবে সমাজের বিদগ্ধ শ্রেণীর কথাই আমরা মনে করে থাকি। কিন্তু বাংলা পুঁথির পুষ্পিকাতে লিপিকর, পাঠক, মালিক এদের পরিচয়ের সূত্র ধরে শিক্ষার বিচিত্র নজীর পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যদের মতো মাত্র কয়েক ঘর পণ্ডিত আর বুদ্ধিজীবীরাই নন, সাধারণ মানুষের মধ্যেও লেখা-পড়ার চল ষোড়শ সপ্তদশ শতক থেকে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। পুঁথি পাঠ বা সাহিত্যানুশীলনে তখন কোনো রকম জাত-ধর্মের বিচার ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় ধর্মমঙ্গল রচয়িতা সহদেব সাউ জাতিতে শুঁড়ি ছিলেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের জাত জানা না গেলেও তাঁর পিতার নাম জানা যায় শঙ্কর মণ্ডল। এঁরা সম্ভবতঃ জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন। এছাড়াও হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগ্দি এই শতকেই পুঁথি নকল করেছেন এরকম উদাহরণ পুষ্পিকা থেকে ভূরি ভূরি মেলে।

১. চি. প. স. চি. ১ম. পৃ. ২২৯।
২. বি ভা. পু. সং ১৭।
৩. ঐ. ঐ.।

এখনকার মতো সেযুগে পাঠশালায় কেবল পাঠ পড়ানো হলেই শিক্ষা সমাপ্ত হতো না। পড়ালেখার সঙ্গে সঙ্গেই চলতো নৈতিক আচারবিচারের প্রতি শিক্ষাদান। গুরু মহাশয়রা ছাত্রদের শীল-আচরণ শেখাতেন এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি প্রখর দৃষ্টিপাত করতেন। অভিভাবকরাও শিক্ষকের কাছ থেকে এটুকু আশা করতেন।

।। **মক্তব-মাদ্রাসায় আরবী-ফার্সী শিক্ষা** ।। মুসলমান সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের অনেক সুলতান মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে এই শ্রেণীর বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া, মসজিদে ও সুফীদের দর্গাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে মক্তবে, তারপর মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করতো। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষায় হতো। উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফার্সী ভাষার সাহায্যেই হতো। অনেকে আরবী ভাষারও চর্চা করতেন। ধর্মীয় শিক্ষা আরবী ভাষার মাধ্যমেই হতো। মুসলমান সমাজে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হতো।

আমাদের আলোচ্য সময়ে মুসলমানদের পাঠক্রম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মক্তব ও মাদ্রাসা উভয় বিদ্যায়তনেই কোরাণ-শরীফ অবশ্য পাঠ্য ছিল।[১] উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্লাতো, আরিস্ততল, সিনা-রুশ্‌দ, আবুরুশ্‌দ, গুলাত্‌[২], অল-গজ্জালী[৩] ইত্যাদি মনীষীদের দর্শনশাস্ত্র, বু-আলীসিনার চিকিৎসাশাস্ত্র 'য়ুনানী' বা 'ইউনানী'[৪] পড়ানো হতো।

।। **ব্যবহারিক শিক্ষা** ।। আমাদের আলোচ্য যুগে প্রত্যেক ভদ্র গৃহেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সাধনার জন্য বাড়ীতে পুঁথি রাখা হতো সযত্নে। এই সব পুঁথি নকল করা তখনকার দিনে একটি প্রধান পেশা ছিল। হস্তাক্ষর ভালো হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই পেশা গ্রহণ করতে পারতো। পুঁথি লেখার এই ব্যবহারিক শিক্ষার সম্বন্ধে পাঠশালাতেও ছাত্রদের সচেতন করে দিতে দেখা যেতো।

বানান শিখিলে কিছু নাই য়গোচর।
অবহেলে চালাইবে পুঁথির অক্ষর ॥

এর থেকে পুঁথি লেখা পেশার ব্যাপ্তি উপলব্ধি করা যায়। কারণ সেকালে কোনো গ্রন্থ ভালো লাগলে তা নকল করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল ॥[৫]

১. বা. দে. ই. ২য়, পৃ. ২৩৮।
২. জড়বাদ।
৩. এঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ 'কিমিয়া সাদৎ'।
৪. চরক সুশ্রুতের আরবী অনুবাদে পুষ্ট গ্রন্থ
৫. চৈ. চ. (ম), পৃ. ২৯১।

শুধুমাত্র সযত্নে গৃহে পুঁথি রাখার জন্যেই সেকালে পুঁথি নকল হতো না। কীর্তন-গান, পুরাণ-কথকতা ইত্যাদির কারণেও পুঁথি নকল করিয়ে নেওয়ার প্রচলন ছিল।

সেকালে শ্রাদ্ধ ও বিবাহ-বাসরে অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করা হতো 'জ্যোতিষ-সংকেতে'। সমাজের কিছু পণ্ডিত ছিলেন এই শ্রেণীর পত্র রচনায় পারদর্শী। এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে পর্যন্ত এই পত্র রচনা করে দেবার জন্যে অনুরোধ যেতো। এই পত্রগুলি ছিল একপ্রকার চিত্রকবিতা। 'পদ্মবন্ধ', 'নৌকাবন্ধ', 'সর্পবন্ধ' ইত্যাদি এদের বিভিন্ন নামও পাওয়া যায় কিছু পরবর্তী কালের চিঠিপত্রে।[১] এছাড়া, সাধারণ হেঁয়ালীতে চিঠি লেখার রীতিও প্রচলিত ছিল। সেকালের অভিজাত পরিবার থেকে চাষার ঘর পর্যন্ত, নির্বিশেষে এই প্রহেলিকাপত্রের আদান-প্রদান চলতো। সম্ভবতঃ এই কারণেই তখন পাঠশালায়ও পত্র লিখবার ধারার মধ্যে, হেঁয়ালীতে চিঠি লেখার ধারাও পাঠ-তালিকাভুক্ত ছিল।[২] সতেরো শতকের প্রথম পাদে রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব ও অদ্বৈতাচার্যের মধ্যে তর্জা পদ্ধতিতে পত্র আদান-প্রদানের প্রাচীনতর প্রসঙ্গ পাই। এছাড়া, সতেরো শতকের কবি ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে ব্যক্তিগত পত্র রচনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পত্র রচনায় এক বিশেষ রীতিকে অনুসরণ করে চলেছেন।

স্বস্তি আদি লিখিঞা লেখিল গুণবান
সকল মঙ্গল ধাম সেন গুণবান ॥[৩]

এর থেকেও মনে করা চলে, আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকে পত্র রচনার রীতি শিক্ষা দেওয়া হতো। এই সময়ের বিভিন্ন 'মঙ্গলকাব্যে রাজার ছেলের যুদ্ধ-বিদ্যা'[৪], ব্যাধের ছেলের ধনুর্বিদ্যা[৫] ইত্যাদি ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার খবর পাওয়া যায়। রাজপুত্রের ক্ষেত্রে অন্যান্য শাস্ত্র, অলংকার ইত্যাদি শিক্ষা ছিল সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে। কিন্তু, তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হতো ইতিহাস, অর্থনীতি, আইন, শিকার ও যুদ্ধ বিদ্যার প্রতি। এছাড়া, সঙ্গীত, চিত্র-শিল্প ইত্যাদি কলাবিদ্যার প্রতিও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হতো।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে বিভিন্ন জাতির বর্ণনার মধ্যে দিয়েও সমাজের নানা শ্রেণীর বৃত্তিমূলক শিক্ষার খবর পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ্যা ও বৈদ্যক শাস্ত্রের

১. "পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষঃ পদ্মবন্ধ এক কবিতা পাঠাই ইহার ভাবার্থ লিখিয়া পাঠাইবেন আর নাগপুরের শ্রীসুধাকৃষ্ণ সিংহের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ১৫ ফাল্গুনে হইবেক তাহার এক নৌকাবন্ধ কিম্বা আর কুনু প্রকার বন্ধ এক কবিতা করিয়া এবং তাহার অর্থ লিখিয়া অতি শীঘ্র পাঠাইবেন কদাচ বিলম্ব না হয়। ইতি" বি. ভা. প. সং ১২৮।

২. চৈ. চ. (অ), ১৯শ অধ্যায়।

৩. ধ ব. ধ. ম. পৃ ২৯৫ ক, বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮।

৪. ব. গো. বি.।

৫. ক. ক চ.।

চর্চাকেও এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেযুগে শল্য বিদ্যা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল কোথাও কোথাও।

॥ **স্ত্রী-শিক্ষা** ॥ বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকদের ধর্মীয় অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করার অধিকারকেও স্বীকার করা হতো। গার্গেয়ী, মৈত্রেয়ী, এঁদের পরিচয় থেকে জানা যায়, বৈদিক যুগে স্ত্রী-শিক্ষার অভাব ছিল না। বৌদ্ধ যুগে এবং পরবর্তী মুসলমান রাজত্বে স্ত্রী-শিক্ষার গণ্ডী সীমিত হয়েছে। তবু, এর মধ্যেও সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের রাঢ় বাংলায় কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালিনী মহিলার যে আবির্ভাব হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন, নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী। ইনিই নিত্যানন্দ দাসকে 'প্রেম-বিলাস' কাব্য রচনা করতে অনুপ্রাণিত করেন। খেতুরির মহোৎসবের বর্ণনায় তাঁর ব্যক্তিত্বই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। এছাড়া, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্রবধূ, সুভদ্রাদেবী 'অনঙ্গকদম্বাবলী' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে।

আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবী। ইনি পিতার জীবৎকালেই বৈষ্ণব-সমাজে নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। পদকর্তা যদুনন্দন ও নরোত্তম দাস তাঁর শিষ্য। শ্রীনিবাসের পত্নী ঈশ্বরীদেবী, তাঁর বড়ো পুত্রবধূ সত্যভামাকে দীক্ষা দেন। সত্যভামাদেবী সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীজীবের সংস্কৃত রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[১] মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী, রামায়ণের পালাগান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া, আলোচ্য সময়ে দু-একজন স্ত্রী-পদকর্তারও আবির্ভাব ঘটে।[২] সুতরাং, সতেরো শতকে সমাজের অন্ততঃ একটি বিশেষ স্তরের স্ত্রীলোকের মধ্যে যে উচ্চতর শিক্ষার প্রবেশাধিকার ঘটেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নারী সমাজের বৃহৎ অংশ, সাধারণ স্ত্রীলোকের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যার প্রচলন বিশেষ না ঘটলেও, ঘরোয়া হিসাব রাখা, চিঠিপত্র লেখা, প্রবাদ প্রবচন বলা, পুরাণ ভাগবতের কাহিনী সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, হেঁয়ালী বা ধাঁধার সৃষ্টি ও তার সমাধান করা ইত্যাদির উপযোগী শিক্ষার অভাব ছিল না।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানে সপত্নী খুল্লনাকে কষ্ট দেবার জন্যে স্বামীর নাম দিয়ে সখী লীলাবতীকে দিয়ে 'কপট প্রবন্ধে' পত্র রচনা করানোর মাধ্যমে স্ত্রী-শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সেই পত্র দেখে খুল্লনার স্বামীর হস্তাক্ষর নয় বলে সন্দেহ করার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লীলাবতীর ও খুল্লনার শিক্ষারও পরিচয় পাওয়া যায়।

---

১. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, ভূ. দ্র.।
২. বা. সা. ই. পৃ. ৪০১।

'প্রভুর আখর আনই ছন্দ।
কে লিখিল পাতি কপট দন্দ ॥'[১]

লহনার কথা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। সতেরো শতকের কবি ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'[২]-কাব্যেও 'হাকন্দ সেবা' করতে গিয়ে লাউসেন দেশের কোনো খবর না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পত্র পাঠালে, কানড়া সে পত্র পড়ে তার উত্তর লিখে দেয়।

'পত্রের বচনে রাণী সোকাকুল হঞা।
দেসের সম্বাদ লেখে কাগজ ধরিঞা ॥
স্বস্তি আদি লেখিঞা লেখিল গুণধাম।
সকল মঙ্গলধাম সেন গুণবান ॥
মিনতি করিঞা লেখে কানড়া জুবতি।
পতির চরনে কোটি কোটি পরণতি ॥'

এর মধ্যে দিয়ে ব্যবহারিক চিঠিপত্র আদান-প্রদানের উপযোগী শিক্ষা যে তখন প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায়।

সে যুগে দেশে রামায়ণ গান, ভাগবত পাঠ, মঙ্গল গান, যাত্রা-কথকতা ইত্যাদির প্রচলন ছিল অত্যন্ত বেশী। নানা উপলক্ষে এই সব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। এর ফলে মেয়েদের আর এক ধরনের শিক্ষা হতো। সেটি হলো পৌরাণিক কাহিনী ও তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ন্যায়-নীতি, পাপ-পুণ্য বোধ সম্বন্ধে গভীর সচেতনতা ও প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন। সেকালের মেয়েদের মুখে মুখে পৌরাণিক কাহিনী ও প্রবাদ-প্রবচনের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। তাই মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে সামান্যা ব্যাধরমণী ফুল্লরার মুখেও ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীর প্রতি যে ধরনের উপদেশ-বর্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তাতে, পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও ফুল্লরাকে ব্যবহারিক জ্ঞানহীনা আ-কাট মূর্খ বলা চলে না মোটেই। এই ব্যবহারিক বিদ্যা সেকালের মেয়েদের মধ্যে ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। এর সঙ্গে ছিল নানা ধরনের হস্তশিল্প। ফুল দিয়ে নানা রকম অলঙ্কার তৈরি করা, গাছের পাতা দিয়ে ও মাটি দিয়ে নানা জিনিস তৈরি করা, আলপনা, ছুঁচের কাজ ইত্যাদিও নিশ্চয়ই একশ্রেণীর শিক্ষার মধ্যেই পড়ে, তা সে পুঁথিগত শিক্ষা না হলেও।

সুরুতর তৎপর আনিয়া খড়িকা।
হাতাহাতি পত্র দিঞে সুরিক্ষা নায়িকা ॥
পরিসর পাত্রের রচিল দুই থাল।
খুরি বাটী ব্যঞ্জন যোগাতে ঝোল ঝাল ॥

১. ক. ক. চ. পৃ. ৭৬।
২. বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮।
৩. ঐ. পত্র ২২৫ক।

নানা চিত্র বিচিত্র নির্ম্মান পরিপাটী।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজে শতাধিক বাটী ॥[১]

।। **বিদ্যায়তন ও আচার্য** ।। সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র বা টোল পরিচালিত হতো গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে। তবে, অনেক সময় স্থানীয় রাজা-জমিদারের কাছ থেকে ভূমি প্রার্থনা করেও টোলঘর স্থাপন করা হতো।[২] বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'র বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় কোনো কোনো পণ্ডিতের টোল তাঁর বাড়িতেই ছিল। কেউ কেউ আবার কোনো ধনী ব্যক্তির বাড়ীর দালানে বা চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসাতেন। সংস্কৃত বিদ্যায়তন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল আবাসিক। পড়ুয়াদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অধ্যাপককেই করতে হতো। টোলে শিষ্যরা চারপাশ ঘিরে বসতো, আর মাঝখানে 'বীরাসনে' বসে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করতেন স্বয়ং আচার্য। ছাত্র ও শিক্ষকের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ এগিয়ে চলতো। আর গ্রাম্য পাঠশালা বসতো সাধারণতঃ কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির বৈঠকখানা, কাছারী-ঘর বা কোনো মন্দির-চত্বরে।

সংস্কৃত বিদ্যায়তনের আচার্য সাধারণতঃ ব্রাহ্মণই হতেন। এঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী পাষণ্ডা গ্রামের রঘুরাম ভট্টাচার্যের মতো ভালো মানুষ, যাঁরা শিষ্যকে দর্শনমাত্র তার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে পুত্রস্নেহে পালন করতেন।

'খুজি পুথি দেখিয়া হইল মায়া মো ॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।'[৩]

আবার অন্য দিকে তেমনই কোনো কোনো অধ্যাপক তাঁর আচার্য জীবনের প্রবল প্রতাপে শিক্ষার জগতে রীতিমত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন, তাও দেখতে পাওয়া যায়।

অবিলম্বে যাহ মোর পাঠশাল ছাড়ি।
মস্তক ভাঙ্গীব নহে মারিয়া পাবড়ি ॥[৪]

কারণ, এঁরাই ছিলেন তৎকালীন রাঢ়ীয় হিন্দুর সমাজজীবনের পরিচালক।

বর্ত্তমানের বিতর্ক প্রতিযোগিতার মতো, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে 'বাদ' বা 'তর্কযুদ্ধে'র বিশেষ প্রচলন ছিল। সাধারণতঃ শ্রাদ্ধ বা বিবাহবাসরের সমবেত পণ্ডিতজনের মধ্যে এই 'বাদ' করানো হতো। এছাড়া প্রচলিত ছিল 'দিগ্বিজয় বিচার'। এ এক ধরনের সাংস্কৃতিক যুদ্ধবিশেষ। এক অঞ্চলের বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করতেন ও সেই স্থানের পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতেন। বিজয়ী হলে তিনি জয়পত্র সংগ্রহ করে আবার অন্যত্র গমন করতেন ও 'দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিত' আখ্যা লাভ করতেন। সতেরো শতকের 'ধর্মমঙ্গলে'র

১. ঘ. ধ. পৃ. ১৩৮-১৩৯।
২. বি. ভা. প. সং ১৩৪৬।
৩. রূ. ধ. পৃ. ১৮।
৪. ক. ক. চ. পৃ. ২৭৭।

কবি রূপরাম চক্রবর্তীর আচার্য, রঘুরাম ভট্টাচার্যের কাছে 'ভট্টাচার্য কণাদ' এইভাবে পরাজিত হয়েছিলেন।[১]

সতেরো শতকের একটি পুঁথিতে সেকালের পাঠশালার একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।

"অষ্টাদশ ছাত্রয়াল পড়িছে নিরন্তর।
অষ্টশব্দি আদি পড়িল অমর॥
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিয়াছে সভে।
অষ্ট কোঠা অষ্টপর শিক্ষা করে ইবে॥
সরকার বেড়িয়া সভে বসে ডানি বা।
অধ্যয়ন করাইছে সুখীরাম খাঁ॥
তিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বাস।
কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাশ॥"[২]

এখানে দেখা যাচ্ছে, পাঠশালার ছাত্র-সংখ্যা মাত্র অষ্টাদশ। কিন্তু, টোলের ছাত্র সংখ্যা হতো অনেক বেশী। আলোচ্য সময়ের কাব্য থেকে টোলের বা সংস্কৃত বিদ্যায়তনের ছাত্র-সংখ্যার বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রেই একশত কুড়ি ('বিদাশয়')[৩] বা ততোধিক সংখ্যার খবর পাই।

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংস্কৃত বিদ্যায়তনে আচার্যের পদ অলংকৃত করতেন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা। অপর দিকে, বাংলা পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন ব্রাহ্মণেতর জাতি, বিশেষ করে কায়স্থ জাতি। সেকালে কায়স্থ সন্তানদের লেখাপড়া শেখা ছিল অবশ্যকর্তব্য। জমিদারি তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে তাঁদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। ফলে, গণিতে এঁরা পারদর্শী হতেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই, গণিতের সমস্যামূলক ছড়ার সমাধান চাওয়া হয়েছে প্রায়ই কায়স্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে। বাংলা পাঠশালার পাঠ্যতালিকায় গণিতের প্রাধান্যের কারণেই সম্ভবতঃ কায়স্থ জাতির শিক্ষকের প্রাধান্য ছিল। অথবা, কায়স্থ শিক্ষকের প্রাধান্যহেতু তাঁদের আয়ত্তাধীন বিষয় গণিতের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে, এমনও হতে পারে। অবশ্য, কায়স্থেতর বিভিন্ন জাতির শিক্ষকের খবরও পাওয়া যায়।[৪]

॥ **শাস্তি-বিধান** ॥ বৈদিক যুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, শিষ্য কোনোরকম অপরাধ করলে তাঁকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হতো নগণ্যই। গৌতমের মতে[৫] ছাত্রদের শারীরিক

১. রূ. ধ. পৃ. ১৮।
২. বি. ভা. পুঁ. নং ১৭।
৩. রূ. ধ. পৃ. ১৮, ১৯।
৪. অনেক পরবর্তী কালের হলেও এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উইলিয়ম এ্যাডাম তাঁর সমীক্ষায় অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর, এমনকি অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষকও দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।
৫. Indian Education in ancient and later times, P. 25.

শাস্তিবিধান অনুচিত। তবে, অনন্যোপায় হয়ে গুরু একমাত্র বেত্রাঘাত করতে পারেন। কিন্তু, অপর কোনো বস্তুদ্বারা শিষ্যকে আঘাত করলে তিনি রাজা-কর্তৃক অপরাধী বলে গণ্য হতে পারেন। মনুর মতে[১]—শিষ্য যদি কোনো বিশেষ অন্যায় করে, তবে গুরু তার পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করতে পারেন মাত্র। কিন্তু অন্য কোনো কোমল স্থানে আঘাত করতে পারেন না। অন্যথায়, গুরুকে রাজা-কর্তৃক পরস্বাপহরণের সমতুল্য শাস্তি গ্রহণ করতে হতে পারে। এছাড়া, তখন সাধারণ অপরাধে ভয়-দেখানো, উপবাস করানো, ঠাণ্ডাজলে স্নান করানো ও চরম অপরাধে গুরুগৃহ হতে নির্বাসিত করা চলতো।[২]

সতেরো শতকেও কোনো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার খবর পুঁথি-সূত্রে পাওয়া যায় না। শিষ্যের প্রতি কোনো কারণে গুরু ক্রুদ্ধ হলে তাকে পুঁথির পাটা দিয়ে আঘাত করার খবর পাওয়া যায়। 'ঐমনি পুঁথির বাড়ি বসাইল গায়' ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে।[৩] কিম্বা অতিক্রোধে শিষ্যকে বিদ্যায়তন থেকে বিতাড়িত করতে দেখা যায়। কোথাও বা বেত্রাঘাতের পরিবর্তে 'মস্তক ভাঙ্গীব নহে মারিয়া পাবড়ি' অর্থাৎ, ছোট মুগুর মেরে মাথা ভাঙার ভীতি প্রদর্শন করবারও খবর মেলে।[৪] তবে, বিদ্যায়তন থেকে শিষ্যকে নির্বাসিত করবার সময়, ব্যক্তি বিশেষে, কোনো অধ্যাপক হয়তো সহৃদয় হয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো আচার্যের সন্ধান দিয়ে, তাঁর কাছে গিয়ে পাঠগ্রহণ করতে নির্দেশ দিতেন। আবার কেউ হয়তো তাঁর প্রবল প্রতাপবশে নানা রকম কু-কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের বিদ্যায়তনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ব্যাপকতর হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, অনিবার্য কারণেই 'পড়িবার কালে কত কিল লাথি খাবে'[৫]—বলে শিক্ষক পূর্বাহ্নেই শিষ্যকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

।। পাঠের উপকরণ ।। লেখাপড়ার জন্যে পড়ুয়ারা প্রাথমিক স্তরে খড়ি দিয়ে মাটিতে অক্ষর-লেখা অভ্যাস করতো। অনেক সময় বালির উপর আঙুল অথবা একটি সরু কাঠি দিয়েও প্রাথমিক বর্ণ পরিচয়ের কাজ চলতো। তবে, ধনী সন্তানেরা অনেক সময়ে এক-টুকরো কাঠের ওপর কোনো রকম রং ব্যবহার করে লেখা অভ্যাস করতো।[৬] এ প্রসঙ্গে 'রামখড়ি'র খবরও পাওয়া যায়। অক্ষর-জ্ঞান সম্পূর্ণ হলে তাল,[৭]

১. Indian Education in ancient and later times, P. 25.
২. Ancient Indian Education, P. 20.
৩ ক.ব পৃ. ১৯।
৪ ক ক.চ পৃ. ২৭৭।
৫. পুঁথি পরিচয়, ২য়। ভূ.পৃ. ১১৩।
৬ Education in ancient India, P. 177-78.
৭. শোধ করি এক তাল পত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাতাব ঢালে রাখিল গুড়িয়া॥ চৈ. চ (ম), পৃ. ৮।

তরেট, ও কলা পাতায় কাঠ কয়লার কালি দিয়ে, শর, কঞ্চি বা পাখির পালকের কলমে লেখা চলতো। কাগজে লেখা হতো আরও পরবর্তী স্তরে। কাগজ বলতে তখন হাতে তৈরি তুলট-কাগজ। সতেরো শতকে এই তুলট-কাগজের প্রচলন ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে আমরা কাগজ তৈরির পেশার খবর পাই।[১] সতেরো শতকের কবি ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'[২]-কাব্যের অনেক জায়গায় পত্ররচনার প্রসঙ্গেও কাগজের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

'দেশের সম্বাদ লেখে কাগজ ধরিঞা।'[৩]

অন্যত্র রয়েছে—

'কাগজ মস্যানি লঞা লিখিতে বসিলা।'[৪]

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে কোনো রকম গ্রন্থের প্রয়োজন হতো না। এই পুস্তকের অভাবের কারণেই হয়তো তখন পড়া অপেক্ষা লেখার প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হতো। তবে, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কোনো গ্রন্থ ভালো লাগলে, তা সযত্নে নকল করে নেওয়া হতো।

'কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥'[৫]

পুঁথি লেখার ক্ষেত্রে, সুন্দর হাতের লেখার যথেষ্ট সমাদর ছিল।[৬] পুঁথি লেখা হতো তুলট-কাগজের ওপরে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি কালি দিয়ে। বিভিন্ন কাব্যে এই কালি প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কোথাও দেখা যায়, "কাজল পাড়িঞা লেখিলেন বৃক্ষপাতে"[৭], কোথাও দেখা যায়, "মসানি গুলিয়া তবে লিখন করিল"[৮], আবার কোথাও বা পাওয়া যায়, কালি প্রস্তুতের জন্যে "হিঙ্গুল হরিতাল নিল মিলেতে গুড়িয়া"[৯]। এর থেকে মনে হয়, তখন বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কালি তৈরি হতো। সেকালে কালি প্রস্তুতের বিভিন্ন ছড়াও পাওয়া যায়।

তীব্র দাহা লোহার গুড়ি।
অর্কাঙ্গার যবার কুড়ি॥
গাবের ফল হরিতকী।
ভৃঙ্গার্জুন আমলকী॥

১ 'কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া'। ক. ক. চ. পৃ. ৩০১।
২ বি. ভা. পু. সং ৪০৮।
৩ পত্র, ২৯৫ক।
৪ পত্র, ১৯৮ক।
৫. চৈ. চ. (ম), পৃ. ২৯১। এই উক্তিটি ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. 'শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি'। ঐ. পৃ ১৩।
৭ ধ ব ধ ম বি ভা. পু. সং ৪০৮। পৃ. ২৯৪খ।
৮, ঐ. ঐ. পৃ. ১৮৬খ।
৯ বি ভা. পু. সং ৬০২৪।

বাবলা ছাল ঝাঁটির রস।
ডালিম লেছে করিবে কষ॥
ভেলায় করা এক আলি।
চারি যুগ না উঠবে কালি॥[১]

কোথাও পাওয়া যায়—

তিল ত্রিফলা শিমূল ছালা।
ছাগ দুগ্ধে দিয়া ভেলা॥
লোহা দিয়া লাহাই ঘসি।
মসী বলে অকাট বসি॥

অন্যত্র পাওয়া যায়—

কাজল গোমূত্র লায়ের জল।
ভৃঙ্গভেলা দিয়ে তোল॥
পীত কাষ্ঠ দিয়ে বসি।
তোটে পত্র না তোটে মসি॥[২]

এই শ্রেণীর আরও অনেক ছড়া পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, এই লিপিবদ্ধ উপকরণ ও প্রণালীকে অনুসরণ করেই সেকালের কালি তৈরি হতো। এই কালির লেখা মাত্র চার যুগ নয়—বহু বছর পর্যন্ত, এমন কি দু-এক শতাব্দী পর্যন্ত উজ্জ্বল থাকে। আবার পুঁথির পাতা ছিঁড়ে গেলেও যে কালি অনুজ্জ্বল হতো না, এও সত্যি। পুঁথির পাতায় অনেক সময় লাল কালি দিয়ে নানা রকম ফুল-লতা-পাখি ইত্যাদির দ্বারা চিত্রিত হতে দেখা যায়।[৩] সুতরাং সেকালে লাল-কালির ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। এই লাল কালি প্রস্তুত-প্রণালী সম্পর্কিত ছড়াও পাওয়া যায়।

সাজি সোহাগা তোলা তোলা।
তার অর্দ্ধেক লোদ ভেলা॥
তাতে দিয়ে লায়ের জল।
লোহার কড়ায়ে কালি কর॥

॥ **গুরু-দক্ষিণা** ॥ পৌরাণিক কাহিনীতে গুরু-দক্ষিণা প্রসঙ্গে অনেক গল্প পাওয়া যায়। এই দক্ষিণা ছিল শিক্ষা সমাপণান্তে দেয় দক্ষিণা। বৈদিক যুগে সমাবর্তনের পূর্বে, গুরুদক্ষিণা বা সে সম্পর্কিত কোনো রকম প্রস্তাবও অপরাধ বলে গণ্য হতো। মনুর মতে[৪], শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্বাহ্নে শিষ্য কোনো রকম দক্ষিণা দান করবেন না। তাঁর মতে, বিদ্যা দান করবার বিনিময়ে কোনো দক্ষিণা গ্রহণ অপরাধ বলে গণ্য হবে।

১. বি. ভা. পু. সং ৪৫৩।
২. বি. ভা পু. সং ৯৭১।
৩. ঐ সং ৯২০। এ সম্পর্কে আগেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।
৪. Indian Education in ancient and later times, P. 93.

আর শিক্ষান্তে দক্ষিণাও ছিল সাধ্যানুযায়ী। সে দক্ষিণা এতো নগণ্য যে, তাকে আচার্যের বেতন হিসাবে গণ্য করা চলে না। কারণ দীর্ঘ এগারো-বারো বছর ধরে গুরুগৃহে থাকা খাওয়ার খরচ সমেত শিক্ষকের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য অন্ততঃ গরীব ব্রাহ্মণ শিষ্যদের ছিল না।

আমাদের সমীক্ষিত সতেরো শতকে গুরু-দক্ষিণার বিশেষ প্রচলন ছিল না। সংস্কৃত বিদ্যায়তনগুলি তখনও ছিল আবাসিক। সেখানে ছাত্রদের থাকা খাওয়ার ভার আচার্য নিজেই গ্রহণ করতেন। আচার্যরা সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমে রাজা অথবা জমিদারদের আনুকূল্যে নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। তাতে কায়ক্লেশে তাঁদের দিন চলে যেতো। অনেক সময়ে, দেশের ধনী-জমিদারদের আনুকূল্য এবং গ্রামের জনসাধারণের বাড়ি থেকে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে দান বা 'চৌপাড়ী' আদায় করা হতো।[১] যদিও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে শ্রীমন্ত সদাগরের বিদ্যারম্ভের প্রাক্‌কালে গুরু-দক্ষিণা স্থির হতে দেখা যায় মাসিক 'পঞ্চাস কাহন কড়ি', তবু মনে হয়, শ্রীমন্ত ধনাঢ্য বণিক-সন্তান বলেই হয়তো এই বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর বর্ণনা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে ভক্ত ও ধনী শিষ্যদের কাছ থেকে সোনা, রূপো, আসন, জলপাত্র, কম্বল ইত্যাদি উপহার পেতেন। তবে সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল না বলেই মনে হয়। সুতরাং, সেকালের শিক্ষকদের সংসার-নির্বাহ চলতো কায়ক্লেশেই। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ দেখা যায়—

'পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ॥
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥'

এই খেদোক্তির মধ্য দিয়ে তৎকালীন শিক্ষক-সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে বিদ্বান অপেক্ষা ধনবানের কৌলিন্য ও প্রতিপত্তি যে সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, তারও আভাস মেলে।

১. চি. প. স. চি। ১ম খ, পু, পৃ, ২২৭।

বিবাহ-পণপ্রথা-সহমরণ

পাটে চড়ি আল্যা রামা পড়ে জয়কার।
প্রদক্ষিণ স্বামীকে করেন সতেক বার।
হুলাহুলি অবলা নিছিয়া ফেলে পান।
অনন্ত বাজনা বাজে অনন্ত নিসান।
শুভক্ষণে ছামুনি বদল কৈল্য মালা।
বিভাবসু পুজিয়া বাসর গেল বালা॥

ঐহিক জীবনে নানা সমস্যা। তার মধ্যে প্রধান সামাজিক সমস্যা হলো নারী-ঘটিত সমস্যা। নিয়ন্ত্রিত কামচর্চার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছে প্রাচীন কালের মানুষ। এরই ক্রমপরিণতিতে এসেছে ব্যক্তিক বিবাহ। যথার্থ আত্মীয়, আত্মীয়তা ও আত্মীয়সমাজ গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিক বিবাহকে ভিত্তি করেই। ব্যক্তিক বিবাহ থেকে সামাজিক স্বীকৃতির উদ্দেশ্যেই হয়তো বিবাহের উৎসব ও ভোজ প্রচলিত হয়। আর বিবাহের উৎসবের মধ্যে আসে নানা বিচিত্র রীতি-রেওয়াজ, আচার-সংস্কার। আদিম জনগোষ্ঠী হলুদ মেখে স্নান করে গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। তারই ফলশ্রুতিতে সম্ভবতঃ গায়েহলুদ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি। এ ছাড়া, আলপনা আঁকা[১], কুলো বা ডালায় ধান, দূর্বা, দীপ, হলুদ ও জলপূর্ণ ঘটের মুখে আম্রপত্র রাখা[২] ঘরের দরজায় কলাগাছ পুঁতে[২], বিয়ের পূর্ব দিনে বরকনের বাড়িতে দই-মাছ পাঠানো, কুশণ্ডিকার সময়ে কনের কোলে শিশু বসানো—এ সবই হচ্ছে আদিম যাদু-সংস্কার। ধান্য, খাদ্য, সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধির প্রতীক। দূর্বা জীবনীশক্তির, কলাগাছ ও আম্রপত্র দীর্ঘ আয়ু ও প্রাণশক্তির প্রতীক। হলুদ সৌন্দর্যের, মাছ প্রজনন শক্তির, কনের কোলে শিশু সৃষ্টিশীলতার ও পুত্র কামনার এবং দীপ আশার প্রতীক। পৃথিবীর আদিম সমাজে এগুলি নানাভাবে ও বিভিন্ন আকারে রয়েছে। 'জরু' যে জমির মতোই বীরভোগ্যা, অর্থাৎ বাহুবল ও পৌরুষ দিয়ে তাকে আয়ত্ত করতে হয়, এবং আদি যুগে যে নারীকে হরণ করেই বরণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল, তার রেশ রয়ে গেছে দরজায় বর আটকানো প্রথায়। পূর্বে কনেপক্ষ প্রকৃতই বাধা দিতো, এখন ছদ্ম বাধা সৃষ্টি করে অর্থের বিনিময়ে দ্বার মুক্ত করে। এখন এটি পরিহাসীজনদের আমোদ স্ফূর্তির উপলক্ষ মাত্র। সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির কাব্যে বিবাহ বর্ণনার মধ্যে এই প্রথাগুলির উল্লেখ আছে। শুভকর্মে বন্ধ্যা ও বিধবা-ভীতি আজকের মতো সেদিনও

---

১. সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল', পৃ. ৪৯ক, জাগরণ পালা। ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুঁথি।

২. চৈ. ভা. পৃ. ১১১।

ছিল, আমাদের বিস্তৃত পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া ঐতিহ্য, আচার ও উত্তরাধিকার হিসাবে।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই বাল্যবিবাহের রীতি ছিল। পুরুষের বয়স সম্পর্কে বিশেষ বাঁধাবাঁধি না থাকলেও, মেয়েদের বেলায় বাল্যবিবাহই ছিল সাধারণ সামাজিক প্রথা। কন্যার বয়সের সর্বোচ্চ সীমা দ্বাদশ বর্ষে পৌছলেই আত্মীয় পরিচিতগণও পাত্রের সন্ধান করতেন। এবং পিতামাতাকে দোষারোপ করতেন। সতেরো শতকের কবি ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে পাই—

'ব্রাহ্মণ বলেন বেনে স্থন তোরে কহি।
তব ঘরে এতো বড কন্যা অবিবাহি॥
সভার প্রধান তুমি বণিকের নাথ।
কন্যা দেখি কেমনে উদরে দেহ ভাত॥
দেখিয়ে উত্তম কুলে কন্যা দেহ দান।
বচন স্থনহ শেষে পাবে অপমান॥'[১]

সতেরো শতকের অপর কবি যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দাবলাস'-কাব্যে দেবক-কন্যা দৈবকীর যোগ্য পাত্র সন্ধানের প্রসঙ্গে শুনতে পাওয়া যায়—

'সযৌবনা কণ্যা ঘরে নাহি জান পাবা।
দেখিতে দেখিতে চিত্তে সুখ আছে কারা॥
গলায়ে না নামে পানি কণ্যাকে দেখিতে।'[২]

কালক্রমে একান্নবর্তী পরিবারের বিলোপ, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক চাপের ফলে বাল্যাববাহ সমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নেয়।

ঘটকালী এবং ঘটক বিদায়ের প্রথা একালের মতোই ছিল। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায় ফুল্লরার পিতা, পাত্র ঠিক করবে বলে সোমাই পণ্ডিতকে প্রতিশ্রুতি দেয়—'ঘটকালী পাবে ওঝা তুমি চারি পণ।'[৩] এক্ষেত্রে প্রথমেই ঘটকের পাত্রী দেখে পছন্দ হওয়া প্রয়োজন।

'বেহুলা লইল গিয়া চরণের ধুলি।
ঘটক দেখিল তার আ-উদর চুলি॥'[৪]

পাত্রী পছন্দ হলে বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা করবার জন্যে তাঁরা নানা কৌশলও করতেন।

'চতুর ঘটক ছিল জনার্দন সাথে।
তুলাস আনিঞা দিল দুই জনের হাতে॥

১. বি. ভা পুঁ. সং. ১০৯৪। প. সং ২১ক।
২. ঐ সং ১২০৯। প সং ৯খ।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ১৭৫।
৪ ক্ষে ম.। বি. ভা. পুঁ. সং । প সং ২২ক।

তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়।
লখাইরে বেহুলা দিব সায় বান্যা কয়॥'[১]

সতেরো শতকের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বরপণ ও কন্যাপণ দুয়েরই খবর পাওয়া যায়। পিতৃগৃহে কন্যার অনুপস্থিতি-জাত ক্ষতিপূরণ বাবদ বরের নিকট হতে কন্যা-শুল্ক গ্রহণ করা হতো। এই কন্যাপণ, কন্যা ও কন্যার পিতার সম্মানী স্বরূপ, স্ত্রীলোকের মূল্যবোধের বিশেষ স্বীকৃতি। আমাদের আলোচ্য সময়ের বাংলা সাহিত্যে এর নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। সতেরো শতকের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে বেহুলার বিবাহ-প্রসঙ্গে কন্যাপণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

'পণগণ নাহি তায়, দানে কন্যা দিতে চায়,
তোমার সুন্দর লখিন্দরে॥'[২]

দ্বিজরামদেবের 'অভয়ামঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুর বিবাহ প্রসঙ্গে কালকেতুর মাতার উক্তিতেও এই একই ইঙ্গিত মেলে।

'পঞ্চ বুড়ি কৈড়ি আছে ঘরে আপনার।
এই কালে কর পুত্রের বিবাহ সম্ভার॥'[৩]

অন্যদিকে কন্যার পিতাকে দেখা যায় তিনি পণ নিতে বদ্ধপরিকর। দুখানি খুঁঞা ধুতি অন্তত না পেলে তিনি কন্যাদানে নারাজ।

'বস্ত্র পণ কবর্দ্দ এক দুইখানি খইয়া লেখ
তবে সে ফুল্লরা দিমু দান।'[৪]

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে, ভাঁড়ু দত্তের, তার পয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক দাদাকে 'মণ্ডলী' পেলে আগে বিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মধ্যে, বিবাহে অর্থের প্রয়োজনের ইঙ্গিতটি লক্ষ করবার বিষয়।

'ভাড়ু দত্ত বলে দাদা দৃঢ় কর হিয়া।
এবার মণ্ডলী পাইলে আগে দিব বিয়া॥'

পরবর্তী কালের চিঠি-পত্রেও কন্যাপণের অনেক খবর পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় "কন্যাটি ৭ সপ্ত বর্ষীয়া বটে সুন্দরী বটে সন্দেহ না করিবে বিনা পনে হইবেক।"[৫] উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলন হওয়ার ফলে এই প্রথা সুপ্রচলিত হয়। কিন্তু কন্যা বয়স্থা হলে কন্যাপণ নেওয়ার প্রশ্ন উঠতো না।

বরপণ প্রথা কন্যাপণের প্রতিক্রিয়াজাত এক অভিনব সামাজিক দুর্নীতি, যা বর্তমান সমাজেও প্রচুর সমালোচনা ও আন্দোলন সত্ত্বেও এক বিষস্ফোটকের মতো টিকে আছে। যদিও সেদিনের সমাজেও বরপণ প্রথা অপ্রচলিত ছিল না। কবি

১. বি. ভা. পুঁ. সং ১৮২৭। প স. ২০ক।
২. ঐ সং ৫৮০৩। প. সং ৫খ।
৩ পৃ. ৪৯।
৪. ঐ. ৫০।
৫. বি. ভা. প. সং ৪৬৩।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায় ফুল্লরার পিতা ফুল্লরার বিয়ের সময়ে পণ স্থির করেছিলেন 'দ্বাদশ কাহন'।[১] ধনী ও রাজ পরিবারে জামাতাকে অনেক উপহার দেওয়া হতো বটে, তবে তা 'পণ' হিসেবে নয়, তা ছিল স্নেহবশতঃ এবং অবশ্যই স্বেচ্ছাকৃত।

'প্রথম দানে দিলাঙ জামাঞিকে সুবর্ণ অঙ্গুরী।
দ্বিতিয় দানে দিলাঙ জামাঞিকে টাকা এক শত আড়ি॥
তৃতীএ দিলাম জামাঞি এক মানিক চর্দ্দি কুড়ি।
দুধ খাইতো গাই দিল স্বর্বর্ণের থাল।
কাঁসা খুরি বাটা বাটী একসত্ত ভার।'[২]

পরবর্তী কালে সেই দানই জামাতার সম্মানার্থে অর্থাৎ 'কুলমর্যাদা পণ'-এ[৩] পরিণত হয়। আমাদের আলোচ্য সময়ে নগণ্য হলেও এই যৌতুক বিয়ের আগেই স্থির করতে হতো। 'চৈতন্যভাগবত'-এ দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর পিতা, বল্লভ আচার্য অতি সংকোচের সঙ্গে ঘটককে বলেছিলেন—

'আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাঞি॥
কন্যামাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।'[৪]

পরবর্তী কালে পণ ও নির্ধারিত অলংকার প্রভৃতি দেনা-পাওনার ব্যাপারে অভাবে বা স্বভাবদোষে পারস্পরিক প্রতারণা এবং তাকে কেন্দ্র করে বিবাহ আসরে ঝগড়া বিবাদ দেখা দিতে থাকে।

কন্যা অথবা বর যে কোনো একজনকে পছন্দ করে বিয়ের প্রাথমিক সম্বন্ধ-স্বীকৃতিকে 'বাক্‌দত্ত' বলা হতো।

'তাহার এক দুহিতা, রূপে গুণে জগন্মাতা,
বাক্যদত্ত কৈল আমা স্থানে।
রসিকের দেখি রূপ, বহুত পাইলা সুখ,
অবশ্য করিব কন্যা দানে॥'[৫]

এই বাক্যদানের কোনো রকম অন্যথা হতো না। প্রস্তাব পাঠানো থেকে শুরু করে বিয়ের পরের কয়েক দিনও উভয় পক্ষের মধ্যে ভোজ উৎসব চলতো নানা উপলক্ষে। বিবাহোৎসবে বাদ্য, নানা ধরনের আতসবাজি, নাচ-গান-যাত্রা, যাদুখেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা আর্থিক স্বাচ্ছল্য অনুসারে থাকতোই।[৬] আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বিয়ে উপলক্ষে "ব্যাল্লিশ বাজন" বাজাবার বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. ক. ক. চ. পৃ. ১৭৫।
২. বি. ম. পৃ. ৮৫।
৩. '…কুলমর্জ্জাদা পন ১৪ তঙ্কা দিঞা লগ্নানুসারে সুভকার্য্য সমাপন করিব এতদর্থে সম্বন্ধ পত্র দিল ইতি…'। বি. ভা. প সং ১২০।
৪. চৈ. ভা. (আ), পৃ. ৭৫।
৫. রসিকমঙ্গল, পৃ. ৪৫।
৬. রা[illegible], পৃ. ৯।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে বিবাহ স্থির হলে বণিক সমাজে প্রচলিত একটি অভিনব আচারের খবর পাওয়া যায়।[১] সেখানে দেখা যায়, বিয়ের আগেই পাত্রকে কন্যাগৃহে আমন্ত্রণ করে এনে তাকে লোহিত কম্বলে বসানো হচ্ছে। তারপর পা ধুইয়ে দিয়ে কন্যাকর্তা বরকে কুলাচারে বরমালা অর্পণ করছেন। ভাবী শাশুড়ী দূর থেকে জামাতা নিরীক্ষণ করছেন। এরপর, গ্রহবিপ্র এসে লগ্ন-বিচার করে দিন স্থির করছেন ও এয়োগণ জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। দিন স্থির হয়ে গেলে, আত্মীয়-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানানো হতো।[২] মৃদঙ্গ, করতাল, দগড়ি, সানি, জয়ঢোল, কাঁসর, বীণা, বাঁশি[৩], শঙ্খ, কাঁসি ইত্যাদি বাজনা বাজতে থাকতো। সুন্দর চাঁদোয়া টাঙানো হতো।[২] তার নীচে বসে দ্বিজগণ কন্যার অধিবাস করিয়ে হাতে মঙ্গল সূত্র বেঁধে দিতেন।

'মঙ্গল সুতা বান্ধে বাউটে জয় জয় দিয়া।'[৪]

পরে, কন্যার পিতা 'মাতৃকা পূজা করে ঘৃতের বসুধারা দিতেন।

'চারিদিগে বেদ পড়ে যতেক ব্রাহ্মণ॥
মহির্গন্ধ শিলা দুর্ব্বা পুষ্প নানা আদি।
ধান্য ঘৃত ফল দধি সিন্দুর অবধি॥
বসুধারা দিয়া সুতাইল আগরে।
কর্পূরধবল ভূপতি কন্যা দান করে॥'[৫]

এরপর 'নান্দীমুখ আদি কৃত্যসকল সমাপ্ত করতেন।

সতেরো শতকের বিভিন্ন কাব্যে বিয়ে উপলক্ষে যে সব স্ত্রী-আচারের উল্লেখ পাই, তার থেকে জানা যায়, আজকের মতো সেকালেও অধিবাসের দিন প্রথমে ঘরের দাওয়ায় আলপনা আঁকা[৬] হতো, পরে নাপিতানী এসে কনের নখ কেটে আলতা পরিয়ে দিতো।

'বেউলা রূপসি নাপিতিনী আনে ডাক দিয়া।
কামাতে বসিলা রামা পুর্ব মুখ হয়া।
আলতা দাও অভাগীর পায়।'[৭]

তারপর সে বরের নামে আগুন পোহাতো ও সরা ভাঙতো।

'লখায়ের নামে রামা আগুন পোহায়া।
বেউলা বিমুখে সরাটি চাললা ভাঙ্গিয়া॥'[৮]

---

১ ক ক চ (ধ উ) পৃ ২২
২. বি. ম পৃ ৩২।
৩. ক. ক চ (ধ. উ), পৃ ৩২
৪. বি ম পৃ. ৩২।
৫. সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'। "কলিঙ্গা বিবাহ পালা"। ক বি পুঁ. সং ২৪৪৩। প সং ৯ক।
৬ 'গোময়ে লেপিয়া মাটি আলিপনা পরিপাটী।' ক ক. চ। বি. ভা. পুঁ. সং ৬৬৮৭। প স ৩৮৭
৭. বি ম পৃ ৮৩।
৮ ঐ ঐ.

এই সব স্ত্রী-আচার আধুনিক কাল পর্যন্ত অনেক অঞ্চলেই বর্তমান রয়েছে। এরপর কন্যার মা সুবেশা এয়োদের সঙ্গে ঘরে ঘরে 'জল সয়ে' ফিরতেন। 'গুআ কড়ি' দিয়ে প্রথমে ব্রাহ্মণের ঘরে, তারপরে কায়স্থের ঘরে, তারপরে কর্মকারের ঘরে, এইভাবে[১] সাত ঘরে, 'জল সয়ে', পাঁচ প্রকার ফুল দিয়ে ঝারি পূর্ণ করে রাখা হতো।

'সাত ঘরে সুন্দরী সহিয়া আনে জল।
ঝাড়ি পুর্যা রাখে জল দিয়া পাঁচ ফল॥'[২]

সাত জন এয়োকে কুমোরের বাড়ী থেকে 'সুমঙ্গল হাঁড়ি' আনতে পাঠানো হতো।[৩] অনেক সময় কাপালবাড়ী থেকে গোমুণ্ড এনে আঙিনায় পুঁতে, তার উপরে গামার কাঠের পিঁড়ি পেতে এয়োগণ কর্তৃক তুক্ করার বর্ণনাও পাওয়া যায়।[৪] এর ফলে কন্যা শত অপমান করলেও, বর গোমুণ্ডসম নীরব থাকবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। বিয়ের সময়কার স্ত্রী-আচারের মধ্যে এই শ্রেণীর তুক্-তাক্ই ছিল বেশী। কন্যার মাতা স্বহস্তে বরণডালা সাজাতেন ও 'ছামুনী'র সময়ে ওষুধ করতে যেতেন। ভাবী জামাতাকে কন্যার বশীভূত করবার উদ্দেশ্যে তিনি এই সব বিচিত্র ধরনের আয়োজন করতেন। আমাদের আলোচ্য সময়ে রাঢ়ের কোনো কোনো অঞ্চলে এই রকম বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, আপোড়া মৃৎপাত্রে গাধার দুধ আর দই এনে বরের কপালে দিলে, সে সহজেই ধোপার গাধার মতো কন্যার বশীভূত হবে।[৫] এ ছাড়া, সংবৎসরে বিবিধ উপলক্ষে প্রস্তুত করা হতো নানা ওষুধের বটিকা। সেগুলি বিয়ের সময়ে প্রয়োগ করতেন কন্যার মাতা। আশ্বিনের পূজার সময়ে যে কাজল তোলা হতো, তা যুবতী-লোচনে দিলে, পুরুষ পাগল হবে[৬] বলে সমাজে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। ভেঁটু খইয়ের সঙ্গে করবার মূল মিশিয়ে উপরাগের দিনে যে ওষুধ প্রস্তুত করা হতো, তা বাসরে পানের সঙ্গে বরকে খাওয়ালে, বর সারা দিন কন্যার মুখ চেয়ে থাকবে বলেও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।[৭] এ-ছাড়া অন্যান্য তুক্-তাক্ও ছিল। কাচলির শিকড়ে ঘষে গুলে অশ্বত্থ পাতার খিলি[৭], শজারুর কাঁটায় করে বরের কপালে চন্দনের 'ছিটেফোটা' দেওয়া[৭], চালের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে ঘরের চালেতে রেখে দেওয়া[৭], বরণের সময়ে বরের অধর মাপতে চাওয়া[৭], ইত্যাদি শ্রেণীর স্ত্রী-আচারের মধ্যে অনেক তুক্-তাকের রীতি প্রচ্ছন্ন ছিল। মন্ত্রপুত

১. বি. ম পৃ. ৭৯-৮০।
২. রূ. ধ. পৃ. ৬১।
৩. ঐ ঐ.। মাথায় বহিয়া আনে সুমঙ্গল হাঁড়ি।
৪. সতেরো শতকের কবি রূপরাম (রূ ধ পৃ ৬১) এবং মুকুন্দরাম (ক. ক. চ. পৃ ৩১) দুজনেই তাঁদের কাব্যে এর বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।
৫. ক. ক. চ. পৃ. ১২০।
৬. ক. ক. চ. (খ. উ) পৃ. ৩৬, রূ ধ পৃ ৬১।
৭. রূ. ধ পৃ. ৬১।

জ্বলন্ত প্রদীপ সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রদীপের সঙ্গে একটি ভিজানো সুতো ডাইনীর কুদৃষ্টি থেকে বরকন্যাকে রক্ষার জন্যে রাখা হতো।

কন্যার অধিবাসের পরে, বরের অধিবাস হতো স্বগৃহেই। এরপর বরযাত্রা। নানা রকম স্বর্ণালংকারে ভূষিত হয়ে, সর্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপে, গলায় পুষ্পমালা পরে, হাতে সুতো বেঁধে, বর মাতাপিতার চরণ-বন্দনা করে, দোলায় চড়ে বিয়ে করতে যেতেন। বরের সঙ্গে বরযাত্রীগণও চলতেন। বাদ্যকার চলতো তাঁদের সঙ্গে বাজনা বাজাতে বাজাতে। বর ও বরযাত্রীদের পথে আটকে, শিশুর দল 'আঠার বাখড়া' বা এক ধরনের ছড়া শুনিয়ে পান বাটি আদায় করতো। তার বর্ণনাও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়।

'হৈল সন্ধ্যা বেলা ফেলে মারে ভেল
জত নগরের ছেলা।
কতো সিসু মেলি বা খল খাটাবি
আঠারো বাখড়া বল্যা।
কর পসারিয়া পথ আগুলিয়া
আঠারো বাখড়া পড়ে।
… …
চাঁদসদাগর হরিষ অন্তর
আঠারো বাখড়া শুনি।
আঠারো বেকতি শুনি অধিপতি
বলে দিব গুয়াপান'[১]

বর এসে উপস্থিত হলে 'বর বরণ' অনুষ্ঠিত হতো। বরের হাতে জল দিয়ে, তার অর্চনা করা হতো। অনেক সময়ে বরের হাতে ধুতি ও নারিকেল দিয়েও 'বর-বরণ' করা হতো।

'বেনেরা বরণ করএ বরণ করে সাধু সদাগর।
হাথে কাচা ধুতি ও নারিকেল।
তুলি দিল জামাএর হাথে।'[২]

তার পরে সাধ্যানুসারে বরকে কাঞ্চন, বসন, অঙ্গুরী, অর্থ, ধেনু, চড়বার জন্যে ঘোড়া ও দোলা, শোবার জন্যে খাট, পট, তুলো, কিতের মশারী, সবৎসা গাভী, সশস্য ভূমি, বসবার জন্যে চন্দন চৌখুড়ি, উত্তম আবাস, সখী, দাসদাসী ইত্যাদি দান করা হতো।

'সজ্যা ঝারি ধেনু থালা রথ গজ ঘোড়া দোলা
দিয়া জামাতার কৈল মান॥'[৩]

---

১. ক্ষে. ম. পৃ ৮৯। বি ভা পুঁ সং ১৯০৬
২. বি. ম পৃ. ৮৫।
৩. ক ক. চ (ধ. উ.), পৃ. ৪৫৫।

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'প্রথম দানে দিলাম জামাঞিকে সুবর্ণ অঙ্গুরী ॥
দ্বিতিয় দানে দিলাম জামাঞকে টাকা একশত আড়ি।
তৃতীএ দিলাম জামাঞি এক মানিক চন্দ কুড়ি ॥
দুদ খাইতো গাই দিল, সুবর্ণের থাল।
কাঁসা খুড়ি বাটা বাটী একসত্ত ভার ॥'[১]

এরপর হতো মালাবদল, শুভদৃষ্টি ও কন্যা-সম্প্রদান।

'পাটে চড়ি আল্যা রামা পড়ে জয় কার।
প্রদক্ষিণ স্বামীকে করেন সতেক বার ॥
হুলাহুলি অবলা নিছিয়া ফেলে পান।
অনন্ত বাজনা বাজে অনন্ত নিসান ॥
সুভক্ষণে ছামুনি বদল কৈলা মালা।
বিভাবসু পুজিয়া বাসর গেল বালা ॥
কুসুম সয়নে সব পুহাইল রাতি।'[২]

কন্যার পিতা শুভলগ্নে কন্যা-সম্প্রদান করতেন। ব্রাহ্মণরা কুশ হাতে বেদ পড়তেন।[৩] বিয়ে শেষ হলে বর-কনে বাসর ঘরে সুখে রাত্রি যাপন করতো। সতেরো শতকের কবি ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে রঞ্জাবতীর বিয়ের প্রসঙ্গে গান-বাজনা ও পরিহাস করে বর-কন্যাকে নিয়ে বাসর জাগার বর্ণনা রয়েছে।[৪] পরদিন সকালে বর, বধুকে নিয়ে আপন আলয়ে গমন করতো। পিতৃগৃহ থেকে স্বামী গৃহে যাবার আগে কনে ইঁদুর-মাটি, চাল, দূর্বা ইত্যাদি মায়ের হাতে দিয়ে পিতৃগৃহের ঋণ পরিশোধ করে।

'ইন্দুর মাটী সসি দূর্বা হাতেতে করিয়া।
দিছেন মাএর হাথে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া বেউলা ছারিলা নিশ্বাস।
শুধিতে নারিলাম তোমার এক খিরের ধার ॥'[৫]

একে বলা হয় কণকাঞ্জলী। এ ধরনের স্ত্রী-আচার রাঢ়ে আজও প্রচলিত আছে। সেখানে শাশুড়ী বধূ-বরণ করতেন। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে কন্যা পক্ষ থেকে শ্বশুর-শাশুড়ীকে নমস্কারী পাঠাবার বর্ণনা পাওয়া যায়—

'সাজি দিল শ্বশুর শাশুড়ী নমস্কারি।
ভূপতি জরদ জোড় জরি পট্ট শাল।'[৬]

১. বি. ম. পৃ. ৮৫।
২. সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'। "কলিঙ্গ বিবাহ পালা।" ক. বি. পুঁ. সং ২৪৬৬। প. সং ৯ক।
৩. রূ ধ. পৃ ৬৩।
৪. বি. ভা. পু. সং. ৪০৮। প. সং ৩০খ।
৫. বি. ম. পৃ. ৮৬।
৬. ঘ. ধ. পৃ. ১৮৭।

বধূর আগমনে শাশুড়ীও নানা রকম তুক্ করতেন এবং আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে ভোজের আয়োজন হতো ফুলশয্যা উপলক্ষে।

॥ বহুবিবাহ প্রথা ॥ আমাদের আলোচ্য সময়ে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল।

'পুরুষ থাকিতে জোড়ে কতেক পরশ।
কেবা নাঞী বিভা করে চারি পাঁচ দশ॥'[১]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'দুই চারি পত্নী তার অনেক তনয়।'[২]

এই সব উক্তি থেকেই বহুবিবাহের স্বাভাবিক প্রচলন সুস্পষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের দুই স্ত্রী ছিলেন। ঈশ্বরী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া। চৈতন্যদেবেরও দুই স্ত্রী, লক্ষ্মী দেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। নিত্যানন্দের দুই স্ত্রী ছিলেন বসুধা ও জাহ্নবা। সতেরো শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীরও দুই স্ত্রী ছিলেন। তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের "একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর / বিশেসিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর" / এই উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর ভাঁড়ু দত্তের 'দুই স্ত্রী চারি শালা'[৩] ছিল, ধনপতি সদাগরেরও দুই স্ত্রী, লহনা ও খুল্লনা। তাই সপত্নী-বিবাদ ছিল সেকালের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

'সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি॥'[৪]

অথবা—

'ননদী সতিনী নাই বচনের জ্বালা॥'[৫]

ইত্যাদি উক্তি থেকে সপত্নী বিবাদের ছবিটি সহজেই ফুটে ওঠে। সপত্নী কন্যা মনসার সঙ্গে দেবী চণ্ডীর দ্বন্দ্বের চিত্র তো সকল 'মনসামঙ্গল'-কাব্যেই বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এই সপত্নীকে নেপথ্যে রেখে স্বামীকে বশ করবার জন্যে সেকালের সমাজে যাদুবিশ্বাস আশ্রিত নানা রকম তুক্-তাক্ ও মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল।

সেকালে সামাজিক অনুশাসন ছিল অত্যন্ত প্রবল ও অলঙ্ঘনীয়। সেই অনুশাসনের রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরিবার ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। অন্তঃপুরে বধূর হাতে সংসার তুলে দেওয়া[৬] বা শাশুড়ী-ননদিনীর বধূ-লাঞ্ছনা প্রসঙ্গে পারিবারিক জীবন-যাত্রার উদ্দেশ মেলে।

১. রা. ধ পৃ. ৫৫।
২. রসিকমঙ্গল, পৃ. ১৫।
৩. ক. ক. চ পৃ. ৩৩৯।
৪. ঐ. পৃ. ২৪৩।
৫. ঘ. ধ. পৃ. ২৭।
৬. 'নিদয়ার মুখ বড়।
বধূ গৃহকর্মে দঢ়॥' ক. ক. চ. পৃ. ১৮১।

'শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা ॥'[১]

আবার যৌথ পরিবারের বন্ধন প্রবল হওয়াতেই সম্ভবতঃ স্বজন পোষণ না করা ছিল নিন্দার বিষয়। বাপ-মা অথবা আত্মীয়-স্বজনকে যে পোষণ করতো না, লোকে প্রভাতে তার মুখদর্শন তো দূরের কথা, নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতো না, পাছে দিন খারাপ যায়। তবু, যৌথ পরিবার তখনকার দিনেও যে অনেকের জীবনে বোঝা স্বরূপ হয়ে উঠেছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে, তারও খবর পাওয়া যায়।[২] সে ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের ভারবহনে ক্লান্ত ও স্বজন ভারে প্রপীড়িত গৃহ-স্বামীর মুখে খেদোক্তিও শোনা যায়।

॥ **সহমরণ প্রথা** ॥ সতেরো শতকের সাহিত্যে 'অন্বারোহণ' বা সহমরণের খবর পাওয়া গেলেও, তখন এই প্রথা বাধ্যতামূলক ছিল না। কবে থেকে এই প্রথার প্রথম সূত্রপাত তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও, এই প্রথার মূল যে মানব সমাজের প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে নিহিত ছিল—একথা বলা যায়। মহাভারতে যুদ্ধবিগ্রহের যে পরিমাণ বর্ণনা পাওয়া যায়, সহমরণের ততো নয়। ঐতিহাসিক যুগে বিজেতাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে রাজপুত মহিলাদের জহরব্রতের কথা জানা যায়। তবে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী শচী দেবী অনুমৃতা হন নি। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সহমৃতা হন নি এবং বহু বছর তিনি জীবিত ছিলেন। নিত্যানন্দের পত্নী বসুধা ও জাহ্নবা কেউই সহমৃতা হন নি। সমগ্র বৈষ্ণব চরিতসাহিত্যে কোথাও সতীদাহের কথা নেই। অন্যদিকে আবার সতেরো শতকের বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে সহমরণের যথেষ্ট খবর পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে নীলাম্বরের মৃত্যুতে তাঁর পত্নী ছায়া অনুমৃতা হয়েছেন।

'দুই কুলে দিয়া বাতি পরান ত্যজিল সতী
পতির অনলে ছায়াবতী ॥'[৩]

আবার কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধে যত সৈন্য নিহত হলো, তাদের স্ত্রীদের অনুমৃতা হতে দেখা যায়।

'পুরে প্রবেশিতে শুনে যতেক কান্দনা
অনুমৃতা হইতে যায় যতেক অঙ্গনা ॥'[৪]

বিভিন্ন 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে সমুদ্রমন্থনের বিষ পান করে মহাদেবের জীবনাবসান ঘটলে, দেবী দুর্গাকে সহমরণে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে দেখা যায়।

---

১. ক. ক. চ. পৃ. ২৬৩।
২. ঐ. পৃ. ৭৬।
৩. ঐ. পৃ. ১৬০।
৪. ঐ. পৃ. ৪৩৪।

'জয় জয় দিয়া ভাঙ্গে অম্র সখা।
দুর্গা ছড়ায় কড়ি ধায় দুর্গা রড়ারড়ি
উপনীত দুর্গা ক্ষীরোদ মথনে।'[১]

সতেরো শতকের কবি সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের 'আদিপালা'য়[২] দেখা যায়, পুত্রদের পরীক্ষা-কল্পে ধর্ম শবদেহ ধারণ করে ভেসে গেলে শিব তাঁর মৃত পিতার সৎকারের ব্যবস্থা করেন, তখন মহামায়া অনুমৃতা হতে যান।

'প্রাণ নাথ কোথা মোর দেহ দেখা হঁয়া
অনুমৃতা বোধে দেবী চলিল ধাইয়া।'[৩]

প্রায় সমস্ত 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যেই দেখা যায়, কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর ছয় পুত্রবধূ অনুমৃতা হন।

'ছয় বধূ অনুমৃতা হৈল জরাতুর।
পুত্র শোকে মৈল রানী খাইয়া মাহুর॥'[৪]

পাত্র মহামদ লাউসেনের মায়ামুণ্ড দেখালে তাঁর তিন স্ত্রী-ই, 'সহমৃতা হইতে আম্রের ভাঙ্গে ডাল।'[৫]

কিন্তু 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে চাঁদসদাগরের ছয় পুত্র মনসার চক্রান্তে মৃত্যুবরণ করার পরে, তাঁদের স্ত্রীরা অনুমৃতা হন নি। এর থেকে স্পষ্টই মনে হয়, সতেরো শতকের রাঢ়ের সমাজ জীবনে সহমরণ প্রথার প্রচলন থাকলেও, তার ব্যতিক্রমও হতো অনেক ক্ষেত্রে।

'গর্ভবতী ঋতুবতী শিশু পুত্রবতী।
তিনজন নাহি জায় পতির সংহতি॥'[৬]

আসলে সাধারণ লোকবিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাসে এই প্রথার উদ্ভব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে, আর ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্য-সমাজের গোঁড়ামিতে পরবর্তী কালেই ঘটেছিল এর বীভৎস বিস্তার।

স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণে যাবার সময়ে, কতকগুলি বিশেষ আচরণ পালন করার বর্ণনা করেছেন আলোচ্য সতেরো শতকের প্রায় প্রত্যেক কবি। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বামীর মৃত্যুতে অনুগামিনী স্ত্রী, কপালে প্রচুর সিন্দুর লেপন করে, সুসজ্জিতা হয়ে[৭] 'জয় জয়' ধ্বনি দিয়ে আম্রশাখা ভেঙে হাতে নিতেন।

---

১. বি. ম. পৃ ১৯।
২. ক বি. পুঁ. সং ১২৬৩।
৩. ঐ. ঐ প. সং ৫ক।
৪. ধ. ধ. পৃ. ৫৫।
৫. ঘ ধ. পৃ. ২৩১।
৬. গঙ্গাবন্দনা। বি. ভা পুঁ সং ৬.২৬। প. সং ৬৬ক।
৭. 'সিন্দুরে ভূষিত ভালে হাতে আম্র ডালে।' ক. বি. পুঁ. সং ২৪৭৩। প. সং ৫ক। সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'।

'জয় জয় দিয়া ভাঙ্গে আম্র সখা।'[১]

অথবা—

'ভাজিয়া আম্রের পাতা চণ্ডিকা হৈমসুতা
প্রভুর উদ্দেশে ভগবতী॥'[২]

তারপর খই ও কড়ি ছড়াতেন চার পাশে।

'দুর্গা ছড়ায় কড়ি ধায় দুর্গা রড়ারড়ি।'[৩]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'খই কড়ি ছড়ায়ে ভারে ভার।'[৪]

কোথাও বা হাতের আম্রশাখা নিয়ে প্রিয়পাত্রদের মাথায় সেই আম্রডাল নেড়ে আশীর্বাদ করবার বর্ণনা পাওয়া যায়।

'আম্র দার ফিরাইলা শিবের মাথায়:
তুমিয়ে সুপুত্র বাছা সুখ দিলে মায়॥
জন্মে জন্মে তোমা বাছা নাছাড়িব আমি।'[৫]

অথবা—

'প্রণতি করেন সবে সতীর চরণে।
আম্রডাল বুলায়ে আশীষ জনে জনে॥'[৬]

অতঃপর চিতা সজ্জিত হলে তাকে ঘিরে নানা রকম কৃত্য[৭] শেষে মৃত স্বামীর দেহ কোলে করে চিতায় আরোহণ করেন সতী। তখন চার পাশে নানারূপ বাদ্য ও জয়ধ্বনি করা হতো।[৮] অনেক পরবর্তী কালে এই বাদ্য ও জয়ধ্বনির অন্তরালে অনেক অনিচ্ছুক সতীর আর্তনাদকে চাপা দিয়ে, তাঁর দেহকে ভস্মীভূত করা হয়েছে সামাজিক বিধানের দোহাই দিয়ে।

---

১. বি ম. পৃ. ১৯।
২ শে. ম পৃ. ৩২।
৩. বি ম. পৃ. ১৯।
৪. ঐ. পৃ. ১০৩।
৫ সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'। ক. বি. পু., সং ২৪৭৩। প. সং ৫ক।
৬ ঘ. ধ. পৃ. ২৩১।
৭. ঐ. পৃ. ২৩২। 'মুণ্ড বেড়ি তাণ্ডব করেন সতী সব।'
৮. বি. ম. পৃ. ১৯।

প্রসাধন

চাঁচর প্রচুর কেশ সুবিচিত্র খোঁপা।
কুসুমের মালা তথি নাগেশ্বরী চাঁপা॥

বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে সেকালে মেয়ে মহলে প্রসাধন পরিচর্যার রওয়াজ ছিল একালের মতোই। সমকালীন সাহিত্যে মেয়েদের বিভিন্ন প্রসাধন নৈপুণ্যের খবর পাওয়া যায়।

অপরের চোখে নিজেকে সুন্দরতর করে উপস্থাপনার যে আদিম চেষ্টা, তার থেকেই জন্ম হয়েছে প্রসাধন কলার। যুগের পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটিরও রূপ বদল হয়েছে, হচ্ছে। তাই গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষ নিজেকে যে রূপে সাজাতো, গৃহবাসী সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তবু রঙ এবং রূপের বদল যতোই হোক না কেন, লক্ষ কিন্তু স্থির। অন্যের কাছে এবং সেই সঙ্গে নিজের কাছেও নিজেকে সুন্দরতর করে প্রকাশ করা, নিজের পরিবেশকে সুন্দরতর করে তোলা। সম্ভবতঃ নৃত্য-গীত-ভাস্কর্য ইত্যাদি যে কোনো নন্দন শিল্পেরই জন্ম রহস্য এই একই। মনের যে সূক্ষ্মতর অনুভূতির প্রেরণায় মানুষ ঘরের মাটির দাওয়ায়, মাটিলেপা বেড়ার গায়ে আলপনা দেয়, নিতান্ত প্রয়োজনের শীতের কাঁথার উপর নক্সা তোলে, সরা ও পটের উপর রঙীন চিত্র আঁকে, সেই একই দৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনার অনুভূতির আবেগে মানুষ নিজের চার পাশের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এর থেকেই জন্ম হয় প্রসাধন শিল্পের।

মধ্যযুগ বসন ও ভূষণের বাহুল্যের যুগ। তাই আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকেও দেখা যায়, কামিনীকুল-ললনাগণ তো বটেই, এমন কি পুরুষেরাও 'রত্নখচিত-অঙ্গুরীয়', 'সুবর্ণের অঙ্গদবলয়', 'বাজুবন্ধ', 'স্বর্ণ-কুণ্ডল', 'নবরত্ন হার' এবং চর্ম নির্মিত কিংবা কাষ্ঠ নির্মিত পাদুকায় ভূষণের সাধ পূর্ণ করে 'চন্দন-চর্চিত' দেহের সুবাসে চতুর্দিক আমোদিত করে তুলতেন।

প্রসাধনের প্রথম পর্ব হলো স্নান। নায়িকা স্নানের আগে 'তৈল-হরিদ্রা' ও কুমকুম দ্বারা গাত্র মার্জনা করে।

'কুমকুমে তুলিয়া মলা নারায়ন তৈল দেয় গায়।'[১]

---

১. ক. ক. চ. পৃ ১০৮।

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'হরিদ্রা কুম্কুম্ তৈল আনিল দুবলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা ॥'[১]

আমলা তেল মেখে, আমলকী দিয়ে চুলের সংস্কার করে[২], তোলা জলে স্নান করে,[৩] চিরুণী দিয়ে কুন্তল মার্জনা করে, ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকিয়ে, তারপর কবরী বন্ধন শুরু করতো। সেকালে বহু বিচিত্র খোঁপার খবর পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'-এর রাধিকার কানড়ী ছাঁদে কবরী বন্ধন থেকে, সেকালের রাঢ় বাংলায় যে এই কানড়ী বা কর্নাটী খোঁপার বিশেষ প্রচলন ছিল তা অনুমান করা যায়। ভাবুক কবি গোবিন্দদাসের রাধাও কখনও—

'বেলন পাটের ছাদে বাঁধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতী মালা।'

আবার কখনও বা—

'ধনী কানড়ী ছাঁদে বাঁধে কবরী।
বন মালতী মালা তাহি উপরি ॥'

এইভাবে কেশ বিন্যাস সমাপ্ত করেছে। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের রাধা কখনও 'লোটন' ছাঁদে, কখনও 'তবল্লকী' ছাঁদে কবরী বন্ধন করেছেন। আমাদের আলোচ্য সময়ের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ দেখি খুল্লনা 'কুসুমের গাভায়'[৪] কবরী বন্ধন করে ধনপতির কাছে উপস্থিত হয়েছে। অধিক বয়স হওয়া সত্বেও লহনাও কিন্তু দাসী দুর্বলা কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে 'গুয়া মুটি'[৫] কবরী বেঁধে খুল্লনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বামী সম্ভাষণে যায়। সতেরো শতকের অপর কবি বিষ্ণু পালের 'মনসামঙ্গল'-এ 'এল্যান কামুড়ি খোপা', 'কলিঙ্গা খোপা', 'নোটন খোপা' বন্ধনের খবর পাওয়া যায়।[৬] রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে 'কানকুড় কবরী'র সুছাঁদ বন্ধনে স্বর্ণালংকারকেও লজ্জা দেবার বর্ণনা রয়েছে।

'কানকুড় কবরী কনকে নাঞী শোভা।'[৭]

ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলে' পাই—

'বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁদিকে টাম্নী।'

এ ছাড়া 'লোটন ছাঁদে', 'তবল্লকী ছাঁদে', 'বেলন পাটের ছাঁদে' কবরী বন্ধনেরই যে শুধু খবর পাওয়া যায় তাই নয়, বেণী বন্ধন বা এলোচুলের রীতিও যে ছিল, "কারো বেণী,

---

১. ক. ক. চ. পৃ ১০৮।
২ ঐ. পৃ. ১০৯; 'আমলখি দিয়া কৈল কেশের মার্জনা।'
৩. ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য। বি. ভা পু. সং ৪০৮, প. সং ৭২ক।
৪. ক. ক. চ পৃ. ১৫১।
৫. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১২৫।
৬. বি. ম. পৃ. ১৪, ৫, ৪৮ ইত্যাদি।
৭. পৃ. ৬৪।

কারো খোপা, কারো এলোচুল' ইত্যাদি বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। সুন্দর কবরী বন্ধন করে তাতে মনোহর ফুলের মালা, পুষ্পস্তবক[১] ও সুবর্ণের ঝাপা[২] দিয়ে সাজাবার রীতি প্রচলিত ছিল।

'চাঁচর প্রচুর কেশ সুবিচিত্র খোঁপা।
কুসুমের মালা তথি নাগেশ্বরী চাঁপা॥'

এর থেকে বোঝা যায় সেকালে কেশ বিন্যাসের রীতিমতো কদর ছিল।

শুধু মেয়েরা নয়, পুরুষদের শিরেও দীর্ঘ কেশ শোভা পেতো এবং তার রীতিমতে পরিচর্যা চলতো। 'আউদর চুলী' সেকালে কেবল মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও বিশেষণ ছিল। সম্ভবতঃ, এই কারণেই বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নবদ্বীপ বাসীর সঙ্গে স্বয়ং কবিও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।

'করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখ স্মঙরি কান্দে সর্ব ভক্তগণ॥'
কেহো বোলে, 'না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন।
কেমতে রহিব এ না পাপিষ্ঠ জীবন॥'
কেহো বোলে, 'সে সুন্দর কেশ আরবার।
আমলক দিয়া কি না করিব সংস্কার।'[৩]

সেকালের পুরুষদের সুদীর্ঘ কেশের উল্লেখ সর্বত্রই পাওয়া যায়। ধনপতি সদাগর, চাঁদ সদাগর সকলেরই দীর্ঘ কেশের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং 'পালায় রামের সৈন্য নাহি বাঁধে কেশ'—কৃত্তিবাসের এই বর্ণনা থেকে শুরু করে, প্রায় সকল বঙ্গ কবিই পুরুষের কেশ বিন্যাসের কথা বলেছেন। কেউ কেউ সে চাঁচর কেশ উন্মুক্ত রাখতে ভালোবাসতেন।

'চাঁচর চিকুর কেশ লোটায় ধরনী।'[৪]

আবার কেউ বা বেণী বন্ধন করে আনন্দ পেতেন।

'চাঁচর চিকুর কেশ বাঁধিয়া সুছাঁদে।'[৫]

ইত্যাদি উক্তি থেকে তা স্পষ্ট হয়। সতেরো শতকে রচিত গোপীজনবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গল'-কাব্যে বরবেশী পুরুষের ক্ষেত্রেও সুন্দর কেশ বন্ধন করে তাতে পুষ্পমালা দিয়ে সাজের বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. 'কবরী বেষ্টিত কৈল মালতীর মালে।' ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১২১।
২. 'খোপায় তুলে নিল মা দশ সুবর্ণের ঝাপা।' বি. ম. পৃ ৫।
৩. চৈ. ভা. পৃ. ৩৬৬।
৪. রসিকমঙ্গল পৃ. ৪১।
৫. ঐ. পৃ. ৪৩।

'সুকুঞ্চিত কেশ বাঁধে নাগরী সকল।
সুবাসিত পুষ্পমালা তাহাতে ভূষণ।'[১]

মনে হয় এদেশে মুসলিম রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত পুরুষদের ক্ষেত্রেও দীর্ঘ কেশই স্বাভাবিক রীতি ছিল। পরে মুসলিম প্রভাবে বাবরি চুল এসে সেই দীর্ঘ চুলকে বিদায় দেয়।

সেকালে সুসজ্জিত নরনারী উভয়েরই চন্দনে চর্চিত দেহের সুবাসে দশদিক্ আমোদিত হতো। সেই কর্পূর-কস্তুরী গন্ধ-চন্দন-কুমকুমের মিলিত সুবাসের সঙ্গে মেয়েদের ক্ষেত্রে 'অলক তিলক চন্দনের' সূক্ষ্ম রেখার প্রচলন ছিল।

'চন্দন তিলক শোভে ললাটে সিন্দুর।
নয়নে কজ্জল তাহে অলক প্রচুর।'

আর থাকতো—

'অন্তরে অন্তরে গন্ধ চন্দনের ফোটা।'[২]

তার সঙ্গে 'কজ্জলে উজ্জ্বল' থাকতো দু-নয়ন।[৩] সেকালে যেমন তাম্বুল রাগে অধর রঞ্জিত করার খবর পাওয়া যায়, তেমনই অলক্তক রাগে অধর রাঙাবার বর্ণনাও মেলে।

'জাবকের রসে কৈল অধর মার্জন।'[৪]

সুকোমল চরণে অলকার রেখা শুধু মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও থাকতো।

'সুকোমল চরণে শোভিত নখ পংক্তি।
অলকার রেখা তার শোভে নানা ভাঁতি।'[৫]

এ বর্ণনা পুরুষ সম্পর্কেই পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকে রচিত বিভিন্ন কাব্যে, বিশেষভাবে রাঢ়ের কবিদের লেখা অধিকাংশ আখ্যানকাব্যে নায়িকার নানা ছাঁদের কাঁচলীর বর্ণনা পাওয়া যায়। সেকালের উৎকৃষ্ট কাঁচলীতে বিচিত্র চিত্র ও লেখা থাকতো। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে ভগবতীর কাঁচলীর লেখার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। লহনা ও খুল্লনাও সুন্দর কাঁচলী ব্যবহার করেছেন প্রসাধনের অঙ্গ হিসেবে। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল', বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল', ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল', ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' ইত্যাদি গ্রন্থে 'লক্ষের কাঁচলী'র সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অনেকেই সোনার কাঁচলীর বর্ণনা করেছেন। এছাড়া চেলি ও নীবিবন্ধনের খবরও মেলে। দেবী, অভিজাত মহিলা বা নর্তকী ভিন্ন অন্য কোনো নারীর কাঁচলীর কোনো উল্লেখ

১. রসিকমঙ্গল পৃ. ৪৮।
২. বি. ম. পৃ. ৫।
৩. চৈ. ভা. পৃ. ৭৬।
৪. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১২১।
৫. রসিকমঙ্গল পৃ. ৪৯।

সতেরো শতকের কাব্যগুলিতে দেখা যায় না। সেদিনের রাঢ়ের সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থ রমণীর কাছে কাঁচলীর ব্যবহার অজ্ঞাত বা অকল্পনীয়ই ছিল। তাঁরা সম্ভবতঃ এক বস্ত্রেই অভ্যস্ত ছিলেন।

মানুষের মনে অলংকারের আকাঙ্খা জেগেছিল কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে। তাই লতাপাতা, ফুলফল, পাখীর পালক, জীবজন্তুর হাড়, পুঁতি, পাথর থেকে শুরু করে জড়োয়া গহনা পর্যন্ত কতো শত জিনিস সভ্য-অসভ্য সকল শ্রেণীর মানব-মানবীর দেহে সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে ব্যাপ্ত। ধাতুর ব্যবহার আবিষ্কারের পর থেকেই লোহা-পিতল-কাঁসা-তামা-রূপো-সোনা একে একে বঙ্গ ললনাদের সাধ পূর্ণ করেছে। কিন্তু প্রাচীন কবির বর্ণনায় যতোই সোনা-রূপোর ছড়াছড়ি থাকুক না কেন, পল্লীর দরিদ্র বঙ্গ-নারীর সাধ, কাঁসার খাড়ু, রূপোর মল, বালা, কঙ্কণ, নথ, হাঁসুলী ও পাশা দিয়েই মেটাতে হতো। বার-ব্রত করে ঠাকুরের কাছে ইহজন্মে অথবা পরজন্মে 'শাঁখার আগে সুবর্ণের খাড়ু' থাকতো তাদের প্রার্থনার সামগ্রী। তবে ধনাঢ্য নাগরিক সভ্যতা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। সেখানে অভিমানিনী স্ত্রী লহনার মান ভাঙাতে ধনপতি তাঁকে অক্লেশে 'পাঁচ পল সোনা' দিতে পারেন।[১] তবে সোনা, রূপো বা পেতল, অলংকার যারই হোক না কেন, তা ছিল অত্যন্ত মোটা ও ভারী ধরনের।

সেকালে অভিজাত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নানারকম স্বর্ণালংকার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। পুরুষদের ভূষণের মধ্যে বাহুতে বাজুবন্ধ[২], ঝাঁপা[২], কেয়ূর-কঙ্কণ[৩], হেম তাড়-বালা[৪], কণ্ঠে মণিমুক্তা খচিত পদক[৫], সোনার কণ্ঠী[৬], প্রবাল ও মুক্তার মালা[৭]. কর্ণে সোনা-মুক্তা গাঁথা কুণ্ডল[৮], রত্নমালা[৯] ইত্যাদি ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

'অজানুলম্বিত ভূজে কেয়ূর কঙ্কণ।'

অথবা—

'নগরে নাগর জনা কানে লম্বমান সোনা।'[১০]

১. 'পাঁচ পল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি।' ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ৩০।
২. 'দুই বাহে বাজুবন্ধ ঝাঁপা নানা মণি।' রসিকমঙ্গল, পৃ. ৪৯।
৩. 'অজানুলম্বিত ভুজে কেয়ুর কঙ্কণ।' ঐ. ঐ.।
৪. 'শোভয়ে হেম তাড় বালা।' ঐ. পৃ. ৩৮।
৫. 'নানা রত্ন মণি মুক্তা গাঁথি থরে থরে।
হৃদয়ে পদক বেড়ি শোভিত সুন্দরে॥' ঐ. ঐ.।
৬. 'দোসরি সোনার কণ্ঠি কণ্ঠের উপরে।' ঐ. পৃ. ৫৪।
৭. 'পহলা মুকুতা মালা বক্ষেতে হিল্লোলে।' ঐ. ঐ.।
৮. 'দুই কর্ণে শোভে সোনা মুকুতা গাঁথনি।' ঐ. পৃ. ৪৯।
'ঝলমল করে মতি শোভে দুই কর্ণে।' ঐ. পৃ. ৪৩।
৯. 'গোধূলি হৈল বেলা সাধু চাপে দোলা
গলাতে দিল রত্নমালা॥' ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ৩৭।
১০. ক. ক. চ. পৃ. ৩৭৯।

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'গোধুলি হইল বেলা সাধু চাপে দোলা
গলাতে দিল রত্নমালা।'[১]

সাধারণতঃ কোমরে সোনার শিকলি, পায়ে মলবাকি, নূপুর, গলায় বাঘ-নখের হার, মতির হার, হাতে সোনার কঙ্কণ, স্বর্ণ তাড ইত্যাদি অভিজাত বালক এবং শিশুর অঙ্গে শোভা পেতো।

'কোটীতটে লম্বমান সোনার শিকলি
মলবাঁকি পদতলে করে ঝিলিমিলি॥
শার্দ্দুলের নখগণে অতি মনোহরে
চলিতে চরণযুগে নূপুর ঝঙ্কারে॥'[২]

কোথাও পাওয়া যায়—

'কোটিতে কিঙ্কিনি সাজে গলে মতিহার বাজে
হস্তে শোভে সোনার কঙ্কণ।
দুই বাহে তাড দুই স্বর্ণে নির্মিত সেই
ব্যাঘ্র নখ হৃদয়ে ভূষণ॥'[৩]

দরিদ্র জননীরা তাদের শিশুদের কণ্ঠে জালের কাঁঠি, বাঘনখ, বাহুতে লোহার শিকলী ও কর্ণে স্ফটিক-কুণ্ডল দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন।

আমাদের আলোচ্য শতকে ধনী রমণীদের বহু রকমের স্বর্ণালংকার ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। কর্ণে কুণ্ডল, হেম মুকুলিকা, কর্ণপুর, স্বর্ণকাপ, উপর কানে কনক বউলী, বউলী চাকি, চাকভাটি-নির্মিত বউলী, নাকে নাক-মাছি, তিলফুল, বাহুতে চিন্তামণি-খচিত টাড়, বাজুবন্ধ, হাতে রাঙ্গাকুলি, মাদুলি, ঝাপা, কেয়ুর, কঙ্কণ, অঙ্গদ, বালা, চুড়ি, রাম-লক্ষ্মণ শঙ্খ, লক্ষ্মীবিলাস শঙ্খ, সরল শঙ্খ, বাই শঙ্খ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, কুলুপিয়া শঙ্খ, মাথায় স্বর্ণ ঝাপা, সিথি, গলায় সতেশ্বরী হার, রস-কাঠি, ঝিলিমিলি হার, গজমতি হার, মণিময় হার, হীরা নীলা-মোতি-পলা-খচিত হার, লম্বমান মোতি হার, আঙুলে অঙ্গুরী, চরণে নূপুর, পাতামল, গুঞ্জটি পাশুলী, রজত পাশুলী, স্বর্ণ পাশুলী, কিঙ্কিণী, স্বর্ণ বলয়[৪], রতন মঞ্জরী ইত্যাদির ব্যবহারের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের অলংকার ব্যবহারের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রে—

'নাকের বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছরা দিল সকল শরীরে॥

১. ক ক. চ (খ. উ.) পৃ. ৩১।
২. ঐ. ঐ. পৃ ২৬৭।
৩. রসিকমঙ্গল, পৃ. ২৩।
৪. 'স্বর্ণ বলয় পায় কণক পাশুলি।' রসিকমঙ্গল, পৃ. ৫১।

গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি॥
উপর হাতেতে দিল তাড স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ॥
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর।[১]

কেবলমাত্র অলংকারই নয়, সেকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের বসন ও ভূষণের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রয়েছে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পরে অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবীর, শিশু চৈতন্যকে দেখতে চৈতন্যদেবের গৃহে আগমনের বর্ণনায়।

'সুবর্ণের কড়ি বউলি রজত মুদ্রা পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ॥
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মলবঙ্ক
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি কটি পট্ট সূত্র ডোরী
হস্ত পদের যত আভরণ॥
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী ভুনিফোতা পট্টপাড়ী
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন॥
...বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লঞা দাসী চেডী
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥'[২]

সম্ভ্রান্ত পুরুষরা 'নেতের ধুতি', 'নেতের উড়ানী' ব্যবহার করতেন। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে অনেক সময়ে কোমরে 'ঝিনবাস' বা ফেটি জড়িয়ে, কাঁধে চাদর ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়।

'ক্ষীণমাঝা কোটিতে শোভিত ঝিনবাস॥
বেড়াইল পাটের পাছড়ি পীত বাস॥
কোটিতে বান্ধিল আঁটি পাটের বসন।'[২]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'দোসরা করিয়া বস্ত্র কাঁধের উপরে।'[৩]

এবং—

'অঙ্গ বেড়ি পাট বস্ত্র বাম কান্ধে শোভে।'[৪]

২. চৈ. চ (আ.), পৃ. ২৭৫।
১. রসিকমঙ্গল, পৃ. ৪৯।
৩. ঐ পৃ ৪৪।
৪. ঐ পৃ. ৪৯।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যদেবকে 'কৃষ্ণ কেলী' নাম্নী রঙ্গিন বস্ত্র পড়তে দেখা যায়। ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে 'পীত ধড়ি', 'দুকুল', 'পাটভেন', 'ক্ষৌম সূত্র বিরচিত বসন', 'জোড ধুতি', 'ছিট উডানি', 'পাটাম্বর', 'সালামের থান', 'জামা জোড়া' ইত্যাদি পরতে দেখি পুরুষকে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে 'খাসা-জোডা' অর্থাৎ এক ধরনের পট্ট-বস্ত্রের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

এছাডা কোথাও কোথাও—

'শিরে চাঁরা জামা গায়।
কটি আটি পটুকায়॥'

আবার কোথাও বা ''বিলাতী খিলাত' গায়ে দেবারও খবর মেলে। পুরুষরা মাথায় পাগড়ী বাঁধতো।

'পাগড়ী সুবর্ণ্ণকৃত শির পর শোভিত
শোভন সাজুয়া গায়।'

—ইত্যাদি উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। তবে, এই পাগড়ী রাজপুরুষ বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষরাই ব্যবহার করতেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে কলিঙ্গ রাজের দরবারে যাবার সময়ে ভাঁড়ুর সম্পর্কে, 'পাগখানি বাঁধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ'—এই উক্তি থেকে পাগড়ী সম্বন্ধে সাধারণের অনভ্যস্ততাই প্রকাশ পায়। সতেরো শতকের অপর কবি ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে লাউসেনকে আমরা বিভিন্ন সময়ে গায়ে জামা দিতে, কোমরে পট্টি বাঁধতে ও মাথায় পাগড়ী বাঁধতে দেখি।

'মদন বিনোদ জামা তুর্ল্যা নিল গায়।
কোমরে বান্ধিল পটি পটুকা সহিতে।
বিনোদ পাগুড়ে বান্ধে মাথার য়োপরে॥'[১]

মনে হয় সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাঙালির পোষাক ধুতি চাদরে একটু একটু করে পরিবর্তন দেখা দেয়। সম্ভবতঃ এই সময় থেকেই কাঠের পাদুকা অর্থাৎ খড়মের পরিবর্তে চর্ম পাদুকার আগমন ঘটে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা প্রথম এর খবর পাই 'চর্ম্ম উডে চর্ম্ম পাদুকার চটচটি'[২] ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে।

অন্য দিকে গরীবের সম্বল ছিল 'খুঞা বসন', 'শীতের পাছরি' ও 'খোকড়ি' মাত্র। শীত ছাডা অন্য সময়ে সামান্য 'আঁঠু ঢাকা বস্ত্রই' ছিল তাদের আকাঙ্খার বস্তু। সেখানে কোনো রকম আড়ম্বরের বাহুল্য ছিল না। এই কারণেই প্রায় সব বিদেশী পর্যটকই[৩] এ দেশের গ্রামের স্ত্রী-পুরুষদের পোষাকের যৎসামান্যতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

১ ধ ধ। প. সং ২০১।
২. পৃ. ১৯৩।
৩ Travels in the Mogul Empire, P. 301-02.

আমাদের আলোচ্য সময়ে নগরের সম্রান্ত ঘরের মহিলাদের শাড়ীর বাহার ছিল যথেষ্টই। তাঁরা শুধু শাড়ী পরে বাড়ির বাইরে যেতেন না, 'চিত্রবর্ণ পট্ট শাড়ীর ওপরে 'ভুনি ফোতা পট্টপাড়ি' অর্থাৎ একালের চাদরের মতো একটি আবরণ, কখনও বা 'উড়ানি', 'খোলসা উড়নি বা ওড়না ব্যবহার করতেন। 'দোছুটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী'[১] ইত্যাদি উক্তি থেকে শাড়ীর দৈর্ঘের পরিমাণ বোঝা যায়। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা অতি দীর্ঘ বস্ত্রের খবর পাই। এবং সে সকল বস্ত্র এতো সূক্ষ্ম ছিল যে হাতের মুঠোর মধ্যে তাকে স্বচ্ছন্দে ধরা যেতো

'বাইশ গজ বসন বাঁ হাতে লয় মুঠি।

আমাদের আলোচ্য সময়ের রাঢ়ের বিভিন্ন কবির কাব্যে লক্ষ্মীবিলাস শাড়ী, পাটের নেত ভুনি মেঘডম্বুর শাড়ী, পাটশাড়ী, কাঁশাড়ী, গুয়াগুটি শাড়ী, তসর বসন, কনক শাড়ী, গঙ্গাজলী শাড়ী, আনন্দার্ক শাড়ী, ভস্মুতো ডুরা শাড়ী, নীল শাড়ী, যাত্রাসিদ্ধ শাড়ী, অগ্নিফুল শাড়ী, মুক্তাফুল শাড়ী, খনসু শাড়ী, মণিমুক্তা খচিত পাটের শাড়ী ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর শাড়ীর ব্যবহারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

সেকালে রাঙা শাঁখা ছাড়া মেয়েদের প্রসাধন অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

'শ্রীরাম লক্ষ্মণ শঙ্খ দুই ভুজে সাজে
চরণে নূপুর শোভা সুর্নলিত বাজে॥

কুমারীর কামনা ও সধবার সোহাগ আবর্তিত হতো এই শাখাকে কেন্দ্র করে। 'শিবায়ন এর কবি রামেশ্বর তো রমণীর আদরের ভূষণ শাখার মহিমা বর্ণনায় একটি পূর্ণ অধ্যায়ই রচনা করলেন। সেখানে দেখা যায়, দেবী ভগবতী অতি সংকোচে, অনেক কাকুতি মিনতি করে, স্বামীর কাছে একজোড়া শাখা প্রার্থনা করেন। কারণ শূন্য হাতে প্রতিবেশিনী রমণীদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর লজ্জা হয়।

'দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটি বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু চাই নাই
লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাই কই॥
ভুল ডাটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের না হয় ওর॥'[৩]

কিন্তু এমন আবদারও মহাদেব মঞ্জুর করলেন না।

'ভিখারীর ভার্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেনে অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥

১ ক ক চ (ধ.উ) পৃ ১২১।
২ রূ ধ পৃ. ১০৮।
৩ রামেশ্বরের 'শিবায়ন' পৃ ২৮০।

বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥'[১]

দরিদ্র হলেও মহাদেবের রসনার ধার অল্প ছিল না। সুতরাং দেবীর 'ভূষণের সাধ' তিনি তো বরদাস্ত করলেনই না, উপরন্তু কু-কথা বলে হুলুস্থূলু বাঁধিয়ে বসলেন। অন্যান্য অলংকার তো দূরের কথা, সেই বসন ও ভূষণের প্রাচুর্যের যুগেও ক্ষেত্র বিশেষে কোথাও কোথাও একজোড়া শাঁখাও বিলাস সামগ্রীর মধ্যে পরতে দেখা যায়। তবু সেকালে যে নানা রকম সুন্দর সুন্দর শঙ্খের ব্যবহার ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সে সব শঙ্খে সুন্দর কারুকার্য করা থাকতো। আবার কুলুপ দেওয়া শঙ্খ বা কুলুপিয়া শঙ্খের[২] ব্যবহারেরও খবর পাওয়া যায়।

প্রসাধনের পর্ব শেষ হলে গায়ে কস্তুরী-মৃগ লেপন করে তার সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করার খবরও মেলে।

'সর্বাঙ্গ ভরিঞা দিল মৃগ নাভির মূল।'[৩]

অথবা—

'সাজন করিয়া উষা শয়ন মন্দিরে বৈসা
কস্তুরী চন্দন মাখে গায় ॥'[৪]

সেই সুবাসিত অঙ্গে, সিন্দুর চর্চিত সীমন্তিনীর চরণ কমলে রাতুল আলতার রূপে, সেকালের অনেক ভাগ্যবানেরই চোখ তৃপ্ত হতো।

---

১. রামেশ্বরের 'শিবায়ন', পৃ. ২৮১।
২. রূ. ধ. পৃ. ৩২।
৩. ধ. ধ.। বি. ভা. পু. সং. ৪০৮।
৪. শে. ম. পৃ. ৭৩।

রন্ধন ও ভোজন

বসাইল কনক আসনে।
তাম্বুল দিল জনে ॥
যতনে সম্ভোগ আনি।
রন্ধন কৈল কোন ধনি ॥

প্রসাধনের মতোই আর একটি বিদ্যাতেও মেয়েদের ছিল স্বাভাবিক নৈপুণ্য। সেটি হলো রন্ধন-বিদ্যা। মধ্যযুগের বিভিন্ন কলা-বিদ্যার মধ্যে যেটিতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব স্ত্রীলোকই নিপুণতা অর্জন করবার চেষ্টা করতেন, সে হলো এই রন্ধন বিদ্যা। তবে, এই বিদ্যাটি সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের অধীনে থাকলেও সমকালীন সাহিত্যে প্রত্যেক কবিই একাধিকবার যে ভাবে রন্ধন অথবা ভোজনের নিপুণ ও রসগ্রাহী বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয়, পুরুষদেরও এই বিশেষ বিদ্যাটি একেবারে অনায়ত্ব ছিল না। ধনী-দরিদ্র যে কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষেই নিজের হাতে রান্না করাই ছিল যুগ-প্রথা। সেকালে যে সব স্ত্রীলোকেরা ভোজকাজে রান্নার ভার পেতেন তাঁদের গর্বের সীমা থাকতো না। রান্নার প্রশংসা পেলে তাঁরা যেমন উল্লসিত হতেন, নিন্দায় বিমর্ষ হতেন তার থেকে অনেক বেশি। তাই ধনপতি, লক্ষপতি ইত্যাদি নামের মধ্য দিয়ে যাদের অর্থকৌলিন্যের ঘোষণা সোচ্চার হচ্ছে, সেই সব ধনী কুলবধূগণ তো বটেই, এমন কি রাজরাণীরাও স্বহস্তে রান্না করতেন। সতেরো শতকে রচিত যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ'-এ দেখা যায়, রাজা হরিশ্চন্দ্র বনবাস থেকে বহু দিন পরে রাজ্যে ফিরলে, সাত রাণী তাঁর সেবায় নিযুক্ত হন। এক এক জন, এক এক কাজ করেন।

'বসাইল কনক আসনে।
তাম্বুল দিল জনে ॥
যতনে সম্ভোগ আনি।
রন্ধন কৈল কোন ধনি ॥'[১]

তবে রান্নার সময়ে দাসীরা সঙ্গে থেকে যোগান দিতো অবশ্যই। বিশেষ কারণে কখনও কখনও দাসীদেরও রাঁধতে বলা হতো। সতেরো শতকের কবি ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায় রঞ্জাবতী তার দাসীকে বলছে—

'পরের রন্ধন অন্ন খাইতে লাগে সাধ।'[২]

১ যা ধ.। সা. প্র. গ্র. পৃ. ৫৩।
২. ধ. ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ৭২ক।

অবশ্য দাসী বা অপর কাউকে রাঁধতে বলার ব্যতিক্রম, বিশেষ বিশেষ কারণেই ঘটতো। কিন্তু সাধারণভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া ছিল খুবই অসম্মান-জনক। দাসীরা সঙ্গে থেকে যোগান দিতে পারে, কিন্তু রান্নার কর্তৃত্ব তাদের হাতে তো দূরের কথা, স্বয়ং সপত্নীর হাতেও কেউ প্রাণ ধরে তুলে দিতে পারতেন না।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, ধনপতি সদাগর দীর্ঘকাল পরে বাণিজ্য থেকে ফিরে আত্মীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে রান্নার ভার দিলেন খুল্লনাকে। এই অধিকার লাভ সেকালের সমাজে খুবই গৌরবের বিষয় ছিল। আবার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সপত্নী লহনাকে তর্জন-গর্জন করতে দেখা যায়।[১] আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কাব্যে সর্বত্রই দেখা যায়, কাউকে কোনো কাজে নিযুক্ত করার নিদর্শন হিসেবে তার হাতে পান দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় খুল্লনার ওপরে রান্নার ভার অর্পণ করলে, 'অঞ্জলি করিয়া রামা শিরে নিলা পান'।[২] খুল্লনার সেদিনের রান্নার বর্ণনা থেকে সেকালের মধ্যবিত্ত ঘরের ভোজন পর্বের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

'বেগুন কুমড়া কচা তাথি দিয়া কলা মোচা
বেশাব পাঠালি ঘন কাঠি॥
ঘৃত সম্তলন তথি হিঙ্গ জিরা দিয়া মেথি
শুক্তার রন্ধন পারিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি নটাশাকে ফুলবড়ি
চঙ্গুড়ি কাঠাল বীচি দিয়া॥
ঘৃতেতে নালিতা শাক সূপ রান্ধে রসবাস
হিঙ্গ জিরা বাসে সুবাসিত॥
ভাজে চিথলের কোল রোহিত মৎস্যের ঝোল
মানবড়ি মরিচ ভূষিত॥
বোদালি হেলঞ্চ শাক কাঠি দিয়া করে পাক
ঘন বেসার সম্তলন তৈলে॥
চিঙ্গুড়ির তোলে বড়া কিছু রাই কিছু খড়া
খর সৌলা কথকগুলা তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন আম্র সউল মীন
খরলোন দিয়া ঘন কাঠি।
রান্ধিল পাকাল রস দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাটী॥

১. 'তর্জন গর্জন করে অধর দর্শনে।' ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১৩২।
২. ঐ. ঐ.

কলা বড়া মুগ সাউলী ক্ষীর সোনা ক্ষীর পুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে ॥'[১]

খাবারের শেষে নানারকম মিষ্টান্নেরও ব্যবস্থা থাকতো তখন।

সমকালীন সাহিত্যে মাছের মধ্যে রুই, চিতল, চিংড়ি, কাতলা, ভেটকী, সোল, শাকাল, বোয়াল, ইলিস, পাবদা, পুঁটি, পাঙ্গাস, মৌরলা, চেলা, নয়না, বান, বাটুয়া, খুড়সী, কালবোস, আড়, গাগর, ফলুই, গড়ুই, চ্যাং, শাল, ট্যাংরা সিঙ্গি, মাগুর, কই ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এর সঙ্গে কাঁকড়া, শামুক, গুগলি ইত্যাদি আহারের খবর পাওয়া যায় কোনো কোনো কাব্যে।[২] এই সব মাছের রান্নারও বিচিত্র বর্ণনা মেলে। মরিচ ও মানবড়ি দিয়ে রুই মাছের ঝোল; চিতল মাছের পেটি ভাজা; চিংড়ি মাছের বড়া; কাঁঠাল বিচি দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারী; সোল মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে আম দিয়ে অম্বল; কুমড়োর বড়ি দিয়ে মাছের চড়চড়ি; সফরি বা সরল পুঁটি ভাজা; পটল, কাঁঠাল বিচি ও মরিচের ঝাল দিয়ে রুই মাছের ঝোল; ভেটকি ও আড় মাছ বাস করে অম্বল; রসুন দিয়ে পোনা মাছ; মরিচের গুঁড়ো দিয়ে চিতল মাছের পেটি ভাজা ইত্যাদির খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর রান্নার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানে দেখা যায়—জামিরের রস দিয়ে পোড়া মাছ, নকুল, গোধিকা পোড়া, শিক পোড়া করে সজারুর মাংস ইত্যাদি ছিল বিশেষ প্রিয় খাদ্যের পর্যায়ভুক্ত। সতেরো শতকে অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে হাঁসের ডিমের বড়া খাবারও খবর পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ছাগ, মেষ, হরিণ, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস খাওয়ার প্রচলন বর্তমান কালের মতোই ছিল। আরও পরবর্তী কালে এসে, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যে খাদ্য তালিকার মধ্যে কিছু নতুন খাদ্যের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখা যায়। এদের মধ্যে মাছের কালিয়া, দোলমা এবং মাংসের কাবাব ও সীক ভাজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই রান্নার জগতে 'দাড়ি-নাড়ি-কলিমুদ্দি-মিয়া'র দল এসে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে।

বর্তমানে বাংলায় নিরামিষাশী লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারের ফলে অনেকেই আমিষ বর্জন করেছিলেন। ফলে নিরামিষ রান্নার পরিপাটি বর্ণনা অনেক কাব্যেই পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস দরিদ্র সন্তান ছিলেন বলে তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে রন্ধন ও ভোজনের বারবার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই 'দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স সকল'—এই পর্যন্ত বলেই শেষ করেছেন। কিন্তু এই অভাব পূরণ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে। সেখানে দেখা যায় নিরামিষ রান্নায় সে যুগে বিপ্লব ঘটেছিল।

১. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১৩৪।
২. রামেশ্বরের 'শিবায়ন', পৃ. ২৬৮।

নিরামিষ রান্নার মধ্যে শিম, বেগুন, কচি কাঁচকলা আর গোটা ছোলা দিয়ে সুক্তোর ঝাল ; কিংবা নিম, শিম, বেগুন, কুমড়ো, কাঁঠাল বিচির সঙ্গে ফুলবড়ি ও আদার রস দিয়ে সুক্তোর ঝোল রান্নার বর্ণনা পাওয়া যায়। কাঁঠাল বিচি, ফুলবড়ি, নারকেল কোরা দিয়ে নটে শাকের ঘণ্ট রান্না করে ঘৃত সম্ভার দেওয়া, হেলঞ্চা-'বার্ত্তাকি'র (বেগুন) ঘণ্ট ; মোচার ঘণ্ট ; কচি মোচা, পলতার ডগা ও ফুলবড়ি দিয়ে ঘণ্ট ; দুধ, চিনি, নারকেল কোরা ও মরিচের ঝাল দিয়ে থোড ঘণ্ট, নারকেল কুমড়ি, ঘী দিয়ে বেগুন ভাজা, থোড ভাজা ইত্যাদি ছিল প্রিয় খাদ্য। পটল, ফুলবড়ি, মোচা, কুষ্মাণ্ড বা কুমড়ো, মানচাকী ইত্যাদি ভাজাও জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া গিমা শাক পোড়া, উচ্ছে পোড়া ও বেগুন পোড়া খাবারও খবর পাওয়া যায়।

সেকালে একই দিনে নানা রকম শাক খাওয়ার প্রচলন ছিল। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত-গ্রন্থে অদ্বৈত-ভবনে শচীমাতার 'বিংশতি প্রকার শাক' রান্নার কথা বলা হয়েছে।[১] কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে 'দশাবধ শাক' রান্নার কথা বলেছেন।[২] 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব শাক এতো ভালোবাসতেন যে, কোনো কোনো শাক-ভোজনে কৃষ্ণে অনুরাগ জন্মাবার কথাও তিনি বলেছেন।

'প্রভু বোলে এই যে অচ্যুত নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥[৩]

সেকালে শাকের মধ্যে হেলঞ্চা, কলমী, গিমা, পুঁই, পলতা, নটে, সরষে, বাথুয়া, পালং, লাউডগা ইত্যাদি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

সতেরো শতকের বিভিন্ন কাব্যে বিচিত্র ধরনের ডাল রান্নার বর্ণনা রয়েছে। 'মুদ্গ স্যুপ', 'মুসুরী স্যুপ ছিল সেকালের প্রিয় খাদ্য। 'টাবা জল'[৪] বা এক ধরনের লেবুর রস দিয়ে মুসুরি ডাল রান্না হতো।

'রান্ধিবে মুসুরি ডাল দিয়া টাবা জল।'[৫]

কচু দিয়ে মুগের স্যুপ রান্নারও খবর মেলে।

---

১. চৈ. ভা (অ) পৃ. ৪৩৪।

২. চৈ. চ. (ম) পৃ. ৪৪১।

৩ চৈ ভা. (অ) পৃ ৪৩৪।

৪. 'টাবা জল'কে 'ডাবের জল' পাঠান্তর ধরে কেউ কেউ মনে করেন সেকালে ডাবের প্রাচুর্যহেতু তা রান্নায় জলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ছোলঙ্গ, নারঙ্গ, ট্যাবা ইত্যাদি লেবু ও লেবু-জাতীয় দ্রব্যের নাম একত্র থাকাতে এই 'টাবা জল'কে লেবুর রস বলেই মনে হয়। যেমন ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-এ পাওয়া যায়—

'ছোলঙ্গ নারঙ্গ টাবা জলপাই কিছু।
কচি তেতুলের ঝোল তাহে দিহ কিছু॥' বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প সং ৭২ক।

৫. ক. ক. চ. পৃ. ১১৬।

'মুগের সুপেতে কচু।
ঘৃত সম্ভারণে হয় মনোহর
মরিচের ঝাল কিছু॥'[১]

এছাড়া, হিং-জিরে দিয়ে মুসুরি সুপ, ছোলার ডাল ইত্যাদিরও প্রচলন ছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারের ফলে অনেকেই আমিষ বর্জন করেছিলেন, তার ওপর সেকালের ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ আমিষ আহার করতেন না। ফলে, নিরামিষ ভোজনের পরিপাটি বর্ণনা অনেক কাব্যে[২], বিশেষ করে বৈষ্ণব চরিত গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সতেরো শতকে বিশেষ করে নিরামিষ ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এদেশে পর্তুগীজদের আমদানী করা আলুর ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গিয়ে ছিল। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে ও ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে আমরা রাঢ়ের অতি প্রিয় ব্যঞ্জন 'পোস্ত'র উল্লেখ পাই।[৩]

প্রতিদিন আহারে বসে চতুর্বিধ স্বাদ গ্রহণের প্রথা ছিল সেকালে। বর্তমান কালের মতো তখনও নিরামিষ ও আমিষ এই দুই ধরনেরই নানা স্বাদের অন্ন প্রস্তুত হতো। 'মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়'[৪] নিয়মিত না হলেও, মনে হয় সেকালে এককালীন একাধিক অম্ল আহারের প্রথা ছিল। খাওয়ার শেষে নানান ধরনের মিষ্টান্নের ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর রান্নার বর্ণনা অপেক্ষা চৈতন্যচরিত-কারদের দেওয়া বৈষ্ণব সমাজের আহারের বর্ণনায় মিষ্টান্নের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সে সব ক্ষেত্রে আমিষের অভাব নানা ধরনের মিষ্টান্ন দিয়েই পূরণ করা হতো।

জল খাবারের মধ্যে দুধ, সর, ননী, পিঠে, নাড়ু, মণ্ডা, চিঁড়ে, মুড়ি, খই ও ফলের ব্যবহার ছিল। ষোড়শ শতকের কবি চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'-কাব্যের খাদ্য তালিকায় রুটি ও খিচুড়ীর খবর পাওয়া যায়।[৫] সতেরো শতকের কোনো কোনো কবির কাব্যে রুটি ও পুরীর খবর[৬] পাওয়া গেলেও লুচির কোনো খবর পাওয়া যায় না। এ খবর আমরা পাই আঠারো শতকে এসে ভারতচন্দ্রের 'সুধা রুচি মুচি মুচি লুচি' ও ঘনরামের 'ঘৃত পক্ক লুচি পুরী'র উল্লেখে। তবে পোলাও-এর কোনো খবর মেলে না। সর্বত্রই 'পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ'। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই কবি-যুগল ছিলেন রাজ অন্নে অভ্যস্ত এবং কিছু পরবর্তী কালের।

১. ধা. ধ পৃ ৫৬।

২ সতেরো শতকের কবি ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে রঞ্জাবতীর সাধারণ ভোজনের বর্ণনায় আমিষ বর্জিত হয়েছে। বি ভা. পুঁ সং ৪০৮॥ প সং ৭২ক।

৩. পোস্ত খাবার হোলা গেল একি মনস্তাপ।' ক. ক. চ. পৃ. ২৪৯।
'পোস্ত খাবার হোলা গেল ছাকনার কানি।' ক্ষে. ম। বি ভা. পুঁ সং ১০ ৪। প সং ১১খ।

৪. চৈ চ (ম) পৃ. ৭৫।

৫. গৌরাঙ্গ বিজয়, পৃ. ৫২।

৬. 'পায়স পিষ্টক রুটি অশেষ রন্ধন।'
'পোড়া পুরী মঠ খাজা বাখাঞ্জা কৌতুকে।' যশোশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস'। বি. ভা. পুঁ. সং ১২০৯। প. সং ১২০ক, ১২০খ।

এর থেকে আমাদের মনে হয় রুটি লুচির ব্যবহার তখনও রাঢ়ের সাধারণ গৃহস্থ ঘরে বিশেষ ছিল না।

এতক্ষণ যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা করা হলো, সেগুলি তৈরি হওয়ার অব্যবহিত পরেই খাওয়ার উপযোগী। দূরদেশে যাওয়ার সময়ে অথবা অন্য কারণে পরে খাওয়ার উপযোগী নানা ধরনের শুকনো খাবারও সতেরো শতকের রাঢ়বাসীরা তৈরি করতে জানতেন। বাংলা থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ চাতুর্মাস্য উপলক্ষে বৎসরান্তে তাঁকে দেখতে যাবার সময়ে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্যে সঙ্গে যে সব খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন, তা দীর্ঘ দিন রেখে খাওয়া চলতো। এর মধ্যে বহু রকমের সুস্বাদু আচারের যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়, তেমনি নানা রকম শুকনো মিষ্টি জাতীয় খাবারের খবর এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রস্তুত প্রণালীরও কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়।

'ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া॥··
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালি কাচুটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় বড় কুথলী ভরি॥
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি-তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল॥'[১]

আলোচ্য সময়ের সাহিত্যে নানা রকম পিঠে পায়েসেরও বর্ণনা মেলে। কিন্তু পোলাও-এর কোনো খবর পাওয়া যায় না। সর্বত্রই 'পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ'।[২]

সমকালীন সাহিত্যে আহাযের বর্ণনায় যতো বাহুল্যই থাকুক না কেন, দরিদ্রের অবস্থা বোধহয় সেকাল একাল চিরকালই এক। তবে সেকালে দরিদ্রের আহারের যে

১. চৈ. চ. (অ). পৃ. ২০৩-২০৬।
২. চৈ. চ. (ম). পৃ. ৭৪।

বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ঘী-দুধ-মাছ-মাংস না হলেও তরকারীর অভাব ছিল না তাদের ঘরেও। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের ফুল্লরার বারমাস্যায় আমানি খাবার উল্লেখ রয়েছে। খাবার পাত্র ছিল না; ঘরের মেঝেতে গর্ত করে তাতেই আমানি খাবার ব্যবস্থা ছিল।

'আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।'[১]

অথবা—

'ভোজনের পাত্র নাই জন্মের কাঙ্গাল।
আমানির তরে ঘরে কুড়্যাছিলে খাল॥'[২]

তবু, 'পান্ত ওদন' আর 'খুদের জাউ' যাদের চিরন্তন সম্বল ছিল, তাদেরও তখন তরকারী—সে যতো নগণ্যই হোক, তার অভাব ছিল না।

'ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া॥'[৩]

কারণ বনআলু, বনকচু, নানা রকম শাক ইত্যাদি তখনও বন-বাঁদার থেকে সংগ্রহ করে নিলেই হতো। তাই খুল্লনাকে ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে, তাকে দিয়ে ছাগল চরিয়ে, দিনান্তে কদাহার দিয়ে খুব কষ্ট দিতে গিয়েও, লহনা তাকে অনেকগুলি ব্যঞ্জন খেতে দিয়েছিল।

'পুরাণ খুদের জাউ তাতে আছে কোণ।
সকল বেঞ্জনে বাঁজি নাহি দেয় লোন॥
রেন্ধ্যাছে কলমি শাক বনাতি কাঁকড়া।
কলায়ের খুদের কোণে তুলিয়াছে বড়া॥
বেগুনের খারা লাউ কুমড়া বাকলা।
গডই মৎস্যের মুড়া তাতে আছে মেলা॥
খইলের বেসার দিয়া জ্বাল দিল বড়ি।
তৈল মুন বিবর্জিত সন্তলন বড়ি॥
গুড়ম্বর ফল কিবা রেন্ধ্যাছে পিণ্ডিরা।
কাঁচা শিমের ব্যঞ্জনে পুরিয়া দিল শরা॥'[৪]

আর সেই আহারের বর্ণনাকে আলোচ্য সময়ের দরিদ্র বাঙালি ঘরের নিত্য দিনের আহার্য বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।[৫]

বিনোদন

কোনখানে কবিত্ব পড়য়ে রায়বার।
কোনখানে বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ।
কোনখানে ভারথ পুরাণ রামায়ণ।

গানবাজনা আজকের মতোই সেকালের সমাজেও লোকপ্রিয় ছিল। আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও চরিতগ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায়, সব রকম উৎসবে, পার্বণে নাচগানের আসর বসতো। কীর্তন, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদিও ছিল উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ।

রাঢ় অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকেই অভিনয় হিসেবে যাত্রার প্রচলন ছিল। সেকালে এই যাত্রার অর্থ, দেবতা বিশেষের লীলা বা চরিত্রের অংশ বিশেষ সাধারণ হৃদয়ে জাগিয়ে রাখবার জন্য কোনো উৎসব। ভবভূতির 'মালতীমাধব'-এ 'ভগবান কালপ্রিয় নাথের যাত্রা' অভিনয়ের কথা আছে। মহাভারতে 'ঘোষযাত্রা', হরিবংশে 'বনযাত্রা'র কথা আছে। আর সেই যাত্রার সঙ্গে নৃত্য গীতের ব্যবস্থার কথাও সেখানে রয়েছে। যাত্রার মধ্যে সবচেয়ে পুরোণো 'শিবযাত্রা', তারপরে 'রামযাত্রা'। 'কৃষ্ণযাত্রার' উদ্ভব আরও পরবর্তী কালে। শ্রীচৈতন্যদেবই সংকীর্তন ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাভিনয় বিশেষভাবে প্রচার করেন।

পারিবারিক উৎসবে মহাভারত ও ভাগবত পাঠ করানোর রীতি প্রচলিত ছিল। শাক্ত পণ্ডিতেরা আবৃত্তি করতেন চণ্ডীর গাথা, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা গাইতেন বেদগাথা, আর সেই সঙ্গে ভাটদের রায়বার পাঠে মুখরিত হয়ে উঠতো উৎসব প্রাঙ্গণ।

'কোনখানে কবিত্ব পড়য়ে রায়বার॥
কোনখানে বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ।
কোনখানে ভারথ পুরাণ রামায়ণ॥'[১]

এরই সঙ্গে চলতো বাদ্য সহকারে নাটুয়াদের নৃত্য। 'ললিত লবঙ্গলতা পদ' অর্থাৎ গীতগোবিন্দের শ্লোক গাওয়ারও বিশেষ প্রচলন ছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' স-পার্ষদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব।[২] মন্দিরা মৃদঙ্গ ছিল কীর্তনের অপরিহার্য বাদ্য। আর বিষয় ছিল 'কৃষ্ণলীলা'। 'চৈতন্যভাগবত'[৩]-গ্রন্থে স্বয়ং মহাপ্রভুকে আমরা নাম ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখি। একবার আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের

---

১. রসিকমঙ্গল, পৃ. ৪৯।

২. চৈ. চ. (ম) পৃ. ৬৪।

৩. চৈ ভা. পৃ. ২৮২ ৮৫।

আঙিনায় আসর করে চৈতন্যদেব স্ত্রীবেশে শাড়ি, হার, বলয়, নূপুর ইত্যাদি অলংকার ও কৃত্রিম বেণীতে সুসজ্জিত হয়ে সখীভাবে নেচে গেয়ে যে কীর্তন করেছিলেন 'চৈতন্য-ভাগবত'-এ তার বর্ণনা রয়েছে।

"একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থলে।
আজি নৃত্য করি অঙ্কের বিধানে॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু 'কাচ[১] সজ্জ কর গিয়া'॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ি সখী সপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ কাচ স্নাতক শ্রীরাম।
'দিয়ড়িয়া হাড়ি মুঞি' বোলয়ে শ্রীমান॥
অদ্বৈত বোলয়ে কে করিব পাত্র কাচ?
প্রভু বোলে 'পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ'॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি,
কাচ সজ্জ কর গিয়া, নাচিবাঙ আমি॥"

উক্ত দিনটির নাচ, গান সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে রয়েছে—

'আচার্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যার ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর॥'

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থেও এই একই কথা পাই।[২] আবার লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-গ্রন্থেও সাজপোষাক করে শ্রীচৈতন্যের যাত্রার আসরে নেমে অভিনয়ের বর্ণনা মেলে।

'এখানে কহিব শুন সাবধানে সব জন
গোপিকা আবেশ বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি ধরে শঙ্খ কঙ্কন করে
দুটি আঁখি রসে ডুবু ডুবু॥
পট্ট সে বসন পরে নূপুর চরণে ধরে
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগৎ মোহে উপমা দিবাঙ কাহে
গৌরী বেশে ঠাকুর আপনি॥'

---

১. এখানে 'কাচ' অর্থে সাজ, অভিনয়ের বেশ, ছদ্মবেশ ইত্যাদি বোঝাচ্ছে।
২. 'মোহিনীর বেশ ধরি নাচে গৌরচন্দ্র।' পৃ. ৭৭।

শুধু কৃষ্ণ যাত্রা নয়, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে রাম যাত্রা, উত্থান দ্বাদশী যাত্রা, দীপাবলী যাত্রার কথাও রয়েছে।

"বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥
হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
'কাহা রে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় বলে বার বার॥
এই মত রাম যাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥"

পরবর্তী কালে এইসব যাত্রার সঙ্গে মনসার ভাসান যাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা যুক্ত হয়। 'আঠারো শতকের প্রথম দিকে কীর্ত্তন ও পাঁচালীতে মানুষ এতো বেশী মেতে উঠেছিল যে, যাত্রার প্রভাব ষোড়শ-সপ্তদশের তুলনায় ক্রমশঃ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আবার ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্য রচিত হবার পরে তার অংশবিশেষ 'বিদ্যাসুন্দর' পালা, অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং যাত্রায় পরিণত হওয়ায় লোকে আবার যাত্রায় মত্ত হয়ে ওঠে। এবং সাধারণের চিত্ত বিনোদনের একটা বড়ো মাধ্যম হিসেবে যাত্রার স্থান হয়।

।। **খেলাধুলা** ।। একালের মতো সেকালেও খেলাধুলা ছিল বিনোদনের একটি বড়ো অঙ্গ। এই খেলাধুলার মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পাশা-দাবা খেলা চলতো।[১] ধনী ব্যক্তিদের সখ ছিল পায়রা ওড়ানো।

"ধনপতি বলে রাঘব বাদের কার্য্য নাই।
তুম্মি আম্মি পণ এড়ি কৈতর উড়াই॥
দড়াদড়ি পণ থুইল তিন লক্ষ ধন।
দুই সাধু পারাবত উড়াএ তখন॥"[২]

বাজী ধরে পায়রা উড়িয়ে আনন্দ বিনোদনের বিস্তার ঘটেছিল আধুনিক কাল পর্যন্ত। এ ব্যাপারে অগ্রণী বঙ্গের 'বাবু'দের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। বঙ্গের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ঘুড়ি ওড়াবার রেওয়াজ প্রাগ-আধুনিক যুগের হলেও, এর সঠিক সময় নির্ধারণ করা কঠিন। তবে আঠারো শতকের একেবারে প্রথম দিকে রচিত রামেশ্বরের

১. ক্ল. খ. পৃ. ৬৫ ; ক. ক. চ. পৃ. ১১১ ; বি. ম. পৃ. ২০।
২. ক. ক. চ. (খ. উ.) পৃ. ১৩-১৪।

'শিবায়ন'-কাব্যে সুতো ও লাটাই-এর খবর মেলে। রায়বাঁশ খেলাও খুব জনপ্রিয় ছিল। লাঠি খেলা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদিও ছিল উৎসব অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ।

'কোনখানে লগুড়ী ফিরায় গোপগণ।
কোনখানে মল্লযুদ্ধ করে নানা ভঙ্গে।'[১]

জুয়া খেলার খবরও পাওয়া যায় আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের সাহিত্যে।

'জুয়া খেলা জগত জানিবে কারবার।
কড়া দিআ জিনে লেহ মানিক ভাণ্ডার॥'[২]

এছাড়া হাতের মুঠোয় সরষে ভেঙে তার থেকে তেল বের করা, লোহার বল হাতের চাপে ভাঙা ইত্যাদিও এক শ্রেণীর খেলার পর্যায়ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়।

'সরিষা নিগুড়ি সেন মাথায় মাখে তেল।
টাকর মারিঞা লোহার ভাঙ্গে বেল॥'[৩]

ছোটো ছেলেমেয়েদের মধ্যে গেণ্ডুয়া বা ভেট্যা খেলা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

'বলেন কস্যপ সুত ভেটা খেলি আয়॥
জিনিঞা আমার ভেটা জাবে নাঞি তুমি।
ভবন হইতে ভাই ভেটা আনি আমি॥'[৪]

অথবা—

'বৎসরে বৎসরে বাড়ে ময়নার পতি।
খেলায় সোনার ভেটা ছাওয়াল সঙ্গতি॥'[৫]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'দিয়াছে সোনার গেড়ু দাদারে বলাই।
সেই গেড়ু লয়্যা আমি আঙ্গিনায় খেলাই॥'[৬]

আবার কোথাও পাওয়া যায়—

'আম্ভের গাজনে খেলে হাথে লয়্যা ভেটা।'[৭]

সুতরাং এই ভেটা খেলা যে বেশ জনপ্রিয় ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। আবার গুলতাই বাটুল খেলা, ইড়িক খেলাও শিশুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় খেলা ছিল।

'বালক সকল তথা খেলিছে ইড়িক।
নিরন্তর দুই হাতে গুলতাই বাটুল॥'[৮]

১. রসিকমঙ্গল, পৃ. ৪৯॥
২. সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'। জাগরণ পালা। প. সং ৫০খ। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
৩. ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'। বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ৯৮খ।
৪. সী. ধ। বি. ভা. পুঁ. সং ৬২৭৭। প. সং ৭খ।
৫. ঐ. ঐ. প. সং ৪৩ক।
৬. যশোশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস'। বি. ভা. পুঁ. সং ১৯০৯।
৭. রূ. ধ. পৃ. ৮৬।
৮. ঐ. পৃ. ৭৮।

এই 'গুলতাই বাটুল' খেলাটা অনুমান করা গেলেও 'ইড়িক' খেলা সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। এছাড়া 'টিকরাজি' খেলা এবং 'পাবড়া ডেলা' নিয়ে খেলাও প্রিয় খেলার পর্যায়ভুক্ত ছিল।

'টিকরাজি খেলে সভে যেই শিশু হারে।
কর্পূর পাতর তারে কিলাইয়া মারে॥'[১]

অথবা অন্যত্র পাওয়া যায়—

'লইয়া পাবড়া ডেলা নিরন্তর করে খেলা।'[২]

এছাড়া 'ইধুলি'[৩] খেলা বা ধূলি খেলা, নৌকো তৈরি করে জলে ভাসানো বা 'ডিঙ্গা' খেলাও বিশেষ পরিচিত ও জনপ্রিয় খেলার পর্যায়ভুক্ত ছিল।

বিশেষ করে মেয়েদের খেলার মধ্যে সতেরো শতকের কবি বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে 'কঅা কঅা' খেলা বা এক ধরনের জলক্রীড়ার খবর পাওয়া যায়। এই খেলায় মেয়েরা জলে নেমে মুখে 'কয়া কয়া' বলে হাততালি দিয়ে জলের মধ্যে আওয়াজ করে সাঁতার কাটতো। এবং এইভাবে পরস্পরের মনোযোগ আকর্ষণ করে অনেকটা জলের মধ্যে চোর চোর খেলার মতো খেলতো।

'কঅা কঅা খেলে বেউলা জলের উপর॥
রুই মৎর্চ হয়্যা বেউলা রাণী যায়।
আঠারটি ভাজু তাখে খেদাড়িয়া যায়॥'[৪]

এছাড়া লুকোচুরি খেলা বা আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে আসা ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে প্রিয় ও পরিচিত চোর চোর খেলার খবর তো সর্বত্রই মেলে।

'খেলে লুকলুকানি আপনি হয়্যা বুড়ি।
এক চোরে সভাকারে করে তাড়াতাড়ি॥'[৫]

এর সঙ্গে চলতো 'দশ পঁচিশ' খেলার মতো আবহমান কাল ধরে চলে আসা বহু বিচিত্র খেলা।

'খেলে দশ পচিশ ছ কড়া লয়্যা কড়ি।
দান ধর্ম্ম দান ফেলে বুড়ি বুড়ি॥'[৬]

॥ নেশা ॥ ঘর সংসারে বিভিন্ন রকমের নেশা চালু ছিল। মদ্যপান এবং আফিং ও ভাঙ সেবনের খবর পাওয়া যায় সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির কাব্যে।

১. সী. ধ। বি ভা. পুঁ, সং ৬২৭৭। প. সং ৪৩ক।
২. রা. ধ. পৃ. ৭৮।
৩. মুনির্দের ছেল্যাগুলি ইধুলি খেলায়। বি. ম. পৃ. ২০।
৪. বি. ম. পৃ. ৭৭।
৫. রা. শি. পৃ. ৫৩।
৬. ঐ. পৃ. ৫৪।

'মদ্যপানে মত্ত হয়ে করেন হিংসন।'[১]

অথবা—

'মদ খাত্যে যায় পারা সুড়িদের ঘর।'[২]

আবার কোথাও পাওয়া যায়—

'ভাঙ্গা পোস্ত মুখে দিছে দোস্ত দোস্ত বলে।'[৩]

এবং—

'পৌরুষ বাড়ালে কেহ পান করি পোস্ত।'[৪]

এখানে পোস্ত বলতে খুব সম্ভবত আফিং-এর কথাই বলা হচ্ছে। কারণ পোস্ত থেকেই আফিং তৈরী হয়। আর ভাঙ সেবনের কথা তো সর্বত্রই পাওয়া যায়। বিশেষ করে শিব ঠাকুরের প্রসঙ্গে। যেমন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে পিতৃগৃহে থাকাকালীন স্বামীকে নিয়ে বিপর্যস্ত দেবী চণ্ডী, শিবের কর্মহীন জীবনেও নেশা করার প্রসঙ্গে বলেছেন—

'অনুদিন কত নাকি কিনা দিব ভাঙ্গ।'[৫]

তবে আলোচ্য সতেরো শতকের বৈশিষ্ট্য হলো, নেশার জগতে তামাকের আবির্ভাব। অবশ্য পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের 'হাসন-হোসেন' পালায় হাসনের অন্তঃপুরের বর্ণনা দেবার সময়ে গোলাম কর্তৃক হাসনকে 'তামাকু' দেবার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি তামাক ষোড়শ শতকে, বাদশাহ আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে প্রথম এনেছিল। বাংলায় এর প্রচলন সতেরো শতকের আগে হয় নি। তাই পঞ্চদশ শতকের অন্য কোনো কাব্যে, এমন কি ষোড়শ শতকের কোনো কাব্যেও তামাকের উল্লেখ নেই। কারণ তামাক তখনও আমেরিকার বাইরে যায় নি। সুতরাং, বিপ্রদাসের কাব্যে তামাক খাওয়ার বর্ণনা পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলেই আমরা মনে করি। সতেরো শতকের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের চাঁদ সদাগরের 'দক্ষিণ পাটনে' নিয়ে যাওয়া বিনিময় দ্রব্যের প্রসঙ্গে তামাকের প্রথম নির্ভরযোগ্য খবর মেলে—

'আর বেটা চিবাইল তামাকের পাতা।
লাল গিলি নেশা লাগি ঘুরি গেল মাথা॥

---

১. রসিকমঙ্গল, পৃ. ১৩।
২. সী. ধ। জাগরণ পালা। প. সং. ১৪থ। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
৩. ঐ. বি. ভা. পুঁ. সং ৬১২১। প. সং ১৬ক।
৪. ধ. ধ। পৃ. ৬১।
৫. ক. ক. চ. পৃ. ১১২।

বেহুস হইয়া পরে ধরণীর তল।
দেখিয়া ব্যাপার রাজা হইল বিকল ॥'[১]

তামাক যে তখনও গণসেব্য হয়ে ওঠে নি, এখানে তারই ইঙ্গিত রয়েছে। এই একই সময়ের অপর কবি সীতারাম দাসের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের আত্মকাহিনী অংশেও বাংলা সাহিত্যে তামাক খাওয়ার অপর একটি নিঃসন্দিগ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়।

'জামকুড়ির চৌকিতে তামাকু খাই বস্যা।'[২]

সুতরাং মনে হয় ষোড়শ শতকে এদেশে প্রথম তামাকের আমদানি ঘটলেও নেশার জগতে তার ব্যাপক প্রচার ঘটেছিল সতেরো শতকেই।

তামাক পাতা ইউরোপে এনেছেন কলম্বাস আমেরিকা থেকে, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। পর্তুগীজ বণিকেরা তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে দিয়েছিল আরবে ও ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে। ক্রমে এই তামাক পাতা নিয়ে সমগ্র ইউরোপ ধূমপানে মত্ত হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষে এই তামাকের প্রথম প্রচলন হয়েছিল দিল্লীর বাদশাহী দরবারে। সেখানে ধূমপান প্রথম করেছিলেন স্বয়ং বাদশাহ্ আকবর। যোগান দিয়েছিলেন তাঁর সভাসদ্ আসাদ্ বেগ। ক্রমে ধূমপান ছড়িয়ে পড়লো দিল্লীর দরবারের ওমরাহদের মধ্যে। তারপরে রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণ কুটীরে, তামাক চালু হলো সর্বত্র। সেই সঙ্গে চালু হলো নানা ধরনের শুদ্ধি করণের প্রক্রিয়া। তৈরী হলো ধূমপানের আধার। ধাতুময় আলবোলা থেকে নারকোলের খোলে মাটির কলকে পর্যন্ত। রূপভেদে ও মূল্যভেদে নামকরণ হলো আলবোলা, গুড়গুড়ি, হুঁকো ইত্যাদি। শুরু হলো তামাকের চাষ। খনার বচনে তামাকের রীতি-পদ্ধতিও জায়গা করে নিলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই নেশা ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলকেই পেয়ে বসলো। খাওয়ার পরে, অতিথি আপ্যায়ণে, মজলিসি আসরে, আরামের ধূমপান আলবোলা ও হুঁকো দুই-ই চলতে লাগলো পুরোদমে। এই নেশার প্রতিরোধে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। কিন্তু কাজ হলো না কিছুই। এ নেশায় পেয়ে বসলো গোটা বাঙালি সমাজকে।

ভাঙ-চণ্ডু-চরস-গাঁজা-রস ইত্যাদি নানা নেশায় এ-দেশের মানুষ আবহমান কাল থেকে অভ্যস্ত হলেও, তা ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপভোগের বস্তু। এবং সেগুলো কখনো তেমন ঘৃণ্য বা নিন্দনীয় ছিল না। বরং দেবভোগ্য বলে অনুকরণীয় ছিল এবং এর এক রকম সামাজিক স্বীকৃতিও ছিল। তামাক তেমন নেশাকর নয়, মনও তেমন মাতিয়ে তোলে না, সম্বিৎ হারাবার কোনো আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এই তামাকে নেশা না থাকলেও আড়ম্বর ছিল। এবং এ ছিল পুরোপুরিই বিলাস-ব্যসন প্রকাশের অন্যতম বাস্তব অবলম্বন। আভিজাত্য, ধন ও মানের বড়াই,

১. কে. ম. পৃ. ৪৭২।
২. বা. সা. ই. পৃ. ৫২৯।

পদাধিকারের দর্প ও দাপট এবং মজলিসে সামাজিক আড়ম্বর প্রকাশের প্রতীক হিসেবে সুদীর্ঘ সুন্দর জরিজড়ানো নল ও কারুময় রৌপ্যখচিত সুগোল কলিকাযুক্ত দামী বৃহৎ ধাতব হুঁকোয় সুগন্ধি তামাকু-সেবন একটি আনুষ্ঠানিক রীতির মর্যাদা পায়। ফলে, অধিকার-ভেদ স্বতঃই স্বীকৃত হয়। তাই অন্যান্য নেশা সেবনের ক্ষেত্রে আদব-কায়দার প্রশ্ন কখনো গুরুতর ছিল না। কিন্তু তামাকু সেবনের মতো নির্দোষ বিলাসের ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা প্রয়োজন হয়ে ওঠে। সস্তা, সহজ লভ্য, সুসেব্য ও শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কাহীন হওয়ায় তামাক সেবন শীঘ্রই গণ-অভ্যাসে পরিণতি পেলো।

বিশ্বভারতী পুঁথি-বিভাগে 'গাঁজা ও তামাকুর গানে'র একটি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। পুঁথিটি কিছু পরবর্তী কালের হলেও পল্লী-কবির সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত রচনা কৌতুক-রসের কবিতার সুন্দর উদাহরণ এবং তামাকু যে মানুষের কতো প্রিয় সেবন ছিল তার মূল্যবান নিদর্শন-স্বরূপ গানটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

'মা মৈলে জেন গুড়াকু তামাকু পাই।
উঠি অতি নিশি ভোরে হুকাটি লইয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই॥
কয়্যা জাব তনয়েরে মৈল্যো যখন শ্রাদ্ধ করে
কুশ পটো টেন্যা ফেল্যা,
কোঁচর তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ড দেয় তাই।
দ্বিজ রামানন্দ ভণে স্থান দিয়ো শ্রীচরণে।
জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা যাই।'[১]

বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনে অভাব, বঞ্চনা, পীড়ন-ক্লিষ্ট মানুষের মনে তামাকু সেবনের মুহূর্তগুলি শান্তি-সুখের প্রলেপ বোলায়। আর সুস্থ ধনী-মানাকে এই ধূমপান দেয় স্নিগ্ধ প্রশান্তি। তাই তামাকের মতো দেশ, জাত, বর্ণ, ধর্ম, নিরপেক্ষ এমন গণসেব্য বস্তু বোধহয় আর দ্বিতীয়টি ছিল না।

এই তামাকুর সামাজিক মর্যাদা সেকালে এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, সামাজিক রীতি লঙ্ঘনকারী ছোটো বড়ো অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে সমাজ প্রধানেরা তার ধোপা-নাপিতের সঙ্গে হুঁকোও বন্ধ করে দিতেন। অর্থাৎ তাকে একঘরে করা হতো। আবার এঁরাই তুষ্ট হলে স্বজাতির বিভেদ বিনাশক হুঁকোটি বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জাতে তুলতেন সহজেই। অন্য কোনো নেশার বস্তুর সমাজে এতোখানি মর্যাদা কল্পনাই করা যায় না।

নেশার জগতে গাঁজা-ভাঙ-সিদ্ধির মর্যাদাও সেকালে কোনো অংশে কম ছিল

১. বি. ভা. পুঁ. সং. ১২৪।

না। তামাকের অর্বাচীন উদ্ভব এর মর্যাদাকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করলেও দেবাদিদেব মহাদেবের সেব্য বস্তু বলেই এরা পবিত্র ও সাধন সহায় হিসেবে গণ্য হতো।

এদেশে ভাঙের ঝাড় জন্মাতো প্রায় সর্বত্রই। গাঁজা-সিদ্ধি-ভাঙ একজাতীয় গুল্মের মঞ্জরী থেকে উৎপন্ন। সে মঞ্জরী শুকিয়ে পুড়িয়ে ধূমপান করা হতো এক বিশেষ ধরনের কল্‌কেতে। জাত-আভিজাত্যের বিচার সেখানে একান্তই অবাঞ্ছনীয়। সিদ্ধির শাং৭ পুজো পার্বণে, শুভ উৎসবে, শুভ যাত্রায় ব্যবহারের রীতি আজও প্রচলিত।

গাঁজা-ভাঙ্-সিদ্ধির সঙ্গে লৌকিক শিবের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে প্রাচীন কাল থেকেই। আর এই সম্পর্কের পথ ধরেই লৌকিক ছড়ায় ও পরবর্তী মঙ্গলকাব্যেও সিদ্ধি ভাঙের সঙ্গে শিবের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে।

'হেন বেলে মহেশ আইল ভাঙ লইঞা।
যোন পাচ-ছয় ভাঙ মস্তকে তুলিঞা॥
সের চারি শঙ্ক যার থাঞা ওদ্র ভরি।
ঢুলিতে ঢুলিতে আইল আপনার পুরি॥'[১]

এই নেশার জন্য দেবী দুর্গার কাছে তিনি কম ভর্ৎসনা লাভ করেন নি। 'অনুদিন কত নাকি কিন্যা দিব ভাঙ'[২]—ইত্যাদি উক্তির মাধ্যমে তিনি 'ঘর জামাই' স্বামীকে চাষে মন দিতে উপদেশ দেন। কখনও বা নেশা-মত্ত স্বামীকে 'কুচনী পাড়ায়' যাবার গঞ্জনা দিতেও দ্বিধা করেন নি।

'দুর্গা বলে আজি জাহ কুচনির পাড়া।
গায়ে পারা বল হল্য খায়্যা ভাঙের গুড়া॥'[৩]

নেশার মধ্যে নির্দোষতম নেশা হলো পান। গোটা প্রাচীন ও মধ্য যুগ জুড়েই পানের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। আজও সে ঐতিহ্য একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। সেকালের ধনী গৃহের তৈজস পত্রের ও বিলাস সামগ্রীর মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে পানের ডাবর, পানের বাটা, চুনাবাটা, গুবাক সম্পুট, পিকদানী, সাঁপুড়া, স্বর্ণ জাঁতি ইত্যাদির দিকে। এই পান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শুধু বাংলায় নয়, গোটা ভারতবর্ষেই নেশার, বিলাসের, আতিথেয়তার এবং সর্বোপরি মাঙ্গলিকের অঙ্গ হয়ে রয়েছে। আর সেকালের বঙ্গ ললনাদের ক্ষেত্রে প্রসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল এই পান।

প্রাচীন ভারতে পানের খুবই সমাদর ছিল। 'শুকোপনিষদ'-এ শ্রীকৃষ্ণ পানকে

২. ক. ক. চ. (ধ. উ.),
৩. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। বি. ভা. পুঁ সং ৬৫৬১। প. সং ১০৪ক

'ইহলোকের পরম সুখের বস্তু' বলেছেন। সেকালের রাজ অন্তঃপুরে পান সাজা ও পরিবেশন করবার জন্যে একশ্রেণীর পরিচারিকা নিযুক্ত থাকতো। সংস্কৃত কাব্য-নাটকে এদের 'তাম্বূল করঙ্ক বাহিনী' বলে উল্লেখ রয়েছে। দিল্লীর তুর্কী সুলতান বলবনের পঞ্চাশ-ষাট জন পরিচারক নিযুক্ত ছিল শুধু তাম্বূল তৈরি ও বিতরণের কাজের জন্য। একথা ইতিহাস সূত্রে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে এই পান খাওয়ার খবর প্রথম পাওয়া যায় চর্যার একটি পদে।[১]

'হিঅ তাঁবোলা মহা সুহে কাপুর খাই।'[২]

এই পানকে রসিক মহলে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য পান সাজাবার মধ্যেও যে নানা রকম কারুকার্য করা হতো—'সাঁচি পানে অপরূপ সাজাইল বিড়ি'[৩]—ইত্যাদি উক্তিতেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সতেরো শতকের বাংলা সাহিত্যে সুন্দর ও সুগন্ধি পানের বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বত্র এর সমাদর বুঝতে পারা যায়।

'কর্পূরের উড়িয়াছে পানের মিসাল।
রবির কিরণে লাগে পরম রসাল ॥
রসিক পুরুষ সনে এ পানের কথা।
ভক্ষণেতে দূর যায় মুখের জড়তা ॥
সাত বিড়ি রোজ প্রতি পান গৌড়েশ্বর।
একটি বিড়ির মূল্য একটি মোহর ॥'[৪]

এখানে শুধু পান সাজাবার আড়ম্বর, পান-রসিক ব্যক্তির খবরই নয়, এর কিছু কিছু গুণের খবরও পাওয়া গেলো। এই পান তখন এমন আড়ম্বরের সঙ্গে খাওয়া হতো যাতে এর বিলাসের আমেজটুকু পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়।

'বালিস হেলান রামা খায় গুয়া পান ॥
কর্পূর সহিত খিলি খাইতে সরস।
নাপানি করিয়া গুয়া খায় গোটা দশ ॥'[৫]

পান ছিল মাঙ্গলিকের প্রতীক। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা উপলক্ষে এই পান ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। সন্তান জন্মের শুভক্ষণে এয়োগণকে তেল হলুদের সঙ্গে পান সুপুরিও দেওয়া হতো শুভ লক্ষণ হিসেবে।

---

১. সংখ্যা ২৮।
২. অর্থাৎ, হৃদয় তাম্বূল মহাসুখে কর্পূর খাই।
৩. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। বি. ভা. পুঁ. সং. ৬৫৬১। প. সং ২৫ক।
৪. ঐ. ঐ. প. সং ২৭খ।
৫. ঐ. ঐ. প সং ৩১ক।

'তৈল হরিদ্রা আর সিন্দুর গুয়া পান।
পূর্ণিত করিঞা দিল আইয়গণে দান॥'[১]

এরপরে শিশু জন্মের শুভ সংবাদ আত্মীয় বন্ধুর বাড়ীতে রজক ও নাপিতের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হতো। সঙ্গে থাকতো পান-সুপারী। শুভ দৃষ্টির সময় পান দিয়ে মুখ ঢেকে রেখে, পরে সেই পান কন্যা নিজেই দুপাশে ও পিছনে ফেলে দেয়—

'লোচনে কজ্জল দিয়া চাবে এক দৃষ্টে।
তাম্বুল দক্ষিণ বামে অচিরতে পৃষ্ঠে॥'[২]

সতেরো শতকের বিভিন্ন কাব্যে দেখা যায়, জামাতাকে কন্যার একান্ত অনুগত করে রাখবার জন্য যে সমস্ত তুক্-তাক্ করা হতো, তার মধ্যে মন্ত্রপূতঃ পানও থাকতো।

'পড়া পান পরশে আপনি হবে মেষ।'[৩]

সয়লা বা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হলে অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে পান-সুপারিরও প্রয়োজন হতো।

'পথিতে পুরিয়া খই, উপরে সাজায়্যা দই,
আখণ্ড কদলী গুয়া পান।
সুবর্ণ কৌটায় করি সুরঙ্গ সিন্দুর ভরি
সয়লা পাতাতে দেবী যান॥'[৪]

কাউকে কোনো প্রস্তাব পেশ করতে হলে দূতের মাধ্যমে পান-সুপারি পাঠাবার রীতি ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কাব্যের কবি তো শ্রীকৃষ্ণের বড়াই-এর মাধ্যমে পান-সুপারি দিয়ে শ্রীরাধার প্রেম প্রার্থনা করার প্রসঙ্গটিকে 'তাম্বুল খণ্ড' নামেই বর্ণনা করেছেন।

পান দিয়ে সম্মান দেখানো সেকালের একটি সুপ্রচলিত ও সুপরিচিত রীতি। ভাগবতে শ্রীরাধিকা তাঁর মুখের পান শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে আপন হৃদয়ের গভীর প্রেম-ভক্তি ব্যক্ত করেছিলেন। বাড়ীতে অতিথি এলে আগে তাকে পান-সুপুরি দিয়ে অভ্যর্থনা করতে হতো। কাউকে কোনো কাজের ভার দিতে হলে তার সামনে পান-সুপারি রাখা থাকতো। সম্মতি-সূচক পান গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো না। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে বণিক ধনপতিকে বাণিজ্য যাত্রার অনুরোধ করে গৌড়েশ্বর, 'ধনপতি দত্তে দিলা পান।'[৫] কিন্তু ধনপতি প্রথমে আপত্তি জানালেও নৃপতির রক্ত রোষ চোখের দিকে তাকিয়ে আর আপত্তি করতে ভরসা না পেয়ে—

---

১. ধা. ধ. পৃ. ৭০।
২. ক্ষে. ম. পৃ. ৭৯।
৩. ধ. ধ. পৃ. ১০৩।
৪. ক্ষে. ম. পৃ. ১৮১।
৫. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ২৬৭।

'বুঝিয়া কার্যের গতি, লয় সাধু ধনপতি,
অঞ্জলি করিঞা গুয়া পান।'[১]

এক কথায় এদেশের ছড়ায়, গানে, খনার বচনে সর্বত্রই এই পানের সমাদরের কথা পাওয়া যায়।

পান ছিল একাধারে আভিজাত্য ও স্বচ্ছলতার প্রতীক। কোনো পরিবারের গৌরব বোঝাতেও বলতে শোনা যায়—

'তামলি কাটয়ে গুয়া
বারুই জোগায় খাসা পান।'[২]

আবার দরিদ্রের সংসারেও কিন্তু সিঁথির সিঁদুরের মতোই 'বদনে তাম্বূল'ও ছিল একাধারে এয়োতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক। সে সমাজের যে কোনো পুরুষ সগর্বে বলতে পারতো—

'চারি নারী মোর ঘরে, অনেক বিলাস করে,
খাসা গুয়া খায় পাকা পান।'[৩]

শুধু তাই নয়, কোনো রমণীকে বিবাহে প্রলুব্ধ করতে পান-সুপারি খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিতেও দেখা যায় অনেক সময়।

'কৌতুকে খাওয়াব গুয়া অঙ্গেতে মাখাব চুয়া
মুখে তুল্যা জোগাইব পান।'[৪]

এ প্রলোভন সংবরণ করা সত্যিই কঠিন ছিল। কারণ মাথায় তেল, কপালে সিঁদুর, মুখে পান, আর হাতে শাঁখা—দরিদ্রের সংসারে এ সবই ছিল বিলাসিতার পর্যায়ের সামগ্রী। উৎসবে অনুষ্ঠানে বাড়ীতে অতিথি এলে নিতান্ত দরিদ্রের সংসারেও আর কিছু না হোক, এয়োদের হাতে অন্তত: একটু পান-সুপারি না দিতে পারলে গৃহস্থের মান রক্ষা দায় ছিল। কিন্তু সামান্য সেই পান-সুপারিটুকুর যোগাড় করাও কখনও কখনও সম্ভব হতো না। 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে সপত্নী কন্যা মনসার বিবাহ স্থির হলে, দুর্গা এয়োদের হাতে একটু পান-সুপারি দেবারও সম্বল নেই বলে শিবের কাছে বিরস বদনে অনুযোগ করেন।

'এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
আর চাবে তৈল সিন্দুরে।'[৫]

কিন্তু এতে অপ্রস্তুত হবার পাত্র শিব নন। তিনি নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় বলে

১. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ ২৬৭।
২. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। বি. ভা. পুঁ. স ৬৫৬১। প. স' ৯:ক।
৩. ক্ষে. ম. পৃ ২৬৬।
৪. বি. ভা. পুঁ. সং ৬৫৬১। প. সং ৪৭ক।
৫. বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'।

বসলেন. বিয়ের পরে যখন এয়োদের পান-সুপারি দেবার প্রশ্ন উঠবে, তখন সেই এয়োদের কি করে শূন্য হাতে বিদায় করতে হয় তা তিনি ভালোই জানেন।

'হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে সবে যাবে পলাইয়া।'[১]

নেশা মাত্রেই কম বেশি কামবর্ধক। পানও সম্ভবতঃ এই কারণেই নেশার সামগ্রীর পংক্তিভুক্ত। প্রিয় মিলনের আশায় বাসর সজ্জা রচনা করে, প্রসাধন শেষে তাম্বূলের রাগে অধর রঞ্জিত করে অপেক্ষা করতে দেখা যায় সতেরো শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেক নায়িকাকেই।

'উভ দণ্ডে জ্বলে বাতি, সুবর্ণ সাপুড়া জাঁতি
সখী-কাটে সুরস গুবাক।'[২]

কিন্তু অযথা বিলম্বে ধৈর্যহারা নায়িকা তখন বারংবার—

'কর্পূর তাম্বূল খায় চঞ্চল নয়নে চায়
সখী বিচে সোনার বিয়নী।'[৩]

এরপরে যথাসময়ে প্রিয়তম এলে তার হাতে সুগন্ধি পান তুলে দিয়ে ইঙ্গিতেই বক্তব্য পেশ করতে দেখা যায়।

'রতন সাপুড়া করি সাজাইল পান।
প্রভু হস্তে দিয়া চায় বঙ্কিম নয়ান॥'[৪]

পান তাই শুধুমাত্র নেশার সামগ্রী নয়, বড়ো উচ্চাঙ্গের নেশার সামগ্রী।

॥ **বারবণিতা** ॥ নেশার সামগ্রীর অধিক প্রচলনের এবং প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বারবণিতা আলয়েরও খবর পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে বারবণিতাদের গ্রামের বাইরে বসবাসের বর্ণনা রয়েছে।

'লম্পট পুরুষ আশে, বারবধূগণ বৈসে,
এক ভিতে হইয়া অধিষ্ঠান।'[৫]

গ্রামের শেষে এরা একটি নির্দিষ্ট পল্লীতে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতো। 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের অধিকাংশ কবিই বারবণিতাদের জন্য নির্দিষ্ট পল্লীকে 'বারুই পাড়া' বলে উল্লেখ করেছেন।

১. বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'।
২. কে. ম. পৃ. ১৯৫।
৩. ঐ. ঐ।
৪ ঐ. পৃ. ২০১।
৫ ক. ক. চ. পৃ. ৩৬১।

'বারুই পাড়ায় বেউস্যা রহিল ভানি ভাগে।'[১]

সতেরো শতকের কবি সীতারাম দাসের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের 'হাসন-হোসেন' পালায় বারাঙ্গনাদের আচার আচরণের নিখুঁত বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

'দিয়ানে আছেন মিঞা সাহেব লড়কী আছে কোলে।
…নগর ভিতর খবর নাঞি তুমি থাক শুয়্যা॥…
নটীর পাড়া গেলেন বোরা খানকী সকল বস্যা।
মিঞা সকল নকল করে রঙ্গ করে হেস্যা॥
পাঠান মগ আছেন সকল খানকী আছে কোলে।
ভাঙ্গ পোস্ত মুখে দিছে দোস্ত দোস্ত বলে॥
বান্দির হাথে পানির ঘরা কেহ বা আছেন কাছে।
ফুলের মালা খোপায় দোলে কুথটী পেখ্যাজ বাজে॥
এবার বলে ছোড় মিঞাজী হাওলে হাওলে কি ও।
কাহা হুয়া পিয়াস লাগা পানি আনকে পিও॥
খানকী লয়্যা মিঞা সকল রঙ্গ তামাসা করে।
ঘরের ভিতর সাপ ঢুকিল চেরাক জ্বলে ঘরে॥
পরদা খোলা আছে ঘরের নাগর গেছে ছেড়্যা।'[২]

সেকালের সম্ভ্রান্ত বারবণিতারা ছিল শিক্ষিত, রুচিসম্মত, শিল্পকর্মে নিপুণ, নৃত্য-গীতে পারঙ্গম, ভালো অভিনেত্রী, এক কথায় সর্বগুণান্বিতা। আর রূপলাবণ্য তো অবশ্যই ছিল। সমস্ত 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের কবিরাই গোলাহাট পালায় বারবণিতাদের প্রধানা, সুরিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন বিস্তারিত ভাবে। সুরিক্ষা লাউসেনকে গোলাহাটে তার কাছে বসবাস করবার অনুরোধ জানিয়ে বলে—

'গোলাহাট সহরে রাজত্ব কর রায়।
বিদ্যা পড়িবার তরে না কর ভাবনা॥
নোদ্যা থাক্যা পণ্ডিত আস্যাছে কত জনা।
আমা থেক্যা পণ্ডিত আছয়ে কোন জনা॥
অষ্টাপকলাৎ সকল মোর বশ।
নাটক নাটিকা দেখ কাব্য কলা রস॥'[৩]

এই সুরিক্ষা নটিনীর কাছে যে সব নাগর বন্দী হয়ে আছে, তাদের জাতিধর্ম অনুযায়ী কাজের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজচিত্রটিও খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সুরিক্ষা নটিনী-শাসিত সে সাম্রাজ্যের যে বর্ণনা প্রায় সমস্ত 'ধর্মমঙ্গল'-

১. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। বি. ভা. পুঁ. সং ৬৫৬১। প. সং ৮৩ক।
২. সীতারামদাসের 'মনসামঙ্গল'। ঐ. সং ৬২১৭। প. সং ১৬ক।
৩. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। ঐ। সং ৬৫৬১। প. সং ৯৮ক।

কাব্যেই পাওয়া যায়,[১] তাতে দেখা যায় কোনো রাজা-জমিদারের চেয়ে এই বারবণিতার প্রভাব প্রতিপত্তি কোনো অংশে কম নয়।

'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের নায়ক লাউসেনকে পরীক্ষা করতে বারবণিতার বেশে দেবী ভবানী স্বয়ং এসে উপস্থিত হন। সেই সময় লাউসেনের সঙ্গে দেবীর ছদ্ম ছলাকলা ও কথোপকথনের মধ্য দিয়েও এই শ্রেণীর চরিত্র কিছুটা ধরা পড়ে।

'ভবানী বলেন রায়　　এ রূপ যৌবন যায়
　　চল রাজা হব দেশান্তরি।
সাত নৃপতির ধোন　　গায়ে মোর আভরণ
　　বাম করে মানিক অঙ্গুরী॥
খাওাব মাখাব আমি　　দুঃখ না পাইবে তুমি
　　মুখে তুল্যা জোগাইব পান।
কৌতুকে খাওয়াব গুয়া　　অঙ্গেতে মাখাব চুয়া
　　জাচিয়া যৌবন দিব দান॥'[২]

কিন্তু লাউসেন কোনোক্রমেই তাঁর ফাঁদে ধরা দেয় না দেখে, দেবী তাঁর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেন—

'এ রূপ যৌবন আর কারে দিব দান।
মুখ তুল্যা কহ কথা জুড়াক পরান॥
তোর পারা মহারাজা না দেখি অজ্ঞান।
সুখে কর বিকচ কমলে মধু পান॥
আস্যাছি অনেক আশে আখড়া আলয়।
মনের বাসনা পূর্ণ না করিলে নয়॥
ভুজদণ্ড যৌবন গৌরব কর দূর।
এত কেন মহারাজা হয়্যাছ নিষ্ঠুর॥
পঙ্কজে খঞ্জন নাচে ব্যাজ নাহি সয়।
ভূতলে আচল পাতি যদি আজ্ঞা হয়॥
অবধান কর রাজা ইতে দোষ নাঞি।
ভারথে এমন রঙ্গ আছে কত ঠাঞি॥
অকলঙ্ক আছে কেবা ই তিন ভুবনে।
বিচারে পণ্ডিত বট ভেব্যা দেখ মনে॥'[৩]

---

১. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। বি. ভা. পুঁ. সং ৬৫৬১। প. সং ২১ক।
২. ঐ. ঐ. ঐ. প. সং ৪৭ক।
৩. ঐ. ঐ. ঐ. প. সং ৪৭খ।

॥ **প্রহেলিকা-বিলাস** ॥ সে যুগে অবসর বিনোদনের একটি নির্দোষ উপায় ছিল প্রহেলিকা রচনা ও তার সমাধান। যা সহজ বুদ্ধিগম্য নয়, সেই রহস্য বা হেঁয়ালির প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ চিরকালের। বর্তমান কালের কিশোর পত্রিকার হেঁয়ালীর পাতার বা দৈনিক সংবাদপত্রের শব্দ-শৃঙ্খল ধাঁধার সমাধান করে মানুষ আনন্দ পায়। প্রাচীন ও মধ্য যুগেও একইভাবে নানা ধরনের ধাঁধার সমাধানের চেষ্টা করে লোকে আনন্দ পেতো। সেকালের কবিকুল মানব মনের এই বিচিত্র ক্ষুধাকে তৃপ্ত করেছেন নানাভাবে। কখনও ধর্ম সম্বন্ধীয় সাধন প্রণালীকে সাধারণের কাছে গোপন করতে গিয়ে উদ্ভট শব্দ প্রয়োগে হেঁয়ালির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন, কখনও তির্যক ভঙ্গীতে কবি তাঁর কাব্য-রচনাকাল বা আত্মপরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে শকাব্দ বিষয়ে হেঁয়ালির আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কখনও কাব্যের পাত্র-পাত্রীদের বাচ্যার্থে বিরোধ ঘটিয়ে হাস্য-রসাত্মক হেঁয়ালির সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ জনমানসে প্রহেলিকার যথেষ্ট সমাদর ছিল বলেই কবিগণ কাব্য মধ্যেও তার বিস্তার ঘটিয়েছেন।

প্রহেলিকার আদি উৎস কি তা আজ রীতিমতো গবেষণার বিষয়। প্রাচীন চর্যাগীতি থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত এবং পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই প্রহেলিকার ছিল অবাধ বিচরণ। এই সব প্রহেলিকা লোক-জগতের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছে এবং বর্তমানেও আমরা একে লৌকিক সাহিত্যের সামগ্রী বলেই মনে করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ উপনিষদের একটি উক্তি অবশ্যই স্মরণীয়—

"পরোক্ষেণ পরোক্ষ প্রিয়া হি দেবাঃ প্রত্যক্ষ দ্বিষঃ" অর্থাৎ দেবতাগণ পরোক্ষ প্রিয়, প্রত্যক্ষ তাঁদের প্রিয় নয়। সাহিত্যের প্রহেলিকাও সম্ভবতঃ এই পরোক্ষ প্রিয়তারই ফল।

'শব্দকল্পদ্রুম্'-এর মতে প্রহেলিকা হলো, "কূটার্থ ভাষিতা কথা'—এর প্রকৃত অর্থ সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন থাকে। বৈদিক সাহিত্যে যে সমস্ত রহস্যময় ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক সূক্ত রয়েছে, সেই সব রচনা ধারারই সুচিন্তিত প্রকাশ ঘটেছে মহাভারতের প্রহেলিকা-গুলিতে। যা 'ব্যাসকূট' নামে পরিচিত। এই ব্যাসকূট সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, ব্যাসদেব গণেশকে মহাভারত লিখে দেবার অনুরোধ করলে, গণেশ একটি সর্তে রাজি হন যে, শ্লোকগুলি বলবার সময় ব্যাসদেব মোটেই থামতে পারবেন না। তাঁকে অনর্গল বলে যেতে হবে। ব্যাসদেব এই সর্তে স্বীকৃত হয়ে এর সঙ্গে নতুন একটি সর্ত যোগ করেন যে, লিখবার সময় গণেশকে অর্থ বুঝে লিখতে হবে। ব্যাসদেব কিছু কিছু বর্ণনা করেই এক একটি কূট শ্লোক বলতেন। আর অর্থ উপলব্ধি করে তা লিখতে গণেশের যে সময় লাগতো, তার মধ্যে তিনি পরবর্তী শ্লোকগুলি মনে মনে ভেবে নিতেন। এই 'ব্যাসকূট'গুলি ছিল প্রহেলিকার আকারে। এগুলি ছাড়াও নিছক প্রহেলিকা জাতীয় শ্লোকও মহাভারতে প্রচুর রয়েছে। যার সাংকেতিক শব্দগুলির অর্থ জানা থাকলে প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা কঠিন নয়।

কাব্যের মধ্যে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করে অন্তর্নিহিত অর্থকে গোপন করা এবং সেই দুর্জ্ঞেয়তা অবলম্বন-জনিত যে হেঁয়ালির সৃষ্টি, সাধারণত ধর্ম সম্বন্ধীয় কাব্য গাথাতেই তা বেশি লক্ষ করা যায়। সে সব ক্ষেত্রে অদীক্ষিত বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাধনার গূঢ় রহস্য উপলব্ধি থেকে বিরত রাখার জন্যে স্থূল অর্থযুক্ত প্রতীক কল্প ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই চর্যাপদের কথা উল্লেখ করা যায়। চর্যাপদের দ্ব্যর্থবোধক ভাষাকে কেউ কেউ 'সন্ধা' বা 'আভিপ্রায়িক' বচন বলেছেন। আবার কেউ বা 'সন্ধ্যা' অর্থাৎ আলো-আঁধারি পূর্ণ ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। 'সন্ধা' অথবা 'সন্ধ্যা' যে নামেই উক্ত ভাষাকে অভিহিত করা হোক না কেন, এর সঙ্গে একটা রহস্য বা প্রহেলিকার ইঙ্গিত যে রয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যেমন চর্যাপদে বর্ণিত আলি-কালি, গঙ্গা-যমুনা, সূর্য-চন্দ্র, ললনা-রসনা, বাম-দক্ষিণ, সোনা-রূপা, হরিণ-হরিণী, শাশুড়ী-ননদী ইত্যাদি প্রত্যেকটি শব্দের সাধনাগত গূঢ় রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে, যা কেবল মাত্র তত্ত্বজ্ঞের কাছেই ধরা দেবে। কিন্তু তত্ত্ব কথাকেই এমন নিপুণ বাহ্যিক প্রতীকের মোড়কে বিবৃত করা হয়েছে, যার ফলে এর বহিরঙ্গ সংবদ্ধ স্থূল চিত্রকল্প দ্বারা কাব্যরস গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে না।

'বলদ বিঅএল গাবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী সোই নিবুধী।
জো সো চৌর সোই দুষাধী।'

এর আপাত অর্থ হলো, 'বলদ বিয়োলো, গাই রইল বন্ধ্যা। তিন সন্ধ্যে পাত্র ভরে তাকেই দোহন করা হয়। যে বুদ্ধিমান সেই বুদ্ধিহীন, যে চোর সেই সাধু।'

আপাত অর্থের মধ্যে এই অদ্ভুত বৈপরীত্য সহজেই আমাদের মনে অনাবিল হাসির সঞ্চার করে। কিন্তু এই সব পদে বাচ্যার্থে বিরোধ ঘটানোর ফলে যতোই কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি করুক না কেন, এর অন্তর্নিহিত গূঢ় সাধনতত্ত্ব একমাত্র দীক্ষিত জনের কাছেই সুগম।

নাথ পন্থীদের সাহিত্যে বিভিন্ন বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে অসাধারণত্ব সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষ করা যায়। নাথদের গুরু গোর্খনাথ-কৃত হেঁয়ালি-বচনের ভাষা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে 'গোলক ধাঁধা' কথাটির। নাথ যোগীদের হঠযোগ দর্শন অর্থাৎ বলপ্রয়োগে চন্দ্র-সূর্য তথা প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রিত করে, প্রাণায়ামাদি শারীরিক কৃচ্ছ সাধ্য কৌশলাত্মক যৌগিক সাধন পন্থা, প্রশ্নোত্তরের হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'গোর্খ-বিজয়' গ্রন্থে।

মধ্যযুগীয় সন্ত কবিদের মধ্যেও বিপরীতার্থক শব্দের হেঁয়ালী সৃষ্টির যথেষ্ট প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কবিতার নাম 'উলট বাঁসিয়া'। অবশ্য এদের হেঁয়ালী সৃষ্টির উদ্দেশ্য বক্তব্যকে বিপর্যস্ত করে বোধ্যতার সীমায়ন নয়, বরং বিপরীত। কারণ

সহজ সরল ভাষায় যে বক্তব্য মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে অক্ষম, বিপরীত কথার ধাঁধায় সেই জনমনই তাৎপর্য উপলব্ধির একাগ্রতায় প্রখর হয়ে ওঠে। ফলে, সন্তদের যে উদ্দেশ্য লোক-প্রচার, তা সার্থক হয়ে ওঠে।

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গিনী, দেহ-সম্ভোগ ইত্যাদি সাধনার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হওয়ায়, তাদের গূঢ় সাধন তত্ত্বকে লোক-প্রচার হতে গুপ্তিত করে রাখবার উদ্দেশ্যে, নানা সংকেত ও হেঁয়ালির ছাঁদে কায়যোগ দর্শনের সনাতন ধারা অগভীর হলেও অব্যাহত ভাবে প্রবহমান। বাউল সঙ্গীতের সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে দেহতত্ত্ব ও সাধন তত্ত্বের গূঢ় কথা, কোথাও গ্রাম্য হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে, আবার কোথাও বা ব্যবহারিক জীবনের সহজ সরল অভিজ্ঞতার কথার মোড়কে আবৃত করে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই প্রহেলিকা-বিলাস যে মধ্যযুগীয় জনমনে কতো গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে অদ্বৈত আচার্য্য জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফতে তাঁকে একটি প্রহেলিকা ছড়া প্রেরণ করেছিলেন।

'বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥'

এখানে অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুকে 'বাউল' বলে অভিহিত করেছেন এবং নিজেরও 'বাউল' বলেই পরিচয় দিয়েছেন। অদ্বৈতাচার্যের এই যোগীসুলভ প্রহেলিকাপ্রিয়তা উল্লেখ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

'তর্জা প্রহেলী আচার্য কহে ঠারে ঠারে।
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ॥'[১]

আবার বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে দেখি, ভাবাবেগে বিহ্বলপ্রায় মহাপ্রভু চৈতন্যদেব একদিন গোপীভাবে বিভোর হলে, জনৈক ভাবজ্ঞানহীন পড়ুয়া তাঁকে গোপী নামের পরিবর্তে কৃষ্ণনাম ধ্যান করতে বললে, মহাপ্রভু তার কাছে যথেচ্ছ কৃষ্ণনিন্দা করেন ও পড়ুয়াকে প্রহার করতে উদ্যত হন। অতঃপর সব পড়ুয়া মিলিত হয়ে এর প্রতিকার বিধান করতে মনস্থ করলে চৈতন্যদেব সে-কথা অন্তরে জানতে পেরে নিম্নোদ্ধৃত হেঁয়ালি বচনটি বলেছিলেন।

'করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে ॥'

অর্থাৎ চৈতন্যদেব কৃষ্ণ নিন্দার দ্বারা তাঁর অন্তরের কৃষ্ণভক্তির উন্মাদনা দমন

১. চৈ. চ. পৃ. ৬৩৫।

করতে চেষ্টা করে দেখলেন, তাতে বিপরীত ফল লাভ হলো। কৃষ্ণভক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পেলো।

হেঁয়ালি সৃষ্টির যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা প্রথমেই বলা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে কবি বা বক্তার মনস্তত্ত্বের দ্বিমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়। কাব্য মধ্যে চমক সৃষ্টি করে জন-চিত্তকে আকৃষ্ট করবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন বুদ্ধিমত্তার বা বাক্-কুশলতার পরিচয় সোচ্চার করে তোলা ও সেই সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইএ অপরকে পরাজিত করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করা। এই উদ্দেশ্যে হেঁয়ালি সৃষ্টি করেছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে অনেকেই। নতুন কবির পক্ষে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা সময় সাপেক্ষ কাজ। ফলে আসরে শ্রোতা জড়ো করবার পক্ষে প্রতিভার পরীক্ষা দেওয়া অপেক্ষা, সহজে আসর মাতানো জনপ্রিয়তার প্রতি আগ্রহাতিশয্য থেকেই শরণ নিতে হতো কথার হেঁয়ালি সৃষ্টি করার প্রতি। যাঁতে করে অন্তত: তার বক্তব্যের প্রতি সাধারণের মন আকৃষ্ট হয়। কারণ সাধারণ শ্রোতা বা পাঠক বাগাড়ম্বরেই তৃপ্ত। গভীর ও সূক্ষ্ম রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা বা যোগ্যতা খুব সীমিত ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকতো।

সতেরো শতকের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে শুকপাখী কর্তৃক প্রহেলিকা প্রশ্নের মাধ্যমে কিছু উচ্চাঙ্গের ধাঁধা বা হেঁয়ালি সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

'প্রহেলিকা কহে শুয়া সভাজন মাঝে।
রাজার আদেশে সব পণ্ডিত জন বুঝে॥
বিধাতার নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগী পুরুষ তাহে আছে নিরাহার॥
যখন পুরুষ তাহে হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গা করে খান খান॥'[১]

অথবা—

'শিরস্থান নিবসে পুরের দুই সার।
ভালমন্দ সবাকার কর‍্যা বিচার॥
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালি॥'[২]

এই সকল হেঁয়ালি বচনকে কাব্য মধ্যে স্থান দিয়ে কবি শ্রোতৃমণ্ডলীর বুদ্ধির মানকে একদিকে যেমন যাচাই করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তাঁদের হেঁয়ালি প্রিয়তাকেও পরিতৃপ্ত করেছেন। আবার নিছক জনচিত্ত রঞ্জন ও আকর্ষণের উদ্দেশ্যেও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কিছু কিছু হেঁয়ালী বচন সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে এই শ্রেণীর হেঁয়ালী বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

১. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ৫১-৫২।
২. ঐ. ঐ.।

'পানি চেএ পাতল কে পাথর চেয়ে ভারি।
লোহা চেএ শক্ত কে কহ সত্য করি॥
লোহা চেএ শক্ত কে দুনিঞার উপরে।
এহি চারি গুপ্ত বাত কহিবেন আমারে॥
পানি চেহে পাতল বাতাস দেখা নাহি জায়।
হাড় হারি নাহি কিছু কেতাবেতে কয়॥'[১]

অথবা—

'দারি বলে দারি বলে পুরো যোগী হে ভাল সমস্তা।
আকাশ যখন না ছিল তখন কোথা ছিল চন্দ্র।
পুষ্প যখন না ছিল তখন ভাল কুথা হে কুথা ছিল গন্ধ।
দধি যখন না ছিল তখন কোথা ছিল ঘিউ ভাল কোথা ছিল ঘি গন্ধ॥
মনুষ্য যখন না ছিল তখন কোথা হে কোথা ছিল জিউ।
আকাশ যখন না ছিল তখন কপালে ছিল চন্দ্র।
পুষ্প যখন না ছিল তখন নাষিকা রহে নাষিকায় ছিল গন্ধ।
দধি যখন না ছিল তখন মথনে ছিল ঘিউ।
মনিষ্য যখন না ছিল তখন সুন্য ছিল জিউ॥'[২]

বিষ্ণুপালের কাব্যের এই হেঁয়ালি রচনার বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে হেঁয়ালি এবং তার সমাধান একই সঙ্গে গ্রথিত করা রয়েছে। এর উদাহরণ বিষ্ণুপালের কাব্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

'সামাঞী হে। কেনে হে॥
পাতের নাম। কলার পাত॥...
উআউ লয়। তবে কি। বড় পাত॥
বড় পত্র শালপত্র। বোনকে যায় না বাগে খায়।
তবে কি বড় পাত তেতল পাত। উআউ লয়॥
...জলে থাকে বড় পাত ফুল হয়।
জানিলাম পেটকে এল্য॥
বল দেখি। বলছি হে।
বল দেখি ফুল হয়।
অহে পদ্ম পাত॥'[৩]

সেকালে ধর্মঠাকুরের গাজনেও এই রকম প্রশ্নোত্তরের ধাঁচে ছড়া কাটাকাটি হতো।

১. বি. ম. বি. ভা. পুঁ. সং ২২৮৬; প. সং ১৬খ।
২. ঐ. ঐ. প. সং ৫ক।
৩. বি. ম. পৃ. ১২৯।

হেঁয়ালী রচনার উদ্দেশ্য যেমন এক নয়, তেমনি রচনার ছাঁদও এক নয়। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই এক ধরনের হেঁয়ালি চলে আসছে 'অঙ্কের ছড়া' ও গণিতের সমস্যামূলক কবিতা বা 'স্যাখত' রচনার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর কবিতার ধারা অনুসৃত হয়েছে প্রাকৃত সাহিত্য হতে। বাংলার অধিকাংশ অঙ্কের ছড়াই শুভঙ্করের নামে চলে আসছে। সেকালের মহাগাণনীক ও মহানিরক্ষকগণ সাধারণতঃ কায়স্থ হতেন বলেই হোঁক, বা হিসেব নিকেশের দিকে তাঁদের প্রবণতা থাকার জন্যই হোক, গণিতের সমস্যা বা স্যাখত সব সময়ই কায়স্থ কর্তৃক লিখিত না হলেও তার সমাধান জানতে চাওয়া হতো কায়স্থকে স্পর্ধা পূর্বক আহ্বান করে। নিছক ধাঁধার বিষয়বস্তু হিসেবে যেমন আমরা গ্রাম-বাংলার আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ, খেলাধূলা, কৃষিকর্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান সংবলিত যে জন-জীবন, তার প্রতিফলন হতে দেখি, তেমনি এই স্যাখত সম্পর্কিত কবিতায় দেখতে পাওয়া যায় কালের ছায়া। কোথাও দেখা যায়, রাজা তাঁর অনুচরকে ঘোড়া কিনতে পাঠালে ঘোড়ার মূল্যায়ণের হিসাবের মাধ্যমে হেঁয়ালি প্রশ্ন করা হয়েছে। কোথাও পাঠশালায় অধ্যয়নের বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে, কোথাও পীরের জায়গীর জমির উৎপন্ন শস্যের হিসাব নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার কোথাও বা পদাবলীর ব্যাপক প্রভাবও বিস্তার লাভ করেছে গণিত সমস্যামূলক কবিতার মধ্যে।[১] কারণ সেকালের জন-মানসে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। আর এই ধরনের হেঁয়ালি সৃষ্টি করা এবং তার সমাধান করা এ সবই ছিল সেকালের সাধারণ মানুষের অবসর বিনোদনের অন্যতম উপায় বিশেষ।

কবি মাত্রেই তাঁর কাব্যে প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন। পাঠকের কাছে সে প্রতীকার্থ যতক্ষণ পর্যন্ত না ধরা দেয়, ততক্ষণ তা থাকে দুর্বোধ্য। আর ধরা দেওয়া মাত্রই তা সুগম হয়ে যায়। আবার কবি-রচিত প্রতীক-ব্যঞ্জনা যদি স্থির প্রতীক হয়, যা বহু ব্যবহারে অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ রূপ লাভ করেছে, তাহলে বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু অনিশ্চিত প্রতীক যা অনেকটা সঙ্কেতের পর্যায়ে পড়ে, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষ্যকার স্বভাবতই তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেবেন। এবং সে অর্থ নিষ্কর্ষণ এমনও হতে পারে, যা রচয়িতার বক্তব্যের ধারে কাছেও পৌছতে সক্ষম নয়। কারণ অনিশ্চিত প্রতীক-রহস্যের সঙ্কেতের চাবিকাঠিটি কবির সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যায়। নতুন চাবি তৈরী করে কোনো কৌশলী গবেষক হয়তো রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মল্লিকার-কৃত সংখ্যাহীন ভাষ্যের উদ্ভব হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য স্থির প্রতীকের ক্ষেত্রেও মতদ্বৈতের অভাব দেখা যায় না। প্রাচীন কবিদের কাল নির্ণয়ের প্রসঙ্গে এই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রাচীন কবিদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের কাব্য রচনাকাল জানাতেন সহজ সরল ভাষায়। কেউ জানাতেন

১. পুঁ. প. ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

স্থির সাংকেতিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে, আবার কেউ বা দুর্বোধ্য হেঁয়ালির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে ভালবাসতেন। তাঁদের এই হেঁয়ালি-বিলাসের ফলে, একই কবির রচনাকাল নিয়ে চূড়ান্ত মতদ্বৈত দেখা যায় পণ্ডিত মহলে। সতেরো শতকের কবি রূপরামের কাব্য-রচনাকালবাচক পদটি এই রকম উৎকৃষ্ট হেঁয়ালিতে আবৃত। যাকে কেন্দ্র করে গবেষক-মণ্ডলীর মধ্যে মতান্তরের অন্ত নেই।

'শাকে সিমে জড় হইলে যত শক হয়।
তিন বাণে চারি যুগ বেদে যত কয়॥
রসের উপরে রস তায় রস দেহ।
এই শকে গীত হইল লেখা কর্যা লেহ॥'

এখানে 'লেখা কর্যা লেহ'—এই শেষোক্ত কথা কটির মধ্য দিয়ে কবি যেন তাঁর তির্যক ভঙ্গিতে প্রকাশিত কাব্য-রচনাকালটির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পাঠক-মণ্ডলীকে সগর্বে আহ্বান করেছেন বলে মনে হয়। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। বিভিন্ন পণ্ডিতের কষ্ট কল্পনার সাহায্যে এর প্রত্যেকটি হেঁয়ালির অসংখ্য অর্থ নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত মজার ব্যাপার এই যে, কবিকৃত হেঁয়ালিটির মধ্যে একটি চরম কৌতুক রয়েছে। কবি আলোচ্য পদটির প্রতিটি চরণের মধ্যেই তাঁর কাব্য সমাপ্তি কালটিকে প্রকাশ করেছেন। রূপরামের হেঁয়ালি বচনটির বৈশিষ্ট্য এখানেই। এবার আলোচ্য হেঁয়ালি বচনটির অর্থ করলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। "তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত কয়'—এর অর্থ (তিন বাণ=৩ × ৫ বা ১৫, চারি যুগ=৪ × ২ বা ৮, বেদ =৪) ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। আবার 'রসের উপরে রস তায় রস দেহ'—এর অর্থ (রস=৬, রসের উপরে রস=৬৬ কে রস বা ৬ ও দেহ বা ৪ দিয়ে গুণ করা—৬৬ × ৬ × ৪=১৫৮৪। আবার 'শাকে সিমে জড় হইলে যত শক হয়'—এই পংক্তিটির সূত্রেও ঐ একই সময় অর্থাৎ ১৫৮৪ শকাব্দ পাওয়া যায়।

শুধু রূপরাম নয়, মানিকরাম গাঙ্গুলি, কাশিরাম দাস প্রমুখ মধ্যযুগীয় বহু কবির কাব্যে বর্ণিত কাব্য রচনাকাল জ্ঞাপক প্রহেলিকা-পদগুলির রহস্যোন্মোচন আধুনিক রহস্যোপন্যাসের জালমুক্ত করা অপেক্ষা কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

এই কাব্যগাথাশ্রিত হেঁয়ালিগুলির মূল উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সেগুলি যে তৎকালীন লোকমনে একটি বিশেষ স্থান লাভে সমর্থ হয়েছিল, তার স্বাক্ষর থেকে গেছে, সেগুলিরই প্রায় অবিকৃত এবং বহু পরবর্তী যুগেও প্রচলিত একান্ত লৌকিক হেঁয়ালি বা ধাঁধার মধ্যে। যেমন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়—

'বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পলাবিয়া গা॥

হিয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি ॥'[১]

এর প্রচলিত লৌকিক রূপ পাওয়া যায়—

'উপরে চলিল রথ নীচেতে সারথি।
কেমন করে চলে রথ বলো এ বেটি ॥'

অথবা অন্যত্র পাওয়া যায়—

'যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন।
ছেলে নয় পিলে নয় ডাকে খনে খন ॥
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুমু খায় মুখে ॥'[২]

এর প্রচলিত লৌকিক রূপ—

'রাম নয় লক্ষ্মণ নয় শেল মেরেছে বুকে।
কতজন ইচ্ছে করে চুম্বন দিচ্ছে মুখে ॥'

অবশ্য লৌকিক প্রচলিত প্রহেলিকাগুলিও জনপ্রিয় হয়ে কাব্যমধ্যে স্থান লাভ করতে পারে। তবে প্রাচীনতার গৌরব যারই প্রাপ্য হোক, উভয় ক্ষেত্রেই জন-মানসে এর গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য।

কালের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পালাবদল ঘটেছে। তাই সঙ্কেত, হেঁয়ালি, ছড়া কাটানোর যে সমাদর সে যুগের মানুষের মধ্যে ছিল, যা সৃষ্টি করে এবং যার সমাধান করে রাঢ়-বাংলার মানুষ অবসর বিনোদনের নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতো, তা সাহিত্যে তো নয়ই, আধুনিক জন-জীবনেও একান্ত দুর্লভ।

---

১. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ৫৩।
২. ঐ. ঐ.।

ব্যাধি-প্রতিকার

পাদোদক দেহ মোরে শুন মহাশয়ে।
বিপ্রপাদোদকে পাপজ্বর নাহি রহে।

সতেরো শতকের রাঢ়ীয়-বাঙালির জীবনে আধি-ব্যাধির প্রকোপ যতো দেখা যায়, তার থেকে পরিত্রাণ পাবার বিচিত্র ব্যবস্থারও খবর পাওয়া যায়। কবিরাজ-বদ্যিদের পাশাপাশি কবচ-তাবিজ, ঝাড়-ফুক, তুক্-তাক্, জলপড়া, তেলপড়া, বিপ্রপাদোদকসেবন, প্রায়শ্চিত্ত—সবই চলতো সমান ভাবে। রাঢ়ের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের বাঁশবন আর মজাপুকুরের পাড়ে পাড়ে, ছায়ায়-ছায়ায় একই ইতিবৃত্ত। এর আর অন্ত নেই। সেদিনের সমাজ-জীবনে এই ছবি কিছু বেশি পরিমাণে এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিস্ফুট হলেও, আজও এদেশের নিভৃত প্রত্যন্ত পরিবেশে সেই ক্ষীয়মাণ ধারাটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। কারণ আশীর্বাদের মাধ্যমে পীড়া শান্তি হবার কামনা একালে নামেমাত্র থাকলেও, সেকালে এর ওপর বিশ্বাস করা হতো পুরোপুরি। বা কালীঘাটে মানত পূজা করা হয় আজও। কিন্তু সেকালের মতো একালে বোধহয় কেউ এতে একান্ত নির্ভর হয়ে থাকে না। সেকালের মানসিকতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেই।

সমকালীন সাহিত্য ও চিঠিপত্রে[১] যে সমস্ত ব্যাধি ও উৎপাতকে ক্রিয়াশীল দেখতে পাওয়া যায়, আলোচনার সুবিধার জন্য সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। (ক) দেহ-বিকারজনিত ব্যাধি, (খ) মনোবিকারজনিত ব্যাধি ও (গ) ডাইনী-প্রেতাদি এবং অপদেবতায় বিশ্বাসজনিত ব্যাধি।

। **দেহ-বিকারজনিত ব্যাধি**। পালাজ্বর, কাস, পেটবেদনা, অজীর্ণতা, গালের বেদনা, পদে ক্ষত, বোধচিহ্ন, ক্ষয়রোগ, ওলাওঠা, গোদ, বধিরতা, শয্যামূত্র, রাতকাণা, পিত্ত রোগে তিক্ত আস্বাদ, কৃমি দুই চারিটি উর্ধঃ অধঃ হয়ে নির্গত হওয়া, ইত্যাদি[২] ব্যাধির উৎপাতে আবহমান কালের সকল মানুষই সমান কাহিল। সমকালীন সাহিত্য

১. যদিও আমাদের আলোচ্য সময়ের প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্র বিশেষ পাওয়া যায় নি, তবু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের প্রাপ্ত চিঠিপত্রের তথ্যও আলোচনা করেছি. এ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাবার জন্য।

২. চিঠিপত্র থেকে প্রাপ্ত এই রোগগুলি অবিকৃতভাবেই এখানে তুলে ধরা হলো। 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ও চিঠিপত্রে এই সব ব্যাধির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারেরও অভিনব ব্যবস্থার খবর পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য সময়ে ওষুধ বলতে ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছ-গাছড়াই বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সতেরো শতকের কবি বিষ্ণু পালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, সমুদ্র মন্থনের কালে বাত-পিত্তাদি 'বিয়াল্লিশ' প্রকার রোগ যেমন উঠলো, তেমনি সে সকল রোগ নিরাময় করতে আবার চৌষট্টি প্রকার ভেষজ-গুণযুক্ত বৃক্ষও উঠলো।

'বেয়ালিশ রোগ ওঠে লয়্যা বাত পিত।
চৌষটি গাছ উঠিল দেহের করিতে হিত॥'[১]

আবার শ্রীচৈতন্যদেবের মুখেও বৈদ্য মুরারী গুপ্তের প্রতি স-পরিহাস নির্দেশ—'লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়'—শুনতে পাওয়া যায় 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে।[২] এর থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, তখন বৈদ্যদের সম্বল ছিল গাছ-গাছরা। জ্বর ইত্যাদি 'সাধ্য-রোগগুলি' বৈদ্যদের সুচিকিৎসায় সেই সকল ভেষজ-গুণসম্পন্ন লতাপাতার সাহায্যে সহজেই নিরাময় হতো। কিন্তু অসাধ্য ব্যাধি দেখলে দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের বিধান দিয়ে, বৈদ্যকে ছল করে পালিয়ে যেতে দেখা যায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে।

'দেখিলে অসাধ্য রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়॥
কর্পূর পাচন করি তবে সে রাখিতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান॥
রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পয়ান॥'[৩]

ওষুধ হিসাবে 'কফ নিবারিতে' পিপ্পলিখণ্ড,[৪] 'পেট বেদনায়' সোমরাজ[৫] ইত্যাদি তিক্তরস এবং তারই সঙ্গে চলতো 'বৈদ্যকের দু-এক প্রকার মুষ্টিযোগ'। 'ক্ষত' বা ঘায়ের মহৌষধ ছিল 'কাল্যা লতার পাতা'। এ সম্পর্কে একটি প্রাচীন ছড়াও পাওয়া যায়—

'কাল্যা লতার পাতা শুষ্ক ক্ষতে প্রলেপ।
ইহাতে নিশ্চয় জান হয় ক্ষত ক্ষেপ॥'[৬]

'রক্ত পিত্তে' রোগীকে 'কুষ্মাণ্ড খণ্ড'[৭] ব্যবহার করতে দেওয়া হতো। সর্প ও বৃশ্চি-

১. বি. ম. পৃ. ১৭।
২. চৈ. ভা. (আ) পৃ. ৭২।
৩. ক. ক. চ. পৃ. ৩৫৩।
৪. চৈ. ভা. পৃ. ৩৫৫।
৫. চি. প. স. চি. ২য়। পৃ. ৭৮।
৬. ঐ. পৃ. ৬৭।
৭. ঐ. পৃ. ৭৯।

কাদির দংশনে 'সালি-বিসালি' পাতা ও 'সমুদ্রের ফেনা' ছিল অব্যর্থ। সালি-বিসালি বৃক্ষের এবং তার পাতার বর্ণনা পাওয়া যায় সমকালীন-সাহিত্যে।

'চাকল বর্ণের পাতা পাণ্ডুর বর্ণের ডাটে।'[১]

অর্থাৎ ধূসর বর্ণের গাছের ডালে সবুজ বর্ণের পাতা হয় এই গাছে। এছাড়া, চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধি তেলের ব্যবহারে পিত্ত ও বায়ু রোগের প্রকোপ প্রশমিত হতো।

'জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদি তৈল ॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু প্রকোপ শান্তি হঞা যায় ॥'[২]

এখনকার মতো সেকালেও ক্ষয়-রোগে 'বাহ্যে রাখিয়া' অর্থাৎ বাড়ীর বাইরে রেখে চিকিৎসা করানো হতো।[৩] শরীরে বসন্তের গুটি দেখা দিলে বৈদ্যের কাছে ব্যবস্থাপত্র নেওয়া হতো। আবার তারই সঙ্গে চলতো বজ্‌লের অনুমোদিত মশলা ব্যবহার করে আরাম হবার চেষ্টা।[৪] আলোচ্য সময়ে শল্য চিকিৎসারও সামান্য খবর পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায়, 'মারহাটা' অর্থাৎ মারাঠীরা প্লীহা-কাটানো ও চক্ষের ছানি-কাটার চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিল।

'ফিরে তারা গুজরাটে শোলঙ্কে পিলুই কাটে
ছানি ফাঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা ॥'[৫]

আমাদের আলোচ্য সময়ের সাধারণ বাঙালি জন-মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মভীতি ও কর্মফলবাদ। অন্ধ আচার-বিচার, বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ সমাজের মানুষ দৈহিক ব্যাধির ক্ষেত্রেও প্রাক্তন কর্মকে দায়ী করে তার হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে ভবসিন্ধুতারণ গুরু-গোসাঁই ও ব্যবস্থাপক-ভট্টাচার্যের কৃপাপ্রার্থী হতো। তাই ওষুধ খাবার আগে পাপ স্খালনের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান যেমন চলতো, তেমনি অনেক রোগ নিরাময়েই বিপ্র-পাদোদক সেবনও চলতো সমান ভাবেই।

'সর্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে ॥'[৬]

ইত্যাদি উক্তি ছড়িয়ে রয়েছে সমকালীন সাহিত্যের যত্রতত্র। জ্বর-নিরাময়ে বিপ্র-পাদোদক আলোচ্য যুগে মহৌষধ রূপে বিবেচিত হতো।

১. বি. ম. পৃ. ৪৮। সালি-বিসালি সম্ভবতঃ বিশল্যকরণী, যা শল্য উন্মোচন ও ব্যাথা নিবারণের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। এখনও রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে এই গাছের পাতার রস ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ঐ একই কারণে।

২. চৈ. চ. (অ). পৃ. ২৩৬।

৩. বি. ভা. প. সং ৪৭৬।

৪. চি. প. স. চি. ২য় পৃ. ৭৭।

৫. ক. ক. চ. পৃ. ৩৬১।

৬. চৈ. ভা. পৃ. ১৩১।

'পাদোদক দেহ মোরে শুন মহাশয়ে।
বিপ্রপাদোদকে পাপজ্বর নাহি রহে॥'

একথা মানুষ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতো। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে বিদ্বেষবশতঃ দেহ কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হয়, এমন ধারণাও সমাজে প্রচলিত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী 'গোপাল-চাপালের' কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।[১] সে সব ক্ষেত্রে আবার সেই ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের আশীর্বাদ ছাড়া সে রোগ-নিরাময় সম্ভব নয় বলে সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

দেবস্থানে ধর্ণা, মানত-পূজা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কিংবা আশীর্বাদাদিতে রোগমুক্তি ইত্যাদির উপরে তখন একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে নির্ভর করা হতো। গালের দাদ নিরাময়ে 'সন্তান' বা স্বস্ত্যয়ন[২], 'শরীর কাহিলে', 'দেবানুগ্রহ মনুষ্য' কর্তৃক 'শ্রীশ্রীগোপাল স্থানে তুলসী'[৩] চড়ানো ছিল অতি প্রচলিত ও সাধারণ ব্যাপার।

মন্ত্র-তন্ত্রের ওপরে তখনকার মানুষের অবিচলিত আস্থা ছিল। সতেরো শতকের কবি রূপরাম তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে বলেছেন—'মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা'[৪]। মন্ত্রের জোরে তখন সর্প-বৃশ্চিকাদির দংশন থেকে শুরু করে পেট-বেদনা, প্লীহা, পোড়া-ঘা ইত্যাদিও নিরাময় হতো। ওঝা গুণিনদের তাই সমাজে খুব সমাদর ছিল। সাপের বিষ নামানোর প্রচুর মন্ত্র সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে বিশেষ করে, বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে পাওয়া যায়।

'কুসদিপের মাঝে আছে সুধা তরঙ্গিণী।
রিনিঝিনি বএ পানি ভেটিয়া উজানি॥
তার মধ্যে বাস ঝাড়টি তিন ঠাঞি তার বাকা।
ছিরকাল বৈসে তায় ধুকুরিয়া কাঁখা॥
ছিরকাল বস্তে কাগ করি সাঞি সাঞি।
যা রে হরের বিষ ত্রিভুবনে নাঞি॥'[৫]

সেকালের প্রায় সমস্ত ওঝাই অনেক দিনের মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন বলে অহংকার করতেন।

'জলে থাকে জলে যায় জলে নাচে জলে রাখে তাল।
যা রে কালকূটি বিষ সর্গ মর্ত পাতাল॥
ই মন্ত্রে জতি মরা না কড়িলি রা।
আর মন্ত্র ঝাড়িছে ভীমসরের মা॥

---

১. চৈ. চ. (আ. লী) পৃ. ৩১০।
২. চি. প. স. চি. ২য়, পৃ. ৭৯।
৩. ঐ. পৃ. ৭৭।
৪. রূ. ধ. পৃ. ১৩১।
৫. বি. ম. পৃ. ২২।

ভীমসরের পানি দিব সভাকার গায়।
বার বৎসরের মরা উঠিয়া ডাড়ায়॥'

মন্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন ছিল সু-প্রসবেও। 'মন্ত্রিতজল' দিয়ে সু-প্রসবের ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে।[১] দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যেও এই মন্ত্রিত জলের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

'দারুণ বেথায় রঞ্জা কান্দিয়া বিকল।
মুখে তুল্যা দিল দাই ঔষধের জল॥'[২]

সতেরো শতকের অপর কবি যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ'-কাব্যেও সুখ-প্রসবের কারণে মন্ত্রপুত জল তথা 'জাওন' ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। 'মেনকাবতী ধাই আসি পাতাইল জাওন।'[৩] ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে।

। **মনোবিকার-জনিত ব্যাধি**। বায়ু-বিকার, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, শয্যামূত্র ইত্যাদি ব্যাধি-গুলির প্রতিকারকল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হতো তার বেশীর ভাগই ছিল প্রধানতঃ দৈব-নির্ভর। বিভিন্ন দেবস্থানে ধর্ণা, কবচ-তাবিজ, স্বপ্নাদ্য-তেল ইত্যাদি ছিল এই সব রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ হাতিয়ার। এর সঙ্গে ভেষজ চিকিৎসাও প্রচলিত ছিল। কারও বায়ু-বিকার রোগ দেখা দিলে, মাথায় 'বিষ্ণুতৈল' এবং আরও অনেক সুগন্ধিযুক্ত 'পাক তৈল' দেওয়া হতো।

'বহুবিধ পাক তৈল সভে দেই শিরে।'[৪]

রোগের আধিক্য দেখা দিলে অনেক সময় রোগীকে 'তৈলদ্রোণে' অর্থাৎ তৈল-পূর্ণ বৃহৎ পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হতো।

'তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে।'[৫]

খেতে দেওয়া হতো 'ডাবু-নারিকেলের' জল।

'খাইবারে দেহ ডাবু নারিকেল জল।
যাবত উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল।'[৬]

এইসব চিকিৎসায় কাজ না হলে অর্থাৎ এর পরেও রোগের আধিক্য দেখা দিলে রোগগ্রস্ত উত্তেজিত ব্যক্তিকে বেঁধে রেখে 'শিবাঘৃত' প্রয়োগ করা হতো।

'দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে।
শিবা ঘৃত-প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে॥'[৭]

১. ক. ক. চ. পৃ. ২৫৮।
২. বি. ভা. পুঁ. সং ৬৫৬১। প. সং ৩৩৭।
৩. ধা. ধ. পৃ. ৬৯।
৪. চৈ. ভা. পৃ. ৮৫।
৫. ঐ. ঐ.
৬. ঐ. পৃ. ১৬১।
৭. ঐ. পৃ. ১৬১।

সাময়িক মূর্চ্ছায় 'মুখে জল' ও 'মরীচের গুড়া" প্রয়োগের খবর পাওয়া যায়।

'বুড়া রাজা মূর্চ্ছা হলো উঠে হায় হায়।
মুখে জল দেয় কেহ মরীচের গুড়া ॥'[১]

এছাড়া, 'চামর-বাতাস' তো ছিলই।[২] শয্যামূত্র, রাতকাণা ইত্যাদি ব্যাধিতে নানারকম 'টোট্‌কা' ওষুধের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল, আজও আছে।

। **ডাইনী-প্রেতাদি ও অপদেবতা-বিশ্বাস-জনিত ব্যাধি**। সতেরো শতকের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান কবিদের কাব্যেই দেখা যায়—জামাতাকে কন্যার বশীভূত করবার প্রয়োজনে, বিবাহের স্ত্রী-আচারের মধ্যে ঔষধিকরণের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সেখানে ঔষধিকরণের উপকরণ হিসাবে, বিশেষ দিনে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত 'কাজল', 'ভেটুখই', 'করবীর ছড়ি মূল', 'শজারুর কাঁটা', 'চালগুড', 'অশ্বদ পাতে বিশাশয় খিলি' অর্থাৎ অশ্বত্থ পাতার একশো কুড়িটি মোড়ক ইত্যাদি বহু খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] সে যুগে এটি একটি নিয়ম সর্বস্ব আচারমাত্র ছিল না, বরং গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে অনুশীলিত হতো। এই সব প্রথার সঙ্গে আর্য সমাজ অপেক্ষা ইন্দ্রজাল ও তুকতাকে বিশ্বাসী আদিম জন সমাজের সম্পর্ক ছিল নিবিড়তর। সুযোগ ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাবে তখনকার জন-সমাজ এই সব ক্রিয়াকলাপের দ্বারা প্রবল-ভাবে প্রভাবিত হতো। আর সে প্রভাব আজকের এই বিজ্ঞানের যুগেও একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে একথা বলা কঠিন।

দেবস্থানের ওষুধ গ্রহণ করে সন্তানবতী হওয়ার বিশ্বাস রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকে চলে আসছে। বন্ধ্যা রমণীরা সন্তান কামনায় যে কতো দেবস্থানে ধর্‌ণা দিয়ে ওষুধ খেয়ে, কতো অপদেবতার স্থানে ঢিল বেঁধে 'ছাগল মহিষ মেষ'[৪] মানত করতেন, আমাদের সতেরো শতকের সাহিত্যে তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

'পুত্র নাঞি রাজা রাণী মরণে বিকল।
পঞ্চাননে পূজা মানে ষষ্ঠীকে ছাগল ॥
রঙ্কিনি বাসুলি পূজা করে এক মোনে।
শ্রীফলের দল দেয় শিবের চরণে ॥
হরিবংশ ভারথ মহলে করাইল।
রঞ্জাবতীর তথাপি বালক নাহি হল্য ॥'[৫]

কোনো কোনো দেবস্থান শুধুমাত্র এই কারণেই প্রসিদ্ধি লাভ করতো। আলোচ্য সময়ের কবি রূপরাম তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের বন্দনা অংশে বলেছেন—

---

১. ঘ ধ. পৃ. ২০৩।
২. ঐ. পৃ. ১৭৮।
৩. রা. ধ. পৃ. ৬১ ৬২।
৪. ঐ. পৃ ৬৯।
৫. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। বি. ভা পুঁ. সং. ৬৫৩১। প. সং ১০ক।

'কামার হাটির পঞ্চানন্দ বন্দো জোড় হাতে।
ছেলের তরে কত মেয়ে ঔষধ যায় খেতে॥'[১]

আজও অনেক দেবস্থানে এই জাতীয় ওষুধ পাওয়া যায়, এবং তা গ্রহণ করে মানুষ উপকৃত হয় বলে গ্রামে গঞ্জে বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি অপদেবতায় বিশ্বাস আদিম কাল থেকে মানুষের মনে দানা বেঁধে আছে। এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে ভুলো-লাগা, বাতাস-লাগা, বাণ-মারা প্রভৃতি। এর থেকে রক্ষা পেতে দরকার হতো ওঝা ও গুণিনদের। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে ওঝা কর্তৃক ভূত-বিতারণের একটি সরস বর্ণনা পাওয়া যায়।

'আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে॥
তিন চাপড় মারি বলে ভূত পালাইল।'[২]

সেকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই আরম্ভ হতো এই অপদেবতার অশুভ অধিষ্ঠানের ভীতি। নবজাত শিশুর কল্যাণ কামনায় যে সমস্ত কৃত্যাদি পালন করা হতো, তার মধ্যে অপদেবতার দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার তুক্‌-তাক্‌, মন্ত্র-তন্ত্র অন্যতম। 'জাতকর্ম' সংস্কারের মধ্যে ষষ্ঠ দিবসে নবজাতককে ঘিরে রাত্রি জাগরণ, নানারকম মন্ত্র-পাঠ, সুতিকা গৃহের চারদিক বেড়ে 'মন্ত্র পড়ে' দেওয়া, গোবর, গোমুণ্ড, লোহা, মাছের আঁশ, জুতো ইত্যাদি এনে সুতিকা গৃহের চারদিকে রাখা, অপদেবতাকে শাসন করবার জন্যই প্রচলিত ছিল। এখনও এর জের দুর্লভ নয়। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পরে সকলে মিলে সুতিকা-গৃহের চতুর্দিক ঘিরে 'বিষ্ণুরক্ষা', 'দেবীরক্ষা' ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠ[৩] এবং ওঝাদের সেখানে আগমন, আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। আজ পর্যন্ত এই প্রথা অব্যাহত রয়েছে।

ছোটো ছেলে অনবরত কাঁদলে মনে করা হতো, কোনো কু-লোকের দৃষ্টি তার ওপর পড়েছে। রাঢ়ে একে বলা হয় 'বাতাস লাগা'। এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শিশুদের অঙ্গে দেবস্থানের 'রক্ষা কবচ' বেঁধে দেওয়া হতো। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'-কাব্যে দেখা যায় শিশু-চৈতন্যকে 'ডাকিনী দানবে পাছে বল করে'[৪] বলে সকলে সতর্ক থাকতেন। এই প্রসঙ্গে সতেরো শতকের কবি রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যেও একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

'চারি দণ্ড হইল বাছা দুগ্ধ নাই খায়।
কল্যাণী মাণিকী বলে এহার উপায়॥

---

১. রূ. ধ. পৃ. ১৬।
২. চৈ. চ. (অ) পৃ. ৩২৫।
৩. চৈ. ভা. পৃ. ২৮।
৪. চৈ. ভা. পৃ. ৫৭।

কেহ কান কথা কহে কেহ বান্ধে রক্ষা।
কেহ বলে পাটু পড়শি বা গেল দেখ্যা॥
কান্দিতে কান্দিতে শিশু কোলে ঘুম গেল।
কল্যাণী মাণিকা বলে জঞ্জাল করেছিল॥'[১]

আলোচ্য সময়ের অপর কবি যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দ-বিলাস'-কাব্যে[২] বালক কৃষ্ণ একদিন অনবরত ক্রন্দন করলে, মাতা যশোমতীকেও অনুরূপ আশঙ্কায় কাতর হতে দেখি।

'ডাকিনী জোগিনী কিবা মুখদোষী আসি।
কান্দাল্য বাছারে পারা হেন মনে বাসী॥
স্তনপান নাহি করে নাহি শুনে বোল।
করপদ আছাড়িঞা করে মাত্র গোল॥
উদর বেথায় পারা তেঞি নাহি ভোখ।
কে জানে কুজ্ঞানে পারা কৈল দুষ্ট লোক॥
নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র রক্ষা বান্ধিবারে।
নিদ্রা যাব যাদু বাছা কেমন প্রকারে॥'

আবার শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূতনা-বধের পরে শিশু-কৃষ্ণকে রাক্ষসীর হাত থেকে ফিরে পেয়েছে মনে করে গোপ-রমণীরা তাঁর অশুভ স্পর্শদোষ খণ্ডাবার জন্যে—

'আনন্দ পাইঞা মন্ত্র বিজে রক্ষা বান্ধে॥
বিজমন্ত্র তন্ত্র জত অঙ্গন্যাস করে।
মহামন্ত্রে রক্ষা বান্ধে দেব দামোদরে॥'[৩]

আমাদের আলোচ্য শতাব্দীর কোনো কোনো কবি তাঁদের দিগ্‌-বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে ডাকিনী-যোগিনীদেরও বন্দনা করেছেন।

'ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ শ্রীধর্ম্মের পা।
লব্ধ হইয়া যে মোর আসরে করে ঘা॥
তিনি মোর ভগিনী আমি তার ভাই।
আসরেতে করে ঘা চণ্ডীর দোহাই॥'[৪]

অপদেবতায় বিশ্বাস যে সেকালে কতো গভীর ছিল, তা এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। আজও খোঁজ করলে রাঢ়ের গ্রামে-গঞ্জে ডাইনী বলে চিহ্নিত দু-একজন স্ত্রীলোক মিলে যাবে। তারা নাকি দৃষ্টিপাত মাত্রই শিশুদেহের রক্ত শুষে নিতে পারে।

'আমি হই মুখ দোষী
ঘরে বসি খাই ছেল্যা' পরেশ পড়সি।'[৫]

---

১. শ্রী. ধ. পৃ. ১৪৩।
২. বি. ভা. পুঁ. সং ১২০৯।
৩. ঐ. ঐ.।
৪. ক. ক. চ. পৃ. ২৫।
৫. বি. ম. পৃ. ৩৮।

যতই অবিশ্বাস্য এবং সেই সঙ্গে হাস্যকর হোক না কেন, এই বিশ্বাস সেকালের মতো একালেও প্রচলিত আছে। সাধারণ মানুষ অপত্য স্নেহের বশবর্তী হয়ে কোনো রকম বিচার-বিশ্লেষণ না করেই এই শ্রেণীর জনমতকে মেনে নেয় এবং কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে।

ঈর্ষান্বিত হয়ে অপরের ক্ষতি সাধন করবার জন্যেও নানা ধরনের মন্ত্র-তন্ত্র ও তুক-তাকের ব্যবহার সে যুগে বহুল প্রচলিত ছিল। 'বাণ-মারা' তার মধ্যে অন্যতম। কালক্রমে মানুষ যতই বস্তুবাদী হয়ে উঠেছে, ততই এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সমাজ থেকে লোপ পেয়েছে।

'মহাসঙ্ক নাম মোর ত্রিভুবন জিনি।
মোর বাণে যম ঘরে জাইবি এখনি॥'

এ কথায় এখন কেউ ভীত হবে না। কিন্তু বাণ-মেরে ফলবন্ত গাছ, পুকুরের জল থেকে শুরু করে মানুষের প্রাণ পর্যন্ত সেকালে নষ্ট করা হতো, এরকম ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল।

'অনুসারে বাণ মারে চান্দ অধিকারী।
নিছিয়া ফেলিল গাছের দক্ষিণ ডালি॥'[১]

তাই একদিকে যেমন ক্ষতি করবার জন্যে নানান ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত ছিল, অপর দিকে আবার সেই বাণ কাটান করবার জন্যেও এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ওঝা-গুণিনদের দ্বারস্থ হতে হতো প্রায়ই। সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করে প্রিয়জনকে কাছে এনে দিতে, বা চিরকালের মতো কাছে বস করে রাখতে পারে, সমাজে এমন গুণিনের অভাব ছিল না।

সেকালের ব্যাধি, তা মনোবিকার-জনিতই হোক আর দেহবিকার-জনিতই হোক না কেন, তার একদিকে যেমন কর্মফল-জনিত চিন্তা ভাবনা সচল ছিল, অন্যদিকে তেমনি অদৃশ্য শক্তির আনাগোনাতেও মানুষ ছিল সমানভাবেই আস্থাশীল। তাই একদিকে যেমন তখনকার মানুষ বিশ্বাস করতো—

'কেবা কারে কাটে আর কেবা কারে রাখে।
কাটে রাখে নারায়ণ না দেখহ চক্ষে॥'

অন্যদিকে এর কারণ হিসেবে আপন আপন কর্মফলকে দায়ী করে ভাবতো, 'যত কিছু শুভাশুভ সব কর্ম ফান্দে'। তাই কবিরাজ বজ্যির পাশাপাশি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কবচ-তাবিজ এবং বিপ্র-পাদোদক চলতো সমান তালেই।

সতেরো শতকের রাঢ়-দেশের এই সব বিচিত্র ব্যাধি ও তার হাত থেকে মুক্তি পাবার এই যে বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই রাঢ়ের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শতাব্দক্রমে আজও অব্যাহত রয়েছে।

১. বি. ম. পৃ ৪২।

শ্রাদ্ধ-প্রেত-পূজা

কপালে জুড়িয়া ফোটা　　বসিল পণ্ডিত ঘটা
　　সকলাতে বসিয়া কম্বলে ॥
অর্ঘ গরু দিয়া দান　　দ্বিজগণে সাবধান
　　পাত্রে বিধি করেন সম্প্রদান।
যথা বিধি পিণ্ডদান　　শ্রাদ্ধ হইল সমাধান
　　ব্রাহ্মণের কৈল বহু মান ॥

বিদেহী আত্মার অমরত্বে আস্থা থেকেই সে সম্পর্কে নানা চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠেছিল সেই আদিম কাল থেকেই। পারলৌকিক নানা দায়িত্ব কর্তব্যও দেখা দিয়েছে সেই একই পথে। তাই মৃত আত্মীয় স্বজনের আত্মার সুখের জন্য বিভিন্ন আচরণ বিধি সমাজে নির্দিষ্ট হয়। মৃতের সংকার, প্রার্থনা, পিণ্ডদান, প্রেত-পূজা, শ্রাদ্ধ, ভোজ ইত্যাদি আচার, প্রথা, পদ্ধতি তাই স্বরূপে বা রূপান্তরে আদিম ও সর্বজনীন।

। **মৃতের সংকার** । এ দেশের ধর্মে-কর্মে, জীবনযাত্রায়, প্রাত্যহিক নানা অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্যেতর দুই ধারার সমন্বয় ঘটেছে। বাঙালির জীবন যাত্রায় বৈদিক অপেক্ষা অবৈদিক ধারারই প্রাধান্য বেশি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।[১]

শবদেহকে ভূ:প্রোথিত করা প্রাচীনতম প্রথা। আবার মৃতদেহকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া, উচ্চ উন্মুক্ত স্থানে পাখিদের আহারের জন্য স্থাপন করা এবং অন্তিম সংস্কৃত বিধি অনুযায়ী অগ্নিতে দাহ করা—এ সবই বৈদিক যুগের শব-সংকার পদ্ধতি। সম্ভবতঃ বৈদিক অবৈদিক ধারার মিশ্রণ।

‘যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ।
সর্বাংস্তানগ্নে আবহ পিতৃন্ হবিষেহওবে।’[২]

[হে অগ্নি, আমাদের পিতৃগণের মধ্যে যাঁহারা ভূপ্রোথিত, জলে নিমজ্জিত বা প্রবাহিত, অগ্নিদগ্ধ অথবা উন্নত স্থানে স্থাপিত, তাঁহাদের সকলকে আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণার্থ এখানে আনয়ন করুন।]

মৃত ব্যক্তির শবদেহকে অগ্নিদাহে সংকার করার বিধানটিক অন্তিম সংস্কার বা

১. চি প. স. চি.। ১ম. পু.। পৃ. ২০৭-৮।
২. অথর্ব, ১৮।২।৩৪

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের সংস্কার বলা হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দুটি সূক্তে[১] বৈদিক যুগের শব-সংস্কার পদ্ধতির বিশেষ আলোচনা আছে। সেখানে দেখা যায় শবদেহকে ভূপ্রোথিত করা প্রাচীনতম প্রথা এবং অগ্নিদাহ করা অন্তিম বিধি। কিন্তু সমাজে প্রাচীন রীতিনীতির সংস্কার সাধিত হলেও সমাজের কিছু লোক সুসংস্কৃত রীতি গ্রহণ করেন না—সনাতনীরা সর্বদাই নূতন সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাচীন রীতি-নীতিকে আঁকড়িয়ে থাকেন। ওদিকে আবার প্রাচীন অবৈদিক মতে মানুষের চরম মৃত্যু নেই। সুতরাং মৃতদেহকে ভস্মীভূত করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রাণহীন দেহটিকে ভূগর্ভস্থ করে রাখলে স্বর্গত আত্মা মধ্যে মধ্যে এসে এতে আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গলার্থে অলৌকিক শক্তি প্রয়োগপূর্বক সাহায্য করবে—এটিই ছিল অবৈদিক বা প্রাক্‌বৈদিক জনবিশ্বাস। কেউ কেউ এটিকে প্রাচীন মুনি-ধারাগত বিশ্বাস বলেও মনে করে থাকেন।[২] সম্ভবতঃ এই কারণেই হিন্দু সমাজের কোনো জাতির কেউ সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁর মৃত্যুর পরে শবদেহটিকে আদি বৈদিক বিধান অনুসারে এখনও ভূপ্রোথিত বা জলে নিমজ্জিত করা হয়।

অবশ্য পরবর্তী কালীন অগ্নিহোত্রের প্রভাবটিও ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসী যোগীদের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। সেইজন্য ভূপ্রোথিত বা জলে নিমজ্জিত করার আগে মৃতদেহের মুখমণ্ডলে ঘৃতের মশাল, প্রদীপ বা পাটকাঠি দ্বারা সামান্য অগ্নি স্পর্শ করানো হয়। এই মুখাগ্নির নিয়ম গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই হিন্দু সমাজে আজও সমানভাবে প্রচলিত। রাঢ় বাংলার নাথ যোগীরাও অগ্নিসংস্কার পদ্ধতির অনুসরণ না করে প্রাচীন ভূপ্রোথিত করার বিধানটিই অনুসরণ করতেন। তাঁরা মুখাগ্নি করে মৃতদেহকে যোগাসনে উপবেশন করিয়ে সমাধিস্থ করেন।[৩] যোগ সাধনায় নির্বিকল্প সমাধিতে নিস্পন্দ দেহের মধ্যে প্রাণ ফিরে আসে। যোগীর বিশ্বাস যাঁকে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে নির্বিকল্প সমাধিস্থ। সমাধি ভঙ্গ হলে আবার প্রাণক্রিয়া আরম্ভ হতে পারে। সুতরাং মৃতদেহকে অগ্নিযোগে ভস্ম করা অনুচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, শবদাহী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদিরা নাবালক শিশুর মৃতদেহ ভূপ্রোথিত করেন।[৪] এটিও সম্ভবতঃ পুনরায় প্রাণক্রিয়া আরম্ভ হতে পারে এই আদিম লোকবিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি।

আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের সাহিত্যে এই মৃতের সৎকার কৃত্যের কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। সতেরো শতকের কবি সীতারাম দাস তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-

১. ১০।১৫।১১ এবং ১০।১৮।৮।
২. চি. প. স. চি। ১ম, পু.। পৃ. ২১১।
৩. গোর্খবিজয়। ভূ. পৃ. গ.—৮।
৪. Caste in India, Hutton, P. 109.

কাব্যে[১] মৃতের সৎকারের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন।

'সৎকার করেন বাপের বহু কষ্ট ধরে।
গড়িল উত্তম চিতা উত্তর সিয়রে॥
অগোর চন্দন কাঠ ঘৃত পাট দিয়া।
বালুকার নিরে তারে স্নান করাইয়া॥
কান্দিয়া কান্দিয়া শিব বাপে সোয়াইল।
খড়িকায় করিয়া অগ্নি হাতে করি দিল॥'[২]

সতেরো শতকের অপর কবি বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে রাজা জন্মেজয় কর্তৃক তাঁর পিতার মৃত্যুতে মৃতদেহ সৎকারের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

'গঙ্গার কুলে রাজাকে লইল তুলিয়া।
আগর চন্দন নিল ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া॥
দক্ষিণে বসিলা রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ।
সলকা জ্বালিয়া কৈল এ মুখ আগুন॥
চন্দনের চেলা যে ফেলায় সারি সারি।
ঘৃত ঢালিল তাথে কলসি কলসি॥
জন্মেজয় জেয়া তায় আনল লাগাল্য।
সাত তাল অগ্নিট প্রবল হইল॥
নাড়িয়া চাড়িয়া রাজার কৈল শত কাজ।
সোনার অঙ্গ পুড়াইয়া কৈল ছারখার॥'[৩]

সৎকারের ক্ষেত্রে নদীর তীর, বিশেষ করে গঙ্গানদীর তীর ছিল কাম্য স্থান। বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে দেখি সমুদ্র মন্থনের বিষ পান করে শিবের প্রাণ স্পন্দন বন্ধ হলে, সে খবর পেয়ে দেবী চণ্ডী এসে তাঁর সৎকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন সমুদ্রের তীরেই।

'চণ্ডী হর লইয়া কুলে নামিল সাগরের জলে
স্নান করায় পশুপতি।
কোথা গেলে রাজা হনুমান আগর চন্দন আন
তিজ সজ্যা কর না যতনে।'[৪]

আবার সতেরো শতকের অপর কবি ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে এর বর্ণনা পাই একটু অন্য রকমভাবে।

১. ক. বি. পুঁ. সং. ২৪৭৩।
২. ঐ. প. সং ৫ক।
৩, বি. ম. পৃ. ৩০।
৪ ঐ. পৃ. ১৯।

'ভবানী বলেন শুন দেবতা সকল।
আনিঞা চন্দন কাষ্ঠ সাজাহ আনল॥
প্রভুর উদ্দিশে যাব আমি অভাগিনী।
যতেক দেবতা মেলি সাজাহ অগুনি॥
আনিঞা চন্দন কাষ্ঠ সাজাল্য আনল।
ভবানী বলেন শুন দেবতা সকল॥
শ্মশানেতে গেল নিঞা চন্দনের স্তম্ভ।
প্রভুরে ধরিয়া লহ কিসের বিলম্ব॥
ত্রিভুবনে হাহাকার মহেশ মোহিত।
চন্দনের কাষ্ঠে অগ্নি হৈল প্রজ্জলিত॥'[১]

ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে অনাদ্যের মায়ামৃত্যু হলে তাঁর তিন পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পিতার যথোচিত সংকার কার্য সমাপ্ত করেন।

'বাহির হইল প্রাণ বিপরীত বেশ।
মায়ার কারণে প্রভু পায় বড় ক্লেশ॥
প্রভুর মরণ দেখি যত সব মুনি।
অবিলম্বে ত্রিদেবারে ডাক দিয়া আনি॥
উলুক বলেন ব্রহ্মা, কি ভাব বিচার।
অগ্নি দিয়া জনকের কর প্রতিকার॥
যতেক বিধান তার সভে কর ধার্য্য।
বল্লুকার তীরে লয়্যা কর অগ্নিকার্য্য॥
লইল নৌতন ঘৃত চন্দনের সার।
বল্লুকার তীরে গেলা করিতে সংকার॥
হেনকালে বলেন উলুক তপোধন।
আমার বচন শুন ব্রহ্মা নারায়ণ॥
পৃথিবী আগোড়া নাঞি ভাব মনে মনে।
অবনীতে অগ্নিকার্য্য করিবে কেমনে॥
মুনির বচন শুনি হেনকালে হর।
ভাবিয়া আপন মনে করিলা উত্তর॥
মৃত্যুঞ্জয় নাম মোর নাহিক মরণ।
উরু ভাগে করহ পাবক নিয়োজন॥
উরাত পাতিয়া দিলা দেব ত্রিনয়নে।
হরের উরুতে হৈল ধর্ম্মের শ্মশান॥
মায়ার কারণে হৈল অগ্নি নিয়োজন।'[২]

১. ক্ষে. ম. পৃ. ৬৪।
২. বি. ম. পৃ. ১১।

সংকারের পূর্বে শবদেহকে স্নান করিয়ে সর্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন-কুঙ্কুম-কস্তুরি লেপন করে, উত্তম বসন ও আভরণ পরিয়ে, উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়ে, কীর্তন মহোৎসব করিয়ে তারপর মুখাগ্নি করা হতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামর্থ অনুযায়ী। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-কাব্যে চৈতন্যদেবের পিতার শবদেহ সংকারের এই রকম বর্ণনাই করেছেন।

'আজ্ঞা দিল গৌরচন্দ্র যতেক ব্রাহ্মণে।
আমার বাপের শয়ন করায় দিব্যাসনে॥
পাট নেত ভোট শ্বেত সকলত কম্বলে।
চিতার উপরে পাড়ি শয্যা গঙ্গাজলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরি দেহ সর্বাঙ্গে চন্দন।
দিব্য বস্ত্র দিব্য মাল্য দিব্য আভরণ॥
শিয়রে চান্দা বালিশ উপরে চন্দ্রাতপ।
দশ দণ্ড করহ কীর্তন মহোৎসব॥'[১]

যে ব্যক্তির পুত্র যথাযোগ্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে পিতার শবদেহের সংকার করে, তাঁর অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয় বলে সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

'করহ সংকার তার শাস্ত্রের বিধানে।
পরকালে পান যেন প্রভুর চরণে॥'[২]

সতেরো শতকের বিভিন্ন কাব্যে ও কিছু পরবর্তী কালের চিঠিপত্রে. মৃত্যুকালে তীর্থযাত্রা, গয়াধাম গমন, গঙ্গাতীরে পিতৃবিয়োগ, তুলসী বনে 'হরিকথা' স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ, মৃত্যুকালে গঙ্গায় অন্তর্জলি যাত্রা, ইত্যাদির কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ বয়সে শরীরে রোগলক্ষণ দেখা দিলে কোনো রকম চিকিৎসার প্রশ্ন আসতো না। বার্ধক্যের অবশ্যম্ভাবী এবং অপ্রতিরোধ্য রোগ জেনে রোগীকে অন্তর্জলী যাত্রা করানো হতো।

'হেনকালে মূর্ছা গেল মিশ্র পুরন্দর।
বিশ্বরূপ শোকে তার গাএ আইল জ্বর॥
মহাবায়ু কফ উর্দ্ধশ্বাস রক্তশ্রবে।
দেখিবারে গেলা তারে সকল বৈষ্ণবে॥
বিপ্রগণ মেলি নৈল গঙ্গা, অন্তর্জলে।'[৩]

গঙ্গার তীরে, তুলসী তলায়, কি তীর্থস্থানে মৃত্যু সেকালের মানুষের একান্ত 'কাম্য ছিল। কিছুকাল পূর্বেও রাঢ় বাংলার মানুষ এই একই সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল।

---

১. চৈ. ম. পৃ. ৪৫।
২. ধ. ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ২০৯ক।
৩. চৈ. ম. পৃ. ৪৩।

। শ্রাদ্ধ ।

হিন্দু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই আত্মা তার মতে অবিনশ্বর। মানুষের মৃত্যুর অর্থ তার দেহের ধ্বংস, আত্মার নয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, আত্মার তুষ্টিবিধান ও তার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা—শ্রাদ্ধ বলতে এ সমস্তই বোঝায়। আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু তিথিতেই শুধুমাত্র জানানো হয়, তা নয়। উপনয়ন এবং বিবাহ ইত্যাদি অন্যান্য সংস্কারের পূর্বেও এই শ্রদ্ধাগুলি অবশ্য দেয়। যুগ যুগ ধরে এই শ্রাদ্ধ হিন্দুর সমাজে ও ধর্ম-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

রাঢে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত শ্রাদ্ধ-বিষয়ক প্রধান নিবন্ধ গ্রন্থ তিনটি। শূলপানির 'শ্রাদ্ধ-বিবেক', রঘুনন্দনের 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' ও গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়া কৌমুদি'। এদেশে এই তিনটি গ্রন্থ অনুসারে শ্রাদ্ধের তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান পালিত হয়। স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'শ্রাদ্ধতত্ত্বম'-গ্রন্থে পুলস্ত্য বচন উদ্ধার করেছেন—'শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে'। তাই শ্রদ্ধাপূর্বক আত্মার উদ্দেশ্যে অন্নাদি দানের নামই শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধ বিষয়ক এই নিবন্ধ গ্রন্থগুলি, সতেরো শতকের সাহিত্যে প্রাপ্ত বর্ণনা এবং আলোচ্য শতকের কিছু পরবর্তী কালের প্রাপ্ত চিঠিপত্রের ভিত্তিতে রাঢ়ে প্রচলিত শ্রাদ্ধকালীন কৃত্যের একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। কারণ মৃত্যুকৃত্যাদির মতো সামাজিক আচারের ক্ষেত্রে মানুষ অন্ধভাবে সংরক্ষণশীল। সুতরাং আলোচ্য সতেরো শতকের পূর্বে ও পরে শ্রাদ্ধ বিষয়ে রক্ষণশীল আচার-সর্বস্ব হিন্দু সমাজে কোনো পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যায় না।

অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ। এই আদ্যশ্রাদ্ধে তিল-কাঞ্চন ও অন্নজল উৎসর্গ করা হতো এবং আজও হয়। সামর্থ অনুসারে পিতামাতার প্রেতত্ব পরিহারের জন্য ব্রাহ্মণকে ধেনু বা বৃষ উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে সেটি প্রতীকী বৃষোৎসর্গ মাত্র। শ্রাদ্ধে আত্মীয়-বন্ধুদের নিমন্ত্রণ, গুরু-পুরোহিতকে সম্মানী স্বরূপ দান, ইত্যাদি অবশ্য কৃত্য ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও আছে।

সতেরো শতকের বিভিন্ন কাব্যে ও কিছু পরবর্তী কালের চিঠিপত্রে, পিতৃশ্রাদ্ধে চন্দন ও ধেনু দান, গয়াধামে গমন এবং সঙ্গতি ও বংশ মর্যাদা অনুসারে পিতা-মাতা-গুরু প্রভৃতির শ্রাদ্ধে হেঁয়ালীর ভাষায় সময়োচিত পত্রে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক রচিত 'নৌকাবন্ধ' 'পদ্মবন্ধ' ইত্যাদি সাংকেতিক ভাষায় পত্র প্রেরণ করে নিমন্ত্রণ করা—অঞ্চলভেদে এই সমস্ত আচার হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল।

শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান ইত্যাদি প্রসঙ্গেও সমকালীন সাহিত্যে কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। 'চৈতন্য ভাগবত' 'চৈতন্য চরিতামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের পিতার মৃত্যুর পরে, তাঁর আত্মার মুক্তির কামনায় শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক গয়ায় পিণ্ডদানের

বর্ণনা রয়েছে। জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী চৈতন্যদেবের পিতা মৃত্যুকালে পুত্রকে অনুরোধ করে যান, গয়ায় গিয়ে তাঁর পিণ্ডদান করতে।

'গয়াতে আমার বাপু দিহ পিণ্ডদান।'[১]

সতেরো শতকের বিভিন্ন 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে ধন্বন্তরীর মৃত্যুতে শিষ্য চাঁদ সদাগরকে মৃত গুরুদেবের পুণ্যার্থে অন্নদান করতে দেখা যায়:

'গুরুদেবের পূর্ণে আমি অন্নদান করিব হে।'[২]

দ্বিজরামদেবের 'অভয়ামঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুকে তার পিতামাতার পারলৌকিক কাজ করতে দেখি।

'সেই কালে কালকেতু লইয়া পুরোহিত।
জননী জনকের করে ঔর্দ্ধ দৈহিক॥
প্রেতকর্ম সকলিয়া ব্যাধের নন্দন।'[৩]

আবার মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে ধনপতি সদাগরের পিতার মৃত্যুতে তাঁর আত্মার সুখের কামনায়, মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকার্য ও আত্মীয়-বন্ধুদের নিমন্ত্রণের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

'তিল তুলসী গঙ্গোদক কুশবটু অশ্বত্থক
সব জর্ব্বা কুসুম চন্দনে॥
সাগত অসুজা কনি দ্বিজ করে বেদধ্বনি
নিয়োজিত হইয়া একমনে।
কপালে যুড়িয়া ফোটা বসিল পণ্ডিত ঘটা
সকলাতে বসিয়া কম্বলে॥
অর্ঘ্য গরু দিয়া দান দ্বিজগনে সাবধান
পাত্রে বিধি করেন সম্প্রদান।
জথা বিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল সমাধান
ব্রাহ্মণের কৈল বহু মান॥'[৪]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শুধু মৃত পূর্বপুরুষদের নয়, আত্মীয় অনাত্মীয় অনেক জীবিত লোকেরও পিণ্ডদান করেছিলেন।

সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে পাত্র মহামদের সঙ্গে যুদ্ধে কলিঙ্গার মৃত্যু হলে কানড়া তার সংস্কার করেন। সেখানে বারো মাসে বারো পিণ্ডদানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

১. চৈ. ম. পৃ. ৪৫।
২. বি. ম. পৃ. ৫০।
৩. অ. ম. পৃ. ৫০।
৪. ক. ক. চ. পৃ. ১৬৫।

'কান্দনা কান্দনা ঝিএ না কান্দিঅ আর।
চিতা সাজাইয়া বাছা কর সতকার ॥…
সেইখানে সতিনির সতকার করিল।
বার মাসে বার পিণ্ড সমর্পণ কৈল ॥'[১]

শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পুত্র পিণ্ডদান করলে পিতার বৈকুণ্ঠলাভ হয়। কিন্তু পুত্রহীন ব্যক্তির পিণ্ডদানের ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি অনুমৃতা না হন, তবে তাঁকেই স্বামীর ঊর্ধ্বলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব বহন করতে হয়।

'পুত্র পিণ্ডদান কর শাস্ত্রের বিধানে।
পরকালে মুক্ত যেন হন তপোধনে ॥
স্বামী মৈলে স্ত্রি রহে তাহাতে বিধান।
অনুমৃতা হঞা মৈলে পূর্ব পরিত্রাণ ॥'[২]

সেকালে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহুবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা হতো বলেও শতাব্দীর সাহিত্য সূত্রে জানা যায়। তার মধ্যে পুষ্করিণী খনন, মঠ প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ রোপন, ইত্যাদি করানোর রীতি অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালের চিঠিপত্রেও এর উল্লেখ মেলে। এছাড়াও উপযুক্ত এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা নানা ধরনের দান গ্রহণ করায়, পরোক্ষভাবেও আবার সমাজ উপকৃত হতো এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। আবার পরবর্তী কালে এই দানকে উপলক্ষ করে দাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যে যে নানা ধরনের বিবাদ বিসম্বাদেরও সৃষ্টি হতো, তারও সরস উল্লেখ মেলে আঠারো উনিশ শতকের বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে। যার মধ্য দিয়ে সেকালের গ্রাম সমাজের সুস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে।

শ্রাদ্ধের বিভিন্ন মন্ত্রেও সেকালের বিশেষ বিশেষ সমাজচিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কোনো কোনো মন্ত্র শুনলে মনে হবে যেন জীবিত ও মৃত এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। আবার কোথাও মনে হবে শ্রদ্ধার দানে তৃপ্ত পিতৃকুল যেন বর্তমানকে অশেষ দুর্গতি থেকে মুক্ত করতে সদা সক্রিয়। শুধু শ্রাদ্ধের মন্ত্রেই নয়, সাধারণ মানুষের মনের মধ্যেও এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। তাই শ্রাদ্ধের সকল কৃত্যই সম্পন্ন করা হতো একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে।

---

১. সী. ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৬২৭৭। প. সং।
২. ধ. ধ.। বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং. ২০৮ক।

দৈব-নির্ভরতা ॥

কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুঃখ সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক ॥
কান্ধে করি বহে কেহ, কেহ চাপে কান্ধে।
যত কিছু শুভাশুভ সব কর্ম্ম ফান্দে ॥

সমগ্র সতেরো শতকের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়, তা হলো, সেকালে দৈবের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল অবিচল। বার্নিয়ার তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর এক জায়গায় লিখেছেন, "এশিয়ার অধিকাংশ লোকই স্বর্গরাজ্যের সংকেত ও নির্দেশ সম্বন্ধে এতো বেশি আস্থাবান যে, পৃথিবীর কোনো ঘটনা যে ঊর্ধলোকের ইশারা ছাড়া ঘটতে পারে, এ তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন না। প্রতি পদে পদে তাঁরা গণৎকারে শরণাপন্ন হন। গণৎকারের পরামর্শ ছাড়া জীবনে এক পা-ও তাঁরা চলতে চান না।...জীবনের অতি তুচ্ছ প্রাত্যহিক ঘটনাও গণৎকার নিয়ন্ত্রণ করেন।...এই জাতীয় জঘন্য কুসংস্কার, কথায় কথায় গণৎকার, পদে পদে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হওয়া,—এ আমি আর কোথাও দেখি নি। মনে হয়, এদেশের লোক জন্ম থেকেই জীবনটাকে যেন জ্যোতিষীর কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে।"[১]

বার্নিয়ার ছিলেন যুক্তিবাদী বিদেশী। তাঁর কাছে অন্ধ সংস্কারের এই রকম বাড়াবাড়ি বিরক্তিকর ঠেকেছিল। আজকের দিনে আমাদের কাছেও তা কম বিরক্তিকর ও হাস্যকর নয়। কিন্তু সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে সেদিনের স্থিতাবস্থা সমাজের যে ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, সেখানেও দেখা যায় দৈবের নির্দেশ মানুষ মেনে চলতো প্রতি পদে পদেই। সাধারণ নৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কারগুলিই নিয়ন্ত্রণ করতো মানুষের ভাব-কর্ম এবং আচরণ।

সেকালের রাঢ় বাংলার মানুষ যে কোনো কাজে যাত্রার পূর্বে শুভক্ষণ দেখে যাত্রা করতো। এবং যাত্রার প্রাক্কালে কোনো কারণে এর অন্যথা ঘটে গেলে, সে যাত্রা যে কখনই শুভ হতে পারে না, এই বিশ্বাসও সমাজে প্রচলিত ছিল।

সতেরো শতকের কবি রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন'-কাব্যে দেখা যায়, লোকমুখে পিতৃযজ্ঞের খবর পেয়ে পার্বতী, শিবের বিনা অনুমতিতেই পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে, তাঁর যাত্রার সময়ের নানান অশুভ লক্ষণ দেখে চিন্তিত শিব বলেন—

'তোমায় আমায় দেখা নাহ্ণি পুনর্ব্বার।
পূর্ব্ব দিকে যাত্রা কৈলে অদ্য শনিবার।

১. Travels in Mogul Empire.

জ্যৈষ্ঠতে পঞ্চম তারা হয়ত তোমার ॥
কৃষ্ণা নবমী তিথি এই তিন দোষ।
বাপ ঘরে গিয়া সতি না পাবে সন্তোষ ॥
ব্যাতীপাত যোগ আর গ্রহমুখ দিবা।
এ যাত্রায় গেলে নাহি ফিরিয়া আসিবা ॥'[১]

এসব ক্ষেত্রে মনে করা হতো দেবতা বিমুখ বলেই যাত্রার সময় বিবিধ অমঙ্গল নির্দেশ করে। এই শুভাশুভ কাল অবশ্যই দেখা হতো যুদ্ধে যাত্রার কালেও। সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে দেখি কালু ডোমের পুত্র সাঁখা ডোম যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে,

'অমঙ্গল দেখে ডোম চিল উড়ে মাথে।
জোগানী মাগএ ভিক্ষা থাল কর্যা হাথে ॥
গিধি কাক ছোব মারে আগুলিয়া গেল।
সাঁখা বীর জয় কালী মনে স্মঙরিল ॥'[২]

শুধু তাই নয়। সাখা ডোমের ইষ্টদেবীও ভক্তের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হয়ে আকাশবাণী করেন।

'আজি রনে না জায়া ফিরিয়া জাহ ঘর
পরান হারাবে সাঁখা কুছিত বাসর ॥
পৌর্ণমাসি পাপ তিথি ভাল নয় দিন।
পূর্ব্ব মুখ গমনে পরের হয় জিন ॥'[৩]

কিন্তু সাঁখা ডোমের ভাবতব্য ছিল যুদ্ধে প্রাণনাশ। তাই সে চতুর্দিকে সমস্ত অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করা সত্ত্বেও, সমূহ বিপদের দিনে কোনো রকম হাচি-টিকটিকির বাধা না মেনেই রণে যাত্রা করে।

'গগন উপরে স্বনে অকস্মাৎ বাণী।
সাঁখা বলে বিপতো বাধক নাঞী মানী ॥'[৪]

এই একই ঘটনা ঘটে পাত্র মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার সময় রানী কালঙ্গার

'ঘোড়া দেখি কলিঙ্গা সমরে যাত্রা করে।
স্বকিনী গৌধিনী উড়ে মাথার উপরে ॥
ডান আঁখি চঞ্চল করে উচাটন মন।'[৫]

---

১ রা. শি পৃ. ৫২।
২. ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুঁথি। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যের জাগরণ পালা। প. সং. ২৩৭
৩ ঐ. ঐ ঐ.
৪ ঐ ঐ ঐ.।
৫ ঐ ঐ. প. সং ৩৯৪

বলাবাহুল্য সেই রণে প্রাণ হারান কলিঙ্গা রানী।

'মনসামঙ্গল'-কাব্যে বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ সুখের হয় নি। এবং তাঁদের সেই দুঃখের ঘনঘটাকে কেন্দ্র করেই উক্ত কাব্যের কাহিনী বিস্তার। তাই বরবেশে লখিন্দর যখন যাত্রা করে, তখন—

'হাঁচি জেঠী পরে জবে যাত্রা করে রায়।
সনকা রমণী কর হানয়ে মাথায়॥'[১]

অন্যদিকে বিবাহের পরে পিতৃগৃহ ছেড়ে বেহুলার শ্বশুরালয়ে যাবার সময়েও দেখা যায়,

'জনক জননী কান্দে বর লখিন্দর।
গ্রেহের গোধিকা ডাকে শিরের উপর॥'
দৈবের কারণে তাহা কেহ নাহি জানে।'[২]

বেহুলা-লখিন্দরের এ যাত্রা যে শুভ যাত্রা হবে না, কবি যেন এই ছত্র কটির মধ্য দিয়ে পূর্বাহ্নেই তার ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। এর থেকে যাত্রাক্ষণের শুভাশুভ সম্পর্কে তৎকালীন সামাজিক সংস্কার যে কতো গভীর ছিল, তা উপলব্ধি করা যায় সহজেই। সেকালে তাই যাত্রার প্রাক্কালে চতুর্দিকের শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি মানুষের ছিল সজাগ দৃষ্টি। সেই কারণেই প্রতি পদক্ষেপের এতো সতর্কতা সত্ত্বেও দৈবের সংকেত বার্তা না পেয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষ বিস্মিত হয়ে বিলাপ করতে বসে।

'কি খেনে কাননে আজি করিলে গমণে।
হাছি জিঠি বাধা তাহে না পড়িব কেনে॥'[৩]

কারণ সেকালের মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, এই হাঁচি-টিকটিকির মধ্য দিয়ে ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায় সমুদ্র মন্থনের বিষ পান করে শিবের প্রাণস্পন্দন বন্ধ হলে, দেবী ভবানী সে বার্তা পাবার আগেই চারিদিকে নানান অমঙ্গল চিহ্ন দেখতে পান।

'মন্থনে মোহিত যদি হৈলা পশুপতি।
কৈলাসেতে অকুশল দেখে ভগবতী॥
ভবানী বলেন আমি দেখি অলক্ষণ॥
আঁখির পুতলী আজি নাচে ঘনে ঘন॥
সদাই মুখেতে হাই না জানি কি হয়।
কতক্ষণে প্রভু মোর আসে মৃত্যুঞ্জয়॥

১. ম. বি. পৃ. ১৪০।
২. ক্ষে. ম.। বি. ভা. পুঁ. সং ১৯০৬। প. সং ৮৭।
৩. যশোশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস'। বি. ভা. পুঁ. সং ১৯০৯। প. সং ১৫২ক।

মন্থনে রহিলা প্রভু না আইলা ঘরে।
আজি কেন রক্তবৃষ্টি পুরীর ভিতরে॥
অম্বর না রহে গায় মুখে উঠে হাই।
সিন্দুর মলিন হৈল দেখিয়া ডরাই॥
ছিণ্ডিল গলার হার নাচয়ে নয়ান।
শুনিঞা উলুক-ধ্বনি উড়িল পরাণ॥
অমঙ্গল দেখি মোর হীন হইল পয়।
নয়ন-পুথলী নাচে হাসি ভাল নয়॥
সিন্দুর মলিন হৈল না জানি কি হেতু।
কি জানি প্রমাদ পড়ে লয়্যা বৃষকেতু॥
এতেক ভাবিয়া দুর্গা বিষাদিত মন।
হেনকালে আইলা নারদ তপোধন॥
নারদ দেখিয়া দুর্গা ভয়ে পুছে বার্ত্তা।
কোথা প্রাণনাথ মোর ত্রিদশের কর্ত্তা॥
নারদ বলেন স্বামী কি কহিব আর।
কহিতে সঙ্কোচ বাসি সেই সমাচার॥
অখিল ঈশ্বর হর মথনে মোহিত।'[১]

অন্যদিকে সেকালের মানুষ নানা মঙ্গল চিহ্ন দর্শনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। কিন্তু তেমনি আবার একটি মাত্র অযাত্রাজ্ঞাপক বস্তু দর্শনে অনেক সুলক্ষণাক্রান্ত বস্তু দর্শনের ফলও নষ্ট হয়ে যায় বলে বিশ্বাস পোষণ করতো।

'স্বর্ণ গোধিকা দোষ চিত্তে বীর হৈল দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশনে।
দেখিনু মঙ্গল যত সকলি হইল হত
দৈব দুঃখ বিধির লিখনে॥'[২]

সেকালের সেই সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের জীবনে অপুত্রক স্ত্রী-পুরুষ দর্শনেও দিন নষ্ট হতো বলে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

'অপুত্রক জনে যদি বিহানে দেখিব।
দিবসের যত ধর্ম সব বৃথা হব॥
প্রভাতে দেখিব যদি অপুত্রকের মুখ।
দিন ব্যর্থ জায় ভোজনে নাহি সুখ।

১ ক্ষে. ম. পৃ. ৬২-৬৩।
২ ক. ক. চ. পৃ. ২১৮।

বিটি আটকুড়া হইলে জল নাহি খাই।
বেটা আটকুড়া হইলে মুখ নাহি চাই।'[১]

শুধু তাই নয়। সন্তানহীনা রমণীর হাত থেকে ভিখারীরা ভিক্ষা পর্যন্ত নিতো না, পাছে দিন খারাপ যায়। কোনো শুভ কাজে এদের ডাক পড়তো না। অপুত্রক পুরুষের মুখদর্শনে যে পাপ জন্মাতো, তার থেকে মুক্তি পেতে ব্রাহ্মণকে একশত ধেনু দান করবার উল্লেখ রয়েছে সতেরো শতকের কবি ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে। গৌড়েশ্বরের দরবারে অপুত্রক রাজা কর্নসেনের আগমন হলে, পাত্র মহামদ গৌড়েশ্বরকে বলে,

'একশত ধেনু যদি দ্বিজে কর দান।
তবে সে তোমার পাপ হইবে নির্ব্বান।'[২]

অন্যদিকে অপুত্রক পুরুষের মুখদর্শনে গৌড়েশ্বরের পাপ ঘটানোর জন্য কর্নসেনকেও তিরস্কার করে মহামদ।

'অপুত্রক হইঞা বস্য রাজার আসনে।
তোমার হইল কেনে এতেক সাহস॥
কোন্ ধন দিয়া তুমি নৃপে কৈসে বস।
মরণ অধিক হইল মস্তক মুণ্ডন॥'[৩]

সেকালে এইসব নানা শুভ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়াও, গৃহনির্মাণে ও গৃহ প্রবেশে, স্নানে, বিশেষ করে পার্বণিক স্নানে, নববস্ত্র পরিধানে কিম্বা পরিহার কালে, মাস-দিন-ক্ষণ-গ্রহ-নক্ষত্র-রাশি নির্ভর শুভাশুভ জানতে ও মানতে হতো। যদিও এখনও হয় না, এমন কথা বলা যায় না। আবার ভূত-প্রেতকে এড়াবার জন্যে বিচিত্র ও বিবিধ ব্যবস্থা, তাতে অমানবিক নির্যাতনমূলক অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন হতো। তাবিজ-কবজ, সোনা-রূপো-লোহা ইত্যাদি ধাতু ধারণ, শান্তি স্বস্ত্যয়ণ, পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আচরণ ছিল অপদেবতা-ভীত বাঙালির নির্ভর ও ভরসা। এগুলি যে নিরাপত্তাকামী আদি মানব গোষ্ঠীর ভয়, বিস্ময় এবং কল্পনা প্রসূত যাদুবিশ্বাস ও আচারের ক্রম-উৎকর্ষ প্রাপ্ত সংস্কার ও রূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনই রূপান্তরে আদিম বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার, দুনিয়ার সভ্যতম সমাজেও জগদ্দল পাথর হয়ে আজও টিকে রয়েছে।

সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রাসঙ্গিকভাবে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব, কিংবা অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি ও তা এড়ানোর নানা উপায় বর্ণিত হয়েছে।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ থেকে রাত্রে শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত সমস্ত কাজে, সব সময়েই মানুষ

১. ধ. ম.। বি. ভা. পু. সং ৪০৮। প. সং ৪৯ক।
২. ঐ. ঐ প. সং ৩৯খ।
৩. ঐ. ঐ. প. সং ৪০ক।

হাঁচি টিকটিকির নানান নির্দেশ মেনে চলতো। এবং এই সব রীতি নীতির অনুসরণ করা যে তাদের পক্ষে পরম কল্যাণকর, একথা মন থেকে বিশ্বাস করতো।

'উত্তর শিয়রে নিদ্রা জেই জন যায়।
ছমাসের পরমাই দণ্ডকে হারায়॥
দক্ষিণ শিয়রে নিদ্রা যায় ভাগ্যবান।
অভাগিয়া পশ্চিম শিয়রে নিদ্রা যান॥
পূর্ব্ব শিয়রে বলে প্রসন্ন জামিনি।
ফলোদয় অনেক পণ্ডিত মুখে শুনি॥'[১]

আমাদের আলোচ্য শতকে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের ওপরও মানুষের বিশ্বাস ছিল অটল। মানুষ শত দুঃখ কষ্টেও দৈবের ওপর আস্থা হারাতো না। মনে করতো সবই তার পূর্বজন্মের কর্মফল এবং সেক্ষেত্রেও মানুষ পরোক্ষভাবে আরও বেশি দৈব নির্ভর হয়ে পড়তো।

'কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুঃখ সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক॥
কান্ধে করি বহে কেহ, কেহ চাপে কান্ধে।
যত কিছু শুভাশুভ সব কর্ম্ম ফান্দে॥'[২]

হত-দরিদ্র মানুষ যেমন মনে করতো,

'বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা॥'[৩]

তেমনি সন্তান কামনা থেকে শুরু করে রোগমুক্তির ক্ষেত্রে পর্যন্ত মানুষ দেবানুগ্রহ, বিপ্রপাদোদক, মানতপূজা, ইত্যাদির মধ্যেই ঘুরে ফিরে মাথা কুটতো। কারণ সেদিনের মানুষ অন্তর থেকে বিশ্বাস করতো—

'কেবা কারে মারে আর কেবা কারে রাখে।
রাখে মারে নারায়ণ না দেখহ চক্ষে॥'

---

১. ক্ষ.ধ.। বি.ভা.পুঁ সং ৮৩৮। প.সং ১৯ক।
২. ম.ম. পৃ. ৮৩॥
৩. ক.ক.চ. পৃ. ২৫

সাহিত্য

পদাবলী-সাহিত্য

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ;
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল
আকুল করিল মন প্রাণ ।"

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক প্রণয়রস সিক্ত কবিতা বাংলা সাহিত্যে 'পদাবলী' নামে পরিচিত। এই পদাবলী সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলায় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচিত হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে, কবিরা তাঁদের অন্তর্নিহিত কাব্য প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পদ রচনা করেছেন। এঁদের পদের সংখ্যাও বেশি নয়। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণব পদাবলীকে নতুন রূপ ও প্রেরণা দান করলো। চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তাদের প্রায় সকলেই সাধক ছিলেন। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তের সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল রাধাকৃষ্ণ লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন। এই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে যাঁরা কবি ছিলেন, তাঁরা কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে অসংখ্য গান ও পদ রচনা করতে লাগলেন। এইভাবে বৈষ্ণব পদের ওপরে ভক্তের সাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়াতে, পদগুলির মধ্যে ভক্তি-প্রেমের অপূর্ব সুন্দর রূপায়ন তাকে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য দান করলো। এই জন্যই বাংলার চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্য বিশালতায় ও উৎকৃষ্টতায় অনন্যসাধারণ রূপ লাভ করেছিল।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পদাবলী সাহিত্যে বৈচিত্র্য অপরিসীম। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরসকে অবলম্বন করে, বাংলায় পদাবলী রচিত হলেও, মধুর রসের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদই সংখ্যায় বেশী। মধুর রসের পদগুলি, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। সম্ভোগ পর্যায়ের পদগুলিতে অভিসার, মিলন, মান ইত্যাদি ও বিপ্রলম্ভ পর্যায়ের পদগুলিতে পূর্বরাগ, বিরহ, মাথুর ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রথম থেকেই বাংলায় দুটি বিশিষ্ট ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে। শুদ্ধ বাংলা ও ব্রজবুলি বা মিশ্র বাংলা। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর ভাষা ব্রজেরই বুলি অর্থাৎ ভাষা, এই অনুমান থেকে ব্রজবুলি নামের উদ্ভব। তবে, উনিশ শতকের আগে এই নামের উদ্ভব হয় নি। কোনো কোনো পণ্ডিত[১] মনে করেন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ উদ্ভূত হবার পরেও, কেবলমাত্র সাহিত্য সৃষ্টির

১. বা. সা. ইং. পৃ. ১৬১।

মাধ্যম হিসাবে যে অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষার প্রচলন ছিল, সেই ভাষাই ক্রমবিবর্তনের ফলে 'অবহট্ট' ভাষায় এবং অবহট্ট ভাষা আবার ক্রমবিবর্তনের ফলে 'ব্রজবুলি' ভাষায় পরিণত হয়েছে।

। কবিশেখর।

সতেরো শতকের রাঢ়ের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবিশেখরের নাম। এই নামে সম্ভবতঃ দুজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন।[১] প্রথম জন হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের অধীনে চাকুরী করতেন। ঐ সুলতানদের নাম উল্লেখ করে তিনি কয়েকটি পদ লিখেছিলেন।[২] পদ-রচনায় এঁর উৎকর্ষের জন্যে এঁকে ছোটো বিদ্যাপতি বলা হয়। এঁর প্রকৃত নাম কবিরঞ্জন বা রঞ্জন। দ্বিতীয় কবিশেখরের প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতার নাম হীরাবতী। ইনি ষোড়শ শতকে জন্মগ্রহণ করলেও সতেরো শতকের প্রথম পাদেও জীবিত ছিলেন। কবিশেখর ব্যতীত 'রায়শেখর', 'শেখর' ভণিতাতেও ইনি পদ রচনা করেছেন। 'গোপালের কীর্তন অমৃত' ও 'গোপীনাথ-বিজয়-নাটক' (সংস্কৃত) নামে গ্রন্থ দুখানি এঁর রচনা।[৩] এই গ্রন্থ দুটি পাওয়া যায় না। এছাড়া, 'গোপাল-বিজয়' নামে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একটি বৃহৎ আখ্যানকাব্য কবিশেখর রচনা করেছেন।

কবিশেখর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলা বর্ণনা করে 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' নামে একটি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। কবিশেখর নামাঙ্কিত পদগুলি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই রচিত। এই পদগুলি সৌন্দর্যের দিক্ দিয়ে বিদ্যাপতির পদগুলির কাছাকাছি যায়। এদের মধ্যে বর্ষার রাত্রিতে শ্রীরাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণনার পদগুলি সবচেয়ে উচ্চাঙ্গের পদ। এই জাতীয় একটি পদ নীচে উদ্ধৃত হলো—

'গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ-পাতন- শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নি- তান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।

১. কবিরঞ্জনের ভণিতায় হোসেনশাহী বংশের সুলতানদের নামোল্লেখ থাকায় তিনি যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত 'গোপাল-বিজয়' এর রচয়িতা কবিশেখর থেকে ভিন্ন ব্যক্তি, তা মনে করলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম। 'গোপাল-বিজয়'—আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর সময় নিয়ে আলোচনা করবো।

২. বা. দে. ই. ২য়, পৃ. ৮০।

৩ বা. সা. ই. পৃ. ২১৪।

শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জিবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর- বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥[১]

কবিশেখর-নামাঙ্কিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদকে ভুল করে বিদ্যাপতির রচনা বলে মনে করা হয়। বিদ্যাপতির নামে অধুনা-বিখ্যাত 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর'—এই উৎকৃষ্ট পদটি সমস্ত প্রাচীনসূত্রে 'শেখর' ভণিতায় পাওয়া যায়।[২] সুতরাং এটি 'গোপাল-বিজয়'-রচয়িতা কবিশেখরের রচনা।

। গোবিন্দদাস কবিরাজ ।

চৈতন্য পরবর্তী কালের রাঢ়ের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। এঁদের মধ্যে জ্ঞানদাস সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষার্ধে পরলোক গমন করেন। অপরজন গোবিন্দদাস কবিরাজ সতেরো শতকের প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা চিরঞ্জীব, হোসেন শাহের 'অধিপাত্র' ও শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। মাতার নাম সুনন্দা। গোবিন্দদাসের জ্যেষ্ঠ ভাই ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এঁরা দুই ভাই মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। পরে, পৈতৃক নিবাস 'কুমারনগরে' এবং আরও পরে 'তেলিয়া বুধুরী' গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন। গোবিন্দদাসের স্ত্রীর নাম মহামায়া, একমাত্র পুত্র দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ। ইনি সতেরো শতকের একজন বিশিষ্ট পদকর্তা। মাতামহের প্রভাবে গোবিন্দদাস প্রথমে শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন; পরে পরিণত বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন। তবে, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বেও তিনি পদ রচনা করতেন বলে জানা যায়।[৩]

---

১. পদকল্পতরু—১৮৪।
২. 'পদরত্নাকর'-এ এটি শেখরের ভণিতায় রয়েছে। পদরত্নাকর ৪০।৮১।
৩ বা. সা. ই. পৃ. ৩২৫।

গোবিন্দদাস কবিরাজ শুধু নিজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, এমন নয়। তাঁর পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণও কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় ভক্তিভাবের জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। গোবিন্দদাসের সমসাময়িক কবি শ্রীবল্লভের রচিত একটি পদ থেকে জানা যায়, গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের আদেশে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনেক অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করেন, এবং তিনি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত ছিলেন।[১]

গোবিন্দদাস কবিরাজের অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে লেখা। এই পদগুলির কাব্য-মাধুর্য অতুলনীয়। গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যাতে তাঁর পদ সহজেই অন্য কবির পদ থেকে পৃথক করে নেওয়া যায়। গোবিন্দদাসের বিশুদ্ধ ব্রজবুলির পদে তদ্ভব অপেক্ষা তৎসম, অর্ধতৎসম শব্দই বেশি। ছন্দের বৈচিত্র্যে, অনুপ্রাস ও উপমা রূপকের ব্যবহারে, ছন্দঝঙ্কারে এবং পদলালিত্যে গোবিন্দদাসের পদগুলি পুরোণো বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই দিক দিয়ে ইনি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনীয়। পূর্বরাগ ও অনুরাগের বর্ণনায় গোবিন্দদাস প্রেমের সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই শ্রেণীর একটি পদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো—

'পিরিতিকি রীত কোন অবগাহই
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস-সাধসে ধস ধস অন্তর
পাঁজর জর জর হোই॥
সজনি তোহে কহি কানু নেহা।
যত যত নীত চীতে নবু উঠয়ে
ভাবিতে আকুল দেহা॥'[২]

তবে, অভিসার-বিষয়ক পদে, বিশেষ করে তাঁর বর্ষাভিসারের পদগুলিতে কবির সর্বাধিক দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা তাঁর বর্ষা-ভিসারের একটি পদ উদ্ধৃত করছি,—

'মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনি পার॥

১. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ। ভূ. পৃ. 'এক টাকা এগারো আনা।
২. পদকল্পতরু—৯৪০।

ঘন-ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বান কিয়ে যতনে নিবার॥'[১]

এছাড়া, গোবিন্দদাসের বর্ষা অভিসারের অন্য একটি বিখ্যাত পদ—'কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি'—ইত্যাদি পদগুলিতে শব্দ-ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে বর্ষার ছন্দ যেন আশ্চর্যভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। অভিসারের পদে বহু নতুন নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করার মধ্যে দিয়েও গোবিন্দদাসের উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি গৌরচন্দ্রিকা পদেরও শ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দদাসের পদের ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ, অলঙ্কার ছাড়াও বাণী সৌষ্ঠব ও আঙ্গিক পারিপাট্যের দিক্ দিয়েও তাঁর পদগুলি তুলনা রহিত। তবে, গোবিন্দদাসের পদের বাহিরঙ্গের সৌন্দর্য যতোখানি, ভাবের গভীরতা সেই পরিমাণে লক্ষ করা যায় না।

। নরোত্তমদাস।

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক অপর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোত্তমদাস। ইনি সম্ভবতঃ সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদের গোড়ার দিকে পরলোক গমন করেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বর্তমান 'খেতরী' গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। নরোত্তমের জীবনের একটা বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হয়েছিল বৃন্দাবনে। উত্তরবঙ্গের সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান নরোত্তমদাসের পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ ও মাতা নারায়ণী। ইনি যৌবনে বৃন্দাবনে গিয়ে লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জীবগোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে রাঢ় বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। নরোত্তমদাস বৈষ্ণব ধর্মমত ও কীর্তন গানে প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। প্রার্থনা-বিষয়ক পদে নরোত্তমদাস সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নরোত্তমদাসের একটি বিখ্যাত প্রার্থনার পদ নীচে উদ্ধৃত হলো—

'তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥

১. পদকল্পতরু—১৮৭।

এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণী ॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥
মালতী-ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তমদাস কহে পিরিতির ফান্দ ॥'[১]

এই পদগুলির মধ্যে ভক্ত হৃদয়ের আকুতি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বাঙালির একান্ত ঘরোয়া ভাষায় রচিত বলে নরোত্তমদাসের পদগুলির অনাড়ম্বর সৌন্দর্য এবং ভাবের আন্তরিকতা আমাদের মনোহরণ করে। নরোত্তমদাস কয়েকটি ছোটো ছোটো সাধন নিবন্ধও রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' বিখ্যাত। এছাড়া, 'সাধনভক্তিচন্দ্রিকা', 'সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা', 'রসভক্তিচন্দ্রিকা', 'চমৎকারচন্দ্রিকা', 'উপাসনা পটল', 'গুরুশিষ্যসংবাদ পটল', 'হাটপত্তন', 'দেহকড়চ', 'রাগমালা', 'আশ্রয় নির্ণয়', ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

। রামগোপালদাস।

সতেরো শতকের পদকর্তাদের মধ্যে রামগোপালদাস বা গোপালদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি জাতিতে বৈদ্য, নিবাস শ্রীখণ্ড। পিতার নাম শ্যাম রায়, পুত্র পীতাম্বরদাস। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন যখন পুরীতে ছিলেন, তখন তাঁর অন্যতম অনুচর চক্রপাণি ছিলেন গোপালদাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। গোপালদাসের মাতামহ মধুসূদন, পুরীর রথযাত্রা উৎসবে নৃত্যগীত করতেন। কবির গুরু রতিপতি ঠাকুর ছিলেন রঘুনন্দনের বংশধর।[২] গোপালদাস 'রাধারসকল্পবল্লী'[৩] বা সংক্ষেপে 'রসকল্পবল্লী' নামে একটি বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদের 'শাখানির্ণয়' অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরা বর্ণনা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এঁর অপর রচনা 'চৈতন্যতত্ত্বসার'। 'রসকল্পবল্লী'র রচনাকাল বাণ-অঙ্ক-শর-ব্রহ্ম অর্থাৎ ১৫৯৫ শকাব্দ বা ১৬৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে ইনি নিজের ও পরিবারের অনেকখানি পরিচয় দিয়ে গেছেন।

রামগোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী' মূলতঃ রূপগোস্বামী-অনুসারী বৈষ্ণব অলংকার শাস্ত্রের বর্ণনা। আলোচ্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈষ্ণব দর্শন অনুসারী নায়ক-নায়িকার প্রেমের বিভিন্ন লক্ষণ বা বৈচিত্র্য বর্ণনা করা। 'রসকল্পবল্লী'-গ্রন্থে অনেক প্রসিদ্ধ কবির পদ সংকলিত হয়েছে এবং সংকলয়িতা যে সব পদের রচয়িতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে

১. পদকল্পতরু — ১৬৫৯।
২. History of Brajabuli Literature, P. 244.
৩. বি ভা. পু সং ২৯৬।

পারেন নি, সেই সব পদ 'মহাজন পদ' বলে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১] খুব অল্প গ্রন্থেই একসঙ্গে এতো জন কবির পদ পাওয়া যায়। রামগোপালদাসের পদগুলি চিহ্নিত করতেও আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। এখানে কবি তাঁর নিজের ছয়টি ব্রজবুলি পদ উদ্ধৃত করেছেন। এর মধ্যে দুটি পদ 'পদকল্পতরু'-গ্রন্থে (১০৫২ ও ১০৭৬ সংখ্যক পদ) গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, 'পদকল্পতরু'র সংকলয়িতার দাবী এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হতে পারে না।

রামগোপালদাসের পদগুলি ভাষার সারল্য ও ভাবের গভীরতার দিক দিয়ে চণ্ডীদাসের পদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এঁর কোনো কোনো পদ চণ্ডীদাসের নামেই চলে আসছে। যেমন, "থির বিজরি বর নগরী" পদটি। গোপালদাস ব্রজবুলি পদের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। তাঁর নিম্নোদ্ধৃত পদটি থেকেই একথা বোঝা যাবে—

'কি কহব রাইক হরি অনুরাগ।
নিরবধি মনহি মনোভাব জাগ॥
সহজে রুচির তনু সাজি কত ভাতি।
অভিসরু শারদ পূর্ণমিক রাতি॥
ধবল বসন তনু চন্দন পূর।
অরুণ অধরে ধরু বিশদ কপূর॥
কবরী উপরে করু কুন্দ বিথার।
কণ্ঠে বিলম্বিত মোহিমহার॥
কৈরবে ঝাঁপল করতল কাতি।
মলয়জ চন্দন বলয়ক পাঁতি॥
চাঁদ-কি কৌমুদী তনু নহ চিহ্ন।
যৈছন ক্ষীর নীর নহ ভিন্ন॥
ছায়া বৈরী না ছাড়ল বাদ।
চরণে শরণ করু যামিনী-আধ॥
গোপালদাস কহ সুচতুর গোরী।
নূপুরক রতন তুলে মুখ পূরি॥'[২]

পিতাম্বরদাস।

পিতাম্বরদাস পিতা রামগোপালদাসের রচিত নিবন্ধ 'অষ্টরস' অবলম্বনে বাংলায় 'অষ্টরসব্যাখ্যা' রচনা করেন। এঁর অপর রচনা রামগোপালদাসের রসকল্পবল্লী' (অষ্টম কোরক) অবলম্বনে রচিত 'রসমঞ্জরী'। গোপালদাসের 'রসকল্প-

১. History of Brajabuli Literature, P. 8.
২. Ibid, P. 245-46

বল্লী'র মতো পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্যাখ্যা'য়ও অনেক পদ উদ্ধৃত হয়েছে। 'পদরত্ন-সংগ্রহ' নামে এঁর একখানি সংকলন গ্রন্থও রয়েছে।[১]

পীতাম্বরদাসের গুরু ছিলেন শ্রীখণ্ডের শচীনন্দন ঠাকুর। পীতাম্বরদাস তাঁর 'রসমঞ্জরী'তে অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তাঁর পিতা রামগোপালদাসের আঠারোটি বাংলা ও ব্রজবুলি পদ এবং নিজের একটিমাত্র ব্রজবুলি পদ সংকলিত করেছেন।[২] এই একটিমাত্র পদকেই নির্দ্বিধায় পীতাম্বরদাসের পদ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এটি 'রাধাবিরহে'র পদ। আলোচ্য পদটি নীচে উদ্ধৃত হলো—

'ছটপট কুসুম শয়নে।
হরি হরি করএ স্মরণে ॥
কাহে করু আভরণ বেশ।
দরশন ভেল সন্দেশ ॥
বিহি মোরে দুরমতি দেল।
মনমথ হানল শেল ॥
লোরে লোচন মন পূরে।
পীতাম্বর দাস রহু দূরে।'[৩]

। ঘনশ্যাম কবিরাজ ।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ বা ঘনশ্যামদাস আমাদের আলোচ্য সময়ের ব্রজবুলি পদের একজন বিশিষ্ট কবি। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য ছিলেন।[৪] ঘনশ্যাম 'গোবিন্দরতি-মঞ্জরী' নামে সংস্কৃতে একটি বৈষ্ণব রসালঙ্কার বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর স্বরচিত ছেচল্লিশটি পদ উদ্ধৃত আছে। সংস্কৃত শ্লোক ও ব্রজবুলি পদ উভয় বিষয় রচনাতেই ঘনশ্যাম নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ঘনশ্যামের রচিত ব্রজবুলি পদগুলিতে পূর্ববর্তী পদকর্তাদের অনুসরণ কোথাও কোথাও খুব স্পষ্ট। যেমন ঘনশ্যাম রচিত—

'ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝুমকল,
ঝিঁ ঝিঁ ঝনকত ঝাঁপিয়া।'

এই পদটিতে কবিশেখরের 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর'—এই প্রসিদ্ধ পদটির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। ঘনশ্যাম কবিরাজের পদ পরবর্তী পদকর্তা নরহরি চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কারণ, নরহরিও অনেক পদের ভণিতায় 'ঘনশ্যামদাস' লিখেছেন। এঁদের দুজনের পদকে পৃথক করার একটি উপায় রয়েছে। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র সংকলয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ ছিলেন নরহরি চক্রবর্তীর পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তীর গুরু।

১. বি. ভা. পু সং ৩২৮৯। পত্র সংখ্যা ২৪২। অখণ্ডিত।
২. History of Brajabuli Literature, P. 247.
৩. Ibid, P. 248.
৪. বা. সা. ই. পৃ. ৪৩৯।

সুতরাং, উক্ত গ্রন্থের ঘনশ্যাম ভণিতায় রচিত পদগুলি নিঃসন্দেহে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত পদ বলে গ্রহণ করা যায়। এই একই ভাবে 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র কবি ঘনশ্যামকে ঘনশ্যাম কবিরাজ বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ, আলোচ্য গ্রন্থের একটি পদ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'-তে সংকলিত হয়েছে (সং ৪৬)।[১] ঘনশ্যাম কবিরাজের একটি ব্রজবুলি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

'পেখলুঁ গোকুল- বসতি বেয়াকুল
গোপরমণীগণ রোই।
ভীগল বসন লাগি রহল তণু
তোঁহারি গমনপথ জোই॥
হরি হে, দূর নগরে মঝু গেহ।
যব তুহুঁ আওলি সব্বহি গোপ সব
তব হাম গোকুল থেহ॥
তহিঁ এক রমণী থোরি বয়স ধনী
চিত্র পুত্তলি সম ঠারি।
যব লোচনপথ- দূরহি গেল রথ
তবহিঁ পড়ল তনু ঢারি॥
ঘেরল সকল সখীগণ চৌদিশে
রোয়ত সখী অগেয়ান।
কহে ঘনশ্যাম তবহিঁ চলি আওলুঁ
পুণ কিয়ে ভেল নাহি জান॥'[২]

রাঢ়ের আরও কয়েকজন পদকর্তার নাম উল্লেখযোগ্য, যাঁরা সতেরো শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন ও আঠারো শতকে পরলোক গমন করেন। এঁরা হলেন, নরহরি চক্রবর্তী, জগদানন্দ, মনোহরদাস ও যদুনন্দনদাস।

। নরহরি চক্রবর্তী ।

নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর ঘনশ্যাম। ইনি বৈষ্ণব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর'-এর রচয়িতা। নরহরি চক্রবর্তীর পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য।[৩] 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তীর স্বরচিত এবং অন্য কবিদের লেখা অনেক পদ উদ্ধৃত হয়েছে। 'ভক্তিরত্নাকর' পনেরটি তরঙ্গ অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। নরহরি চক্রবর্তীর ঐতিহাসিক চেতনা ও তথ্য-প্রমাণ নিষ্ঠা সে যুগের পক্ষে

১. History of Brajabuli Literature, P. 215

২. পদকল্পতরু ১৬৩৩ সংখ্যক পদ। আলোচ্য পদটি ঘনশ্যামদাসের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'-গ্রন্থে এবং পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী'-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৩. বা. সা. ই. পৃ. ৬৬৬।

বিস্ময়কর। যখনই তিনি কোনো কথা বলেছেন, প্রায় ক্ষেত্রেই তার স্বপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তিনি জীবগোস্বামী ও বীরভদ্র গোস্বামীর কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। আধুনিক-পূর্ব যুগে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর মেলে না বললেই হয়। এছাড়া, 'ভক্তিরত্নাকরে' অধুনালুপ্ত বহু মূল্যবান্ গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব মহান্তদের কাযকলাপ, তৎকালীন নবদ্বীপ-সহরের বর্ণনা ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থে এমন অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে, অন্য কোনো সূত্রে যা পাওয়া যায় না। এই দিক্ দিয়ে 'ভক্তিরত্নাকর'কে বাংলার বৈষ্ণব-সমাজের বিশ্বকোষ বলা যায়। এছাড়া, আলোচ্য গ্রন্থে সাতাশ জন বিশিষ্ট পদকর্তার তিনশো চোদ্দটি পদ সংকলিত হয়েছে।[১] 'ভক্তিরত্নাকর' সতেরো শতকের শেষ দিকে অথবা আঠারো শতকের প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। নরহরি চক্রবর্তীর অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'নরোত্তম-বিলাস'। এতে নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি বারোটি 'বিলাস' অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এছাড়া, 'শ্রীনিবাস-চরিত্র' নামে অপর একখানি জীবনীগ্রন্থও নরহরি চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন। তবে, এই বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। ইনি 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে একটি বৃহৎ পদসংকলনেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।[২] নরহরি চক্রবর্তী 'নরহরিদাস' বা 'নরহরি' এই উভয় ভণিতাতেই পদ রচনা করেছেন। এই নামে অন্য একজন কবির পদও রচিত হয়েছে। তিনি নরহরি সরকার বা নরহরি ঠাকুর। এঁদের দুজনের পদ এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে পৃথক করা কঠিন। তবে এর একটি প্রধান উপায় হলো—নরহরি সরকারের পদের বিষয়বস্তু হলো 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তার জীবনী'। পদগুলি অধিকাংশই বাংলায় রচিত, ভাষা সহজ সরল এবং এতে তৎসম শব্দের বাহুল্য নেই। অন্যদিকে, নরহরি চক্রবর্তীর পদ বেশীর ভাগই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। এঁর রচিত পদের ভাষা তৎসম-বহুল কৃত্রিম এবং শব্দাড়ম্বরের বাহুল্যে জটিল। এই জন্যই নরহরি চক্রবর্তীর পদে কবিত্বের ভাব-গভীরতা অপেক্ষা ভাষা ও ছন্দ চাতুর্যের প্রাধান্যই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। নরহরি চক্রবর্তী আবার 'ঘনশ্যামদাস' ভণিতায়ও কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পদকর্তা ঘনশ্যাম কবিরাজের সঙ্গেও তাঁর পদ যে কিছু পরিমাণে মিশে গিয়েছে, একথা ঘনশ্যাম কবিরাজের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

নরহরি চক্রবর্তী অনেক পদ রচনা করেছেন। 'গৌরচরিত্র চিন্তামণি' নামে এঁর একটি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর সংকলন রয়েছে।

নরহরি চক্রবর্তীর একটি ব্রজবুলিপদ নীচে উদ্ধৃত হলো—

'দেবরমণী- বৃন্দ বিরচি
বেশ বিবিধ ভাঁতি।

১ History of Brajabuli Literature, P. 278.

২. বা. সা. ই. পৃ. ৬৫৭।

রাজত থল- মাহি অতুল
ঝলকে কনক কাঁতি ॥
ভ্রমত গগন- পথ অগণন
যুথ হিয়-উৎসাহ।
মানত দিঠি সফল নিরখি
গৌরবর-বিবাহ ॥
মিশ্র-ভবন রীত রুচির
উচরি পুলক গাত।
নব নব আভি- লাষ করই
ধৃতি ধরই ন যাত॥
নিরুপম পহু- প্রেয়সী ছবি
লোচন ভরি নেত।
নরহরি কত ভাখব সবে
প্রাণ নিছনি দেত॥'[১]

এছাড়া, নরহরি চক্রবর্তীর বাংলায় রচিত দু-একটি উৎকৃষ্ট পদও রয়েছে।

। জগদানন্দ ।

আলোচ্য সময়ের অপর পদকর্তা জগদানন্দ একজন অসাধারণ শব্দকুশলী কবি ছিলেন। ধ্বনি-ঝংকার ও শব্দ-বৈচিত্র্যে জগদানন্দ ছিলেন অদ্বিতীয়। এঁর লেখা একটি বিখ্যাত পদের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো—

'মঞ্জু বিকচ-কুসুম-পুঞ্জ
মধুপ-শবদ গুঞ্জ-গুঞ্জ
কুঞ্জরগতিগাঞ্জগমন মঞ্জুল কুলনারী
ঘনগঞ্জন চিকুর পুঞ্জ
মালতি-ফুল মালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জনগতি হারি ॥'

এই শব্দকৌশলেই জগদানন্দের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। শব্দের উপরে অসাধারণ দখল থাকায়, পদকর্তারা যাতে পদ রচনার সময় সহজে মিল খুঁজে পান, এই উদ্দেশ্যে জগদানন্দ 'ভাষা-শব্দার্ণব' নামে একখানি সমধন্যাত্মক শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

। মনোহরদাস ।

সতেরো শতকের পদকর্তা মনোহরদাসের পিতার নাম গোবিন্দানন্দ, ভাই নিত্যানন্দ। এঁর প্রপিতামহ বাণীনাথ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ

১. History of Brajabuli Literature. P. 282,
২. বা. সা. ই. পৃ. ৬৬৩।

রামানন্দ রায়ের ছোটো ভাই। মনোহরদাসের অল্পবয়সে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। প্রথম জীবনে ইনি কাটোয়ার কাছে 'বেগুনকোলা' গ্রামে গুরুগৃহে বাস করেন এবং পরে গুরুর আদেশে ব্রজবাস করেন। মনোহরদাসের গুরু রামশরণ চট্টরাজের পিতা ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

মনোহরদাসের রচিত পদের[১] সংখ্যা বেশী নয়। সহজ সরল ভাষার মধ্যে দিয়ে কবির ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ের পরিচয় এঁর রচিত পদগুলিতে সর্বত্রই মেলে। মনোহরদাস খণ্ডিতা, আক্ষেপানুরাগ ইত্যাদি বিষয়ে পদ রচনা করলেও এঁর রচিত 'সূচক'-শ্রেণীরও কিছু পদ পাওয়া যায়। রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদের প্রসঙ্গ এর 'সূচক' পদগুলি রচিত। এই শ্রেণীর একটি পদ নীচে উদ্ধৃত হলো—

'জয় সাধু-শিরমণি সনাতন রূপ।
যো দুহু প্রেম-ভকতি-রস-ভূপ॥
রাধাকৃষ্ণ-ভজনকে লাগি।
শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বৈরাগী॥
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
মীলল সকল ভকতগণ সাথ॥
সভে মেলি প্রেম ভকতি পরচারি।
যুগল-ভজন-ধন জগতে বিথারি॥
অনুখন গৌরচন্দ্র-গুণ গান।
ভোরল প্রেমে ওর নাহি পান॥
কহিহুঁ না হেরিয়ে ঐছে উদাস।
মনোহর সদত চরণে করু আশ।'[২]

। যদুনন্দনদাস।

সতেরো শতকের অনুবাদাশ্রয়ী কবিদের মধ্যে যদুনন্দনদাস অগ্রগণ্য। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য, জাতিতে বৈদ্য, কাটোয়ার কাছে মালিহাটি গ্রামে এঁর বাস ছিল।

যদুনন্দনদাসের রচিত অনেকগুলি অনুবাদগ্রন্থ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রূপ গোস্বামীর রচিত 'বিদগ্ধ মাধব'-এর অনুসরণে 'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব'[৩], বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-এর অনুবাদ 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'[৪], কৃষ্ণদাস কবিরাজের সংস্কৃত 'গোবিন্দলীলামৃত'-এর অনুসরণে 'গোবিন্দলীলামৃত'[৫] এবং 'প্রেমবিলাস' ধরনের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ

১. বি. ভা. পুঁ. সং ২৪০১, ২৯৮১, ৪৫৬৫ দ্রঃ।
২. পদকল্পতরু—২৩৬৭।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং ১২, ৩১৯, ৪০২, ৬৬৬, ৬৪৮ দ্রঃ।
৪. ঐ. সং ১৫৫, ১৬৩৬ ইত্যাদি।
৫. ঐ. সং ২৫৬, ১২২২, ১২২৩, ১৪৬১, ১৩৮১, ২৩৭৪ ইত্যাদি।

'কর্ণানন্দ' উল্লেখযোগ্য। 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীনিবাস আচার্যের কার্যকলাপ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অনুসরণে নব-বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৫২৯ শকাব্দের বৈশাখ মাসে বা ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।[১] আলোচ্য গ্রন্থে বীর হাম্বীরের দুটি ও শ্রীনিবাস আচার্যের চারটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-গ্রন্থে যদুনন্দনের নিজের রচিত পাঁচটি দীর্ঘ পদ রয়েছে।

যদুনন্দন কেবলমাত্র একজন অনুবাদক নন। ইনি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধি-ক্ষণের একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। যদুনন্দন কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর রচনা রীতির দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। যদুনন্দনের কোনো কোনো কবিতায় 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যদুনন্দনের ভাষা, রচনাশৈলী ও উচ্চাঙ্গের শব্দ নির্বাচন তাঁর রচিত পদকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই অবদান তুচ্ছ নয়। যদুনন্দন ব্রজবুলি পদের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি।

যদুনন্দনের রচিত বিভিন্ন বৈষ্ণব পদের মধ্যে 'পূর্বরাগ', 'মান' ইত্যাদি শ্রেণীর পদগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

'পরিজনসুধারসবাণী।
না শুনসি কাহে অগেয়ানী॥
বাঢ়ায়সি কাহে অতি রোষ।
না শুনসি হরি গুণ দোষ॥
বিছাই মানে দহ রাই।
কাহে তনু সুতাপসি তাই॥
তোহে লাগি সুতাপিত কান।
অতয়ে তেজহ তুহুঁ মান॥
হৃদয়ে করুণা উপজাই।
দিঠিকোণে নিরখি কানাঞি॥
অতি কাতর রসরাজ।
এ যদুনন্দন কহে আজ॥'[২]

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অন্য একজন যদুনন্দন রয়েছেন। ইনি যদুনন্দন চক্রবর্তী। ইনিও যদুনন্দন, যদুনাথ, যদু ইত্যাদি ভণিতায় পদ রচনা করেছেন। ফলে উভয়ের পদ মিশে গিয়েছে। তবে, যদুনন্দন চক্রবর্তী ছিলেন গদাধর দাসের শিষ্য। তাই যে সব পদে এঁর গুরুর নাম পাওয়া যাবে, সেগুলি নির্দ্বিধায় এই দ্বিতীয় যদুনন্দনের বলে গ্রহণ করা চলে।

বিশ্বভারতী পুঁথিভাণ্ডারে 'সংগ্রহতোষণী'র একটি পুঁথি আছে। পুঁথি সংখ্যা ৫৬৬৩।

১. History of Brajabuli Literature, P. 220.

২. পদটি 'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্বে' উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং এই পদটি আমাদের আলোচ্য যদুনন্দনের রচিত।

পত্র সংখ্যা ১-১৩৬। খণ্ডিত। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতার নামও যদুনন্দনদাস। নিবাস কাটোয়ায়। এই কবিও হেমলতা দেবীর শিষ্য। কিন্তু, এই যদুনন্দন জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতার নাম শিবপ্রসাদ, মায়ের নাম ব্রহ্মময়ী। কবির জন্ম পালিগ্রামে। এঁর মতে হেমলতাদেবী 'বেগুনকোলা' গ্রামে বাস করতেন। গ্রন্থ মধ্যে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে—

'শ্রীহেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম।
কাটোয়া নগরে বাস কহিলাম মর্ম্ম॥
পালিগ্রামে জন্ম হয় যদুনাথ নাম।
ভক্তির অযোগ্য হই সদা অভিমান॥
শিবু প্রসাদ পীতা মোর মাতা ব্রহ্মময়ী।
আচার্য্য পরিবার যদুনাথ কহী॥
সর্ত্তিথ জৈষ্ঠ হন রঘুনাথদাস।
তার আজ্ঞাসারে লিখি সংগ্রহ বিলাস॥'[১]

আচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বীরভূম বিবরণী'র তৃতীয় খণ্ডে আলোচ্য 'সংগ্রহতোষণী'র যদুনন্দন এবং 'বিদগ্ধমাধব' এবং 'গোবিন্দলীলামৃতে'র যদুনন্দনকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেছেন।[২] কিন্তু যদুনন্দনের অন্যান্য সুপরিচিত গ্রন্থে তিনি নিজেকে বৈদ্য বলেছেন—

'চৈতন্য দাসের দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস
আচার্য্যা শ্রীলহেমলতা।
তার পাদ পদ্ম আশ এ যদু নন্দনদাস
অম্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা॥'[৩]

অথবা—

'যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম তার।
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥'[৪]

বাসস্থানের বিষয়ে 'মালিহাটি' ও 'কাটোয়া'য় কোনো বিরোধ নেই। কারণ দুটো জায়গাই খুব কাছাকাছি। কাজেই একই লেখকের এক গ্রন্থে মালিহাটি অপর গ্রন্থে কাটোয়া থাকা খুব অস্বাভাবিক নয়। আবার জন্মস্থান সম্পর্কে অপরাপর সব গ্রন্থ নীরব থাকায় 'সংগ্রহতোষণী'তে উক্ত পালিগ্রামও গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

---

১. 'সংগ্রহতোষণী'। পত্র সং ১ক।
২. বীরভূম বিবরণী। ৩য় খণ্ড। পৃ ৩৮-৪১।
৩. গোবিন্দলীলামৃত, পৃ. ২৫৪।
৪. কর্ণানন্দ, পৃ. ২৮।

কিন্তু 'সংগ্রহতোষণী'তে বলা হয়েছে, যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্যের অনুরোধে গ্রন্থখানি রচনা করেন—

'হেন গ্রন্থ আচার্য্য প্রভু আমাকে সমর্পণ
নয় পত্র গ্রন্থ ইথে ষড়দরশন ॥
প্রভু মোরে পড়াইল নিভৃতে বসিএ।
পয়ার করহ যদু উপাসনা দিএ ॥
হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরণে প্রত্যাশ
সংগ্রহ পয়ার লেখেন যদুনাথদাস ॥'[১]

যদুনন্দন আলোচ্য গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন—

'মোর প্রভু হন আচার্য্য আপুনি।
নিজগুনে সুনান সুনি কৃতার্থ আঁাম ॥
দিনহিন দেখি দয়া করিলে আমারে।
সন্দেহ ছেদন করি সুধিলে অন্তরে ॥'[২]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'আচার্য্য দিক্ষিত গুরু লীলাতত্ত্ব দিল।
নিত্যোতত্ত্ব জানাইতে শিষ্যে আজ্ঞা দিল ॥'[৩]

এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টতঃই মনে হয়, 'সংগ্রহতোষণী'র যদুনন্দন, শ্রীনিবাস আচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। এবং তাঁরই নির্দেশে 'সংগ্রহতোষণী'-গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। পরে আচার্য কন্যা হেমলতা দেবীর নিকটে সম্ভবতঃ দীক্ষা গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে, যদুনন্দনের অন্যান্য গ্রন্থে তিনি যে শ্রীনিবাস আচার্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি সর্বত্র দাসানুদাস বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। আবার 'সংগ্রহতোষণী'র ভাষাও যদুনন্দনের অন্যান্য সুপরিচিত গ্রন্থের তুলনায় অনেকটা বিশৃঙ্খল ধরনের। সুতরাং 'সংগ্রহতোষণী'র যদুনন্দনকে আমরা 'গোবিন্দলীলামৃত', 'বিদগ্ধমাধব' বা 'পদাবলী'র যদুনন্দন থেকে পৃথক অপর এক ব্রাহ্মণ যদুনন্দন বলে মনে করছি।

---

১. 'সংগ্রহতোষণী'। পত্র সংখ্যা ২২ক।
২. ঐ. ঐ. ৮০খ।
৩. ঐ. ঐ. ১১৯ক।

চরিত-সাহিত্য

গৌরাঙ্গ না হইত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা
জগতে জান'ত কে॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। শুধুমাত্র দেবকাহিনী নয়, মানুষের বাস্তব জীবন-কাহিনী নিয়েও গ্রন্থ রচিত হতে পারে, এই সব গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাই প্রমাণিত হলো। যদিও গ্রন্থকাররা প্রত্যেকেই ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁরা মানুষ হিসাবে দেখেন নি, দেখেছেন ভগবান্ হিসাবে। তাই জীবন-চরিত হিসাবে এই সব গ্রন্থ আদর্শস্থানীয় নয়। ফলে, শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের মানবতা এই সব গ্রন্থে অবশ্যই কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া, এই সব গ্রন্থে অলৌকিক বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্যকে আবৃত করে। তবুও, বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হলে এদের মধ্যে থেকে অকৃত্রিম তথ্য আবিষ্কার করা দুরূহ নয়।

। চৈতন্যচরিতামৃত ।

সতেরো শতকে রচিত প্রথম চৈতন্য-চরিত গ্রন্থ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এই গ্রন্থের রচনাকাল গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত নিম্নোক্ত শ্লোক থেকে জানা যায়।—

'শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যোহহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গত॥'[১]

সিন্ধু=৭ বা ৪, অগ্নি=৩, বাণ=৫, ইন্দু=১। অর্থাৎ ১৫৩৪ বা ১৫৩৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে বা ১৬১২ অথবা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছিল। তবে গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দেই গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাঢ়ের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামের অধিবাসী

১. চৈ. চ. (অ. লীলা), পৃ. ৩৬৮

ছিলেন। এঁর একজন ভাই ছিলেন। একদিন কৃষ্ণদাসের বাড়িতে অহোরাত্র সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেখানে নিত্যানন্দের শিষ্য, মীনকেতন রামদাস উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণদাসের ভাই চৈতন্যদেবকে ভক্তি করতেন, নিত্যানন্দকে করতেন না। তিনি রামদাসের সঙ্গে তর্ক করেন। ফলে, রামদাস ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যান। সেই রাত্রে কৃষ্ণদাসের ভাই-এর 'সর্বনাশ' হয় এবং কৃষ্ণদাস স্বপ্নে নিত্যানন্দের দেখা পান। নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে বৃন্দাবনে যেতে বলেন। কৃষ্ণদাস তখন বৃন্দাবনে চলে যান। তখন ছয় গোস্বামী জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস তাঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক মহাকাব্য ও বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা' রচনা করেছিলেন। তারপর বৃদ্ধ বয়সে তিনি বৃন্দাবনের মহান্তদের অনুরোধে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মমতের দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত, আদিলীলা মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত জীবনকাহিনী, মধ্যলীলায় সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী ছয় বছরের তীর্থ পর্যটন এবং অন্ত্যলীলায় অবশিষ্ট জীবন বর্ণিত হয়েছে। তবে, শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর বর্ণনা এতে নেই। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল 'মুরারি গুপ্তের কড়চা', 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' এবং বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'-গ্রন্থ থেকে। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'-গ্রন্থে যে সব বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাকে সূত্ররূপে উল্লেখমাত্র করে, যে সব ঘটনা বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেবল সেই সেই ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তাই, আলোচ্য গ্রন্থখানি শুধু চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নয়, দর্শনগ্রন্থ হিসাবেও এর একটি বিশিষ্ট মূল্য রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির নিছক কাব্য-মূল্যও অপরিসীম। নীলাচলে বাসের সময়ে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার যে বর্ণনা কৃষ্ণদাস দিয়েছেন, তা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের সঙ্গেই তুলনীয়। এর অংশ বিশেষ আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি—

'প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার॥

---

১. চৈ. চ. (আ লী.), পৃ. ১৫৯-১৬০।

দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গাযমুনাধার॥
বৈবর্ণ্য, শঙ্খের প্রায় হৈল শ্বেত অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা॥[১]

'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যে লেখক অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায়, অত্যন্ত দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের অবলীলাক্রমে বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৈষ্ণবোচিত বিনয়ও ছিল অসামান্য। গ্রন্থমধ্যে নানাভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে ও উপসংহারে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে আন্তরিক বিনয় জ্ঞাপন করেছেন, সেই সব অংশে একদিকে নিজের দৈন্য, অন্যদিকে তাঁর ভক্ত হৃদয়ের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের ভাষায় অনেক জায়গায় হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। লেখকের দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাসের জন্যেই সম্ভবতঃ এরকম হয়েছে।

এছাড়া, এই কাব্যের কিছু কিছু ত্রুটিও রয়েছে। তার মধ্যে অলৌকিক বর্ণনা গ্রন্থখানির প্রধান ত্রুটি। এছাড়া, এই কাব্যের অনেক জায়গায় ছন্দ পতনও দেখা যায়।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের পরেও সতেরো শতকের রাঢ় বাংলায় কয়েকটি চৈতন্য-চরিত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সে সব গ্রন্থ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে, এদের মধ্যে নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস', মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই সব গ্রন্থে অনেক বৈষ্ণব মহান্তের জীবনী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

। প্রেমবিলাস।

'প্রেমবিলাস' রচয়িতা নিত্যানন্দদাস ছিলেন শ্রীল নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য। জাহ্নবাদেবীর আদেশেই নিত্যানন্দদাস 'প্রেমবিলাস' রচনা করেছিলেন বলে এই গ্রন্থে লেখা আছে।[২] গ্রন্থটিতে চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের এবং গৌড়ীয় মহান্তদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

'প্রেমবিলাস' গ্রন্থখানি সাড়ে চব্বিশটি বিলাসে বিভক্ত। এই গ্রন্থে একটি রচনাকাল-বাচক শ্লোক পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে,—'পক্ষাদ্বিতিথী'—(১৫২২

১. চৈ. চ. (অ. লী.), পৃ. ২৬৩-৬৪।
২. বি. ভা. পু. সং ৫৯৬।

শকাব্দ) অর্থাৎ ১৬০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।[1] কিন্তু, বইটির মধ্যে এমন অনেক কথা লেখা আছে যা সম্পূর্ণ অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে সাড়ে চার বিলাস একেবারেই অপ্রামাণিক রচনা। সেই জন্যে বিশেষজ্ঞগণ 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতঃ বা অংশত জাল বই বলে মনে করেন।

। অনুরাগবল্লী ।

মনোহরদাসের 'অনুরাগবল্লী'-গ্রন্থের রচনাকাল 'বসু চন্দ্র কলা'—যুক্ত শকের (১৬১৮) চৈত্র মাস অর্থাৎ ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।[1] 'অনুরাগবল্লী'-গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। আলোচ্য গ্রন্থখানি ৮টি 'মঞ্জরী'তে বিভক্ত। এতে মুখ্যতঃ শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী সংগ্রহ করতে যে সব ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, সেদিকে কবি বিশেষ নজর দিতে গিয়ে কবিত্ব শক্তি প্রকাশের সুযোগ পান নি। গ্রন্থকারের নিজের মত প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে উদ্ধৃত অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক এবং একটি গুরু-শোচক স্তব থেকে জানা যায়, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি আদ্যপান্ত পাঠ করলে সেকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। 'অনুরাগবল্লী'তে মনোহরদাস নিজের পরিচয় বিশেষ দেন নি। গ্রন্থমধ্যে মাত্র এক জায়গায় তাঁর বাসস্থান হিসাবে 'কাটোয়া নিকট বাইগণ কোলা পাঠবাড়ী'-তে গুরুগৃহে বাস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। 'অনুরাগবল্লী'তে দুটিমাত্র পদ রয়েছে, তা শ্রীআচার্য প্রভুর রচিত বলে স্বীকৃত হয়েছে।

। রসিকমঙ্গল ।

গোপীজনবল্লভ দাসের রচিত 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থখানি আলোচ্য শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য চরিত-গ্রন্থ। এর মধ্যে শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। 'রসিকমঙ্গলে'র লেখক ছিলেন শ্যামানন্দের শিষ্য ও রসিকানন্দের গুরুভাই। গোপীজনবল্লভের বাস ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ধারেন্দা গ্রামে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রচনা আরম্ভের তারিখ, গ্রন্থ রচনা শেষ করতে কতো সময় লেগেছিল, তার নিখুঁত হিসাব উল্লিখিত হলেও, সনের কোনো উল্লেখ নেই। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রসিকানন্দের জন্ম ১৫১২ শকাব্দে অর্থাৎ, ১৫৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৫৭৪ শকাব্দে অর্থাৎ, ১৬৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে।[2] রসিকানন্দের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই 'রসিককমঙ্গল' গ্রন্থখানি রচিত হয়। কবির পিতা রসময়, তিনি জাতিতে গোপ। কবির দুই খুল্লতাত বংশীদাস ও মথুরাদাস, এবং পাঁচ ভাই। সকলেই রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন বলে আলোচ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

১. অনুরাগবল্লী, অষ্টম মঞ্জরী দ্রষ্টব্য।
২. র. ম.। পৃ. ১৭, ১৮৩ দ্রঃ।

রাঢ়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্তে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ইতিহাসের উপাদান 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। সেই দিক্ দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। গ্রন্থখানিতে আলোচ্য সময়ের অনেক সামাজিক তথ্যও নিবদ্ধ রয়েছে। তবে, এই শ্রেণীর নিবন্ধে যে ধরনের অলৌকিক কাহিনী থাকে, আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও তার অন্যথা হয় নি। রসিকানন্দ অনেক মুসলমানকে শিষ্য করেছিলেন বলে আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন, মেদিনীপুরের তৎকালীন শাসনকর্তা আহম্মদ বেগ।[১] শাহ্ শুজার কাছেও রসিকানন্দ অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়েছিলেন বলে গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।[২]

গ্রন্থখানিতে শ্যামানন্দের প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ, 'প্রেমবিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর' ইত্যাদি গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তমদাসের সঙ্গে শ্যামানন্দের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এটি খুবই বিস্ময়কর।

। বৈষ্ণব-নিবন্ধ-সাহিত্য ।

সতেরো শতকের রাঢ়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটি গৌণ শাখা 'নিবন্ধ-সাহিত্য'। বৈষ্ণবদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা বিষয় আলোচনা করে ছোটো বড়ো অনেক বাংলা নিবন্ধ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই নিবন্ধ-সাহিত্যকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম শ্রেণীর নিবন্ধ গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তদের তালিকা ও গুরু-শিষ্য পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে।

বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি বেশীর ভাগই বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনাবলী ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে। দু-একটি ক্ষেত্রে মাত্র রচয়িতারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে প্রধান হলো রামগোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী' এবং রামগোপালদাসের পুত্র পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্যাখ্যা'।

'রসকল্পবল্লী'র রচনাকাল 'বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম'—অর্থাৎ ১৫৯৫ শকাব্দ। ঐ বছরের দীপান্বিতার দিন অর্থাৎ ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর তারিখে বইটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'রসকল্পবল্লী' শুধু রসতত্ত্বের নিবন্ধ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নয়, এর মধ্যে ষোড়শ সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব সমাজ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বহু পদও এর মধ্যে সংকলিত হয়েছে। পীতাম্বরদাসের গ্রন্থ তত্ত্ব, তথ্য ও পদ সংকলনের দিক দিয়ে মূল্যবান।

বৈষ্ণব ভক্তদের নামের তালিকা এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরা জাতীয় রচনাগুলি 'শাখাবর্ণন' নামে পরিচিত। এই রচনাগুলির মধ্যে রামগোপালদাসের 'শাখানির্ণয়' উল্লেখযোগ্য। রাঢ়ে রচিত সতেরো শতকের অন্যান্য 'শাখাবর্ণন' গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলরামদাসের 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা', শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ভুক্ত দেবনাথ-দাসের 'গৌরগণাখ্যান', শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন বংশীয় হৃদয়ানন্দদাসের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গণোদ্দেশদীপিকা' এবং মাহাতা নিবাসী দ্বিজ শ্রীরূপচরণের নিবন্ধ।

১. র. ম. পৃ. ১১৯-২১।
২. ঐ. পৃ. ১৭৩-৭৪।

'শুকর চড়ায় ডোম
সেহ কৃষ্ণ পায়।'

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যে সমস্ত আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল সেগুলিও বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত। এই আখ্যানকাব্যগুলিকে সাধারণভাবে 'কৃষ্ণমঙ্গল' বলা হয়।

সতেরো শতকে রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যগুলিতে প্রধানতঃ ভাগবতের কাহিনীকে অনুসরণ করা হলেও, ভাগবত-বহির্ভূত অনেক কাহিনীও এতে স্থান পেয়েছে। এই সব কাহিনীর মধ্যে প্রধান 'দানলীলা' ও 'নৌকাবিলাস'। ইতিপূর্বে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এই দুটি কাহিনী পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে উৎকট আদিরসের আধিক্য দেখা যায়। সতেরো শতকে রচিত রাঢ় বাংলার 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যগুলির মধ্যে আদিরসের নিদর্শন খুব বেশী মেলে না। তবে ঐ কাব্যগুলিতে গভীরতারও অভাব দেখা যায়। রচনারীতিতেও গতানুগতিক প্রথানুবর্তনের চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট।

। গোপাল-বিজয়।

এই সময়ে রাঢ় বাংলায় যে সব 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবিশেখরের 'গোপাল-বিজয়'। এই কাব্যখানি বিশ্বভারতী থেকে ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক এটিকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী রচনা বলে মনে করেছেন।[১] কিন্তু তিনি লক্ষ করেন নি, এই কাব্যে 'বেশালি' (Vasilha) ইত্যাদি পর্তুগীজ শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়।[২] অথচ, সতেরো শতকের পূর্বে বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে নি। 'গোপাল-বিজয়ে'র একটি পুঁথির[৩] লিপিকাল—১৫৯৫ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৬৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু এই তারিখের ঠিক আগে আর একটি তারিখ এই পুঁথিতে উল্লিখিত হয়েছে—'শাকে গজাব্দি শর চন্দ্র'। এই তারিখকে আদর্শ পুঁথির লিপিকাল বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটিই সম্ভবতঃ 'গোপাল-বিজয়ে'র রচনাকাল। গজ—৮, অব্দি=৪ (অব্দি—৭

১. গোপাল-বিজয়, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২. ঐ পৃ. ৬২ দ্রষ্টব্য।
৩. ক. বি. পুঁ. সং ২৬০।

ধরলে কবিশেখরের আবির্ভাব কাল সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সংগতি থাকে না)[১], শর—৫, চন্দ্র—১। ১৫৪৮ শকাব্দ বা ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দ 'গোপাল-বিজয়ে'র রচনাকাল হতে পারে।

'গোপাল-বিজয়' দীর্ঘায়তন কাব্য। এর মধ্যে কবির কবিত্বের নিদর্শন যথেষ্টই পাওয়া যায়। এই কাব্যের নানা জায়গায় তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি গোপীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এ সমস্তই চৈতন্য পরবর্তী কালের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে।

'গোপাল-বিজয়'-কাব্যে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, কবির প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতার নাম হীরাবতী। 'গোপাল-বিজয়' সহজ সরল ভাষায় রচিত একান্ত বর্ণনাময় কাব্য। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগের সঙ্গে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কাব্যখানিতে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা ও সেই সঙ্গে স্থূল আদিরসেরও প্রাধান্য রয়েছে। আলোচ্য কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার রূপ অপেক্ষা মাধুর্যরসের দিকটিই স্ফুটতর হয়েছে। আলোচ্য কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ভাষায়, ভাবে এমন কি পদাংশগত মিলও লক্ষ করা যায়।

। মাধব-সংগীত।

পরশুরামের 'মাধব-সংগীত' সতেরো শতকে রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।[২] আত্মপরিচয় অংশে কবি ঊর্ধতন চার পুরুষের নাম[৩] ও অন্যত্র জন্মস্থান হিসাবে চম্পকনগরীর 'দাসকন্য' গ্রামের নাম[৪] উল্লেখ করেছেন এবং গুরু মনোহরদাসের উল্লেখ[৫] করেছেন। আলোচ্য মনোহরদাস পদকর্তা গোবিন্দদাসের বন্ধু ও সমসাময়িক। আলোচ্য কাব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং 'মাধব-সংগীত' সতেরো শতকের রচনা।

---

১. সতেরো শতকে রচিত রামগোপালদাসের 'শাখানির্ণয়ে' রঘুনন্দনের শাখায় 'কবিশেখর রায়' নামে একজন পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামগোপালদাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত অনেক পদ এবং 'গোপাল-বিজয়' কাব্যের কিছু অংশও উদ্ধৃত করেছেন। ইনি যে অনেক গ্রন্থ এবং পদ রচনা করেছেন তাও উল্লিখিত হয়েছে সেখানে। সুতরাং, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য 'কবিশেখর রায়' ও 'গোপাল-বিজয়ে'র রচয়িতা কবিশেখর অভিন্ন হওয়াই সম্ভব। তা যদি হয়, তবে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্যের রচনা সময়ের হিসাবে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের বেশী পরে রচিত হতে পারে না।

২. বা. সা ই. ১।অ, পৃ. ৬৭-৬৯ দ্রঃ।

৩. মাধব সঙ্গীত, পৃ. ১৫।

৪. মাধব-সঙ্গীত, পৃ. ৩০৯। এ ছাড়া, পরশুরাম রায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা কুমার শেখর শ্যাম। 'শ্যাম' উপাধিক আগরি জাতির বাস বর্ধমানের চম্পাই নগরী অঞ্চলে এখনও বর্তমান। এই অঞ্চলে 'দ্বাদশঘণ্য' বা 'বারঘন্ত' নামক গ্রামও বর্তমান। এই 'দ্বাদশঘণ্য' 'দাসঘন্য', 'দাসকন্য' ইত্যাদি-ভাবে রূপান্তর লাভ করতে পারে। ফলে মনে হয়, কবি পরশুরাম রায় বর্ধমানের চম্পাই নগরী অঞ্চলের লোক ছিলেন।

৫. মাধব-সঙ্গীত, পৃ. ২৫,২৪১ ইঃ।

। কৃষ্ণমঙ্গল ।

'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যে অপর এক পরশুরামকে আমরা পাই, ইনি পরশুরাম চক্রবর্তী বা সংক্ষেপে দ্বিজ পরশুরাম।[১] আলোচ্য পরশুরাম চক্রবর্তীর রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের অন্যতম 'শ্রীবৎসচিন্তা উপাখ্যানে'র একটি পুঁথিতে রচনাকাল পাওয়া যায় ১৫৮৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।[২] সুতরাং এই পরশুরাম চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে সতেরো শতকের কবি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজ পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্য প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন, পরশুরামের সম্পূর্ণ পুঁথি অত্যন্ত দুর্লভ। এবং তিনি দাবী করেছেন, তাঁর বহরমপুরের বাড়ির পুঁথিখানি সম্পূর্ণ।[৩] কিন্তু আলোচ্য মুদ্রিত গ্রন্থটির পরেও আরও অনেকগুলি পালা পাওয়া যায়।

বরানগর 'পাটবাড়ী'র পুঁথিভাণ্ডারে, প্রথম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়।[৪] সে পুঁথি আমরা দেখেছি। এছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহের পরশুরাম চক্রবর্তীর 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের একখানি পুঁথিও আমরা দেখেছি। আলোচ্য পুঁথিখানি খণ্ডিত। কিন্তু তাতেও মুদ্রিত গ্রন্থের অতিরিক্ত দু'চারটি পালা রয়েছে। বলাবাহুল্য, বরানগর 'পাটবাড়ী'র পূর্বোক্ত সম্পূর্ণ পুঁথিখানিতে আরও কতকগুলি অতিরিক্ত পালা রয়েছে। সুতরাং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের সম্পাদক মহাশয়ের দাবীকৃত পুঁথিখানি সম্পূর্ণ বলে আমরা স্বীকার করতে পারছি না। মুদ্রিত গ্রন্থের পরেও 'যদুবংশ-ধ্বংস-কাহিনী', 'দ্বারকায় নারদের আগমন', 'কৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ', 'শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের বিবরণ' ইত্যাদি অতিরিক্ত অংশ দেখা যায়। এছাড়া, মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যবর্তী অংশেরও অতিরিক্ত অন্য পালা পাওয়া যায়। যেমন, 'মৃত-বৎসা পালা' ইত্যাদি। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'যদুবংশ-ধ্বংস' উপাখ্যান থেকে কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করছি,—

'ধর্মশীল যদুবংশ দ্বারকা নগরে।
ব্রাহ্মণের হিংসা তারা কভু নাহি করে ॥
তবে যদুবংশে কেন হৈল ব্রহ্মশাপ।
কহিঞা ঘুচাহ মুনি মনের সন্তাপ ॥
সুকদেব বলে [রাজা] শুন দিঞা মন।
একদিন বসিঞা ভাবেন নারায়ণ ॥

---

১. পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল', পৃ. ৩১৭।
২. বা. সা. ই. পৃ. ১০১৪।
৩. পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল', ভূ. দ্রঃ।
৪. পুঁথি সংখ্যা ২২৯৫।৭, পত্র সংখ্যা ২-১৮৪। কেবল মাত্র প্রথম পত্রটি নেই।

পৃথিবীর ভার খণ্ড যাইবে কেমনে।
পৃথিবী ব্যাপিল মোর যদুবংশ গণে ॥
যদি এই যদুবংশ করিএ সংহার।
তবে সে নাস হইব পৃথিবীর ভার ॥
এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ভাবেন অন্তরে।
যদুবংশ ক্ষয় হবে কেমন প্রকারে ॥
ইথে যদি ব্রহ্মশাপ যদুবংশে হয়।
তবে এই যদুবংশ সব হয় ক্ষয় ॥
এত বলি যজ্ঞ আরম্ভিল নারায়ণ।
নিমন্ত্রিএগ আনিল যতেক মুণিগণ ॥
যজ্ঞ সমাপণ তবে কৈলা [যদুরায়]।
যত মুনিগণ সব হৈলা বিদায় ॥
কৃষ্ণের মায়ায় সবে নাঞি গেলা দেশে।
সভে মেলি গেলা তবে প্রভাস উদ্দেশে ॥
হেনকালে সব যদুবংশের কুমার।
খেলাইতে গেলা তথি আনন্দ অপার ॥
প্রভুর মায়াতে সব পাইল কুমতি।
কৃষ্ণের কুমার সম্বে সাজাল্য যুবতি ॥
লোহপুত্র দিল তার উদর উপর।
গর্ভবতী সাজাইএগ আইলা কুমার ॥
সেই গর্ভবতী লইএগ সেই যদু সুত।
উপনীত হইলা গিএগ মুণির সাক্ষাত ॥
সভে মেলি জিজ্ঞাসিল করিআ চাতুরী।
শুন শুন মুণিগণ নিবেদন করি ॥
এই নারী এস্যাছেন তোমাদের স্থানে।
কিছু নাহি কহে এই লজ্জার কারণে ॥
হইবে ইহার গর্ভে কেমন সন্ততি।
কিবা কন্যা কিবা পুত্র কহ মহামতি ॥
শুনিয়া বিরূপ কথা যত মুণিগণ।
কোপে কম্পবান তনু লোহিত লোচন ॥

... ...

ব্রাহ্মণের শাপ কভু না হয় অন্যথা।
এইত কহিল রাজা সব তত্ত্বকথা ॥

বাহ্যার্থ এসব কথা আছে ভাগবতে।
দ্বিজ পরশুরাম গান ভারতের মতে॥
এই সব তত্ত্বকথা যে করে শ্রবণ।
অন্তকালে পায় সেই গোবিন্দচরণ॥
গোবিন্দপদারবিন্দ সভেমাত্র সার।
গান বিপ্র পরশুরাম কৃষ্ণ সখা যার॥'[১]

পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল' ভাগবতের অনুসরণে রচিত হলেও ভাগবত বহির্ভূত 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ড' ও 'দোললীলা'—এই লৌকিক কাহিনীগুলিও বর্ণিত হয়েছে। পরশুরাম চক্রবর্তী ব্যতীত 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের অন্য কোনো কবি শ্রীকৃষ্ণের 'দোললীলা'র বর্ণনা করেন নি। শ্রীকৃষ্ণের 'দোললীলা'র বর্ণনা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র বৈষ্ণব পদকর্তাগণই করেছেন। সুতরাং এই দিক দিয়ে পরশুরামের কাব্যে বেশ অভিনবত্ব দেখা যায়।

পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতোই রাধাকে 'চন্দ্রাবলী' বলা হয়েছে। আলোচ্য কাব্যে 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' ইত্যাদি লৌকিক অংশ বর্জিত না হলেও আদিরসের প্রাধান্য নেই।

। **শ্রীকৃষ্ণবিলাস** ।

সতেরো শতকের অন্যান্য 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের তালিকায় আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হতে পারে, যেমন, ঘনশ্যামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' এবং কৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'। এঁদের দুজনেরই গুরু ছিলেন জয়গোপালদাস।[২] এই জয়গোপালদাস সম্ভবতঃ বীরভদ্র গোস্বামীর শিষ্য ও গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত জয়গোপালদাসের সঙ্গে অভিন্ন। শেষোক্ত জয়গোপালদাস ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিক্ষণে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং, তিনি যদি ঘনশ্যামদাস ও কৃষ্ণকিঙ্করের গুরু হন, তবে, এই দুই কবির কাব্যও সতেরো শতকের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

কৃষ্ণকিঙ্করের 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যখানি ভাগবতের দশম স্কন্ধের খানিকটা অংশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের পরীক্ষিৎ-কাহিনী অনুসরণ করে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত। কাব্যখানি নিতান্ত বৈশিষ্ট্য-বর্জিত, বর্ণনাত্মক, ভাগবতের অনুবাদমাত্র। এই কাব্যখানিতে 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' ইত্যাদি লৌকিক পালা একেবারে স্থান পায় নি। এর মধ্যে আদিরসেরও স্পর্শ নেই।

---

১. শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের ব্যক্তিগত সংগ্রহের পরশুরাম চক্রবর্তীর 'কৃষ্ণমঙ্গল' এর পুঁথি। পত্র সংখ্যা ৭৭ক-৭৭খ।

২. বা. সা. ই. পৃ. ৫১০।

এমন কি শ্রীরাধিকারও উল্লেখমাত্র নেই কোথাও। এখানেও ভাগবতের মতোই অনেক গোপীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করেন।[১]

ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, এই কৃষ্ণকিঙ্কর ভারতপাঁচালীকার কাশীরামদাসের জ্যেষ্ঠ ভাই।[২] কিন্তু, এই ধারণার অনুকূলে কোনো প্রমাণ নেই। বরং প্রতিকূলে একটি প্রমাণ আছে। আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণকিঙ্কর তাঁর 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যে বলেছেন, তাঁর গুরু তাঁকে এই নাম দিয়েছেন।

'ব্রাহ্মণকুমার গুরু অতি দয়াবান্।
কর্ণে মন্ত্র দিঞা মোর কৈল পরিত্রাণ॥
সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুঞা।
আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দ নন্দন ভজ গিঞা॥'

কিন্তু, কাশীরামদাসের অগ্রজের পিতৃদত্ত নামই ছিল কৃষ্ণকিঙ্কর।

ঘনশ্যামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'-কাব্যে প্রধানতঃ ভাগবতকে অনুসরণ করা হয়েছে। কবি তাঁর গুরুর আদেশে এই কাব্য রচনা করেছিলেন, এবং কাব্যের ব্রজলীলা অংশ পর্যন্ত তিনি ভণিতায় গুরুর দোহাই দিয়েছেন। যতদূর মনে হয়, গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এই অংশ পর্যন্ত রচনা করেছেন। পরবর্তী অংশে আর গুরুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়, গুরুর তিরোধান, বা অন্য কোনো কারণের জন্যে ঐ অংশ হয়তো তিনি স্বাধীনভাবে রচনা করেছেন।

---

১. কৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', পৃ. ৩৮।
২. বা সা. ই. প. ৪২৩।

সহজিয়া সাহিত্য

'সহজ জানিবে কে।
নিবিড় অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজে পশিছে সে॥'

বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক অংশ 'সহজিয়া' নামে পরিচিত। অবশ্য 'সহজিয়া' শব্দটি খুব আধুনিক। উল্লিখিত সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনও নিজেদের 'সহজিয়া' বলেন নি। নিজেদের সাধন-পদ্ধতির বর্ণনা দেবার সময়ে এঁরা অনেক সময়ে 'সহজ' (সহজাত অর্থে) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'সহজ জানিবে কে।
নিবিড় অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজে পশিছে সে॥'[১]

এর থেকেই আধুনিক গবেষকগণ এঁদের নাম দিয়েছেন 'সহজিয়া'। এই সহজিয়াদের সকলেরই সাধন-পদ্ধতি বা মতাদর্শ এক রকমের নয়। এ সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন—'যে সব পুরাতনপন্থী যোগী ও তান্ত্রিক গুহ্য-সাধক বৈষ্ণব প্রেমভক্তিবাদ গ্রহণ না করিয়া বহির্বাসরূপে বৈষ্ণবতার ভেক—অর্থাৎ কৃষ্ণ-রাধা, গোকুল-বৃন্দাবন, চৈতন্য-নিতাই ইত্যাদি বুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারাও চৈতন্যচরিতামৃতের দোহাই দিয়াছেন। ইহারা এবং যে সব বৈষ্ণব সাধক মিথুনাচার—গুহ্যতান্ত্রিক সাধনা রূপেই হোক আর কৃষ্ণের ব্রজলীলার অনুশীলন রূপেই হোক—আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই উভয় সম্প্রদায়ই এখন আমরা শুধু 'সহজিয়া' অথবা 'সহজিয়া বৈষ্ণব' নাম দিয়া—একাকার করিয়া লইয়াছি।'[২]

এই 'সহজিয়া' বৈষ্ণবদের সৃষ্ট সাহিত্য পরিমাণের দিক দিয়ে অল্প নয়। বাংলায় এঁরা অনেক 'পদ' রচনা করেছিলেন এবং বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় এঁরা অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন।

'সহজিয়া'দের লেখা পদ ও গ্রন্থগুলি সতেরো শতকের শেষার্ধ থেকে রচিত হতে আরম্ভ করেছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তবে, ঠিক কোন পদ ও গ্রন্থগুলি সতেরো শতকের রচনা, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। মুকুন্দদাস বা মুকুন্দদেব নামক

১. চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি, পৃ. ১৮৭।
২. বা. সা. ই. ১।অ, পৃ. ৪৬

'সহজিয়া' গ্রন্থকার নিজেকে কৃষ্ণদাসের শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। একথা সত্য হলে, তিনি নিশ্চয় সতেরো শতকের লোক। তবে, 'সহজিয়া' লেখকদের অধিকাংশ উক্তির মতো এই উক্তিটিও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাঢ়েই 'সহজিয়া' সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল বেশী।

'সহজিয়া' নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বৈষ্ণব হলেও দার্শনিক মত ও সাধন-পদ্ধতি উভয় দিক দিয়েই এঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তুলনায় স্বতন্ত্র। এঁদের মতে, যা কিছু তত্ত্ব ও দর্শন সবই মানুষের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরকীয়া প্রেমকে সাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু 'সহজিয়া' সাধকেরা বিশ্বাস করতেন, বাস্তব জীবনে এই পরকীয়া প্রেম-চর্চার মাধ্যমেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। 'সহজিয়া'দের মতে, জয়দেব, চণ্ডীদাস, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ প্রত্যেক প্রাচীন কবি ও সাধকই পরকীয়া-সাধনা করতেন।

'সহজিয়া' লেখকেরা অধিকাংশ সময়েই নিজেদের নাম রচনায় ব্যবহার না করে রচয়িতা হিসাবে চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তমদাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকারদের নাম দিতেন। উদাহরণস্বরূপ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত দুটি পদ উদ্ধৃত করছি—

'কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরী॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি॥
হৃৎপদ্ম নির্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভীমূলে॥'[১]

অথবা—

'মানুষ মানুষ সবাই কহয়ে
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ ধন॥
ভরমে ভুলয়ে অনেক জন
মরম নাহিক জানে।

১ Post Chaitanya Baisnav Cult—P. 129.

মানুষের প্রেম নাহি জীবলোকে
মানুষ সে প্রেম জানে॥
মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা
সেই সে মানুষ সার।
মানুষ লক্ষণ মহাভাবগণ
মানুষ ভাবের পার॥
মানুষ নাম বিরল ধাম
বিরল তাহার রীতি।
চণ্ডীদাস কহে সকলি বিরল
কে জানে তাহার রীতি॥'[১]

এর মধ্যে প্রথম পদটিতে 'সহজিয়া'দের দেহতত্ত্বের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর ওপর তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্যটিতে 'সহজিয়া'দের মূল আদর্শের প্রশস্তি করা হয়েছে, অর্থাৎ যে মানুষের দেহের মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব নিহিত রয়েছে তারই জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

নিজেদের নামে যে সব 'সহজিয়া' লেখক পদ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মুকুন্দদাস, তরুণীরমণ ও বংশীদাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

একথা আগেই বলা হয়েছে, মুকুন্দদাস বা মুকুন্দদেব নিজেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। 'সহজিয়া' বৈষ্ণব-নিবন্ধগুলির এক বড় অংশের রচয়িতা মুকুন্দদেব। তার মধ্যে অনেকগুলি খুবই অশ্লীল। মুকুন্দদেবের ভণিতায় 'অমৃতরত্নাবলী', 'অমৃতরসাবলী', 'আদ্য সারাৎসারকারিকা', 'আনন্দলহরী', 'রসসমুদ্র', 'রসসাগরতত্ত্ব', 'রাগরত্নাবলী', 'রাধারসকারিকা', 'সাধনোপায়' ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 'রাগরত্নাবলী' নামক গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভণিতায়ও পাওয়া যায়।

মুকুন্দদেবের রচিত নিবন্ধগুলির মধ্যে 'অমৃতরত্নাবলী' ও 'অমৃতরসাবলী'ই প্রধান। 'অমৃতরত্নাবলী'র মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'দেহতত্ত্ব'। এই মানব দেহকে জানলেই প্রথমে আত্মরূপ বা ব্রহ্মরূপ এবং পরে, পরমাত্মরূপ বা বিশ্বরূপ উপলব্ধ হবে।

'সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজদেহ জানিলে আপন হবে স্থির॥
দেহকে জানিতে যদি পার ভাল মনে।
দেহেতে সকল আছে এ চৌদ্দভুবনে॥'[২]

---

১. Post Chaitanya Baisnav Cult—P. 129.

২. চৈতন্যোত্তর প্রথম চারটি সহজিয়া পুঁথি, পৃ. ১৩৪-৩৫।

আলোচ্য গ্রন্থে মানবদেহের অভ্যন্তরে নাড়ী, কমল ও সরোবরের সম্পর্কে এবং আধ্যাত্ম-জীবনের স্ফূরণে এদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। দেহতত্ত্বের অতিরিক্ত মানব সত্তার আর একটি বৈশিষ্ট্য দেহাভ্যন্তরস্থ পুরুষ ও প্রকৃতির যুগল-রূপের কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

মুকুন্দদেবের অপর গ্রন্থ 'অমৃতরসাবলী' প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সহজ ধর্মে দার্শনিক-তত্ত্বের বিবৃতি দেওয়া আছে। দ্বিতীয় ভাগে আখ্যায়িকার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সকলের শিক্ষা ও সাধনার কথা বলা হয়েছে। এই মন ও ইন্দ্রিয়ের বিকার দূর না করে সহজ প্রেমের সাধনা করতে গেলে, প্রেম বিকৃত হয়ে কামনার বিষ-বাষ্পে যে সাধককে ভস্মীভূত হতে হয়, সে-কথাও বলা হয়েছে।

'নির্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥'[১]

জিতেন্দ্রিয় ও নির্বিকার চিত্ত হবার পরে, দেহতত্ত্বকে আয়ত্ত করবার কৌশল 'অমৃতরসাবলী'তে সন্ধ্যা ভাষায় বলা হয়েছে—

'বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকহ একের কাছে॥
যেন আম্রফল ভিতর বাহির
কুশি-ছাল তার কশা।
তার আস্বাদন জানে যেই জন
পুরয়ে তাহার আশা॥'[২]

পণ্ডিতদের মতে, মুকুন্দদেবের 'সহজিয়া' নিবন্ধগুলি মূলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। পরে, তাঁর শিষ্যদের দ্বারা বাংলায় অনূদিত হয়।[৩]

আলোচ্য গ্রন্থ দুখানির মতো আরও অনেক গ্রন্থে আমরা বাংলার 'সহজিয়া' বৈষ্ণবদের সাধন-পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা পাই। তবে, সমস্ত 'সহজিয়া'-গ্রন্থেই যে উচ্চ মার্গের সাধন-প্রণালী বর্ণিত হয়েছে এমন নয়। সাধনতত্ত্বের নামে অনেক নিকৃষ্ট রচনাও প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব 'সহজিয়া'দের মধ্যে যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার নামে সমাজ গর্হিত ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতেন, সেই সব ভেকধারী ভণ্ডরাই এই সব গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারের নামে চালাতেন।

---

১. চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি, পৃ. ২০৭।
২. ঐ. ঐ. পৃ. ১৮৮।
৩. বা. সা. ই. ১অ, পৃ. ৫১।

তরুণীরমণের ভণিতায় কতকগুলি রাগাত্মিকা পদাবলী পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পদাবলীতে রূপক বা প্রহেলিকার অন্তরালে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা যোগের প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।[১] তরুণীরমণের ভণিতায় 'চণ্ডীদাস-নকুল-সংবাদ'ও পাওয়া যায়। তবে, এটি সম্ভবতঃ অনেক পরবর্তী কালের রচনা, কারণ এর খানিকটা বাংলা গদ্যে রচিত।

বংশীদাস শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপা লাভ করেছিলেন এবং ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। বহু সাধারণ বৈষ্ণব পদ ও 'সহজিয়া' পদ ছাড়াও ইনি 'ভজনরত্ন', 'রসতত্ত্বগ্রন্থ', 'গৌরলীলামৃত', 'নিকুঞ্জরহস্য', 'রসামৃতসার' ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

রাঢ়ের 'সহজিয়া' বৈষ্ণবদের সৃষ্ট সাহিত্য পরিমাণের দিক্ দিয়ে যেমন বিশাল, তেমনি তার বৈচিত্র্যও অপরিসীম। এই সাহিত্য সম্বন্ধে যথোচিত গবেষণা এ পর্যন্ত হয় নি; হলে নিশ্চয়ই আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হতো। এ পর্যন্ত যেটুকু উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, তার ভিত্তিতে আমরা রাঢ়ের 'সহজিয়া' সাহিত্যের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম মাত্র।

কোনো 'সহজিয়া' রচনারই তারিখ সুস্পষ্টভাবে জানার উপায় নেই। বিশেষভাবে, প্রাচীন কবি, মহাজন ও সাধকদের নামে যে সব পদ ও গ্রন্থ আরোপিত হয়েছে, তাদের রচনাকাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে, 'সহজিয়া'দের অধিকাংশ রচনায় রূপ গোস্বামীর বা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র দোহাই দেওয়া হয়েছে। ফলে, স্বভাবতই বোঝা যায় যে, ষোড়শ শতকের মধ্য ভাগের পরে 'সহজিয়া' সাহিত্য রচিত হতে শুরু করে, এবং সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ('চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাকাল) পরে এই সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু'-গ্রন্থে বহু 'সহজিয়া' পদ ধৃত হয়েছে। পদগুলির রচনাকাল স্বভাবতই এর অনেক পূর্ববর্তী। অতএব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশেষভাবে সতেরো শতককেই রাঢ়ের 'সহজিয়া' বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই কারণে তারিখ স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও 'সহজিয়া'দের বিভিন্ন রচনা বর্তমান নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

রাঢ়ের 'সহজিয়া' সাহিত্যের মধ্যে 'সহজিয়া' বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান্। এই তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এবং এর সমস্ত দিক্ এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। এ পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে, তার সারমর্ম আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

১. বি. ভা. পু. সং ৫৮৪, ২৭২৪, ৩১৩৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

"সহজিয়া সাধনা মানুষ হইবার সাধনা। এই মানুষ সহজ মানুষ, উহাই পরমার্থ সত্য : সহজ মানুষ হইবার সাধনা অতি দুরূহ।...সহজের সাধনা রসের সাধনা। এই সাধনায় পাঁচটি আশ্রয় ও তিনটি অবস্থা। প্রবর্ত অবস্থায় নাম ও মন্ত্র এই দুইটি আশ্রয়। দ্বিতীয় অবস্থা সাধক অবস্থা। এ সময় আশ্রয় ভাব। তৃতীয় অবস্থা সিদ্ধ অবস্থা। ইহার দুইটি আশ্রয়, একটি প্রেম এবং অপরটি রস।...সকলের সারবস্তু এই মনুষ্য শরীর, ইহাকে ঠিক ঠিক জানা প্রয়োজন। তন্ত্র কিংবা আগমশাস্ত্রে যেরূপ অসংখ্য নাড়িমণ্ডল এবং চক্রাদির উল্লেখ আছে, সহজিয়াগণের মতে তাহা অপেক্ষাও নানা সূক্ষ্মতম শরীরে অবস্থিত নানা নাড়ী ও সরোবরের ও কমলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।...মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সাধক ভাবের উদয় হয়। প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক কাম জয় করিতে হয়, তখন প্রকৃতি দর্শন বা সঙ্গ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। যখন কাল নিজের বশীভূত, তখন নিজ ভাব অনুসারে নায়িকা গ্রহণ করিতে হয়।..."[১] আচার্য কবিরাজ মহাশয়ের এই উক্তির মধ্যে দিয়ে 'সহজিয়া' সাধনার যে রূপটি পরিস্ফুট, রাঢ়ের 'সহজিয়া' বৈষ্ণব সাহিত্যে সেই সাধন পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা আমরা পাই। তবে, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত 'সহজিয়া'-গ্রন্থেই যে উচ্চমার্গের সাধন প্রণালী বর্ণিত হয়েছে এমন নয়। সাধনার নামে অনেক গর্হিত ও অসামাজিক কার্য-কলাপও যে এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে চলতো, তার পরিচয় বহু 'সহজিয়া' রচনার মধ্যে নিহিত রয়েছে। ফলে, বাংলার 'সহজিয়া' বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা বড়ো অংশই খুব অশ্লীল ও আপত্তিকর রচনা। 'সহজিয়া'দের মধ্যে যেমন অনেক বিশুদ্ধ সাধক ছিলেন, আবার অনেক ভেকধারী ভণ্ডও ছিলেন। তাঁরাই শেষোক্ত রচনাগুলির লেখক।

'সহজিয়া' সাহিত্যের রসবিচার করতে গেলেও দেখা যায়, সব রচনা সমান স্তরের নয়। কোনো রচনা এতোই অশ্লীল যে তা আলোচনার অযোগ্য। কোনো রচনা আবার একান্ত তুচ্ছ ও অসার। কোনো কোনো রচনায় আবার অবিমিশ্রভাবে তত্ত্বকথা বর্ণিত হয়েছে। ফলে, তা একান্ত নিরস হয়ে পড়েছে। অল্পসংখ্যক 'সহজিয়া' পদে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রসের স্বাদ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত কয়েকটি 'সহজিয়া' পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জাতীয় বহুল প্রচলিত একটি পদের প্রথম অংশ—

'কূলের উপরে কূলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউয়ের উপরে ঢেউয়ের বসতি ইহা জানে কেউ কেউ॥'

এর তত্ত্বগত অর্থ যাই হোক না কেন, এর মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা অনুভব করা যায়।

---

১. চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি, প্রাক্কথন দ্রঃ।

আর একটি সুপরিচিত পদের প্রথমাংশ সুভাষিতের সুন্দর দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লিখিত হতে পারে—

'মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা ;
কাজ নাই সখী তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা ॥'

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'সুনহ মানুষ ভাই'-পদটিও অমরত্ব লাভ করেছে। যদিও এই পদটিতে আসলে মানুষের দেহের মধ্যে নিহিত তত্ত্বের কথাই বলা হয়েছিল, তবুও এর কয়েকটি ছত্রকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে মানুষ ও মানবতার জয়গান হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আধুনিক সাহিত্য-রসিকগণ এই অর্থেই ছত্রগুলিকে গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ সাহিত্য

'প্রথমে রামায়ণ দ্বিতীয়ে মহাভারত
তৃতীয়ে অনুবাদ লেখন কলইনু ভাগবত।'

সতেরো শতকে রাঢ় বাংলার কবিরা অনুবাদ সাহিত্যের যে সব শাখায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'ভাগবত' উল্লেখযোগ্য। এই সব অনুবাদের বেশির ভাগই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। ফলে, লেখকের স্বাধীন রচনার পরিচয় যেমন এদের মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনি বাংলার ঐতিহ্যানুসারী অনেক মূলাতিরিক্ত বিষয়ও দেখতে পাওয়া যায়।

॥ রামায়ণ ॥

বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রামায়ণের কথাই প্রথমে বলতে হয়। সতেরো শতকে রাঢ় বাংলায় অবশ্য খুব বেশী বাংলা রামায়ণ রচিত হয় নি। যে কখানি রামায়ণ রচিত হয়েছিল, তাও সম্পূর্ণ রামায়ণ নয়, তার অংশবিশেষ। অন্ততঃ রাঢ়ের সতেরো শতকের কোনো কবির লেখা সম্পূর্ণ 'রামায়ণে'র পুঁথি এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায় নি। রামায়ণের অংশ-বিশেষ যাঁরা বাংলায় রচনা করেছিলেন, অথবা যাঁদের রচনার কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন পুঁথিতে পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে জিত ঘটকের নাম করা যায়। জিত ঘটক কাশীরাম দাসের রচিত মহাভারতের 'বনপর্ব'কে সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই সম্পূরণের তারিখ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন—'পঞ্চপুষ্প রস শশি'—অর্থাৎ ১৬০৫ শকাব্দ বা ১৬৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। জিত ঘটকের ভণিতায় রামায়ণের পুঁথিও পাওয়া গিয়েছে। এই রামায়ণ জিত ঘটকের লেখা মহাভারতের মতো প্রচার লাভ করে নি বটে, কিন্তু রচনা হিসাবে এটি নিন্দনীয় নয়।

সংস্কৃত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের রাজসভায় অঙ্গদের গমন এবং অঙ্গদ কর্তৃক রাবণকে ভর্ৎসনা করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গকে বাঙালি কবিরা আ[illegible] পল্লবিত আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা রামায়ণগুলিতে এই অঙ্গদের [illegible] 'অঙ্গদ রায়বার' আখ্যা পেয়েছে। রায়বার শব্দের অর্থ রাজদ্বারের বা রাজসভার [illegible] এবং রাজস্তুতি। কোনো কোনো কবি কেবলমাত্র 'অঙ্গদ রায়বার' রচনা করেছেন, এমনও দেখা যায়। রাঢ়ের 'অঙ্গদ রায়বার' রচয়িতাগণ প্রায় সকলেই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কবি ফকিররাম কবিভূষণ। ইনি

বাঁকুড়ার অধিবাসী ছিলেন। কারণ, মল্লাব্দে ইনি তাঁর সত্যনারায়ণের পাঁচালীর রচনাকাল জানিয়েছেন। এই রচনাকাল হলো—"ইন্দু বিন্দু সিন্ধুকে প্রবর্ত"—অর্থাৎ ১০০৭ মল্লাব্দ বা ১৭০১-০২ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর 'অঙ্গদ রায়বার' তার আগেই, সম্ভবতঃ সতেরো শতকের শেষ দশকে রচিত হয়েছিল। ফকীররামের সত্যনারায়ণের পাঁচালী থেকে জানা যায়, তাঁর মায়ের নাম দেবকী এবং তিনি রামভক্ত ছিলেন। ফকীররাম যে জাতিতে ব্রাহ্মণ সে কথার উল্লেখও তিনি করেছেন।

অন্যান্য 'অঙ্গদ রায়বার' রচয়িতার মধ্যে রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, কাশীরাম, দ্বিজ তুলসী, খোশাল শর্মা, মতিরাম, জগন্নাথদাস, দ্বিজ দুলাল ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য।

'অঙ্গদ রায়বার' সাহিত্য হিসাবে মোটেই উৎকৃষ্ট নয়। এর মধ্যে স্থূল ভাঁড়ামো এবং রুচি বিগর্হিত বর্ণনার আধিক্য অত্যন্ত বেশী।

আলোচ্য শতকে রাঢ়ের কবিরা রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ছোটো খাটো কাহিনী অবলম্বনেও কাব্য লিখেছেন। 'শিবরামের যুদ্ধ', 'তরণীসেনের যুদ্ধ', 'লক্ষ্মণ ভোজন', 'নরমেধ যজ্ঞ' ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে রচিত অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। এই সব রচনার মধ্যে লক্ষ্মণের লেখা 'শিবরামের যুদ্ধ' এবং দ্বিজ দয়ারামের লেখা 'তরণীসেনের যুদ্ধ' উল্লেখযোগ্য রচনা।

সপ্তদশ শতক থেকে রাঢ়ে কীর্তনের ঢঙে রামায়ণ গান করার প্রথা প্রবর্তিত হয়। তার মধ্যে পদাবলী সাহিত্যেরও প্রভাব পড়েছিল। এর ফলে, কৃষ্ণলীলার ছাঁচে রামলীলার পদও রচিত হতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের রাসের অনুকরণে শ্রীরামচন্দ্রের রাসও কোনো কোনো পদে বর্ণিত হয়েছে, এমনও দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই জাতীয় পদ প্রায় সবই পাওয়া যায় রামায়ণের পুঁথির মধ্যে। বিচ্ছিন্নভাবেও কোনো কোনো পদ যে পাওয়া যায় নি, তা নয়। একটি রাম-রাসের পদের শেষাংশ নীচে উদ্ধৃত হলো—

'যত পাত্র মিত্রগণ কর তহি জোড়ত
দেবগণে জয় জয় ধ্বনি।
রামদাসে ভনে ও রাঙা চরণে
না ঠেলিহ রঘুমণি ॥'[১]

পদটিতে ব্রজবুলির প্রভাব খুব সুস্পষ্ট।

দুর্লভ নামে একজন কবি রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো কাহিনীর আধারে পদ রচনা করেছিলেন। ১১০৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি পুঁথিতে দুর্লভের দুটি পদ পাওয়া গিয়েছে।[২] একটির বিষয়বস্তু 'রাম-নির্বাসন', অপরটির বিষয়বস্তু 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। সপ্তদশ শতকে রচিত রামলীলা পদের মধ্যে এই

১. বা. সা. ই. পৃ. ৪৫৩।
২. ঐ. পৃ. ৪৪৪।

পদ দুটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উচ্চস্থান লাভ করতে পারে। এদের মধ্যে প্রথম পদটির কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হলো—

'বাছা রাম
খানিক দাঁড়াইয়া থাক মায়ের মরণ দেখ
আস্য চুম্ব খাইয়ে বদনে।
মোর প্রাণ বাহির হৈলা যাবে পদ দেখাইয়া
তবে তুমি যাইবে কাননে॥'[১]

সতেরো শতকের রাঢ়ে আরও অনেক রাম-বিষয়ক কবিতা রচিত হয়েছিল। তবে সেগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

॥ মহাভারত ॥

সতেরো শতকে রচিত বাংলা মহাভারতের মধ্যে প্রথমেই কাশীরামদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। কাশীরামদাস বাংলা মহাভারতের প্রথম কবি নন। তাঁর আগে অনেক কবি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মহাভারত রচনা করেন। কাশীরামদাস সম্পূর্ণ মহাভারতও রচনা করেন নি বা করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কীর্তি সম্পূর্ণ মহাভারত রচয়িতাদের কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। বাংলা মহাভারতের কথা বলতে গেলে কাশীরামদাসের নামই প্রথমে মনে পড়ে।

কাশীরামদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে অল্প-স্বল্প তথ্য পাওয়া যায়। কিছু তথ্য তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আবার কিছু তথ্য পাওয়া যায়, কবির অনুজ গদাধরদাস রচিত 'জগন্নাথ-মঙ্গল'-কাব্য থেকে।

বিভিন্ন পুঁথির সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, কাশীরামদাস ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। তাঁদের পদবী ছিল 'দেব'। তা সত্ত্বেও তিনি কাশীরামদাস নামে পরিচিত। কারণ, সে যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছাড়া অপর সব জাতির লোকেরা নিজেদের পদবীর উল্লেখ না করে নামের শেষে 'দাস' ব্যবহার করতেন। কাশীরামদাসের অসম্পূর্ণ 'বনপর্ব' রচনা করতে গিয়ে জিত ঘটক নামে জনৈক কবি লিখেছেন—

'ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস॥'[২]

কাশীরামদাসও তাঁর প্রপিতামহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

'কায়স্থ কুলেতে জন্ম।'

তবে, কাশীরামদাসের রচিত মহাভারতের অনেক ক্ষেত্রেই 'দেব' ভণিতা পাওয়া যায়।

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥'[৩]

১. বা. সা. ই. পৃ. ৪৫৪।
২. ক. বি. পুঁ. সং ২৭২৪।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং ১৭২০। আদিপর্ব, প সং ৮৫ক।

অথবা—

'আদিপর্ব ভারথ গরুড় জন্মকথা।
কাশীরাম দেব কহে পাঁচালির গাঁথা।'[১]

নিজের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে কাশীরামদাস বলেছেন—

'ইন্দ্রানী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধি গ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তত্তুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥'[২]

অর্থাৎ কাশীরামদাসের পিতার নাম কমলাকান্ত, পিতামহ সুধাকর ও প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর। কমলাকান্তের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকিঙ্কর, মধ্যম কাশীরাম ও কনিষ্ঠ গদাধর।

গদাধরদাসের 'জগন্নাথমঙ্গল' (১৬৪২ খ্রীঃ) কাব্য থেকে জানা যায়, কাশীরামদাসের পিতা আপন পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করে জগন্নাথ দর্শনার্থে উড়িষ্যায় যান এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। তাঁর তিন পুত্রের জন্মও উড়িষ্যাতেই হয়।

'দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস।
জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈল বাস॥
কমলাকান্তের হল্য এ তিন কোঙর।'[৩]

তবে, কাশীরামদাস পরবর্তী জীবনে উড়িষ্যা পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে এসেছিলেন বলে মনে হয়। কাশীরামদাসের পিতৃভূমি ও বাসভূমি কোথায় ছিল, সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তী 'সতেরো শতকের বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি প্রধান সমস্যার বিচার'—অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো।

কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত মহাভারতে বর্তমানে আগাগোড়া কাশীরামদাসেরই ভণিতা পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত কারোর সন্দেহ ছিল না যে, মহাভারতের আগাগোড়া কাশীরামদাসের রচনা নয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁর সম্পাদিত মহাভারতের 'অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদে'র উপসংহারে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করে গবেষকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন—

'আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

এরপরে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-গ্রন্থে লেখেন যে, সতেরো শতকের শেষের বা আঠারো শতকের গোড়ার দিকের পুরোনো পুঁথিতে বিরাটপর্বের পরে, আর কাশীরামদাসের 'ভণিতা' পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে করা হয়েছিল কাশীরামদাস আদি, সভা, বন এবং বিরাট-পর্বের কিছু অংশ পর্যন্ত রচনা করে যান

---

১. বি. ভা. পুঁ. সং ১৭২০। প. সং ২৫৪, ৩১৮ ইত্যাদি।
২. ঐ. ১২০। আদিপর্ব, প. সং ১৬১খ।
৩. ম. বা. ত. কা. পৃ. ১৭৭।

যান। কিন্তু বিরাটপর্বের অধিকাংশই কাশীরামদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। এর পরে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল দেখিয়েছেন যে বনপর্বের পুরোণো পুঁথিতে 'অগস্ত্য উপাখ্যানের' পর আর কাশীরামদাসের ভণিতা পাওয়া যায় না। অন্য কবিদের ভণিতা পাওয়া যায়। এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় ১৭২১ শকাব্দের মহাভারতের বনপর্বের একটি পুঁথিতে পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটির পাঠান্তরে।

'আদি সভা বিরাট বনের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।'[১]

আগেই বলা হয়েছে যে বনপর্বের পুরোণো পুঁথিতে 'অগস্ত্য উপাখ্যানে'র পরে আর কাশীরামদাসের ভণিতা পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে বনপর্বের একটি পুঁথিতে[২] 'জিত' নামে জনৈক লেখক বলেছেন—

'ধন্য ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস।
চারি পর্ব মহাভারত করিলা প্রকাশ॥
আদ্য সভা বিরাটের রচিলা পাচালি।
তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্বে তিহো আরম্ভ করিলা এই পুঁথি।
কালবসে মৃত্যু তার হইল দৈবগতি॥
অগস্তি আক্ষাণ[৩] করি হইল কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্তি॥'

সুতরাং কাশীরামদাস আদিপর্ব, সভাপর্বের পরেই বিরাটপর্ব সম্পূর্ণ করেন এবং তারপরে বনপর্বের 'অগস্ত্য উপাখ্যান' পর্যন্ত রচনা করে পরলোক গমন করেন, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং, কাশীরামদাস মহাভারতের আদি, সভা ও বিরাটপর্ব এবং বনপর্বের অনেকাংশ রচনা করে পরলোক গমন করেন। এর মাধ্যমেই তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সেকালে লোকে সম্পূর্ণ মহাভারতই পড়তে চাইতো। এই কারণেই কাশীরামদাসের রচিত পর্ব কয়টির পরবর্তী অন্যান্য পর্বগুলি রচনা করবার জন্যে কবিদের মধ্যে আগ্রহ দেখা যায়। এই পর্বগুলি রচনা করবার সময়ে তাঁরা দুটি উপায় অবলম্বন করেছেন। প্রথমটি হলো, পূর্ববর্তী কবিদের রচিত মহাভারত থেকে অংশবিশেষ আহরণ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বর্তমানে প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে কিভাবে সঞ্জয়, নিত্যানন্দ, কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর রচনা প্রবেশ করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সঙ্গেই কাশীদাসী মহাভারতের অধিকতর সাদৃশ্য।

১. সা. প. প. ৬৬ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। পৃ. ৯৪-৯৭। শ্রীঅজয়কুমার কয়ালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২. ক. বি. পুঁ. সং ২৭২৪।
৩. অগস্ত্য আখ্যান।

এবং সে সাদৃশ্য যুদ্ধপর্ব এবং তৎপরবর্তী অধ্যায় গুলিতেই সর্বাপেক্ষা বেশী। নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা বহু অংশেই কিছুমাত্র মার্জন, পরিবর্তন বা সংশোধন না করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।"[১] এছাড়াও আমরা দেখেছি কাশীদাসী মহাভারতের শান্তিপর্ব কৃষ্ণানন্দ বসুর রচনা। কাশীদাসী মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব দ্বিজ রঘুনাথের রচনা। কাশীদাসী ভীষ্ম, কর্ণ ও উদ্যোগপর্ব নন্দরামদাসের রচনা, এবং কাশীদাসী মহাভারতের কর্ণপর্বের 'অগস্ত্য উপাখ্যানে'র পরবর্তী অংশ ও মুষলপর্ব জিত ঘটকের রচনা। মহাভারত রচনাকালে কবিদের অনুসৃত দ্বিতীয় উপায়টি হলো, নিজেদের রচনাকে জনপ্রিয় করবার জন্যে নিজেদের কাশীরামদাসের আপনজন বলে দাবী করা। এই দাবী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অমূলক মনে হলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তা সত্য ছিল। এই কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন নন্দরামদাস।

নন্দরামদাস কাশীরামদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। অথচ নন্দরামদাস নিজেকে 'নারায়ণ নন্দন' বলেছেন—

'নারায়ণ নন্দন সেবিয়া রাধাশ্যাম।
পাণ্ডব বিজয় বিরচিল নন্দরাম॥'[২]

'নারায়ণ' নামে কাশীরামদাসের কোনো সাক্ষাৎ-ভ্রাতার উল্লেখ কাশীরামদাস বা গদাধরদাস করেন নি। নন্দরামদাসের পিতা সম্ভবতঃ কাশীরামদাসের জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাই ছিলেন। বিশেষ করে নন্দরামেরও 'দেব' পদবীর উল্লেখ কোনো কোনো পুঁথিতে পাওয়া যায়।

'কায়স্থ কুলপতি দেব কুল স্থিতি
কহে নন্দরাম দাস।'[৩]

নন্দরামের নামে উদ্যোগপর্ব, দ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন পুঁথিতে নন্দরামের একটি উক্তি বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। তার সারমর্ম এই যে, কাশীরামদাস মৃত্যুর সময়ে মহাভারত সম্পূর্ণ করতে না পারার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং নন্দরামদাসকে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার ভার দিয়েছিলেন। নন্দরামের এই উক্তির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত কাশীরামদাসের মহাভারতের ভূমিকায় এর কয়েকটি ছত্র প্রকাশ করেন—

'কাশীরাম দাশয় তিঁহ জ্যেষ্ঠতাত।
মৃত্যুকালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়া হাত॥
আয়ু অবশেষ বাপু যাই পরলোকে।
রচিতে না পালাঙ পোথা পাই বড় শোকে॥

১. ৭ম সংস্করণ। পৃ. ৪৬০-৬৬।
২. বা. সা. ই. পৃ. ৪৬২।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং ২০৩০। প. সং, ২৫ক।

আশীর্ব্বাদ করি আমি বলিহে তোমারে।
পাণ্ডব চরিত্র বাপু রচিবা আদরে॥
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি ভাবি রাধাশ্যাম।
দ্রোণপর্ব্ব ভারত রচিল নন্দরাম॥'

মহাভারতের উদ্যোগপর্বের একটি পুঁথিতে[১] রয়েছে—

'নন্দরাম দাসে বলে শুন শ্যামরায়।
আমারে অভয় প্রভু দেহ যমদায়॥
জ্যেষ্ঠভাত কাশীদাস পরলোক কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন কবি কালে॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন॥
তাঁর আশীর্ব্বাদে আর ব্রাহ্মণ কৃপাতে।
দিনে দিনে আশয় হৈল্য ভারত রচিতে।'

উদ্যোগপর্বের অপর একটি পুঁথিতে[২] এই ছত্রকটি পাওয়া যায়—

'কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা॥
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্ব্বাদ॥
আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক॥
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেই জন।
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ॥
কাশীদাস মহাশয় আশীর্ব্বাদ দিল।
তাঁহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল।'

বিশ্বভারতীর একটি 'দ্রোণ'-পর্বের পুঁথিতে[৩] আমরা নন্দরামদাসের এই উক্তির অপর একটি নতুন পাঠ আবিষ্কার করেছি। এর আগে আলোচ্য অংশটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। শ্লোকটি নীচে উদ্ধৃত করা হলো—

'ভারত চরিত্র ব্যাস বিরচিত
শ্রবণে কলুষ নাস।

১. সা. প. পুঁ. সং ১২৪২। পত্র সংখ্যা ৩ক।
২. বা. সা. ই. ১৷২। পৃ. ৪৫৮-৫৯।
৩. বি. ভা. পুঁ সং ২০৩০।

স্বর্গেতে যাইতে ধরি মোর হাথে
কহিলেন কাশীদাস ॥
শু[ন] নন্দরাম পুরিবে এ কাম
আ[মি] যাই পরলোকে।
রচিত্তে এ পোথা নাহি দিল ধাতা
রহি গেল বড় শোকে ॥
তুমি গুণবান দেখিএ সন্তান
[অ]পূর্ব তোমার ভাব।
কায়স্থ কুলপতি দেবকুল স্থিতি
কহে নন্দরামদাস ॥'[১]

শুধু তাই নয়, কাশীরামদাসের মৃত্যুকালীন অনুরোধ পালন করতে না পারা পর্যন্ত তিনি ইষ্টদেবতা শ্যামরায়ের কাছে অভয় প্রার্থনা করেছেন—

'নন্দরামদাস বলে শুন শ্যামরায়।
আমারে অভয় প্রভু দেহ যম দায় ॥
জ্যেষ্ঠ তাত কাশীদাস পরলোক কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে ॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন ॥
তাঁর আশীর্ব্বাদে আর ব্রাহ্মণ কৃপাতে।
দিনে দিনে আশয় হৈল্য ভারত রচিতে ॥'[২]

সুতরাং কাশীরামদাসের মহাভারতের পরবর্তী কবিদের মধ্যে প্রথম স্থান নন্দরামদাসের।

এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কাশীরামদাসের অসম্পূর্ণ বনপর্বের শেষাংশ নন্দরামেরই রচনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু নন্দরামের ভণিতায় বনপর্বের কোনো পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আবার নন্দরাম কাশীরামদাসের রচিত বনপর্বের পর থেকে উদ্যোগপর্ব, দ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্ব রচনা করেছেন। তাই বনপর্বের 'অগস্ত্য উপাখ্যানে'র পরবর্তী অংশও নন্দরামের রচনা হওয়া খুবই সঙ্গত। বনপর্বের শেষাংশে অনেক পুঁথিতেই কাশীরামদাস ব্যতীত জিত ঘটক ও দ্বৈপায়নদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। মহামুনি ব্যাসের দাস এই অর্থে দ্বৈপায়ন নাম যে কোনো মহাভারতকারই ব্যবহার করতে পারেন। তাই জিত ঘটকের পুঁথিতে দ্বৈপায়নদাসের ভণিতা থাকায় অনেকে জিত ঘটক ও দ্বৈপায়নদাসকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন।

১. প. সং ২৪ক।
২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথি, সং ১২৪২। উদ্যোগপর্ব। প. সং ৩।

এবং দ্বৈপায়নদাসের নামে প্রচলিত বনপর্ব সহ গদাপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব ও আশ্চর্য পর্বেরও রচনার গৌরব জিত ঘটকে আরোপ করতে চান। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে লিখেছেন,…'ঐ পর্বগুলিতে (গদাপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব, আশ্চর্যপর্ব) কয়েক স্থানে 'দ্বৈপায়নদাস' ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু 'দ্বৈপায়নদাস' মানে ব্যাসের দাস। যে কোন মহাভারতকারই এই ভণিতা দিতে পারেন। বিশ্বভারতীর একটি বনপর্বের পুঁথির (সং ৯২০) জিত ঘটক রচিত অংশের মধ্যেও কয়েক জায়গায় 'দ্বৈপায়নদাস' ভণিতা পাওয়া যায়। এর থেকে এ-ও মনে করা যায় যে 'দ্বৈপায়নদাস' ভণিতাযুক্ত গদাপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব ও আশ্চর্যপর্বেরও আসল লেখক জিত ঘটকই।'[১] কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ কাশীরামদাসের বনপর্বের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বৈপায়নদাসের রচনা (ভণিতা সহ) পাওয়া যায় (অগস্ত্য উপাখ্যানের পরবর্তী অংশগুলি)। সেখানে জিত ঘটকের ভণিতা কোথাও নেই। কেবল মাত্র একখানি পুঁথিতে[২] ছাড়া। কিন্তু সেখানেও একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কাশীরামদাসের ভণিতার পরে (অগস্ত্য উপাখ্যানের পরবর্তী অংশে) 'এথা হৈতে ঘটক জীতি আরম্ভ'[৩] লেখা থাকা সত্ত্বেও তার পরবর্তী অনেকগুলি উপাখ্যানে কেবলমাত্র 'দ্বৈপায়নদাস'-এর ভণিতাই পাওয়া যায়। তার মধ্যে একবারও জিত ঘটকের ভণিতা পাওয়া যায় না। যেমন—

'গীতছন্দে অভিলাস রচে দ্বৈপায়ণ দাস
কৃষ্ণপদে মাগয়ে ভকতি।'[৪]

অথবা,

'ভারত পঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাস।
পাচালী প্রবন্ধে বিরচিল দ্বৈপায়ন দাস।'[৫]

আবার জিত ঘটকের ভণিতা যেখান থেকে আরম্ভ হয় তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই ভণিতা পাওয়া যায়। মাঝখানে একবারও দ্বৈপায়নদাসের ভণিতা পাওয়া যায় না। দুজনে একই ব্যক্তি হলে এ রকম হবার কোনো কারণ ছিল না। সে ক্ষেত্রে দুটি ভণিতাই মিলেমিশে লেখা থাকতো। এর থেকে মনে হয় লিপিকরের কাছে জিত ঘটকের পূর্বোক্ত অংশ সুলভ ছিল না, অথবা দ্বৈপায়নদাসের উক্ত অংশের রচনা উৎকৃষ্টতর মনে হয়েছে। বিশেষ করে দ্বৈপায়নদাসের বর্ণনা ভঙ্গী ও জিত ঘটকের বর্ণনা ভঙ্গির মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র মিল নেই। সুতরাং দ্বৈপায়নদাস ভণিতার অন্তরালে যে কবির নাম আত্মগোপন করে রয়েছে, তিনি আর যেই হোন জিত ঘটক নন। একথা নিশ্চয় করে বলা যায়।

---

১. পৃ. ১৮৮।
২. বি. ভা. পুঁ. সং ৯২০।
৩. ঐ. বনপর্ব। ৩৭ক।
৪. ঐ. ঐ. প. সং ৬৪খ।
৫. ঐ. ঐ. প. সং ৪৪ক।

দ্বৈপায়নদাসের ভণিতার পর্বগুলির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই 'কাশীর নন্দন' ভণিতা পাওয়া যায়। আবার জয়ন্তদেব নামে অপর এক মহাভারতকারও তাঁর রচিত পর্বে নিজেকে কাশীর নন্দন বলে অভিহিত করেছেন।[১] আবার এঁদের দুজনের রচিত একই স্বর্গারোহণপর্বে অর্থাৎ 'দ্বৈপায়নদাস' ও 'জয়ন্তদেব' ভণিতায় রচিত একই স্বর্গারোহণ পর্বের মধ্যে কোনোই মিল নেই। অথচ দুটি পর্বেই 'কাশীর নন্দন' ভণিতা পাওয়া যায়। সুতরাং এই কাশীর নন্দনের দাবী গ্রাহ্য করতে হলে কাশীরামদাসের দুই পুত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু কাশীরামদাসের কোনো পুত্রের অস্তিত্ব এখনও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানা যায় নি।

এইভাবে কাশীরামদাসের না লেখা পর্বগুলি লেখার জন্যে কালক্রমে অনেক কবিই আসরে অবতীর্ণ হলেন। পূর্বোল্লিখিত চারজন কবি ছাড়া, অন্যান্য যেসব কবির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—তাঁরা হলেন শিবরাম ঘোষ ও কৃষ্ণানন্দ বসু। বিরাটপর্বের পরবর্তী পর্বগুলির' জন্যে জনসাধারণ স্বভাবতঃই এই কবিদের রচনার উপর নির্ভর করতো। কালক্রমে জনসাধারণ বিভিন্ন রচনা থেকে কতকগুলি পর্ব নির্বাচন করে নিল। অবশিষ্ট পর্বগুলি পরিত্যক্ত হলো। যে সমস্ত কবি একাধিক পর্ব রচনা করেছিলেন, তাঁদের রচিত কোনো কোনো পর্ব হয়তো জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত এবং অন্য কোনো কোনো পর্ব বর্জিত হলো। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, নন্দরামদাসের রচিত 'উদ্যোগপর্ব' গৃহীত হয় নি, 'দ্রোণপর্ব' ও 'কর্ণপর্ব' গৃহীত হয়েছে। যেসব পর্ব একাধিক কবি রচনা করেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে মাত্র একজন কবির রচনাই জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। আবার এমনও দেখা যায়, কাশীরামদাসের পরবর্তী কোনো কবি হয়তো কোনো বিশেষ পর্ব রচনা করেন নি; সেক্ষেত্রে লিপিকর বা গায়েনরা অন্য কবির (যেমন নিত্যানন্দের) লেখা মহাভারত থেকে সেই পর্বকে গ্রহণ করে তাঁকে কাশীরামদাসের রচিত পর্বগুলির পাশে স্থান দিয়েছেন। এইভাবে জনসাধারণ কর্তৃক আঠারোটি পর্বের মহাভারতের একটি সংকলন গড়ে ওঠে। তাতে প্রথমে রচয়িতাদের নিজস্ব ভণিতাগুলি রক্ষিত হতো। কিন্তু, পরবর্তী কালে কাশীরামদাসের অ-লিখিত পর্বগুলি থেকে তাঁদের রচয়িতাদের 'ভণিতা' তুলে দিয়ে গায়েন ও লিপিকররা কাশীরামদাসের 'ভণিতা' বসিয়ে দেন। এইভাবে অষ্টাদশপর্ব 'কাশীদাসী মহাভারত' সৃষ্ট হয়েছে। এই কারণেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মহাভারতে আমরা আঠারোটি পর্বই কাশীরামদাসের 'ভণিতা'য় পাই।

কাশীরামদাস মহাভারতের অনুবাদক হলেও অনুবাদের আড়ষ্টতা তাঁর রচিত মহাভারতের কোথাও নেই। আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা তিনি কোথাও প্রায় করেন নি। কারণ, কাশীরামদাসের মহাভারত মূল মহাভারত অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত এবং সর্বত্র স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

---

১. 'জয়ন্ত রচিল কাশীদাসের নন্দন' ইত্যাদি ভণিতা পাওয়া যায়।

কাশীরামদাসের উদ্দেশ্য ছিল, মহাভারতের রস-ভাণ্ডারটি বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা। এই দুরূহ সংকল্প সাধনে কাশীরামদাস যে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কাশীরামদাসের আগে অনেকেই বাংলা মহাভারত রচনা করেছিলেন। তবে, তাঁরা কেউই বাঙালী জন-মানসে জায়গা করে নিতে পারেন নি। কিন্তু কাশীরামদাসের মহাভারত আপামর জনসাধারণ অভিভূত হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল।

কাশীরামদাস যেসব অংশে মূল মহাভারতের নিছক অনুবাদ করেছেন, সে সব অংশের কথা বাদ দিয়ে, যে সব ক্ষেত্রে তিনি মূলের কাহিনীকে মাত্র অনুসরণ করে ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীতে নিজের স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, সেখানেই কাশীরামদাসকে কবি হিসাবে পাওয়া যায়। কাশীরামদাসের মৌলিক কবি প্রতিভার পরিচয় বিশেষ করে পাওয়া যায়, যে সব অংশ তিনি নিজে সংযোজন করেছেন, সেই সব অংশে। কাশীরামদাসের রচিত পর্বের মধ্যে এ রকম অংশ খুব অল্প নয়। আমরা বর্তমানে কাশীরামদাসের রচিত পর্বগুলির মধ্যে কোথায় তিনি মূলকে অনুসরণ করেছেন, মূলের কোন্ কোন্ অংশ তিনি বর্জন করেছেন এবং কোন্ কোন্ অংশ তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

আদিপর্ব—কাশীরামদাস মহাভারতের আদিপর্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল মহাভারতকে অনুসরণ করেছেন, কেবল কয়েক জায়গায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মূল মহাভারতের কোনো কোনো অংশ তিনি বর্জনও করেছেন। যেমন—প্রথম থেকে সৃষ্টি বর্ণনা, মহাভারতলেখার জন্যে গণেশকে নিয়োগ করা, ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম, ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিসান্ত্বনা, মহাভারতের প্রশংসা, সমন্ত পঞ্চক উপাখ্যান, অক্ষৌহিণী পরিমাণ, পর্বসংগ্রহ, আদিপর্বের শ্লোক-সংখ্যা, আঠারো পর্বের শ্লোক-সংখ্যা, একের পর এক পর্ব সংগ্রহের প্রশংসা, পৌষ্যপর্ব, জন্মেজয়ের শাপ, সোমশ্রবা ঋষির উপাখ্যান, আয়োধ-ধৌম ও আরুণিক বৃত্তান্ত, উপমন্যু উপাখ্যান, বেদঋষি ও উতঙ্ক বৃত্তান্ত, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ করার প্ররোচনা ইত্যাদি অংশ কাশীরামদাস একেবারে বাদ দিয়েছেন। এ ছাড়া, কুরু-পাণ্ডবের শত্রুতার কারণ বর্ণনা, মহাভারত মাহাত্ম্য, উপরিচর বসুর পরিচয় ক্ষত্রিয় বংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, প্রাচীন রাজ-সংস্থান, ভূভার হরণের মন্ত্রণা, সম্ভবপর্ব, দেবাসুরের বংশ বর্ণনা, শুক্রের বংশ, তির্যক প্রাণী প্রভৃতির জন্মক্রম, রুদ্রাদির সৃষ্টি বিস্তার, রাজাদের জন্ম ও কর্ম, কৌরব, পাণ্ডব এবং যাদবদের বংশের বর্ণনা ইত্যাদি বিভিন্ন অংশও কাশীরামদাস বর্জন করেছেন।

কোথাও কোথাও আবার দেখি, কাশীরামদাস মূল মহাভারতের বিবরণে কতকটা পরিবর্তন সাধন করেছেন। যেমন—নারদ কর্তৃক সমুদ্র মন্থনের সংবাদ, তথায় শিবের আগমন, মহাদেবের বিষপান, অমৃতের জন্যে সুরাসুরের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনায় কাশীরামদাস কতকটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধারণ' মূল মহাভারতে থাকলেও, আলোচ্য অংশ কাশীরামদাস খুব বিস্তৃত আকারে বর্ণনা

-করেছেন। এই অংশে তার নিজস্ব কারুকার্য রয়েছে। পরশুরাম অবতার, দেব-দানবাদির ভূতলে জন্মগ্রহণ, শকুন্তলার উপাখ্যান ইত্যাদি অংশ মূল মহাভারত থেকে নেওয়া হলেও এ সব ক্ষেত্রে কাশীরামদাস কিছুটা নতুনত্ব এনেছেন। মেনকাকে বিশ্বামিত্র বিবাহ করে সংসার পেতেছিলেন, কিন্তু একদিন স্বামীর ক্রোধ দেখে মেনকা ভয়ে পালিয়ে যান, এই বর্ণনায় কাশীরামদাস লঘু রসিকতার সৃষ্টি করেছেন। শান্তনুর জন্ম কাহিনীতেও কাশীরামদাস খানিকটা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। অষ্টবসুর জন্ম-বিবরণ মূল মহাভারত থেকে নেওয়া হলেও অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে। সম্পূর্ণ কাহিনীটি মূলকে অনুসরণ করে নি। গান্ধারীর শত সন্তান প্রসবের কাহিনীটিও মূল মহাভারত থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন অংশ কাশীরামদাস অতি বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন।

কাশীরামদাস দ্রুপদের সভায় লক্ষ্যভেদের অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এবং অতি দীর্ঘ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ অংশে তিনি যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। প্রত্যেক রাজার নাম করে—যাঁরা লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন, তাঁদের অপদস্থ হবার কথা তিনি কৌতুকের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। পরাজিত রাজন্যবর্গের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধেরও কাশীরামদাস বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামী হওয়ার কারণ বিশ্লেষণে কাশীরামদাস স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। পাণ্ডবদের বিবাহবার্তা শুনে দুর্যোধনাদির মন্ত্রণা, ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরের পাঞ্চালগমন, সুন্দ-উপসুন্দর বিবরণ, দ্রৌপদী সম্পর্কে নিয়ম-নির্ধারণ, অর্জুনের নিয়মভঙ্গ, বনে গমন এবং উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি কাহিনী মূল মহাভারতের অনুরূপ। কিন্তু এদের মধ্যে কাশীরামদাস কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। মূল মহাভারতের সুভদ্রাহরণ ও কাশীরামদাসে বর্ণিত সুভদ্রাহরণের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায়। কাশীরামদাস লিখেছেন, সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং সত্যভামা এই বিবাহে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন। সত্যভামা সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের গন্ধর্ব মতে বিবাহ দিয়েছিলেন। এর পরে কাশীরামদাস সত্যভামার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গে গিয়ে পারিজাত হরণ করার কথা বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অনেক বিষয়েরই অবতারণা করেছেন। যথা, গড়ুর কর্তৃক ইন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাওয়া, ইন্দ্র কর্তৃক সত্যভামার স্তব করা, সত্যভামার ব্রত অনুষ্ঠান ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া, সত্যভামার ক্রন্দন ও অবশেষে স্বামীকে ফিরে পাওয়া ইত্যাদি অংশে কাশীরামদাস নতুনত্ব দেখিয়েছেন। কাশীরামদাস বর্ণিত বলরাম কর্তৃক দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের আয়োজন, এবং প্রসঙ্গতঃ শাম্বের বিবাহ-বর্ণন—এই দুটি বিষয়ের কোনো উল্লেখ মূল মহাভারতে নেই। অর্জুন-কর্তৃক সুভদ্রা হরণ অংশেও সুভদ্রার নিপুণ-হস্তে রথ চালনার বর্ণনা করে কাশীরামদাস আলোচ্য অংশটিতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন।

এই পর্বের অনেকগুলি বর্ণনা কাশীরামদাসের নিজস্ব সংযোজন—এগুলি মূল মহাভারতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কয়েকটি অংশের উল্লেখ করতে

পারি। সমুদ্র-মন্থন কালে বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধারণ অংশে, মোহিনীর সঙ্গে হরের মিলন বর্ণনা কাশীরামদাসের নিজস্ব সংযোজন। কাশীরামদাস লিখেছেন—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে জন্মেজয় ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সাধন করতে শুরু করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের সমূলে বধ করবার সংকল্প নিলেন। ব্রাহ্মণদের জব্দ করার জন্যে শেষ পর্যন্ত কুশ নির্মূল করতে প্রবৃত্ত হলেন। এরপরে জন্মেজয়ের ধর্ম-হিংসা, ব্যাসের বচনে নিবৃত্ত হওয়া, জন্মেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ, ব্যাসের পুনরায় আগমন এবং মহাভারত শ্রবণ করতে নির্দেশ দান, অশ্বমেধ যজ্ঞের যশলাভ সম্বন্ধে অভিহিত করা ইত্যাদি অংশ কাশীরামদাসের মহাভারতেই মাত্র আছে। মূল মহাভারতে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখই নেই। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদ প্রচেষ্টায় কাশীরামদাস ভীষ্ম-দ্রোণাদিরও অংশ গ্রহণ দেখিয়েছেন। লক্ষ্যভেদে সফল হলে তাঁরা দ্রৌপদীকে দুর্যোধনের হাতে সমর্পণ করবেন—এই ছিল তাঁদের সংকল্প। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডী ভীষ্মের সামনে উপস্থিত হওয়ায় ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করলেন এবং দ্রোণ প্রভৃতিও কোনো-না-কোনো কারণে এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হলেন। মূল মহাভারতে এ সব ঘটনা নেই। সেখানে একমাত্র কর্ণই লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি 'সূতপুত্র' বলে দ্রৌপদী তাঁকে বরণ করতে অস্বীকৃত হন এবং কর্ণ তখন ধনুর্বাণ ত্যাগ করেন।

সভাপর্ব—এই পর্বের প্রায় বিষয়ই মূল মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় কাশীরামদাস স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, রাজসূয়-যজ্ঞের বর্ণনা। এই বর্ণনায় আমরা দেখি বিভীষণ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে দ্বারপালের কাছে বাধা পাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিভীষণের মহিমা খর্ব করিয়ে তাঁর ভক্তির অহঙ্কারের শাস্তি দিয়েছেন। হিড়িম্বা এবং ঘটোৎকচও রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছে, দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার মধ্যে প্রচণ্ড কলহ বেঁধেছে এবং তাঁরা পরস্পরকে পুত্রহারা হবার শাপ দিয়েছে। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও বস্ত্রহরণ অনেকাংশে মূল মহাভারত থেকে গৃহীত হলেও, কাশীরামদাস এতে কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। এ ছাড়া, কর্ণবাক্যে ভীমের ক্রোধ, কুরুসভায় নারদের আগমন ও ভবিষ্যৎ বাণী ইত্যাদি অংশগুলিও কাশীরামদাসের নতুন সংযোজন।

বনপর্ব—আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কাশীরামদাস বনপর্বের 'অগস্ত্য উপাখ্যান' পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। এই পর্বে (অর্থাৎ তাঁর লেখা অংশের) আগাগোড়াই তিনি মোটামুটিভাবে মূল মহাভারতকে অনুসরণ করেছেন। অবশ্য কাশীরামদাস কয়েকটি নতুন বিষয়েরও বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান' বর্ণনা মূল মহাভারতে নেই। এই অংশে কাশীরামদাস যথেষ্ট নাটকীয়তা ও করুণরস সৃষ্টি করেছেন। বৃহদশ্ব মুনি কর্তৃক পাণ্ডবদের 'নলরাজার উপাখ্যান'-কথন মূল মহাভারতের অনুরূপ হলেও, আলোচ্য অংশে নল ও দময়ন্তীর কাহিনী বিস্তারে কাশীরামদাস

নাটকীয়তার সৃষ্টি করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। এই পর্বেও কাশীরামদাস মূল মহাভারতে বর্ণিত কোনো কোনো বিষয় অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, আবার কোনো কোনো অংশ একেবারে বর্জন করেছেন। নারদের কাছে যুধিষ্ঠিরের তীর্থস্নানের ফল শোনার প্রসঙ্গটি মূল মহাভারতের অনুসরণে রচিত হলেও, এটি কাশীরামদাস খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া, মূল মহাভারতের যুধিষ্ঠিরাদির বক-ঋষির উপদেশ লাভ, পুরাতত্ত্ব-স্মরণে দ্রৌপদীর আত্মপ্রসাদ লাভ, ধৌম্যের কাছে যুধিষ্ঠিরের বনান্তর গমন-প্রার্থনা এবং ধৌম কর্তৃক বিবিধ পুণ্য বনের বর্ণনা ইত্যাদি অংশ কাশীরামদাস বর্জন করেছেন।

বিরাটপর্ব—কাশীরামদাস বিরাটপর্ব আরম্ভ করেছেন 'ব্যাসবর্ণন' বা মহামুনি বেদব্যাসের স্তব-স্তুতি করে। মূল মহাভারতে এরকম বর্ণনা নেই। বিরাট রাজার সভায় প্রবেশের পূর্বে যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব, দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও রাজ্য-প্রাপ্তিরূপ বরলাভ ইত্যাদি মূল মহাভারতের বিষয়গুলি কাশীরামদাস বাদ দিয়েছেন। তাছাড়া, পঞ্চপাণ্ডবের বিরাট রাজসভায় প্রবেশের পরম্পরা কাশীরামদাস পরিবর্তিত করেছেন। বিরাট রাজগৃহে ভীমের মল্লযুদ্ধ-প্রসঙ্গে মূল মহাভারতে 'ব্রহ্ম-মহোৎসব' উপলক্ষে মল্লযুদ্ধ ও মহামল্ল জীমূত-বধের উল্লেখ রয়েছে। অপর পক্ষে, কাশীরামদাসের মহাভারতে 'শঙ্কর যাত্রা' উপলক্ষে কেবল মল্লযুদ্ধ নয়, তার সঙ্গে নানা ধরনের নৃত্য-গীত মহোৎসবের উল্লেখ রয়েছে এবং কোনো মল্লবীরের নামোল্লেখ কাশীরামদাস করেন নি।

'কীচক বধ' অংশে কাশীরামদাস যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টি করে বৈচিত্র্য এনেছেন। অর্জুনের দশনাম-কথন অংশ মূল মহাভারতেও রয়েছে। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে গান্ধারীর সঙ্গে কুন্তীর শিবপূজা নিয়ে বিরোধের কাহিনী এবং অর্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ মূল মহাভারতে নেই। বিরাট রাজার গোধন-হরণ উপলক্ষে কুরু-সৈন্যের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের বর্ণনা অংশে অনেক ক্ষেত্রেই কাশীরামদাসের স্বীকয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

কাশীরামদাস বাংলায় মহাভারত রচনা করেছেন। তাঁর রচনা অনেকাংশে মূল মহাভারতের ভাবানুবাদ। মূল বিষয়বস্তুকে অভিন্ন রেখেও কবি অনেক জায়গায়ই স্বাধীনতা অবলম্বন করে মূলের কোনো কোনো অংশ বর্জন এবং নতুন নতুন অংশ সংযোজন করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। প্রয়োজনবোধে কোনো অংশ সংক্ষিপ্ত, আবার কোনো অংশের বিস্তারিত বর্ণনাও করেছেন।

কাশীরামদাসের মহাভারতের চরিত্রগুলিরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মূল মহাভারতের চরিত্রগুলি কঠিন ও কোমল, বিরাট ও লঘু, সুন্দর ও ভয়ংকরের সমন্বয়ে রচিত অপরূপ সৃষ্টি। কাশীরামদাস চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সব ক্ষেত্রে অনুধাবন করতে পারেন নি। তিনি তাদের যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তার মধ্যে স্থূল হস্তাবলেপের চিহ্ন জায়গায় জায়গায় ফুটে উঠেছে।

মূল মহাভারত পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলেই স্বীকৃত হয়েছে। কাশীরামদাসের মহাভারত যে সেই অনুপম মহাকাব্যের বাংলা প্রতিরূপ নয়, তা স্বীকার করতেই হয়। তিনি পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে ও পাঁচালীর ঢঙে মহাভারতের 'অমৃতসমান'-কথাকে বাংলা রূপ দিয়েছেন।

যেসব ক্ষেত্রে কাশীরামদাস নিছক অনুবাদ করেছেন, সেখানে তাঁর মৌলিক কবি-ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। কাশীরামদাসকে কবি হিসাবে আমরা পাই, যেসব অংশ তিনি নিজে সংযোজন করেছেন সেই অংশগুলিতে। তাঁর নিজস্ব কবি-প্রতিভার বিকাশ এখানেই ঘটেছে। এই মৌলিক অংশগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে রয়েছে কোথাও বেশ কৌতুকপ্রিয়তা, কোথাও নাট্যধর্মিতা, আবার কোথাও বা করুণ রসের সমারোহ। যেমন জন্মেজয় রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করা, হিড়িম্বা ও দ্রৌপদীর বিবাদ (মূল মহাভারতের বিরোধী), বিভীষণের বধ হওয়া, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় ধনুকের ছিলা পরাতে গিয়ে রাজাদের দুরবস্থা, মেনকা ও বিশ্বামিত্রের ঘর-সংসারের বর্ণনায় স্বামীর ক্রোধ দেখে ভয়ে মেনকার পলায়ন, বিরাট রাজগৃহে ভীমকর্তৃক কীচক-বধ, বিরাট রাজের গোধন হরণকারী কুরুদলের সঙ্গে যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে অর্জুন ও উত্তরোর কথোপকথন, কৌরব সৈন্য দর্শনে ভীত এবং রণ-বিমুখ উত্তরের প্রতি অর্জুনের শাণিত উক্তি প্রয়োগ, উনশত ভাইসহ কীচকের মৃত্যুর পরে, দ্রৌপদীকে দেখে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থার বর্ণনা, ইত্যাদি অনেকক্ষেত্রেই কাশীরামদাস লঘু হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করেছেন। নাটকীয়তা সৃষ্টির দিকেও কাশীরামদাসের বেশ ঝোঁক ছিল। সুভদ্রা-হরণ অংশ তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান ও নলরাজার উপাখ্যানেও যথেষ্ট নাটকীয়তা রয়েছে। গভীর কাব্যরস পরিবেশনের সুযোগ কাশীরামদাসের ছিল না। তাঁকে মোটামুটি একটা বাঁধা ছকে পথ চলতে হয়েছে। তবুও ত্রিপদী-ছন্দে রচিত অংশে যথেষ্ট কাব্যরসের সন্ধান মেলে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দ্রৌপদীর আকুল-স্বরে আহ্বান—ত্রিপদীবন্ধে রচিত। এই অংশে যথেষ্ট করুণ-রসমিশ্রিত কাব্যরসের পরিচয় মেলে। শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় বর্ণনা, শ্রীবৎসের সঙ্গে রাণী চিন্তার ও নল-রাজার সঙ্গে দময়ন্তীর পুনর্মিলন বর্ণনা, ইত্যাদি অংশে কাশীরামদাস গভীর কাব্যরস পরিবেশন করেছেন। বিরাটপর্বের শুরুতেই মহামুনি বেদব্যাসের স্তব-স্তুতির বর্ণনা আমাদের মনোহরণ করে। ছদ্মবেশী সারথি অর্জুন সম্পর্কে কৌরবদের অনুমান, পরিচারিকাবেশী দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণনা, ইত্যাদি অংশ ত্রিপদী-ছন্দে উচ্চাঙ্গের কাব্যরস-মণ্ডিত হয়েছে। এ ছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তরের প্রতি পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য সম্পর্কে অর্জুনের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আমাদের মনোহরণ করে।

কাশীরামদাসের মহাভারত বাংলাদেশে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। একমাত্র কৃত্তিবাস ছাড়া, অপর কোনো কবির রচনা অনুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত বাংলার 'জাতীয়

কাব্য'। বাঙালি-কণ্ঠে কৃত্তিবাসের সঙ্গে কাশীরামদাসের নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয়। উভয়েই নিজ নিজ কাব্যধারায় সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি।

সতেরো শতকের রাঢ়ের অন্যান্য মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যে নন্দরামদাস, দ্বৈপায়ন দাস, জয়ন্তদেব, কৃষ্ণানন্দ বসু এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব রচনা করেছিলেন। নন্দরামদাস রচনা করেছিলেন—উদ্যোগ, দ্রোণ ও কর্ণ-পর্ব। কৃষ্ণানন্দ বসু রচনা করেছিলেন—শান্তিপর্ব এবং জয়ন্তদেব ও দ্বৈপায়নদাস রচনা করেছিলেন স্বর্গারোহণপর্ব। এঁদের রচিত পর্বগুলির মধ্যে অনেকগুলি বর্তমানে কাশীরাম দাসের মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের ভণিতাতেও এখন কাশীরামদাসের নাম পাওয়া যায়। এঁদের কারোরই জীবৎকাল-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। নন্দরামদাসের সময়-সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় লিখেছেন—"বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী হইতে সংগৃহীত ১০৮৩ সনের একখানি দামোদরের পদাবলীর উপর লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বর্ষে ১৮ই ফাল্গুন কৃষ্ণা-তৃতীয়ার দিন নন্দরামদাসের মৃত্যু ঘটে।"[১]

এই শতাব্দীরই একজন মহাভারত রচয়িতা জিত ঘটক। তিনি কাশীরামদাস-রচিত অসম্পূর্ণ বনপর্বকে সম্পূর্ণ করেছিলেন, 'পঞ্চপুষ্প রস শশি পরিমান শক'—অর্থাৎ ১৬০৫ শকাব্দ বা ১৬৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এঁদের সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

॥ ভাগবত ॥

বাংলা ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ খুব বেশী হয় নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে দুজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের মধ্যে একজনের নাম সনাতন চক্রবর্তী, অপরজন সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ। এঁদের মধ্যে সনাতন চক্রবর্তীর দেশ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। সনাতন ঘোষালের জন্ম হয়েছিল কলিকাতার ঘোষাল বংশে এবং কটকে বসে ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

। **সনাতন চক্রবর্তী**। সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবত দুবার মুদ্রিত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রথমবার তা ছেপেছিলেন লালচাঁদ বিশ্বাস নামে একজন প্রকাশক। তিনি অবশ্য এর একাদশ স্কন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন। ১৭৮০ শকাব্দের (১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) আষাঢ় মাসের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সমালোচনা করেছিলেন।[২] এর পরে, বঙ্গবাসী-কার্যালয় থেকেও এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তা দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সনাতন চক্রবর্তী নামক…একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তক রচনার কাল নির্দেশ

১. বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা. পৃ. ২৶।
২. পৃ. ৭২।

করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে উহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।'[১] বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে রঘুনাথ পণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ লেখেন, "সনাতন চক্রবর্তী সমগ্র ভাগবতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"[২]

সনাতন চক্রবর্তীর এই ভাগবত এখন আর একেবারেই পাওয়া যায় না। কয়েক বছর আগে আমরা একটি নামপত্রহীন ছাপা বাংলা ভাগবত দেখেছিলাম। তার ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর হওয়া সম্ভব। ভণিতায় শুধুমাত্র 'সনাতন' নামটি উল্লিখিত রয়েছে। এই ছাপা বইতে কেবলমাত্র একাদশ স্কন্ধই ছিল। সম্ভবতঃ এটি সেই লালচাঁদ বিশ্বাস প্রকাশিত সংস্করণ।

। **সনাতন ঘোষাল**। ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধ সনাতন ঘোষাল বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই নয় স্কন্ধের পুঁথি বর্তমানে বিশ্বভারতীর পুঁথিভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে।[৩]

সনাতন ঘোষালের ভাগবতের প্রায় প্রত্যেক স্কন্ধের শেষেই রচনাকালবাচক একটি করে শ্লোক রয়েছে। এর প্রথম স্কন্ধের রচনাকাল "কলানিধি বিষ্ণুপদ কাল"—(১৬০১) শকাব্দের কার্তিক মাস অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয় স্কন্ধের রচনাকাল "ষোলশ ষোড়শ"—(১৬১৬) শকাব্দের পৌষ মাস অর্থাৎ ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। তৃতীয় স্কন্ধের রচনা সমাপ্তিকাল "ঋতু চন্দ্র কাল শশী"—(১৬১৬) শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। চতুর্থ স্কন্ধের রচনাকাল "বসু চন্দ্র ঋতু শশী"—(১৬১৮) শকাব্দের আষাঢ় মাস অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। পঞ্চম স্কন্ধের রচনা সমাপ্তিকাল "গজ শশী রস চন্দ্র"—(১৬১৮) শকাব্দের অগ্রাণ মাস অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। নবম স্কন্ধের রচনাকাল "গগন যুগল ঋতু সমুদ্র কুমার" (১৬২০) শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

নবম স্কন্ধের শেষে সনাতন ঘোষাল যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায়, তাঁর পিতামহের নাম কৃষ্ণানন্দ, পিতার নাম রামচন্দ্র এবং তিনি পিতার মধ্যম পুত্র। তাঁর জন্ম হয়েছিল কলিকাতার ঘোষাল-বংশে। কলিকাতা বৃহত্তর রাঢ়েরই অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে সনাতন ঘোষালকেও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

সনাতন ঘোষাল ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের সময়ে তিনি শ্রীধর স্বামীর টীকাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল।

---

১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃ. ৪৭২।
২. পৃ. ৩, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং ৯০১-৯০৯।

মঙ্গলকাব্য

'ধর্ম কর্ম করে সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥'

দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক আখ্যান কাব্যগুলি সাধারণ ভাবে 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা এই 'মঙ্গলকাব্য'।

রাঢ়-অঞ্চলে অসংখ্য লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার প্রচলন ছিল সুপ্রাচীন কাল থেকে। সর্প, ব্যাঘ্র, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি বহুমুখী সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভের কামনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ নানা রকম দেবদেবীর শরণাপন্ন হতো। মুসলমান আমলে বিধর্মী রাজশক্তির উৎপীড়নে অসহায় সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে এই সব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এইভাবে দেবদেবীর জনপ্রিয়তা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনিই তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে 'মঙ্গলকাব্য'ও রচনা হতে থাকে। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের ওপরেই এই সব 'মঙ্গলকাব্যে'র প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

বাংলা 'মঙ্গলকাব্যে'র ধারায় 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'ধর্মমঙ্গল' এই তিন শ্রেণীই প্রধান। এ-ছাড়া 'কালিকামঙ্গল', 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন', 'রায়মঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'লক্ষ্মীমঙ্গল' ইত্যাদি অন্যান্য বহু 'মঙ্গলকাব্যে'র অন্তর্গত কিছু কিছু ছোটো-বড়ো কাব্যও রচিত হয়েছিল।

প্রত্যেক 'মঙ্গলকাব্যে'র কতকগুলি সাধারণ বিষয় লক্ষ করা যায়। কাব্যের সূচনায় দেবদেবীর বন্দনা, দিগ্‌বন্দনা, শাপভ্রষ্ট দেবদেবীর কাব্যের নায়ক-নায়িকারূপে জন্মগ্রহণ করা, বিবাহ-বাসরে নারীদের পতিনিন্দা, বিবাহের বর্ণনা, খাদ্যের বর্ণনা, নায়িকার বারোমাসের দুঃখের বর্ণনা বা 'বারমাস্যা' ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অবতারণা অধিকাংশ 'মঙ্গলকাব্যে'ই পাওয়া যায়।

॥ মনসামঙ্গল ॥

'মনসামঙ্গল'-কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। দেবী মনসার পূজা করলে সর্পের ভয় থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় বলে সমাজে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এই মনসা দেবীর ঐতিহ্য খুব প্রাচীন।[১] কোনো কোনো

১. পূর্ববর্তী 'রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি' শীর্ষক অধ্যায়ে মনসা দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পণ্ডিতের মতে ঋক্‌বেদে প্রচ্ছন্নভাবে এই মনসা দেবীর উল্লেখ রয়েছে।[১] লৌকিক বিশ্বাস অনুসারে মনসা শিবেরই কন্যা। অবশ্য তাঁর কোনো জননী নেই। চণ্ডী এঁর বিমাতা। ইনি আস্তিকের জননী এবং জরৎকারু ঋষির স্ত্রী। মহাভারতে উল্লিখিত নাগরাজ-ভগিনী জরৎকারুর সঙ্গে ইনি অভিন্না। চণ্ডীর সঙ্গে বিরোধের ফল হিসেবে মনসার একটি চক্ষু কানা হওয়াতে অ-ভক্তেরা এঁকে 'কানী' বলে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

। **ক্ষেমানন্দ**। সতেরো শতকের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের কবিদের মধ্যে প্রথমেই কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি রাঢ়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁর কাব্যের আত্মকাহিনী অংশ থেকে জানা যায়,[২] পশ্চিমবঙ্গের সেলিমাবাদ পরগণায় কবির বাস ছিল। এঁর পিতার নাম শঙ্কর মণ্ডল, ভাইয়ের নাম অভিরাম। স্থানীয় শাসনকর্তা বারাখাঁর মৃত্যুতে দেশে অরাজকতা দেখা দিলে, কবির পিতা তিন পুত্রকে নিয়ে দেশত্যাগ করেন এবং রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্লের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাভ করেন। সেখানেই একদিন দেবী মনসা বস্ত্র বিক্রয়িনী-মুচিনীর বেশে কবিকে দেখা দেন এবং কাব্য রচনার আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হন। সম্প্রতি কোনো কোনো গবেষক দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ক্ষেমানন্দ স্বপ্নে দেবী মনসার সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' রাঢ়-অঞ্চলে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আজও সে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে।

'মনসামঙ্গল'-কাব্যের মূল কাব্য-কথায় একটি সহজ মানবিক আবেদন রয়েছে। মধ্যযুগের গ্রামীণ বাংলার গার্হস্থ্য জীবন-রসের আবেদন তার এক মুখ্য উপাদান। কিন্তু সেই দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে'র কাহিনী-অংশ নিবিড় ভাবে দানা বাঁধতে পারে নি। বিভিন্ন পালাগুলি যেন ক্ষীণ সূত্রে গাঁথা বিচ্ছিন্ন গল্পের টুকরোর মতো। মাঝে মাঝে পৌরাণিক কাহিনীর সংযোজন, গল্পের প্রবহমানতাকে আরও ব্যাহত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, গল্পের পারস্পরিক সংহতি রক্ষার চেয়েও বিচ্ছিন্ন অথচ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী রচনায় ক্ষেমানন্দের আন্তরিক প্রবণতা ছিল। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় তাঁর কাব্য জুড়ে নানাভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কবির সম্মুখে পূর্ববর্তী মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কাশীরামদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাহিত্য-কীর্তির উজ্জ্বল আদর্শ থাকায় তাঁর কাব্যের ভাষা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও গ্রাম্যতা বর্জিত হয়ে উঠেছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে পৌরাণিক আখ্যানের বর্ণনা যথেষ্ট পাওয়া যায়, আবার লৌকিক প্রসঙ্গের মধ্যেও পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচনার সচেতন প্রয়াসও লক্ষ

১. বা. সা. ই. ১৷অ, পৃ. ১৭৭।
২. বি. ভা. পুঁ. সং ৯৮৬, ১০৮৯, ১০১৪, ১৮২৭, ১৯০৬ ও ১৮২৭ প্রঃ।

করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, মনসার উদ্ভব ও পরিচয় প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা যায়। সেখানে মনসার জন্ম সম্পর্কে প্রচলিত গল্প-কাহিনীর সঙ্গে কবি বেদ পুরাণের ঐতিহ্য সংযোজিত করেছেন।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরামের মতো পরিবেশ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তৎকালীন দেশ-কাল সম্পর্কে কবি যে অ-সচেতন ছিলেন এমন কথাও বলা চলে না। মনসা কর্তৃক 'হাসানের পুরী-নাশের উদ্যোগ' অংশে মুসলমান-সমাজের সামগ্রিক রূপের যে ছবি পাওয়া যায়, তাকে নিখুঁত বাস্তব বর্ণনা বলা গেলেও, সেখানে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর প্রভাব দুর্লক্ষ নয়। মুকুন্দরামের প্রভাবের দৃষ্টান্ত অন্যত্রও পাওয়া যায়। যেমন 'জালুমালু'র গৃহে দেবী মনসার আবির্ভাব ও তাঁর সঙ্গে 'জালুমালু'র কথোপকথন অংশ, কালকেতু ও দেবী চণ্ডীর কথোপকথনের সঙ্গে আংশিক ভাবে তুলনীয়।[১]

কেমনে তোমার প্রাণ শুখান মৎস্যের ঘ্রাণ
দাণ্ডাইতে নাহি বাস ঘৃণা।
... ...
ছাড়িয়া আমার ঘর যাও তুমি স্থানান্তরে
অনুচিত এখানে বিশ্রাম॥
... ...
মোর ভাঙ্গা ঘর কোটা চৌদিগে মীনের কাটা
চরণ বাড়াইতে নাহি স্থান॥

'মনসামঙ্গল'-কাব্যের প্রধান চরিত্র চাঁদ সদাগর। পরম শৈব ও চণ্ডীর উপাসক চাঁদ সদাগর দেবী মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচারের প্রধান অন্তরায়। প্রতিষ্ঠালোলুপ দেবতার কোপ সহজেই চাঁদের উপরে পড়ে। চাঁদ সদাগরের দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের কাহিনী সব 'মনসামঙ্গল'-কাব্যেই কম-বেশী বর্ণিত হয়েছে। ক্ষেমানন্দের চাঁদ সদাগরকেও আমরা দেখি স্বধর্ম ও আদর্শ রক্ষা করতে অনেক লাঞ্ছনা ও দুর্দশাকে বরণ করে নিতে। কিন্তু, নিদারুণ নির্যাতনও চাঁদ সদাগরকে বিন্দুমাত্র আদর্শচ্যুত বা স্বধর্মচ্যুত করতে পারে নি। লখিন্দরের মৃত্যুতে যে চাঁদ সদাগর ভেবেছে—

'ভাল হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ।
চেঙ্গমুড়ি কানি সঙ্গে ঘুচিল বিবাদ॥'[২]

অর্থাৎ, এবারে মনসার সঙ্গে বিবাদে আর কোনো স্নেহের বন্ধনের ভয় রইলো না। সেই চাঁদ সদাগরই বেহুলা কর্তৃক লখিন্দর-সহ ছয় পুত্রের প্রাণ ও হৃত চৌদ্দডিঙ্গা ফিরে পেয়ে এবং স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদের মুখ চেয়ে—

---

১. বি. ভা. পুঁ. সং ১৮৬, প. সং. ১২৮ক-খ।
২. বি. ভা. পুঁ. সং ১২০৬, প. সং ১৪খ।

'বিপাকে হারাই পাছে হাতে পায়্যা নিধি।'[১]

এই ভেবে মনসার পূজা করতে সম্মত হলো। তবু তাঁর মনে দ্বিধা ছিল—

'যে হাতে পূজিনু মুই সোনার গন্ধেশ্বরী।
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরি।'[২]

ইত্যাদি উক্তিতেই তার প্রকাশ ঘটেছে। এইখানেই চাঁদ সদাগর চরিত্রের সার্থকতা। পৌরুষের সঙ্গে স্নেহের, দৃঢ়তার সঙ্গে কোমলতার মিলনে চাঁদ সদাগর চরিত্রের সার্থক বাস্তব রূপায়ন।

তবে ক্ষেমানন্দের কাব্যের শুরুতে সমুদ্র-মন্থন কালেই চাঁদ সদাগরের ভাগ্যকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে[৩] এবং কাব্যের শেষে তাকে দিয়ে মনসার সঙ্গে সমগ্র সর্পকূলকেও পূজা করিয়ে[৪] ক্ষেমানন্দ চাঁদ সদাগর চরিত্রের বলিষ্ঠতার যথেষ্ট হানি করেছেন।

ক্ষেমানন্দের কাব্যের বেহুলা চরিত্রটি আধুনিক সমালোচকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। বেহুলা তার মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে কলার মান্দাসে নিরুদ্দিষ্টের পথে ভেসেছে। পথিমধ্যে একদিকে তার অনিন্দ্যসুন্দর রূপের প্রতি মানুষের আকর্ষণ, অপর দিকে, মৃত স্বামীর গলিত দেহের প্রতি মাংসাশী প্রাণীদের লোভ—এই প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে শেষ পর্যন্ত সে তার লক্ষ্যে পৌঁছেছে। বেহুলার এই দুঃখ-বেদনার বর্ণনায় ক্ষেমানন্দ সার্থক করুণ-রসের সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হয়, আলোচ্য কাব্যের বেহুলা চরিত্রটি যেন খানিকটা ছকে বাঁধা। সে তার পূর্ব-নির্দিষ্ট পথে চলেছে এবং সে যে দেবী মনসার কৃপায় সব বিপদ থেকে সহজেই উদ্ধার পাবে,—এইরূপ একটি মনোভাব তার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। মৃত স্বামী ও ছয় ভাসুরকে নিয়ে গৃহে ফেরার পথে যোগিনী বেশে বেহুলার পিতৃগৃহ দর্শন এবং ডোমনীর বেশে তার শ্বশুর-গৃহে যাওয়ার বর্ণনার মধ্যে ক্ষেমানন্দ যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। এই অংশে বেহুলা চরিত্র হাস্যমুখর হয়ে নতুন দীপ্তি লাভ করেছে।

বাংলা 'মনসামঙ্গল'-কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষতঃ সতেরো শতকের রাঢ়ের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যগুলিতে মনসার চরিত্র বেশ জীবন্ত হয়েছে। বিমাতা চণ্ডীর প্রতি তাঁর ঈর্ষা, চাঁদ সদাগরের লাঠির ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকা, ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে দিয়ে মনসা যেন পরিপূর্ণ মানবী হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছেন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি যেভাবে চাঁদ সদাগরের পুত্রদের প্রাণ সংহার করেছেন, তা অন্যায় হলেও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে অস্বাভাবিক নয়। মনসা অনেক দুঃখ, বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করেছেন, আবার

১. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল', অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। পৃ. ৩০৮।

২. ঐ. ঐ. ঐ. ঐ.

৩. 'চাঁদকে দিলেন হর ব্রহ্মজ্ঞান কন্যা।
মনসারে না মানিবি এই জ্ঞান পায়্যা'। ঐ. পৃ. ২৭।

৪. 'দেবীর বচন শুন্যা হরষিত চাঁদবাণ্যা
আগে পূজে যতেক ভূজঙ্গ।' ঐ. পৃ. ৩৮০।

নিজেও অনেককে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করেছেন। এই সমস্ত বিষয়ের ভিতর দিয়ে মনসা চরিত্র খুব সজীব হয়ে উঠেছে। অন্যান্য কবির রচিত 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের মনসা চরিত্র অপেক্ষা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের মনসার নিঃস্বতা, রিক্ততা ও বঞ্চনার বেদনা আমাদের মনকে অনেক বেশী আর্দ্র ও অভিভূত করে তোলে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে কোথাও কোথাও সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নৈষ্ঠিক অনুসরণ, বিশেষ করে সংস্কৃত শাস্ত্র-সম্মত নারীর বর্ণনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কখনও কখনও এই বর্ণনা হয় তো স্বাভাবিক সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছে।[১] তবু একথা ঠিক যে, এই পরিমিতি-বোধ সম্পর্কে অ-সচেতনতা খুব দৈবাৎ ঘটেছে। কোথাও কোথাও আবার বর্ণনার পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে।[২]

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও কোথাও কোথাও ভাষা ও ছন্দের এমন পারিপাট্য লক্ষ করা যায়, যা আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের অন্যান্য 'মঙ্গলকাব্যে' দুর্লভ। উদাহরণ স্বরূপ চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙ্গা ডোবাবার উদ্দেশ্যে মনসা-প্রেরিত জলধরগণের প্রলয়-সৃষ্টির বর্ণনা অংশ উল্লেখ করা যায়। আলোচ্য অংশটি ছন্দের সুষমায় ও ভাষার চাতুর্যে এক উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এর কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

'পুষ্কর দুষ্কর ধাইল সত্বর
করিতে ঝড় বরিষণ।
আসিয়া কালীদয় করিল উদয়
ডুবাইতে সাধুর না॥···
হুড় হুড় দুরদুর পড়িছে চিকুর
যেন বেগে ধায় গুলি।
বলিছে কাণ্ডার নাহিক নিস্তার
ভাঙ্গিল মস্তক খুলি॥
দেখিতে অদ্ভুত পড়িছে বিদ্যুৎ
আচ্ছাদিল গগনে ভানু।
বিপদ গুণিয়া বলিছে বাণিয়া
কেনবা বাণিজ্যে আইনু॥'

কবি এখানে ছন্দের আর শব্দের ঝংকারে প্রলয় দেবতার ডমরুর সুরটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যের ভাষায় মাধুর্য সৃষ্টির জন্যে অনেক

১ হাসন-হুসনের চর সাভার মুখে দেবী মনসার রূপ বর্ণনা।

২. সনকা কর্তৃক পূজিত দেবী মনসার 'বারী' ভেঙে ফেললে, চাঁদের প্রতি সনকার উক্তি, মনসা কর্তৃক চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ হলে চাঁদের প্রতি সনকার উক্তি; বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ-প্রসঙ্গে চাঁদের প্রতি সনকার উক্তি ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একই ভাবাত্মক, একই পুরাণ-কথার দীর্ঘ বৈচিত্রহীন বর্ণনা রয়েছে

সময়ে শব্দের ধ্বনিগত চমৎকারিতা সৃষ্টি করেছেন। এইরূপ সৃষ্টির প্রয়োজনে এক দিকে যেমন তিনি প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন, অপর দিকে অপ্রচলিত তৎসম শব্দের ব্যবহার[১], তৎসম শব্দকে ভেঙে অদ্ভুত নতুন নতুন শব্দ-সৃষ্টি[২] এবং প্রচুর হিন্দী এমন কি ব্রজবুলি ভাষারও ব্যবহার করেছেন। সব ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ সার্থক না হলেও, মঙ্গলকাব্যের ভাষার ক্ষেত্রে আভিজাত্য ও বৈদগ্ধ আরোপের প্রচেষ্টার দিক দিয়ে ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

। **বিষ্ণুপাল** । 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের অপর একজন কবি বিষ্ণুপালও রাঢ়ের অধিবাসী। এঁর রচিত 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের ভাষা থেকে এঁকে সতেরো শতকের লোক বলে মনে হয়। বিষ্ণুপালের প্রাপ্ত পুঁথি[৩] থেকে কবির নাম ছাড়া অন্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গলে'র পুঁথিগুলি প্রায় সবই খণ্ডিত এবং কতকগুলি গায়েনের পুঁথি ও সাধারণ ভাবে ভণিতা-বর্জিত। এঁদের মধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত ও ডক্টর সুকুমার সেন-সম্পাদিত পুঁথিটি মোটামুটি ভাবে অখণ্ডিত। পুঁথিগুলির অধিকাংশের প্রাপ্তিস্থান বীরভূম বা উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান। পুঁথির ভাষায়ও আলোচ্য অঞ্চলের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বিষ্ণুপালের কাব্যের ভাষায় অজয়-অববাহিকা অঞ্চলের সুস্পষ্ট প্রভাব এবং উক্ত অঞ্চলে আজও প্রাচীন রীতিতে বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গলে'র গান গাওয়া হয় দেখে আমাদের মনে হয়, আলোচ্য কবি সম্ভবতঃ এই অঞ্চলেরই লোক ছিলেন।

কয়েকটি লৌকিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা ব্যতীত, মোটামুটি ভাবে বিষ্ণুপালের কাব্যের কাহিনীর ক্ষেত্রে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর অনুসরণ লক্ষ করা যায়। কাব্যের সূচনায় ধর্মঠাকুরের পুরাণ-অনুযায়ী সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। তবে, এর কাহিনী অংশ দৃঢ়সংবদ্ধ নয়, খানিকটা খাপছাড়া মতো। অতি জনপ্রিয়তা, গায়েনের সংকলন ও একাধিক সম্পূর্ণ পুঁথির অভাব, এর জন্যে দায়ী হতে পারে। আবার 'বাচাল' বলে চিহ্নিত ছড়া ধরনের পদগুলিতে প্রায় সময়েই মিলের বালাই নেই।

বিষ্ণুপালের কাব্যের ভাষার পারিপাট্য একেবারেই নেই বলা চলে। তবে, এই সহজ সরল গ্রাম্য কথ্য ভাষায় বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর একত্র সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। সহজ সাধারণ ভাষায় পৌরাণিক

---

১. নৌকা অর্থে 'বুহিত্র', কাঠাল অর্থে 'পনস' ইত্যাদির ব্যবহার।

২ 'বানের নন্দিনী উষা সুন্দর আবয়' (অবয়ব)—ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল', অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, পৃ. ৬৪।

অথবা, 'তেজিয়া শিবের পূজা কিছু নাহি খায় রাজা
অনাহারে দিন করে নিভ্যা (নির্বাহ)।' ঐ. পৃ. ৫৯।

৩. বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গলে'র ১৭৩৯, ২২২২, ২৩৮৬, ৩৩৬১-৬৪, ৪৯৫৭, ৫৩৬১, ৬০৩০-৩১ সংখ্যক পুঁথি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষ্ণুপালের সব কটি পুঁথি এবং এসিয়াটিক সোসাইটির ৪৯৯ সংখ্যক সম্পূর্ণ পুঁথিটি আমরা দেখেছি।

রস পরিবেশনে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিষ্ণুপালের সমাজ-সচেতনতাও অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক ছিল। সমকালীন জীবনের আচার আচরণের খুঁটিনাটি বর্ণনা যেমন রয়েছে, তেমনি এঁর কাব্যের অনেক জায়গায়ই শাস্ত্রাচার ও দেশাচার সমান অধিকার পেয়েছে। এইখানেই বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের জনপ্রিয়তার মূলসূত্র।

বিষ্ণুপালের কাব্যে সহজ প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার বা উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের রূপটি কোথাও কোথাও উজ্জ্বল হয়েছে। যেমন—

'মা যদি মরে বলে বাপে কিবা কাজ।
মা মরে গেলে ছেলের মুণ্ডে পড়ে বাজ॥
মা মরে গেলে ছেলের বাপ তাওই।
মা মরে গেলে ছেলে হয় বোনের বাবই॥'[১]

অথবা—

'বাপের ভিক আছে বুনি জদি মাগ্যে খাই।
মাগিঞা কি খাব পাছে কুমন্দকে ডরাই॥
নিকুলিন হয়া জদি ধনের ঘরকে জাই।
পিড়া পানি থাকুক আগু সম্বাসা না পাই॥'[২]

বিষ্ণুপাল অনেক সময়ে দু-একটি ছত্রের মাধ্যমে সহজ কৌতুক রসের পরিবেশন করেছেন। যেমন, শিবের লাম্পট্য সম্পর্কে কবির সরস উক্তি—

'অথর্ব্ব হইল বুড়া জখন আইসে ঘর।
বুড়ার তরঙ্গ দেখ বিভা করিবার বর॥
ঘরকে আসিবার বেলে বুড়া আইসে খিরি খিরি।
হাত্তে করিঞা আইসেন ত্রিশূল নড়ি॥'[৩]

কন্যার রূপের বর্ণনা দানেও কৌতুক রসের অবতারণা করতে দেখা যায়—

'রূপবতী কন্যার রূপের নাই অন্ত।
ঘর হতে বেরেইতে চৌকাটে ঠেকে দন্ত॥'[৪]

বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গলে'র অন্তর্গত মনসার বিষ-ঝাড়ার মন্ত্রে প্রাচীন চর্যা-ছড়ার ভগ্নাংশ রক্ষিত রয়েছে—

'খটক উম্বর তিস্থর মান।
ছাড ছাড় বিস তো ব্রোহ্মকপাল॥

১. বি. ভা. পু. সং ৬০৩৪, প. সং ২০খ-২১ক।
২. ঐ. ঐ. প. সং ২০খ।
৩. ঐ. সং ৩৩৬৪, প. সং ৯২ক।
৪. ঐ. ঐ. প. সং ৯৫ক।

চেঁতে হোম ভাদ্রে ইন্দ।
ছাড় ছাড় লঙ্কার কাল নিদ ॥
তাউক খুলি বুড়ি ভালি গেল ধনি।
সুরুআ কাপরে লাগি গেল ঘাম ॥
সরুআ কাপরে বিপরিত রা।
কালি কোওলে বিষ ঘা মুখে ধা ॥'[১]

বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে পাঠককুলের মনোরঞ্জনের জন্যে নতুন ধরনের অপ্রধান কাহিনীর সংস্থাপনের সূত্রে কিছু লৌকিক ছড়া-গীতির আমদানী করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মাছের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর তুলনা[২], শ্বশুরের কাছে কোনো পুত্রবধূর রান্নার যোগ্যতা সম্পর্কে গ্রাম্য পরিহাসপূর্ণ বর্ণনা[৩], দুই ভাবী শ্বশুরের মধ্যে হাস্য-কৌতুকের বিনিময়[৪], জনৈক তাঁতি ও তাঁতিনীর আচার-আচরণের গ্রাম্য কৌতুক রসাত্মক বর্ণনা[৫] ইত্যাদি অংশ লোকরঞ্জনের জন্যে সংযোজিত হলেও তৎকালীন প্রচলিত আঞ্চলিক লোক-ছড়া হিসাবে এদের মূল্য যথেষ্ট।

বিষ্ণুপালের কাব্যের ভাষা একান্তভাবে আধুনিক। বীরভূম অঞ্চলে এঁর কাব্যের অধিক প্রচারের ফলে, উক্ত অঞ্চলের কথ্যভাষার কাব্যমধ্যে নির্বিচার প্রবেশ লক্ষ করা যায়। কবির কাব্যের ভাষার আধুনিকতার এটিও অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।

। **সীতারামদাস**। সতেরো শতকে রচিত 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের অপ্রধান কবিদের মধ্যে সীতারামদাসের[৬] নাম করা যায়। সীতারামদাসের জন্ম এবং তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য সতেরো শতকে রচিত হলেও, এঁর 'মনসামঙ্গল'-কাব্য আঠারো শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রচিত হয়। সীতারামদাসের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের রচনাকাল 'শশি বিন্দু চন্দ্র বেদ'—অর্থাৎ ১০১৪ মল্লাব্দে বা ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ। সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর 'পদবী' সম্পর্কে নতুন আলোক সম্পাত করা হয়েছে।

সীতারামদাস তাঁর গৃহদেবতা 'গজলক্ষ্মী'র দোহাই দিয়ে কাব্য রচনা করেন। বিষ্ণুপাল যেমন মনসা দেবীকে, হাসন-হোসেনকে পরাজিত করতে সূর্যের তথা ধর্মের স্মরণ নিইয়েছিলেন, সীতারামদাসও তাঁর 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে দেবী মনসাকে দিয়ে ধর্মপূজা করিয়েছিলেন।

---

১. বি. ভা. পু. স° ১৩৬৪। প. সং ৯৭৭।
২. ড. সুকুমার সেন-সম্পাদিত 'বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল', পৃ. ৫২-৫৩।
৩. ঐ. ঐ. পৃ. ৭৭।
৪. ঐ. ঐ. পৃ. ৭৭-৭৮।
৫. ঐ ঐ. পৃ. ১০০-০৭।
৬. বিশ্বভারতী সংগ্রহে সীতারামদাসের 'মনসামঙ্গলে'র একখানি খণ্ডিত পুঁথি রয়েছে। এর সংখ্যা ৬২১৭।

সীতারামদাসের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যখানি সহজ সরল পাণ্ডিত্য-বর্জিত ভাষায় রচিত। 'হাসন হোসেন'-পালায় সে যুগের মুসলমান সমাজের এবং তৎকালীন বারাঙ্গনা সমাজের নিখুঁত বাস্তব-চিত্র পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও দু-একটি ছত্রের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরের ছবিও ফুটে উঠেছে—

'খাটে বস্যা খাসা বিবি কানে সোনার কড়ি।
গলায় হেস্যা হাথে টাড় খোস রঙ্গের বুড়ি॥
নাল চরকা সুতা কাটেন ছেল্যা পিএ মাঞি।
ফটক দুয়ার ফাক পড়্যাছে তাহে খবর নাঞি॥
ছেল্যার উলান করেন বিবি দেখা দিলেন বোড়া।
ভাতের সানক হাথে লয়্যা বান্দি আছেন খাড়া॥'[১]

কোথাও আবার দু-একটি ছত্রের মধ্যে দিয়ে গ্রাম জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে—

'খাটের উপরে সব ঢালিয়াছে গা।
পড়্যা ঘুমের ঘোরে কোলে কোলে ছা॥'[২]

সীতারামদাসের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণে নতুনত্ব না থাকলেও মোটামুটি ভাবে কাব্যখানি সুখপাঠ্য।

॥ চণ্ডীমঙ্গল ॥

মনসার মতো চণ্ডীর ঐতিহ্যও খুব প্রাচীন। রাঢ়ের প্রচলিত 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে যে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, তাঁর পৌরাণিক স্বরূপের সঙ্গে লৌকিক ঐতিহ্য মিশে এই দেবীকে নবরূপ দান করেছে।[৩] এই দেবী প্রধানতঃ বন্যপশুর অধিষ্ঠাত্রী, কান্তারবাসিনী দুর্গা।

প্রচলিত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কাহিনী দুটির মধ্যে প্রথমটি ব্যাধ-দম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী। অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ কালকেতু ও তার সাধ্বী স্ত্রী ফুল্লরা চণ্ডীর কৃপায় ধনলাভ করে নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। পরে, পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গরাজের আক্রমণে তাদের সাময়িক দুর্দশা দেখা দিলেও, দেবী চণ্ডীর কৃপায় তারা অচিরেই বিপন্মুক্ত হয়। 'চণ্ডীমঙ্গলে'র দ্বিতীয় কাহিনীটি এক বণিক্-পরিবারের সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এটি ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীমন্তের কাহিনী। এর মধ্যে ভক্তদের ওপর চণ্ডীর কৃপাবর্ষণ ও অ-ভক্তকে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করবার দৃষ্টান্ত মেলে।

'চণ্ডীমঙ্গলে'র প্রথম কবি মাণিক দত্তের নাম পরবর্তী কবিগণের কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডক্টর অসিতকুমার

১. বি. ভা. পু. সং ৬২১৭, প. সং ১৩খ।
২. ঐ. ঐ. প. সং ১৩ক।
৩. পূর্ববর্তী 'রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি' শীর্ষক অধ্যায়ে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ দুজন মাণিক দত্তের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। প্রথম জন 'চণ্ডীমঙ্গলে'র আদি কবি এবং অপর জন মুকুন্দরামের পরবর্তী কবি। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাণিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য প্রকাশিত হয়েছে।[1] কিন্তু তার ভাষা অর্বাচীন ও মুকুন্দরামের প্রভাব বর্জিত নয়। সুতরাং একে নির্বিচারে আদি মাণিক দত্তের কাব্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি শঙ্করকিঙ্করের 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'গৌরীমঙ্গলে'র পুঁথি কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে।[2] ষোড়শ শতকে সম্ভবতঃ একাধিক 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁর 'চণ্ডীমঙ্গলে'র রচনাকাল "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়জিত"—অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

। মুকুন্দরাম। 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের, তথা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' জনসাধারণের কাছে 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' নামেই পরিচিত। এই গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতক কি সপ্তদশ শতক, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা পরবর্তী "সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকটি প্রধান সমস্যার বিচার" - শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি, মুকুন্দরাম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেছেন।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের অন্তর্গত আত্মকাহিনীটি থেকে জানা যায়, কবির নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামিন্যা গ্রামে। সেখানকার তৎকালীন ডিহিদার মামুদ (মহম্মদ) সরিফ প্রজাদের উপরে অত্যাচার করতে থাকেন এবং মুকুন্দরামের প্রভু ভূস্বামী গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী করেন। তখন কবি হিতৈষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশত্যাগ করেন। পথে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে এক জায়গায় দেবী চণ্ডী কবিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করতে বলেন। অতঃপর মুকুন্দরাম বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আরড়া গ্রামে উপস্থিত হয়ে, ব্রাহ্মণভূমের রাজা বাঁকুড়া রায়ের কাছে আশ্রয় লাভ করেন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পরে রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে চিত্রিত শিব-সতী-পার্বতী চরিত্রের অনুসরণ লক্ষ করা যায় পরবর্তী কালে রচিত 'শিবায়ন' কাব্যগুলিতে। আলোচ্য অংশে মেনকা ও পার্বতীর আচরণের খুঁটি-নাটির মধ্য দিয়ে কবি তৎকালীন মধ্যবিত্ত চাষী ঘরেরই ছবি এঁকেছেন।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের। এর মধ্যে যে মানবিক রস রয়েছে, তা তুলনা রহিত। এই কাব্যখানি বাণীর দীপ্তি লাভ করেছে এবং রসমণ্ডিত

১. ডঃ সুনীলকুমার ওঝা-সম্পাদিত।
২. পুঁ. প. ৩য়, পৃ ৪০ ৭৫ দ্রঃ।

হয়েছে। এই কাব্যের মধ্যে মানুষের জীবন, মানুষের সুখ-দুঃখ, মানুষের হৃদয়ের কথা যেমন নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে, তেমনই এর চরিত্রগুলিও পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

জীবন সম্পর্কে মুকুন্দরামের যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা ছিল, তারই রূপায়ণ দেখা যায় 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে। মুকুন্দরাম তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষভাবে দুঃখের অভিজ্ঞতাই লাভ করেছেন, তাই এই কাব্যে দুঃখের চিত্রগুলিই জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কবির ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ব্যাথা-বেদনা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যথার্থ রূপলাভ করে যে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে, বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামই তা সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন। কাব্যের সঙ্গে জীবনের এমন নিবিড় যোগ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নি। প্রথমেই কবির আত্ম-কাহিনীটি একটি অপূর্ব করুণ-রসাত্মক আলেখ্য। মুকুন্দরাম যেখানে বলেছেন—

'তৈল বিনা কৈল স্নান করিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।'

কবি নিজে জল পান করে রইলেন, কিন্তু শিশুর ভাত খাবার জন্যে কান্না সেদিন পিতৃ-হৃদয়কে ব্যাকুল করেছিল। এখানে একটি মর্মস্পর্শী দুঃখের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারপর কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করে উত্তরোত্তর দুঃখের চিত্র দেখতে পাই। হর-গৌরীর সংসার-যাত্রার বর্ণনা, ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধুর অভিশাপ-প্রাপ্তির কাহিনী, কালকেতুর শরে পশুদের খেদোক্তি, ফুল্লরার বারমাস্যা, খুল্লনার দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবন যাত্রা ইত্যাদি বর্ণনাগুলিতে সর্বত্রই দুঃখের তীব্র নগ্নরূপ দেখতে পাই। এই কারণে কেউ কেউ মুকুন্দরামকে 'দুঃখবাদী' কবি বলে অভিহিত করেন। কিন্তু মুকুন্দরাম দুঃখকেই জীবনে সারসত্য বলেন নি। জীবনে দুঃখ আছে বলে তিনি দুঃখের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু, এই দুঃখের পিছনে যে আশার আলো আছে, সে কথাও তিনি শুনিয়েছেন আমাদের। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে এই দুঃখকে জীবনের বিকাশের কাজে লাগাতে পেরেছেন। তাই তিনি জীবন-রসিক কবি।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র ভাষা সরল, বর্ণনা অনাড়ম্বর, কিন্তু তারই মধ্যে অপূর্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। কালকেতুর অত্যাচারে উৎপীড়িত পশুকুলের বর্ণনা, দেবী চণ্ডীর দ্ব্যর্থ-মূলক বাক-পটুতার সঙ্গে ফুল্লরার বুদ্ধির প্রতিযোগিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গের গতানুগতিকতার মধ্যেও, কবির মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ করে নিয়েছে। ফুল্লরার 'বারমাস্যা' মুকুন্দরামের রচনার একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। ফুল্লরার দুঃখের বর্ণনা হিসাবেই নয়, ভাষার চাতুর্যেও এই অংশটি প্রশংসনীয়। যেমন, শ্রাবণ মাসের ও পৌষ মাসের বর্ণনা-অংশের উল্লেখ করা যায়। 'বারমাস্যা' অংশে কাব্য সৌন্দর্য ছাড়াও ফুল্লরা চরিত্রের একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সে ব্যাধ রমণী হলেও বচন-চাতুর্যে কম যায় না। এর পরে কালকেতুর সুখোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি শঠ-চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া

যায়। ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল এবং 'ধনপতি'-উপাখ্যানের দুর্বলা দাসীও এই শ্রেণীর চরিত্র। এদের চরিত্র খুবই জীবন্ত। এদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রের মতো শঠতার এমন জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় একটিও মেলে না। এই কুটিল, স্বার্থান্বেষী ও প্রতারকের চরিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম এই কাব্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর থেকে মুকুন্দরামের রচনা-শৈলীর যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র সাহিত্যিক মূল্যও এই চরিত্রগুলি অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে তুলেছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই কাব্যখানি খুবই সুখপাঠ্য। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই কাব্য পড়তে কোথাও এতোটুকু ক্লান্তি অনুভব হয় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে খুব কম কাব্যই এই গৌরবের দাবী করতে পারে।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের নারী চরিত্রগুলি বিশেষভাবে ফুল্লরা ও খুল্লনার চরিত্র অঙ্কনে কবি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে, ফুল্লরা চরিত্রটি প্রথম দিকে ব্যাধ-নারী হিসাবে যেমন জীবন্ত ও সার্থক, পরবর্তী অংশে রানী ফুল্লরা ততটা সার্থক হয় নি। রানী ফুল্লরা আমাদের অপরিচিত। কারণ সে, বাস্তব জগতের অধিবাসিনী নয়। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গ-রাজের যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে দেখা যায়, ফুল্লরার ব্যাধ নারীর উপযুক্ত বুদ্ধি ছিল ; রানীর উপযুক্ত বুদ্ধি তার একেবারেই ছিল না। যে ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে নিজের গৃহে একাকিনী দেখে এবং সপত্নীর জ্বালায় সে স্বামী-গৃহ ত্যাগ করেছে শুনে বলে—

'সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনে।'[১]

—যে ফুল্লরা চণ্ডীকে সম্ভাব্য সপত্নী ভেবে তার বারমাসের দুঃখের কাহিনী ঘটা করে শোনায়, আবার যেখানে দেবী চণ্ডীর প্রদত্ত 'মাণিক-অঙ্গুরী' পেয়ে বলে—

'একটি অঙ্গুরী নিলে হবে কোন্ কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥'[২]

সে সব ক্ষেত্রে ফুল্লরা চরিত্রে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন গ্রামীণ চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু, রাণী ফুল্লরা এর তুলনায় ম্লান। ফুল্লরা চরিত্রের আর কোনো বিকাশ এই পর্বে আমরা দেখতে পাই না। সুতরাং এই চরিত্র অঙ্কনে কবি সাফল্য এবং অসাফল্য দুই-ই বরণ করেছেন।

খুল্লনা-চরিত্রটিকে মুকুন্দরাম অনেকটা আদর্শ চরিত্ররূপে অঙ্কিত করেছেন। বিয়ের পর থেকেই নতুন জীবনের একটানা দুঃখ-বেদনার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার প্রথম জীবনের ক্ষণিক সুখভোগের চিত্রগুলি যেন অস্পষ্ট ও ম্লান হয়ে গেছে। সপত্নী-

১. ক. ক. চ. পৃ., ২৪৯।
২. ঐ. পৃ. ২৮৭।

কোমলে সে বুদ্ধিহীনা না হলেও, অসহায় বালিকামাত্র। তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় বণিক সভায় পরীক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে। ধনপতি অর্থদানের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করতে চাইলে বুদ্ধিমতী খুল্লনা বলে—

'খুল্লনা বলেন নাথ বলিহে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে॥
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে বঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক॥'[১]

এরপরে খুল্লনা-চরিত্রের আমরা আর একটি রূপ দেখতে পাই। এক দিকে প্রবাসী-স্বামীর জন্যে বেদনা বোধের সঙ্গে অপর দিকে যুক্ত হয়েছে তার একমাত্র সন্তানের বিচ্ছেদ বেদনা। এই দুঃখকেও খুল্লনা অপরিসীম ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছে। তার অন্ধ-মাতৃস্নেহ মুহূর্তের জন্যেও পুত্রের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। নিজের চরিত্রের উপরে সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই খুল্লনা তার জীবনের একটির পর একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কাব্যের প্রথমেই সেই একান্ত বালিকাটির কর্তব্যপরায়ণা জননীতে উত্তরণেই খুল্লনা-চরিত্রের স্বার্থকতা।

লহনা-চরিত্রটিও মোটামুটি ভাবে সুচিত্রিত। লহনা সহজ সরল গ্রাম্য স্ত্রীলোক। সে সংসারে সপত্নী আগমনের সংবাদ পেয়ে যতো সহজে কাঁদে, স্বামীর কাছ থেকে অলঙ্কার প্রস্তুত করবার জন্যে পাঁচ পল মাত্র সোনা পেয়ে, সে দুঃখ ততো সহজেই ভুলে যায়। আবার রন্ধনশালে থাকতে থাকতে তার রূপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে তার স্বামী তাকে সপত্নী এনে দিচ্ছে—একথাও সে সহজেই বিশ্বাস করে। কারণ জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির শক্তি তার ছিল না। সে যতো সহজে সপত্নী খুল্লনাকে ভালবাসে, ঠিক ততো সহজেই দাসী দুর্বলার স্বার্থ-জড়িত পরামর্শে সেই ভালোবাসাকে ঈর্ষায় পরিণত করে। তারপর খুল্লনার প্রতি যে-কোনো রকম আচরণ করতেই তার আর বাধে না। আবার যেখানে সেই খুল্লনাই ছাগল চড়িয়ে গৃহে ফিরতে দেরী করে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লহনার অবদমিত স্নেহ সেখানে দু-একটি কথার মধ্যে দিয়ে সহজেই আত্মপ্রকাশ করে—

'পরের বচনে তারে দূর কৈলুঁ দয়া।
অন্নকষ্ট দিয়াছি আপন মাথা খায়্যা॥'[২]

এখানে লহনা-চরিত্রের সার্থকতা। লহনা বর্ষিয়সী নিঃসন্তান স্ত্রীলোক। নারী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ তার মধ্যে হয় নি। তাই তার অপূর্ণ মাতৃ-হৃদয় কখনও হিংস্ররূপে আবার কখনও স্নেহময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কারণেই চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে।

১. ক. ক. চ. (ধ. উ.), পৃ. ১৮০।
২. ঐ. পৃ. ১০৭।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে কালকেতু-চরিত্রে স্থানে স্থানে কবির কৃতিত্ব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি স্থানে স্থানে সামঞ্জস্যের অভাবও দৃষ্টি এড়ায় না।

কালকেতু সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে শাপ-ভ্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র। কিন্তু তার কার্যকলাপের মধ্যে দেবতার বা রাজপুত্রের বৈশিষ্ট্য কিছুই দেখা যায় না। প্রথম থেকেই সে একজন ব্যাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার চলা বলা কিছুই সুচারু-সুন্দর নয়। কালকেতুর অত্যাচারে পীড়িত পশুকুলের ক্রন্দনও যেন কতকটা অতিরঞ্জন বলে মনে হয়। কারণ, কালকেতুর বিক্রমে বাঘ-সিংহ-হাতি-ভালুক ইত্যাদি সমস্ত বনের পশু যখন তটস্থ তখন কালকেতু বাঘের চামড়া, হাতির দাঁত ইত্যাদির ব্যবসা করে সহজেই ধনী হতে পারতো। কিন্তু, তা হয় নি। যদিও কাব্য মধ্যে ফুল্লরার হাটে গিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া, গণ্ডারের খড়্গ বিক্রীর কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু তবু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, কালকেতু দু-একটি পশু বধ করে ঘরে আনে এবং তার স্ত্রী ফুল্লরা সেই মাংস হাটে বিক্রী করে সামান্য দু-চার পয়সা রোজগার করে। অতএব দেখা যায়, মুকুন্দরাম এই চরিত্রকে যতটা চমকপ্রদ করতে চেয়েছেন, তার স্বাভাবিকতা ও সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে তিনি ততটা নজর দেন নি। যাই হোক, এর পরবর্তী অংশে কালকেতু চরিত্র খানিকটা জীবন্ত হয়েছে। কালকেতু ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে মারতে যাবার দৃশ্যে, তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সরলতার পরিচয় আমাদের মনোহরণ করে। কিংবা, দেবী চণ্ডীর বরে ধনপ্রাপ্তির পরে, সেই প্রাপ্তধন সম্পর্কে চণ্ডীকেই সন্দেহ করে কালকেতু যখন সতর্ক হয়—

'পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছু পানে চায়॥
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধন ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী॥'[১]

তখন কালকেতুর সেই আচরণের মধ্যে দিয়ে সহজ সন্দেহ-প্রবণ গ্রামীণ চরিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু ধূর্ত মুরারী শীলের শঠতার জালে বন্দী না হয়ে কালকেতু যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তা তার চরিত্রের স্বাভাবিকতার হানি ঘটিয়েছে।

এরপরে কালকেতু রাজা হলো। রাজোচিত বিজ্ঞতা তার ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ ভাঁড়ু দত্তের শঠতা সে প্রথম থেকেই বুঝতে পারে নি! তাকে শুধু সে আশ্রয় দেয় নি, প্রশ্রয়ও দিয়েছিল। ভাঁড়ু দত্ত যখন প্রজাদের উপরে অত্যাচার করলো, তখন কালকেতু তাকে ভর্ৎসনা করলো, এবং দুর্বিনীতের মতো কথা বলায় কালকেতু তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। এখানেও কালকেতুর অদূরদর্শিতার পরিচয় পাই। তার উচিত ছিল ভাঁড়ু দত্তকে বন্দী করে রাখা। তা না করার ফলে সে অনায়াসেই রাজার কাছে ফিরে কলিঙ্গ-রাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে রাজ্য আক্রমণ

১ ক. ক. চ. পৃ. ২৮৯।

করালো। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কালকেতু যা করলো, তা একজন বীরের পক্ষে খুবই লজ্জার কথা। এ কাজ ব্যাধ কালকেতুর পক্ষে যেমন খুবই স্বাভাবিক, তেমনি রাজা কালকেতুর পক্ষে শুধু ভীরুতা নয়, নির্বুদ্ধিতারও পরিচায়ক। সুতরাং কালকেতু চরিত্রেও কিছু কিছু সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। প্রথম থেকেই তাকে অসাধারণ করে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তার নগণ্যতা যেন শেষ পর্যন্ত ঘোচে নি। যেখানে কালকেতু একজন সরল ব্যাধের মূর্তিতে দেখা দিয়েছে মাত্র, সেখানেই সে স্বাভাবিক হয়েছে।

মুকুন্দরাম কালকেতু চরিত্রটি সৃষ্টির সময়ে প্রথানুগতা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন নি। ব্যাধদের জীবন সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা ছিল, তাতে কালকেতুকে তিনি অনায়াসেই একজন স্বাভাবিক সরল ব্যাধরূপে আঁকতে পারতেন। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শ—নায়ককে বীর, মহৎ কর্তব্য-পরায়ণ ও সর্বগুণান্বিত করে সৃষ্টি করা। মুকুন্দরাম সেই আদর্শের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করতে পারেন নি। ফলে, সরল ব্যাধের চরিত্রে তিনি অসাধারণত্বের প্রলেপ লাগিয়েছেন। যার ফলে চরিত্রটি আংশিকভাবে জীবন্ত হলেও পরিপূর্ণভাবে দেখতে গেলে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়েছে।

ধনপতি চরিত্রটি মোটামুটি ভাবে সুচিত্রিত। ধনপতি শিবের ভক্ত। চণ্ডীর প্রতি তার কোনোই শ্রদ্ধা নেই। সে নিজের আদর্শে অবিচল থেকেছে; শত নির্যাতনেও সে ভেঙ্গে পড়ে নি। অবশ্য ধনপতি চরিত্রের অপর একটি দিকও রয়েছে। তাতে কিছু কিছু এমন বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করা হয়েছে, যা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। সে পরিজন সঙ্গে নিয়ে পারাবত-ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করে। খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে লহনার কথা ভুলে গিয়ে, তাকে বিবাহ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রেমেও তার নিষ্ঠা নেই। তাই প্রবাসে গিয়ে সে অনায়াসেই দুই স্ত্রীর কথাই ভুলে গিয়ে নতুন করে বিলাস-জীবন রচনা করেন। গৃহসুখ তার ভাগ্যে ছিল না। তাই প্রথম জীবনের রূপমোহকে কাটিয়ে উঠে স্থায়ী কল্যাণের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সে পেলো না। কিন্তু কাব্যের শেষে প্রবাসে নিজ পুত্রকে সে চিনতে পারে না। তাই, বন্দীশালা থেকে উদ্ধার পেয়ে উদ্ধারকর্তার প্রতি সকৃতজ্ঞ উক্তির মধ্যে দিয়ে ধনপতি চরিত্রের করুণ রূপই ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে দিয়ে ধনপতি-চরিত্রের নিষ্পিষ্ট চিত্তের মাধুর্য ও মহিমাটুকু প্রকাশ পেয়েছে।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। এই কাব্যের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও দীপ্তিপূর্ণ, চরিত্রগুলিও তেমনি (সব ক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক। তদানীন্তন সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির বিশদ বর্ণনা তাঁর এই কাব্যে পাওয়া যায়। সেই বর্ণনার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। কিন্তু সাহিত্য-রসিকের কাছেও তাদের আকর্ষণ কম নয়।

সতেরো শতকে রাঢ়ের অন্যান্য যে সমস্ত কবি 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজগঙ্গাদাস, কৃষ্ণরামদাস এবং হরিরামের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিজগঙ্গাদাস মুকুন্দরামের সমসাময়িক কবি। এঁর কাব্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

কৃষ্ণরামদাসের লেখা চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথিরও অংশ বিশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আলোচ্য কাব্য দুখানি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন বলে এ সম্পর্কে পরবর্তী 'সতেরো শতকের অপরিচিত ও স্বল্প পরিচিত কবিগণের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক আলোচনা' শীর্ষক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে।

। **হরিরাম**। হরিরামের লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'কালকেতু-ফুল্লরা' এবং 'ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্তের কাহিনী'—এই উভয় কাহিনীই পাওয়া যায়।[১] হরিরাম সম্ভবতঃ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর অংশের অধিবাসী ছিলেন। কারণ ইনি কাব্য মধ্যে শোভাসিংহ নামক এক ব্যক্তির জন্য চণ্ডীর প্রসাদ ভিক্ষা করেছেন। এই শোভাসিংহ সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের চেতুয়া বা বরদাবাটী পরগণার জমিদার শোভাসিংহের সঙ্গে অভিন্ন। এই শোভাসিংহ সতেরো শতকের শেষ দশকে মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অল্প পরে নিহত হন। হরিরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'ও এর কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।[২]

॥ **ধর্মমঙ্গল** ॥

চণ্ডী ও মনসার মতো ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করেও রাঢ় অঞ্চলে একটি সাহিত্য ধারা গড়ে উঠেছিল। 'ধর্ম পূজা পদ্ধতি', 'ধর্মপুরাণ' ও 'ধর্মমঙ্গল'—এই ত্রিবিধ আশ্রয়ে এই বিশেষ মঙ্গলকাব্য ধারাটি গ্রথিত। অবশ্য, আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের রচনা তারিখ সংবলিত কোনো স্বতন্ত্র 'ধর্ম পূজা পদ্ধতি'র পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা যায় নি।

ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা। এই দেবতার পরিকল্পনায় যে সূর্য, বরুণ, যম, বুদ্ধ ইত্যাদি দেব রূপ কল্পনার প্রভাব রয়েছে, ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী 'রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি' শীর্ষক অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মঠাকুরের পূজা প্রধানতঃ রাঢ়-অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ এবং রাঢ় অঞ্চলের জীবন-চর্যাই এই কাব্যে বিধৃত হয়েছে। এই কারণেই 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা হয়ে থাকে। 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের রচয়িতা প্রায় সকলেই রাঢ়ের অধিবাসী। হিন্দু-সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর, বিশেষ করে ডোম, বাগদি, হাড়ি ইত্যাদি জাতির

---

১. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃঃ ৪৪৯ দ্রঃ।
২ ঐ. ঐ. ঐ. ঐ.

লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরের উপাসক। 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের জনপ্রিয়তাও বিশেষ ভাবে এদের মধ্যেই ছিল। যদিও উচ্চবর্ণের কবিরাই কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু তার জন্যে এবং আসরে ধর্মমঙ্গল গান করার কারণে অনেক সময়েই তাঁদের সমাজে হেয় হতে হয়েছে।

'ধর্মপুরাণে'র কাহিনী তিনটি অংশে বিভক্ত। সৃষ্টিকাহিনী, ধর্মপূজা পদ্ধতি ও ধর্মপূজা প্রবর্তনের কাহিনী। অবশ্য, কোনো কোনো 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যেও 'সৃষ্টিপত্তন' কাহিনী ও ধর্মপূজা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ধর্মপূজা প্রবর্তনের কাহিনীতে সদাডোম কর্তৃক ধর্মঠাকুরকে প্রথম পূজা করা এবং রামাই পণ্ডিত কর্তৃক ধর্মপূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো 'ধর্মপুরাণে' এই কাহিনী হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনীতে অনুবৃত্ত হয়েছে।

। **যাদুনাথ** । সতেরো শতকের রাঢ়ে রচিত যে একটিমাত্র 'ধর্মপুরাণে'র কথা জানা যায়, সেটি যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ'। এই 'ধর্মপুরাণে'র রচনাকাল সতেরো শতকের শেষ দশক।

আলোচ্য কাব্যে যাদুনাথ, কৃষ্ণরাম রায়ের বর্ধমানের রাজা হওয়ার উল্লেখ করে কাব্য-সমাপ্তি কাল জানিয়েছেন—

'মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরি।
সেইকালে কৃষ্ণরাম নিল বসুন্ধরী॥
ভার্যা বন্দি দাস হয়ে কবরী তাহার।
সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমার॥'[১]

কৃষ্ণরাম রায় সম্বন্ধে আমরা জানি যে, তিনি ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের নিকট থেকে চাকলে বর্ধমানের জমিদারীর সনন্দ লাভ করেন। ভারত সম্রাটের সনন্দ-প্রাপ্তির এই তারিখ কৃষ্ণরামের অধিকার লাভের চূড়ান্ত স্বীকৃতি। কিন্তু, এর কিছু পূর্বেই তিনি অধিকার লাভ করেছিলেন। সুতরাং, যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ'ও আলোচ্য সময়ের কিছু পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

যাদুনাথের প্রকৃত নাম যাদবরাম নাথ। পিতার নাম বিনোদ নাথ, পিতামহের নাম দামোদর পতি।

'দামোদরপতি পিতা দোমেতে আলয়।
পুণ্যবান বিনোদ নাথ তাহার তনয়॥
হতমূর্খ যাদুনাথ তাহার সন্তান॥'[২]

১. ড. পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত 'যাদুনাথের ধর্মপুরাণ', পৃ. ১০।
২. ঐ. ঐ. ভূ. পৃ. ১০৪।

পুত্রের নাম শোভারাম।[১] কবি সম্ভবতঃ জাতিতে যুগী (নাথ) ছিলেন। যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে'র পুঁথিখানিও পাওয়া গিয়েছে হাওড়া জেলার ডোমজুড় গ্রামে এক যোগী-তাঁতীর বাড়ী থেকে।[২]

যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে'র কাহিনী-অংশ যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তেমনই এতে ধর্ম-পূজা পদ্ধতিরও বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয় যে, যাদুনাথ 'ধর্মপুরাণ' রচনা করলেও ময়ূরভট্টের উল্লেখ কোথাও করেন নি। আবার এঁর দৃষ্টিতে রামাঞি পণ্ডিত মানুষ নন, 'ধর্মমঙ্গলে'র প্রকাশক স্বয়ং ধর্মঠাকুর।

'কলি অবতার আপুনি নিরঞ্জন
রামঞি পণ্ডিত [না]ম।'[৩]

অথবা—

'রামাঞি সয়ঙ্ক নিরঞ্জন'[৪]

যাদুনাথ এই কাব্যে ধর্মঠাকুরের দশাবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ ও কল্কি অবতারকে একীভূত করে যবন বাদশাহরূপে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়েছেন।

'দশমে বন্দিনু বৌদ্ধ কল্কি অবতার।
সত্য শূন্য তার নাম মেলচ্চ-আকার॥
যবনরূপে দিল্লীয়ে কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালি।
যবনরূপে একাকার সংহারিলে কলি।'[৫]

যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে'র কাহিনী-অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এতে যেমন মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য—'দেবদেবীর বন্দনা', 'দিগ্‌বন্দনা', 'চৌতিশাস্তব', 'বারমাসী-বর্ণনা', 'নায়কের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন' এবং অবশেষে 'স্বর্গারোহণ' ইত্যাদি সবই রয়েছে; 'ধর্মপূজা বিধানে'র মতো 'ধর্মপূজা পদ্ধতির' ক্রমিক পর্যায়গুলি (মন্ত্রতন্ত্র বাদ দিয়ে) সুগ্রথিত হয়েছে। আবার 'ধর্মপুরাণে'র কাহিনী—রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী মদনার ধর্মপূজা প্রসঙ্গের পৌরাণিক আখ্যায়িকাও এর প্রধান উপজীব্য রূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং, 'ধর্মমঙ্গল', 'ধর্মপুরাণ' ও 'ধর্মপূজা পদ্ধতি'র সমন্বয়ে আলোচ্য 'ধর্মপুরাণ'-গ্রন্থখানি এক বিচিত্র রচনা।

যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে'র ভাষা সহজ এবং পাণ্ডিত্য বর্জিত। আলোচ্য কাব্যে তৎকালীন সময়ের বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ রীতি-নীতিরও ইঙ্গিত রয়েছে। সমসাময়িক কালের সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যার মূল্য অনস্বীকার্য।

---

১. 'রক্ষ পুত্র শোভারামে'। যাদুনাথের ধর্মপুরাণ, পৃ. ৬১।
২. যাদুনাথের ধর্মপুরাণ, ভূ. পৃ. ১ দ্রঃ।
৩. ঐ. পৃ. ২৩।
৪. ঐ পৃ. ৫৬।
৫. ঐ. পৃ. ৭।

'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের প্রথম কবি হিসাবে ময়ূরভট্টের নামই প্রচলিত। পরবর্তী 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য রচয়িতাগণ 'ধর্মমঙ্গলে'র প্রথম কবি হিসাবে ময়ূরভট্টের নাম করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ময়ূরভট্টের কোনো নিঃসন্দিগ্ধ রচনা পাওয়া যায় নি।[১] ময়ূরভট্টের কথা বাদ দিয়ে রচনাকাল হিসাবে বিচার করলে 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের আদি কবি রূপরাম চক্রবর্তী। এছাড়া শ্যাম পণ্ডিত, রামদাস আদক, ধর্মদাস বণিক ও সীতারামদাস প্রমুখের নামও আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের কবি হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকের কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য অবশ্যই সমান নয়। তবে, চরিত্রগুলি প্রায় সব কবির কাব্যেই জীবন্ত হয়েছে। একমাত্র লাউসেনের চরিত্র বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে যাওয়ায়, কিছু পরিমাণে প্রাণহীন। সাধারণ ভাবে প্রায় সব 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যেই তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেদের তুলনায় নিম্নবর্ণের লোক-চরিত্রগুলিই বেশী সার্থক হয়ে উঠেছে। এছাড়া সে যুগের যোদ্ধাজাতি ডোমেদের বীরত্ব ও রাঢ়ের সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রার নিখুঁত পরিচয় এই সব কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

। **রূপরাম** । সপ্তদশ শতকের রাঢ়ের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের কবিদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। রূপরামের বাড়ী ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে। রূপরামের পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতার নাম দৈমন্তী অর্থাৎ দময়ন্তী। শুজা যে সময়ে বাংলার শাসনকর্তা (১৬৩৯-৫৯ খ্রীঃ) রূপরাম তখন কাব্যরচনা আরম্ভ করেন। কবি তাঁর আত্মকাহিনী অংশে লিখেছেন—

'রাজমহলের মাঝে যবে ছিল সুজা।
পরম কল্যাণে আছিলত সব প্রজা ॥'

তাঁর কাব্য সম্পূর্ণ হয় শুজার শাসনকালের অল্প পরে। রূপরামের কাব্যরচনাকাল নিয়ে আমরা পরবর্তী সতেরো শতকের বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকটি প্রধান সমস্যার বিচার'-শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

কাব্যের প্রারম্ভে রূপরাম 'ধর্মমঙ্গল'-রচনার সূত্র হিসেবে নিজের প্রথম জীবনের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই আত্মকাহিনীটি রসঘন ও তথ্যপূর্ণ। এই আত্মকাহিনী অংশে সে যুগের সমাজ-জীবন সম্পর্কে যেমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়, তেমনই ছোট গল্পের মতো একটি পরিপূর্ণ জীবন-রসোজ্জ্বল কাহিনীও পাওয়া যায়। তবে, মুদ্রিত পুস্তকে লেখা রয়েছে যে, রূপরাম গুরুগৃহ থেকে ফিরে তাঁর মায়ের দেখা পেলেন না—তাঁর বড়ো ভাইয়ের আপত্তির কারণে। এই কথা একেবারেই বিশ্বাস-যোগ্য নয়। অনেক পুঁথিতে যে পাঠান্তর পাওয়া যায়[২], তাতে দেখা যায় মায়ের সঙ্গে রূপরামের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ, "বড় ভাই-

১. 'শ্রীধর্মপুরাণ' (বি. ভা. পু. সং ১৩৬০)-এর ভণিতার 'নিবাস শ্রীযোর গ্রাম মৌরভট্ট নাম'—যোর গ্রামের ভট্ট উপাধিধারী কোনো ধর্মমঙ্গলকার ময়ূরভট্ট নামে খ্যাত ছিলেন সম্ভবতঃ এই নির্দেশই করে।

২. 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল', ডক্টর সুকুমার সেন ও ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত, ভূ. পৃ. ১৸৶. দ্রষ্টব্য।

এর শাসন যতই কঠোর হউক, তাহা মায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিতে পারে না।"[১] আত্মকাহিনীতে রূপরামের প্রতি ধর্মঠাকুরের উক্তির মধ্যে একটি আশ্চর্য পঙ্‌ক্তি পাই— 'যে বোল বলিবে তুমি সেই হব গীত'[২]—এই ছত্রটি রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' পঙ্‌ক্তিটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রূপরামের কাব্যের চরিত্র চিত্রণ শক্তি প্রশংসনীয়। তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রই প্রাণহীন নয়। বিশেষ করে মহামদ, লখাই, কালুডোম, হরিহর বাইতি, ধুমসী প্রভৃতি চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রূপরামের প্রখর বাস্তববোধ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং পরিবেশ রচনায় দক্ষতা, চরিত্র-চিত্রণে স্বাভাবিকতার সৃষ্টি করেছে। তাই, প্রত্যেকটি চরিত্রই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও কথায় প্রত্যেকটি চরিত্রের আন্তর-পরিচয় নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'শালেভর' পালায় রঞ্জাবতীর আত্মবিসর্জনের পূর্ব মুহূর্তের দ্বিধা খুব সুন্দরভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন—

'সন্ন্যাস করিতে রঞ্জার তনু অবসেষ।
তথাপি না পাইল রঞ্জা ধর্ম্মের উদ্দেস ॥
সামুলার পাত্র ধরি করিল রোদন।
কেন মরে বিমুখ হৃঞিল নিরঞ্জন ॥
তুমি বলেছিলে বুনি চাপাই নদি যাবে।
আট দিনে সেখানে ধর্ম্মের দেখা পাবে ॥
... ...
সভে চল ঘরে জাই ঘটে বিসর্জ্জন।
ঘরে গিয়া বুড়া রাজার করিব পালন ॥
সামুলা বলেন রানি সালে ভর দেয়।
সালে ভর দিয়া তুমি পুত্রবর নেঅ ॥
... ...
রঞ্জাবতী বলে জদি সালে দিব ভর।
কবে মরে সাক্ষাতে হইবে মাধাধর ॥
সবে বলে মরিলে জীবন নাঞি পায়।
তোমার বচন শুন্যা প্রাণ উড়্যা যায় ॥
শালকাঁটা আগুন বজ্রর সম ধার।
ইথে ঝাঁপ দিলে নাঞী জীবনে নিস্তার ॥'[৩]

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সামুলা ও দাসদাসীগণের উৎসাহদানে রঞ্জাবতী যেন কতকটা দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই শালে ভর দিতে বাধ্য হলো।

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৫১৯।
২. 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল', ডক্টর সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত, পৃ. ২০।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং ৮৮৯। প. সং ৩ ক-খ।

'আমি যদি ভর দিব সালের উপর।
আমি মলে এখনি তোমরা জাবে ঘর॥
সামুলা বলেন আমি ঘর নাই জাব।
তুমি মলে তুই বনে চামর ঢুলাব॥
বিনঅ করিয়া বলে ইছারাণা হাড়ি।
তুমি ভর দিলে মরা নাই জাব বাড়ি॥
তিনদিন থাকিব ধর্ম্মের মুখ চেয়্যা।
নহে প্রাণ তেজিব গরল বিষ ক্ষেয়্যা॥
এত শুনি রঞ্জাবতী হরসিত মন।'[১]...

রূপরামের কাব্যে যুদ্ধের বর্ণনায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। বিভিন্ন 'মঙ্গলকাব্যে' যুদ্ধ-সজ্জার যে বর্ণনা আমরা পাই, রূপরামের বর্ণনা তাদের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, বিস্তৃততর ও সমধিক বাস্তব-ঘেঁষা। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে কাড়া-নাকাড়ার শব্দে যুদ্ধ-সজ্জার সংকেত-ধ্বনি, সৈন্য-সজ্জা, যুদ্ধের আয়োজন ও বিপুল সংখ্যক সৈন্যের বিচিত্রতর পোষাক ও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খাদ্য ও পানীয় সমেত অগ্রগতিতে যথেষ্ট বাস্তব-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সৈন্য-সমাবেশ, যুদ্ধে উত্থান-পতনের গতিময়তায়, সংঘর্ষের বাস্তব চিত্রণে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের পরস্পরের প্রতি আস্ফালন ও অহঙ্কারবাক্য প্রয়োগে, যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রের বর্ণনায়, বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যের বর্ণনায়, শব্দ নির্বাচনের ও শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষার উচ্ছলতাকে সংযত করে প্রচণ্ড সংঘর্ষের যে চিত্র কবি অঙ্কিত করেছেন, তাতে একদিকে যেমন তাঁর কল্পনার সমৃদ্ধি, অপরদিকে তেমনি সূক্ষ্ম বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এর কারণ, রূপরামের জীবৎকালের বাস্তব অভিজ্ঞতা। রূপরাম সম্ভবতঃ মোগলের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থরচনার সময়ে খালিপে হাকিমের পরাজয় ঘটেছিল। তবে, একথা ঠিক যে, রূপরামের কাব্যে হিন্দু আমলের কাহিনী গ্রথিত হলেও যুদ্ধসজ্জা ও ফৌজ-চলাচলের বর্ণনায় তিনি সমকালের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তাই আলোচ্য কাব্যের এই অংশ সাহিত্য ও ইতিহাসে বিজড়িত হয়ে বর্তমানে, তৎকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের উপরে এক বিচিত্র আলোকপাত করেছে।

রূপরামের কাব্যের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। প্রকাশের ঋজুতা, মিতভাষিতা, পরিমিতিবোধ ও মানবরসের স্পর্শ রূপরামের কাব্যের ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করে দীপ্তি সঞ্চারিত করেছে। রূপরামের কাব্যের রুচিবোধও অত্যন্ত মার্জিত। অতি স্থূল গ্রাম্য রসিকতা তিনি কোথাও করেন নি। রূপরামের কাব্যের কৌতুক, জীবনের উপর এক স্নিগ্ধ, রসোজ্জ্বল আলোকরেখা বিকীরণ করে। সমগ্র কাব্যে প্রসারিত এক সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে তিনি পাঠক সাধারণের মনকে জয় করেছেন। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-

১. বি. জা. পুঁ. স ৮৮৯। প. সং ৩৩।

কাব্যের পুঁথি যা পাওয়া গিয়েছে, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বা কাশীরামদাসের 'মহাভারতে'র প্রাপ্ত পুঁথি থেকে তা সংখ্যায় বেশী। এর থেকেও রূপরামের নিঃসন্দিগ্ধ জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

। **শ্রীশ্যাম পণ্ডিত** । 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের অপর একজন প্রাচীন কবি শ্রীশ্যাম পণ্ডিত। এঁর কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত পুঁথি সবই খণ্ডিত অথবা অপর কোনো কবির কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত। বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৪০৮-সংখ্যক পুঁথিতে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক এই দুই কবির রচনা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। আলোচ্য পুঁথিটির তারিখ ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব শ্রীশ্যাম পণ্ডিত এই তারিখের অন্ততঃ ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের কাব্যের সামান্য নিদর্শন হিসাবে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। সোমঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা—

'প্রথমে উমুরা সাজে হাসন হুসন।
কাজে যবন তারা সবার সমন॥
হাথি ঘোড়া পদাতিক পচাসি হাজার।
সভার সঙ্গে সেনা সাজিল সুসার॥
সোলসয় খোজা তার সাজে নিজ সাথে।
হেড়া রুটি পান পানি থাকে জার হাথে॥
এরাকি ঘোড়ায় চলে নানা অস্ত্র ধরে।
তবে সাকি বাকি সাজে দুই সহোদরে॥
জাতে মগর মূর্তি দেখিতে সুন্দর।
... ...
নিরঞ্জনমঙ্গল শুনহ সর্ব্বজন।
শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ভাসে আনন্দিত মন॥'[১]

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের কাব্যে অনেক প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে। লাউসেন গৌড় যাত্রা-পথে কামারের কাছে যেভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছে, তাতে বল্লালসেনের নাম পাওয়া যায়। এরকম বর্ণনা-অংশ আর কোনো 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে পাওয়া যায় নি।

'শুন মোর পূর্ব্বকথা নিবাস আছিল যথা
কহি তোরে করিয়া নিশ্চয়।
কনকসেন পিতামহ সেনভূমে ছিল সেহ
কর্ণসেনের আমি তোক।
বল্লালসেনের গোষ্ঠি যার সৃষ্ট অনাসৃষ্টি
যার কীর্ত্তি ঘোষে সর্ব্বলোক॥'[২]

---

১. বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮। প. সং ১৭খ।
২. বা. সা. ই. পৃ. ৫১৪।

আলোচ্য কবির কাব্যের প্রাপ্তিস্থান বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চল। কবিও সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম রাঢ়েরই লোক ছিলেন। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের কাব্যে প্রচুর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

। **রামদাস আদক** । সতেরো শতকের রাঢ়ের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের অপর কবি রামদাস আদক। এঁর কাব্যরচনা কাল 'বেদ বসু বাণ চন্দ্র'—(১৫৮৪) শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

রামদাসের কাব্যের মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে দেখা যায়, এর অধিকাংশই রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের হুবহু অনুসরণ। কেবল ভণিতায় রূপরামের স্থানে রামদাস আদকের নাম পাওয়া যায়। এর থেকে কোনো কোনো গবেষক অনুমান করেছেন যে, রামদাস আসলে রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে'র গায়েন ছিলেন। পরে স্বাধীনভাবে গান রচনা করতে শুরু করেন; এবং রূপরামের কাব্যের সামান্য পরিবর্তন সাধন করে তার থেকে রূপরামের ভণিতা তুলে দিয়ে কাব্যটিকে নিজের নামে প্রচার করেন।

রামদাস আদকের সমস্ত পুঁথি বিশ্লেষণ করলেই এই অনুমানের যথার্থ প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হতে পারে। আপাততঃ আমরা রামদাসের কাব্যকে যেভাবে ছাপা অবস্থায় পাচ্ছি, তার মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্যই আবিষ্কার করা যায় না, যা রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে নেই। এই কারণেই রামদাস আদকের কাব্যের স্বতন্ত্র কোনো আলোচনা বর্তমানে অপ্রয়োজন বলে মনে করি।

। **সীতারাম দাস (সরকার)** । সীতারামদাস 'হাজার চারি শালে (মল্লাব্দে)' —অর্থাৎ ১৬৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন। কবির পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী। কনিষ্ঠ ভাই শোভারাম—

'নিরঞ্জন পদ আশে সীতারামদাস ভাসে
মনে যত করিয়া ভাবন।
কনেষ্ঠ ভাই শোভারাম তার কর পূর্ণ কাম
হরি-হরি বল সর্ব্বজন॥'[১]

সীতারামদাস জাতিতে কায়স্থ ছিলেন—

'সীতারাম কাএস্ত ধর্ম্মের গীত গায়।'[২]

সীতারামের পদবী সম্ভবতঃ 'সরকার' ছিল। আত্মকাহিনী-অংশে কবি যেখানে তাঁর পিতৃ ও মাতৃকুলের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, কবির কনিষ্ঠ খুল্লতাতের নাম 'কুশলরাম'।[৩] অন্যত্র এই কুশলরামকেই কবি 'কুশলরাম সরকার খুড়া'[৪]—বলে অভিহিত

১. ক. বি. পুঁ. সং ২৪৭৩। প. সং ৬ক।
২. সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'। 'জাগরণ' পালা। প. সং ৩৩ক। শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল-সংগ্রহ।
৩. বা. সা. ই. পৃ. ৫২৯।
৪. ঐ পৃ. ৫৩৬।

করেছেন। আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুঁথিতে[১] অকিঞ্চন সরকার নামে জনৈক ব্যক্তির জন্যে কবিকে ধর্মঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা করতে দেখা যায়—

'অকিঞ্চন সরকারে দয়া দিবে ধর্ম্ম পদছায়া
ভুবনে রাখিবে ভগবান।'[২]

আলোচ্য অকিঞ্চন সরকার সম্ভবতঃ কবির পুত্র অথবা অপর কোনো বিশেষ স্নেহ-ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। এই সব কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সীতারামদাসের পদবী ছিল 'সরকার'।

কবির নিবাস ছিল সুখসায়রে।

'সীতারামদাস গান সুক সায়রে ঘর।'[৩]

একটি পুঁথিতে[৪] পাওয়া যায় সীতারামদাস বাঁকুড়ার রাজা রঘুনাথ সিংহের (বীর হাম্বীরের পুত্র)[৫] অধীনস্থ সাহাপুর পরগণার অন্তর্গত সুখসায়র গ্রামে বাস করতেন।

'জগতে বিখ্যাত মল্যবলি নাথ
রঘুনাথ সিংহ রাজা।
দানে কর্ন্যবির পুণ্যে যুধিষ্টির
বিনসন মহাতেজা॥
তার অধিকারে পরগণে সাহাপুরে
শুক সায়রেতে বাস।
ধর্ম্মের চরণ করি একমন
গায় সিতারামদাস॥'

সীতারামদাসের মাতুলালয় ছিল ইন্দাস। ইন্দাসের ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় সন্ন্যাসীর বেশে পথে দেখা দিয়ে কবিকে কাব্য রচনার আদেশ দেন। কাব্যমধ্যে কবি শুধু বাঁকুড়া রায় নয়, তাঁর দেবালয়কেও বন্দনা করেছেন এবং তাঁর বিস্তারিত বর্ণনাও করেছেন। গৃহদেবতা গজলক্ষ্মীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন কবি। তাঁরই আদেশে ও কৃপায় কবি প্রথমে 'ধর্মমঙ্গল' ও পরে 'মনসামঙ্গল' কাব্য[৬] রচনা করেন।

সীতারামদাসের কাব্যান্তর্গত আত্মকাহিনী অংশটি বিস্তৃত হলেও অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক। সীতারামদাসের একটি পুঁথিতে[৭] পাওয়া যায় 'গণেশ সেন' নামে জনৈক ব্যক্তির গৃহে থেকে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি 'ধর্মমঙ্গলে'র গীত আরম্ভ করেন—

১. পুঁ. সং ৫৫৯৫। লিপিকাল ১০৮৬ সন (মল্লাব্দ)।
২. ঐ. প. সং ১০ক।
৩. ঐ. প. সং ১৪ক।
৪. ঐ. ঐ.
৫. বা. দে. ই. ২য়, পৃ. ৪৫১-৫৩ দ্রঃ।
৬. সীতারামদাসের রচিত 'মনসামঙ্গলে'র কথা ইতঃপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।
৭. ক. বি. পুঁ. সং ৫৫৯৫। লিপিকাল ১০৮৬ (মল্লাব্দ)।

'গণেশ সেনের ঘরে নূপুর দিলেন মোরে
সীতারাম দাস রস গান।'[১]

আলোচ্য গণেশ সেন কে এবং কোথাকার লোক ছিলেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না।

সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের অনেক স্থলেই চিরাচরিত কাহিনীর মধ্যেও ঘরোয়া খুঁটি-নাটির সুন্দর ও বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যায়। সতেরো শতকের দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি দেবতাকে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে মানুষের সুখ-দুঃখময় দৈনন্দিন জীবনের দিকে পড়তে শুরু করে। যার সুমহৎ পরিণতি আমরা ভারতচন্দ্রে দেখতে পাই।

সীতারামদাস অল্পবয়স থেকেই 'মনসামঙ্গল' ও 'ধর্মমঙ্গলে'র পালা গান করতেন বলে মনে হয়। কারণ তিনি বলেছেন—

'অতি মূর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে।'[২]

এই গায়ক-বৃত্তি থেকেই তাঁর কাব্য-রচনায় আগ্রহ জন্মায় এবং তিনি প্রায়ই স্বপ্নে প্রেরণা লাভ করতেন।

'রাতি দিন স্বপনে গীতের কথা শুনি।'[৩]

আমরা পূর্বেই বলেছি, সেকালে ধর্মের গান গাওয়া ও রচনা করা উচ্চশ্রেণীর পক্ষে হীনকার্য বলে বিবেচিত হতো। তাই কবি এই আদেশকে নিজের ভাগ্যের দোষ বলে গ্রহণ করেছেন।

'নরমধ্যে অধম আমার সম নাই।
তব বাক্য মহাপ্রভু লঙ্ঘা গেল নাই॥
... ...
পরকালে কি হব কহ না মহাশয়॥'[৪]

অথবা—

'সীতারাম দাস গান কপালের লেখা।'[৫]

সীতারামদাস তাঁর কাব্য রচনার প্রেরণার পটভূমিতে ধর্মঠাকুরের এই নির্দেশের বিস্তৃতি বিবরণ কাব্যমধ্যে দিয়েছেন। একদিকে ধর্মঠাকুরের অলঙ্ঘনীয় আদেশ, অপর দিকে ধর্মের গান লিখে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হবার ভয়,—কাব্য-রচনার প্রাক্‌কালে কবির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত ছত্র কটির মধ্যে দিয়ে—

'বাউল হয়্যা গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি নিরন্তর।
মনে ইচ্ছা নাই হয় যাই নিজ ঘর॥

১. ক. বি. পুঁ. সং ৫৫১৫। প. সং ১০ক।
২. বা. সা. ই. পৃ. ৫৩২।
৩. ঐ. পৃ. ৫২৮।
৪. ঐ. পৃ. ৫৩২।
৫. ক. বি. পুঁ. সং ২৪৬০। 'মল্লযুদ্ধ' পালা। প. সং ৬ক।

বৈষ্ণবের মত বুলি করি রাম নাম।
দিন কত করিলাম ইন্দাসেতে ধাম ॥'[১]

সীতারামদাসের কাব্যে সহজ সরল কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কোথাও কোথাও। কলিঙ্গার বিবাহের পরে কন্যাকে বিদায় দিতে গিয়ে কাঙুর-মাতার ক্রন্দন অংশটি মর্মস্পর্শী—

'কন্যারে বিদায় দিয়া কাঙ্গুর মাতা।
আমার প্রাণের নিধি হাড়্যা যায় কোথা ॥
আন্ধার ঘরের বাতি হাড়ে যায় কোথা।
না স্তনিব সরু সরু চান্দমুখের কথা ॥
স্বামী লইয়া ঘর কর্য্য কান্দ নাই আর।
স্বামীকে বাসিবে যেন মুনিময় হার ॥'[২]

কলিঙ্গার বিবাহে কাঙুর রমণীগণের পতিনিন্দা-অংশও সহজ সরল কৌতুকরসের পরিচায়ক। কোথাও কোথাও অশ্লীলতার ছোঁয়াও রয়েছে। কানড়াকে বিয়ে করতে গেলে গৌড়েশ্বরের বয়স ও যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ভারীগণের সরল উক্তির মধ্যে দিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে—

'বিদাসঅ বৎসর বএস হল্য তার।
ঘোড়ায় উঠিতে নারে স্তন সমাচার ॥
দলায় চড়িতে হঅ নিদান সময়।
ঠোঙ্গা দিএ খায় দুগ্ধ না খায় ওদন ॥'[৩]

সীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে অনেকগুলি যুদ্ধের ও যুদ্ধ-যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। যুদ্ধ-সজ্জার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সেকালের যুদ্ধে যে, সকল শ্রেণীর লোকেই অংশ গ্রহণ করতো—এ কথা জানা যায়, এবং তাদের মধ্যে কার কি রকম সাজ-পোষাক ছিল, সে সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা করা যায়। যুদ্ধের বর্ণনায় কবি অনেক সময়ে অনুপ্রাসের সুচারু প্রয়োগ করেছেন। আমরা নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি ছত্র নীচে উদ্ধৃত করছি—

'ঘোড়ার ঘুরুনী ঘোর ঘন খায় পাক্।
গায় গায় গজ পড়ে সেনা সব ছাড়ে ডাক্ ॥
... ...
সন্ সন্ সবদে সমরে সর ছাড়ে।
ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কার দুহাথে ঠাগি (?) ঝাড়ে ॥'[৪]

১. বা. সা. ই. পৃ. ৫৩৪।
২. ক. বি. পুঁ. সং ২৪৬৬। 'কলিঙ্গা বিবাহ' পালা। প. সং ১০ক।
৩. ক. বি. পুঁ. সং ২৪৭৪। প. সং ৪ক।
৪. সী. ধ.। 'জাগরণ' পালা। প. সং ১৭ক। শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল-সংগ্রহ।

সীতারামদাসের কাব্যের চরিত্রগুলি মোটামুটি জীবন্ত। রঞ্জাবতীর চরিত্রটি খুব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সহজ-সরল, পুত্রস্নেহে অন্ধ রঞ্জাবতীকে আমরা কাব্য মধ্যে সর্বত্র স্বরূপে আত্মপ্রকাশিত দেখি।

পাত্র মহামদের খল ও জিঘাংসু চরিত্রটিও জায়গায় জায়গায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। ভগিনী রঞ্জাবতীর বৈধব্য ও পুত্র-নাশই শুধু তার কাম্য ছিল না। তার জিঘাংসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। লাউসেনের স্ত্রীদের পর্যন্ত কি করে সর্বনাশ করা যায়, সে চিন্তাও তার মনে স্থান পেয়েছিল। এই মহামদকে আমরা সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় দেখি, বছরের খাজনার টাকা ঠিকমতো জমা না পড়ায়, লুটের দায়ে গৌড়েশ্বর তাকে বন্দীশালায় দিলে, পাত্রের মনোবাসনা অপূর্ণ থাকায় খেদোক্তির মধ্যে দিয়ে—

'আমি মরি বেড়ি পরি তায় দুঃখ নাঞি।
এই দুঃখ রহিল লাউসেন মল্য নাঞি॥
... ...
মরা হাড়ি ময়নায় পেলাব আর কবে।
বেটা বেটা বল্যা বনি কখন কান্দিবে॥'[১]

—এই ছত্র কটির মধ্যে মহামদ-চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

। **ধর্মদাস বণিক**। সতেরো শতকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের আর একজন কবিকে আমরা পাই। এই কবির নাম ধর্মদাস বণিক। ধর্মদাস বণিকের কাব্যের সামান্য উল্লেখ থাকলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এঁর কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা এ পর্যন্ত কোথাও না থাকায়, আমরা পরবর্তী 'অপরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত কবিগণের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক আলোচনা'-শীর্ষক অধ্যায়ে এঁর কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করবো।

॥ শিবমঙ্গল বা শিবায়ন ॥

বহু পূর্ব হতেই শিবঠাকুর বাংলা-কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন। তবে এদেশে, শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রূপটি অক্ষুণ্ণ ছিল না। পৌরাণিক শিব-চরিত্রের সঙ্গে বহু লৌকিক ঐতিহ্য মিলে মিশে গিয়েছিল।[২] এই সব লৌকিক ঐতিহ্য অনুসারে শিব চাষ করেন, গাঁজা-ভাঙ খান, এমনকি তথাকথিত নীচ-জাতীয় লোকেদের পাড়ায় গিয়ে অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গ পর্যন্ত করেন। শিবের গৃহস্থালীর চিত্রও বাঙালির একান্ত পরিচিত—দুঃখ দারিদ্র্যে ভরা। শিবের চরিত্র ও তাঁর গৃহস্থালীর বর্ণনা 'মনসা-মঙ্গল'-কাব্যে ও 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে পাওয়া যায়। সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকে

১. ক. বি. পুঁ. সং ৫৫৯৫। প. সং ৩ক।

২. আমরা শিবঠাকুরের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী 'রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি'-শীর্ষক অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

শিবের কাহিনী স্বতন্ত্র 'মঙ্গলকাব্য'রূপে-রচিত হতে থাকে। এই শ্রেণীর কাব্যই 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন' নামে পরিচিত।

'শিবায়ন'-কাব্যে 'মঙ্গলকাব্যে'র অনেক বিশিষ্ট অঙ্গ অনুপস্থিত। যেমন দেবদেবীদের শাপভ্রষ্ট হয়ে কাব্যের নায়ক-নায়িকা হওয়া, সুখের ও দুঃখের বারমাসিয়া, নারীদের চিত্র-লিখিত কাঁচুলির বর্ণনা, বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের পতিনিন্দা (কোনো কোনো শিবায়নে শাশুড়ীদের জামাতৃ-নিন্দা বর্ণিত হয়েছে) প্রভৃতি। অন্যান্য 'মঙ্গলকাব্যে' এক বা একাধিক প্রধান আখ্যান থাকে এবং তাদের মধ্যে দিয়ে যে দেবতাটির কথা কাব্যটিতে বলা হয়, তাঁর মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। কিন্তু, 'শিবায়নে' এই জাতীয় কোনো আখ্যান নেই। সেখানে কেবল শিবেরই নানা আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত কারণে 'শিবায়ন'কে সম্পূর্ণ 'মঙ্গলকাব্য' বলা যায় না।

। **রামকৃষ্ণ** । 'শিবায়ন'-কাব্যের প্রাচীনতম কবি রামকৃষ্ণ রায়। রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন'-কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১০৯১ বঙ্গাব্দ। এর থেকে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এঁর কাব্যরচনাকাল আনুমানিক সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। কবির পিতার নাম কৃষ্ণ রায়, মাতার নাম রাধাদাসী। দুই পুত্র জগন্নাথ ও বলরাম। কবি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। নিবাস বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত রসপুর-কলিকাতা গ্রামে। রামকৃষ্ণের উপাধি ছিল কবিচন্দ্র।

রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন'-কাব্যে প্রধানতঃ পৌরাণিক শিবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-কাব্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিব প্রসঙ্গ সংগ্রহ করে তাদের একত্র সমাবেশ করা হয়েছে। রামকৃষ্ণের 'শিবায়নে' তা করা হয় নি। রামকৃষ্ণের 'শিবায়নে' প্রধানতঃ পৌরাণিক শিব-কাহিনীকেই অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য কাব্যখানির মোট ছাব্বিশটি পালার মধ্যে কেবলমাত্র ষোড়শ পালাটি (মনসার উপাখ্যান) পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক উপকরণ দ্বারা রচিত। রাঢ়ে প্রচলিত 'শিবমঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন লৌকিক বিষয়, যেমন 'শিবের চাষ', 'মাছধরা', 'গৌরীর শঙ্খ পরা', ইত্যাদি রামকৃষ্ণের কাব্যে নেই। উক্ত অংশগুলি জনপ্রিয় হলেও নিতান্ত রুচি-বিগর্হিত বলেই কবি এগুলিকে সযত্নে পরিহার করেছেন। শিবের লৌকিক চরিত্র এই কাব্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে না পারলেও, 'শিবের বিবাহ', 'হর-গৌরীর কোন্দল' ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনায় নিম্নবিত্ত বাঙালী পরিবারের গার্হস্থ্য চিত্রের বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, 'শিবমঙ্গল'-কাব্যের কোনো কেন্দ্রীয় কাহিনী নেই। উপরন্তু, রামকৃষ্ণের কাব্যে আবার জনপ্রিয় লৌকিক কাহিনীগুলি বিশেষ না থাকায় কাব্যটি আয়তনে বৃহৎ হলেও কাব্যটির আকর্ষণ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। চরিত্র-চিত্রণও তেমন উজ্জ্বল নয়। এই সব কারণে রামকৃষ্ণের কাব্য তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। তাঁর কাব্য পরবর্তী কবিদের কাছে আদর্শরূপেও গৃহীত হয় নি।

। শঙ্কর কবিচন্দ্র। কবিচন্দ্র উপাধিধারী অপর একজন কবির 'শিবমঙ্গল'-কাব্য সতেরো শতকেই রচিত হয়েছিল। গ্রন্থের মধ্যে তিনি লিখেছেন, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর সিংহের রাজত্বকালে (১৬৫৬-৮২ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি কাব্য রচনা করেন।[১] কবির প্রকৃত নাম 'শঙ্কর কবিচন্দ্র'।

'শিবমঙ্গল'-কাব্য রচনায় শঙ্কর কবিচন্দ্র, পূর্ববর্তী কবি রামকৃষ্ণের পৌরাণিক ধারার অনুসরণ না করে শিব-সম্পর্কিত লৌকিক ধারাই অনুসরণ করেছিলেন বলে, এই বিষয়ে তিনি পরবর্তী কবিদের পথ প্রদর্শকের গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'শিবের মৎস্যধরা'-পালা ও 'গৌরীর শঙ্খপরা'-পালা নামক অংশ দুটি আলোচ্য কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই দুটি পালাই সম্পূর্ণ লৌকিক। এই জন্যই আলোচ্য কাব্যের লৌকিক আবেদন অনস্বীকার্য। পরবর্তী কবিরা এই পালা দুটি রচনা করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

।। কালিকামঙ্গল ।।

বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী কালীর[২] মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্যের নাম 'কালিকামঙ্গল'। রাঢ়ের কবিরা যে সমস্ত 'কালিকামঙ্গল'-কাব্য লিখেছিলেন তাদের মধ্যে কালীর পৌরাণিক-প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত কয়েকটি কাহিনী প্রধান আখ্যান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত আখ্যানের মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দরে'র কাহিনীই প্রধান। এই কাহিনীটি ইতিপূর্বে কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যে রূপায়িত হয়েছিল। কিন্তু ঐ কাব্যগুলি একান্ত ভাবেই লৌকিক প্রণয় কাব্য। বাংলার 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যগুলি বেশির ভাগই এই সব লৌকিক সংস্কৃত কাব্যের সগোত্র। কালীর মাহাত্ম্য যেন তাদের ওপর শিথিলভাবে আরোপিত। দু-একটি 'কালিকামঙ্গলে' অবশ্য 'বিদ্যাসুন্দরে'র কাহিনী পাওয়া যায় না—তার পরিবর্তে আমরা অন্য কাহিনী পাই।

। প্রাণরাম। রাঢ়ের 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যের প্রথম কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ভণিতা থেকে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম ছিল মুকুন্দ। কবি নিজেকে 'মুকুন্দনন্দন' বলে কাব্যমধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যের রচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাণরাম এই ভাবে তাঁর কাব্য-রচনা সমাপ্তিকাল নির্দেশ করেছেন—

> 'শকে বসু বসু বাণ চন্দ্র সমন্বিত।
> কালিকামঙ্গল তথি হইল বিদিত॥'[৩]

প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যের আলোচনা কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে

---

১. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ১৩৯।

২. এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী 'রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি'-শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল'-এর মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ২৪৪।

পাওয়া যায় না। কাব্যখানি মুদ্রিত হয়ে ১২৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হলেও, সেই মুদ্রিত গ্রন্থ বা কোনো পুঁথির সন্ধান এযাবৎ পাওয়া যায় নি। বহু পূর্বে প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল' সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।[১] প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গলে'র অস্তিত্ব উক্ত আলোচনাটি ছাড়া অন্য কোথাও ছিল না। সম্প্রতি শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল প্রাণরামের একটি মুদ্রিত গ্রন্থ ও একটি সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। তাঁরই সৌজন্যে আমরা উক্ত গ্রন্থ ও পুঁথি দেখেছি। তার থেকেই প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যের নমুনা হিসাবে কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

গুণসিন্ধু রাজার স্ত্রীকে স্বপ্ন দিয়ে মর্তে কালীপূজার প্রচারের মধ্যে দিয়ে কাব্যখানির কাহিনী-অংশ আরম্ভ হয়। আমরা আলোচ্য কাব্যের সেই প্রথম অংশটি উদ্ধৃত করছি—

'বিচিত্র সিংহাসনেতে বসিয়া কুতূহলে।
কৌতুকে কালিকা জয়া বিজয়ারে বলে॥
শুনহ বিজয়া জয়া কি রূপে আমার।
অবনী মণ্ডলে হয় পূজার প্রচার॥
সখা বলে শুন নৃত্য গীতবাদ্য প্রিয়া।
ত্রিগুণধারিণী তুমি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া॥
কাঞ্চিপুর গ্রামে বাস গুণসিন্ধু রাজা।
তাহার জায়ার ঠাঞি আগে লও পূজা॥
স্বপ্ন দিতে চল তুমি যুক্তি মোর মত।
তনয় নিমিত্তে যেন রাণী করে ব্রত॥
নরমুণ্ডবলী কণ্ঠা শ্মশান বাসিনী।
স্বপ্ন দিতে অবিলম্বে গেলা নারায়ণী॥'[২]

সুন্দরের কালীর প্রতি স্তবটিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি—

'সুন্দর সন্তোষে করে বহু প্রণিপাত।
নিবেদন করে পুণ যোড় করি হাত॥
ভুবন জননী শুন করি নিবেদন।
শুভদ তোমার পদ করিনু পূজন॥
হইল সকল সিদ্ধি ইথে নাহি আন।
কেবা আছে আমার সমান ভাগ্যবান॥

---

১. ১২৭৯ সনের এডুকেশন গেজেটে 'বিদ্যাসুন্দর'-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গলে'র কথা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতে আছে,..."কালিকামঙ্গল' খানি ১২৪৩ সনে শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার শর্মা কর্তৃক সংশোধিত হইয়া শিবাদহে মুদ্রিত।" সা. প. প. ১৩৫০।

২. প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল', পৃ. ১৫।

যেজন দেখিল ভুয়া চরণ কমল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল ॥
যদর্থে আমার বর্দ্ধমানেতে গমন।
সম্প্রতি করিবে সিদ্ধি এই প্রয়োজন ॥
পুনরপি বলে দেবী শুনরে কুমার।
মন্ত্র পড়ি ক্ষিতিতলে মারিবে ফুৎকার ॥
সুড়ঙ্গ হইবে তবে ধরণী ভিতরে।
সেই পথে যাবে বাছা বিদ্যার অন্তরে ॥
পরম সুন্দরী ক্ষিতিপতি বালা সঙ্গে।
সঙ্গোপনে কতদিন বঞ্চি রতি রঙ্গে ॥
ধরিবে যখন তোরে কাল কোতায়াল।
হানিতে লইবে কোপে বসুমতী পাল ॥
আমার স্মরণে তোর হইবেক রক্ষা।
সকল প্রকারে তোর নহিবেক কক্ষা ॥
ত্রিগুণ ধারিণী দেবী ত্রিজগত মাতা।
এত বলি পরিতোষে হৈলা অন্তগতা ॥
করিয়া সংসার মুদ্রা কৈল বিসর্জন।
নির্মাল্য বাসিনী পূজা করিল তখন ॥
হরষিত হৈয়া করে প্রসাদ ভোজন।'[১]

সুন্দরকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বিদ্যা যে কাতরোক্তি করেছে সেটিও বেশ মর্মস্পর্শী হয়েছে। আমরা তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম—

'শঙ্কটে করহ রক্ষা।
শুন নিশাপতি, ধর্ম্মে দেহ মতি,
দেহ পতি মোরে ভিক্ষা ॥
গুণসিন্ধু মহারাজা।
পৃথিবী বিখ্যাত গুণে অবদাত
পুত্র তুল্য পালে প্রজা ॥
তাহার নন্দন এই।
লোক সুবিদিত সর্ব্ব গুণান্বিত
সকল পণ্ডিত জয়ী ॥
জিনিয়া মোরে বিচারে।

১. প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল', পৃ. ১৪৩।

মম অকিঞ্চনে অতি সঙ্গোপনে
বিবাহ করে আমারে ॥
বিদিত সখীর মাঝে।
জননী জনকে আদি বন্ধু লোকে
নাহি জানাইলাম লাজে ॥
বিস্তার বিনয় বাণী।
কোটালে না শোনে বিদ্যা দুঃখ মনে
ভাবে পিনাক পাণি ॥
দেব দেব বিরূপাক্ষ।
কোটাল বিপক্ষ নাহি সুনে বাক্য
আপনি শঙ্কটে রক্ষ ॥
করিনু কি অপরাধ।
মোরে স্মর হর দিলে পতি বর
সেই হৈল পরমাদ ॥
দোষ থাকে কর ক্ষমা।
এত বলি কাদে রচে চারু ছাদে
প্রাণরাম সেবি শ্যামা ॥'[১]

। **কৃষ্ণরামদাস**। সতেরো শতকের বাংলা-সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী কবি কৃষ্ণরামদাস। কৃষ্ণরামদাসের ভণিতায় ছটি 'মঙ্গলকাব্য' পাওয়া যায়। 'কমলামঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল', ষষ্ঠীমঙ্গল', 'শীতামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল'।

কৃষ্ণরামদাসের বাড়ী ছিল কলিকাতার কাছে নিমতা গ্রামে। এই গ্রাম ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত বলে অনেকে হয়তো কৃষ্ণরামকে রাঢ়ের কবি বলে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হবেন। কিন্তু প্রাচীনকালে গঙ্গার পূর্ব তীরের এক বৃহদংশকে রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭ সংখ্যক পুঁথিতে লেখা আছে—

'রাঢ় দেশ ফুলিয়া যার নাম।
মুখটি বংশেতে জন্ম অতি অনুপাম ॥'

ফুলিয়া বরাবরই গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল, এখনও আছে। ফুলিয়া যদি রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়, তবে নিমতাও স্বচ্ছন্দে রাঢ়ের অন্তর্গত বলে গণ্য হতে পারে। কারণ, ফুলিয়া থেকে নিমতার দূরত্ব মাত্র কয়েক ক্রোশ।

কৃষ্ণরামদাস জাতিতে কায়স্থ। তাঁর পিতার নাম ছিল ভগবতীদাস। কবি 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যে আপন জন্মস্থানের বর্ণনায় বলেছেন—

১ প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল', পৃ. ১৯৫।

'অতিপুণ্য[ময়] ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তার।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্ব কূল
নিমিত্তা নামেতে গ্রাম যার॥...
সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।
তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি॥'[১]

সুতরাং কৃষ্ণরামদাস মাত্র কুড়ি বছর বয়সে 'কালিকামঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণরামদাসের 'কালিকামঙ্গল' অত্যন্ত দীর্ঘ কাব্য। আলোচ্য কাব্যটির রচনাকাল-বাচক পদটি পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল কর্তৃক সংগৃহীত, ২৪-পরগণার মগরাহাট থানার পশ্চিম বেলিয়া গ্রামের একটি পুঁথি থেকে। পুঁথিখানি ১১৬৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত। শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের সৌজন্যে আমরা পুঁথিখানি আনুপূর্বিক দেখার সুযোগ পাই। পদটি নিম্নরূপ—

'সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাতা নাম তার
পরগণা অনুপম ক্ষিতি।
সাবর্ণি চৌধুরী জায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
পশ্চিমে আপনি ভাগিরথী॥
বলে কবি কৃষ্ণরাম নিমিত্তা তাহার গ্রাম
কথা হৈল কালির মঙ্গল।
বসু নব বান ইন্দু সক এই গুণ সিন্দু
বিচারিয়া বুঝহ সকল॥'[২]

সুতরাং 'কালিকামঙ্গলে'র রচনাকাল ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। কৃষ্ণরামদাস তাঁর কাব্যের সূচনায় অপর একটি শ্লোকে এর রচনাকাল লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটি সব পুঁথিতেই মেলে। আলোচ্য শ্লোকটি একটি জটিল হেঁয়ালী। সেটি বিশ্লেষণ করেও বিশেষজ্ঞগণ ১৫৯৮ শকাব্দই পেয়েছেন।[৩]

কৃষ্ণরামদাসের কাব্য-পাঠে জানা যায়, দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কাব্য রচনার আদেশ দেন, এবং সেই কাব্যে কি কি বিষয় থাকবে তার নির্দেশও দেবী দিয়েছেন।

'দক্ষযজ্ঞভঙ্গ কথা প্রথমে রচহ গাথা
পুরাণ প্রমাণি এ সকল।

১. কৃ. গ্র. পৃ. ৭।
২. প. সং ৪ক।
৩. সা. প. প. ১৩৫০। পৃ. ৩৯, ডক্টর দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জন্ম হিমালয় গিরি কামদেব ভস্ম করি
বিবাহ করিল পুণঃহর।
তারকের গুণ নাশে সুলোচনা যুঝে রোষে
তাহারে বধিল পুরন্দর॥
তারাবতী তাঁর প্রিয়া নারদ তথায় গিয়া
কৈলা মোর চরিত্র সকল।
সেবিয়া পাইল বর পশ্চাত হইল নর
বিদ্যা আর সুন্দর ভূতল॥
প্রভাবতী উপাখ্যান শুনিল সখার স্থান
গোপতে বিবাহ কৈল কবি।
তনু হরি শিরশেষে আইলা কৈলাস বাসে
এত বলি অন্তর্দ্ধান দেবী॥'[১]

কিন্তু, কৃষ্ণরামদাসের 'কালিকামঙ্গলে'র মুদ্রিত গ্রন্থে শুধুমাত্র 'বিদ্যাসুন্দর'-উপাখ্যান এবং তার মধ্যে সংক্ষেপে প্রভাবতীর কাহিনীটুকু পাওয়া যায়। কৃষ্ণরামদাস যে দেবীর নির্দেশ অনুযায়ী অর্থাৎ, দেবীর নির্দেশিত প্রাথমিক বিষয়গুলি অনুসরণ করেই কাব্য রচনা করেছেন—একথা এতদিন পর্যন্ত পণ্ডিত মহলে অনুমানমাত্র ছিল। কিন্তু, পূর্বোক্ত পুঁথিটি থেকে আমরা জেনেছি,—'কালিকামঙ্গল'-কাব্যে সতী ও দক্ষযজ্ঞ কাহিনী, পার্বতীর ও শিবের উপাখ্যান, তারক-বধ, তারক-পুত্র সুলোচন ও তারক-পত্নী তারাবতীর কাহিনী, সুলোচন ও তারাবতীর মর্ত্যলোকে সুন্দর ও বিদ্যারূপে জন্মলাভ, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান এবং তার মধ্যে প্রভাবতীর কাহিনী রচনা করে কৃষ্ণরাম তাঁর কাব্যের আখ্যানগত পরম্পরা রক্ষা করেছেন।[২]

প্রথম পরিচ্ছেদ 'দক্ষযজ্ঞ'-পালায় সতীর দেহত্যাগ অংশ থেকে সামান্য নিদর্শন দেওয়া হলো—

'নয়নে সলিল ধায় যেন মুকুতার হার
উগরিয়া পেলায় খঞ্জন।
কলঙ্ক যুকত ইন্দু মুখে পড়ে বিন্দু বিন্দু
সেই জলে গলিয়া অঞ্জন॥
সতীরে সমুখে দেখি দক্ষ জায়া মহাসুখী
দিল আনি রত্ন সিংহাসন।

১. কৃ. গ্র. পৃ. ৮।

২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখিকার প্রবন্ধ 'কবি কৃষ্ণরামদাসের অপ্রকাশিত রচনা'—Visva-Bharati Journal of Research, Vol. V. Part 1. 1980-82, P. 75-86 দ্রষ্টব্য।

দিয়া ভৃঙ্গারের পানি জিজ্ঞাসিল এই বাণী
কেন দেখি মলিন বদন ॥
আঁখি করে ছল ছল বাহিয়া পড়এ জল
না জানি হইল অভিমান।
জনকের অপরাধ মোরে কর পরসাদ
মাগিয়া লইমু এই দান ॥
আমি নিদারুন অতি পরান সমান সতী
তবাস না করি বহু দিন।
অস্থি অবশেষ অঙ্গ ঢলক করের শঙ্খ
দুঃখে দুঃখে হয়্যাছে মলিন ॥
আইস আইস কোলে তোমহ মধুর বোলে
ঘুচাও মায়ের মন দুঃখ।
আপন অঞ্চল ধরি অনেক জতন করি
মুছিল সতীর চারু মুখ ॥
তোমা দরশন পাই আনন্দ অবধি নাই
জুড়াইল হৃদয় আমার।
প্রশন্ন হইয়া বিধি মোরে মিলাইল নিধি
দূরে পলাইল দুঃখ ভার ॥
মাএর বচন পেলি সিংহাসন দূরে ঠেলি
অবনি বসিল অভিমানে।
নয়নে সলিল ধার তিতে তমু বাস আর
মজাইলা মানস খেআনে ॥
হরের চরণ তল খেআইয়া নিরমল
যোগীরে জিনিল মহামায়।
কালীর চরণ তলে কবি কৃষ্ণরাম বলে
সতী দুঃখে তেয়াগিল কায় ॥'[১]

আলোচ্য ছত্র কটিতে দীর্ঘ বিরহের পরে মাতা-পুত্রীর মিলন ও তাঁদের দুঃখ-অভিমানের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণরামের উচ্চাঙ্গের কবিত্ব শক্তির পরিচয় মেলে।

কৃষ্ণরামদাসের 'কালিকামঙ্গলে'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পার্বতী ও শিবের উপাখ্যানের অন্তর্গত উমার তপস্যার অংশবিশেষ থেকে নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি ছত্র দেওয়া হলো—

'বিশেষ বলিব কিবা নিদাঘ সময়ে শিবা
হুতাশন জ্বালি চারিপাশে।

১. প. কং ২৩২।

অতি দুঃখ দিআ কায় দাড়াইঞা এক পায়
নিরখয়ে সবিতা আকাশে ॥
... ...
শুন সভে বড় রস তপস্যায় হয়্যা বস
ব্রহ্মচারী রূপে শূলপানি।
তেজে অন্ধকার হরে দণ্ডকমণ্ডলু করে
উত্তরিলা যথায় ভবানি ॥
না বুঝিলু কিবা ভাবি প্রণাম করিলা দেবী
সখী দিলা বসিতে আসন।
অতিথি সেবনে ফল তবে সুবাসিত জল
শূন্য ঝারি করি ততক্ষণ ॥
বুঝিআ দেবীর মন ব্রহ্মচারী ত্রিলোচন
চাতুরী করিয়া কিছু বলে।
কবি কৃষ্ণরাম গায় শুন দেবী মহামায়
নায়কেরে রাখিবে কুশলে ॥'[১]

এবারে তারক-পুত্র সুলোচন ও তাঁর পত্নী তারাবতীর উপাখ্যান থেকে নিদর্শন হিসেবে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'তাড়কের ডরে ইন্দ্র অধিক কাতর।
সাজিল দেবতাগণ করিতে সমর ॥
রবি শশি বরুন পবন হুতাশন।
ছয় দিবসের শিশু দেব ষড়ানন ॥
পুরন্দর আদি করি যতেক অমর।
সভে পীঠ দিলা অতি হইয়া কাতর ॥
ময়ুরে চড়িয়া আগে গিয়া ষড়ানন।
শকতি হানিয়া তারে বধিলা তখন ॥
... ...
শুনিল সমরে যদি পড়িল তাড়ক।
সমিধ পাইয়া জেন জলিল পাবক ॥
অনিবার ক্রোধ মনে বলে সাজ সাজ।
ভুষিত রাখিব যশ ত্রিভুবন মাঝ ॥
... ...
তারাবতী নাম সুলচনের রুক্মিনী।

১. পা. সং ১৭৫-১৭ক।

সময়ে যাইতে মনে করে জোড় পানি ॥
শুনিয়া না শুনে তাহা নিকট মরন।
কৃষ্ণরাম মাগে কালি চরণে স্মরণ ॥'[১]

কৃষ্ণরামের 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের মালিনী-চরিত্রটি জীবন্ত। এখানে মালিনীর নাম বিমলা। বেশীর ভাগ 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্যের তুলনায় এই চরিত্রটি স্বভাবসঙ্গত। এমন কি, 'বিদ্যাসুন্দর'-আখ্যানের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের মালিনী-চরিত্রের চলা বলাও এর সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, ভারতচন্দ্র যেন কতকটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণরাম অঙ্কিত চরিত্রটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'কালিকামঙ্গল'-কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র। কিন্তু, 'কালিকামঙ্গল'কে মহাকাব্যোচিত বিশালতা দেওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র কৃষ্ণরামদাসই দাবী করতে পারেন। কবির কৃতিত্ব আরও বেশী এই কারণে যে, 'কালিকামঙ্গল' রচনার সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর।

। **শিবরাম** । সতেরো শতকের আর একজন বিশিষ্ট রাঢ়-নিবাসী 'কালিকামঙ্গল' রচয়িতা হলেন, শিবরাম ঘোষ। এঁর 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যে 'বিদ্যাসুন্দরে'র কাহিনী পাওয়া যায় না। তাঁর বদলে বিক্রমাদিত্যের 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' বা 'বত্রিশ সিংহাসনে'র কাহিনীর মধ্যে দিয়ে কালীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে।[২] এই গ্রন্থে বত্রিশটি পুতুলের নামের মধ্যে কিছু কিছু অভিনবত্ব দেখা যায়। এর একটিমাত্র খণ্ডিত পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। তাতে বারোটি পুতুলের কাহিনী মেলে। বইটিতে কেবল কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণিত হয় নি—কালীভক্ত বিক্রমাদিত্যের জীবন কাহিনী সুসংবদ্ধ আকারে ধারাবাহিকভাবে এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে।

শিবরাম ঘোষের অপর রচনা 'একাদশীর পাঁচালী'র রচনাকাল ১৬০৩ শকাব্দ বা ১৬৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ।[৩] তাঁর 'কালিকামঙ্গল' এর কয়েক বছর আগে বা পরে রচিত হয়েছিল। কাব্যখানিতে কবি এইভাবে আত্মপরিচয়, বাসস্থান ও কাব্য রচনাকাল জানিয়েছেন—

'বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ রাধিকা জননী।
মহাগুরু দুইজন বন্দো পুটপাণি ॥
... ...
শশী শূন্য রস অগ্নি শকের বৎসর।
পাতসা অরং সাহা দিল্লি-ঈশ্বর ॥

১. প. সং ২৯৭।
২. সা. প. প. ১৩৪৯। পৃ. ১৩০। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
৩. বা. সা. ই. পৃ. ১০৪৫।

তমলিপ্ত মহাস্থান বন্দো দেবতা বাসুলি।
তথাএ রচিল এই ব্রতের পাঁচালি॥
দৈবকীনন্দন-পদ ভজি একমনে।
একাদশী ব্রতকথা শিবরাম ভনে॥'[১]

॥ রায়মঙ্গল ॥

'মঙ্গলকাব্যে'র এই ধারায় ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এবং আনুষঙ্গিকভাবে কুম্ভীরদেবতা কালু রায় ও মুসলমানদের পীর বড়খাঁ গাজীর মহিমাও কীর্তিত হয়েছে।

দক্ষিণরায়কে উপাসনা করলে বাঘের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। 'রায়মঙ্গলে' বর্ণিত কাহিনীতেও এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দক্ষিণরায় এক মিশ্র দেবতা।[২] দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বড়খাঁ গাজী এই তিন জনেরই পূজা সুন্দরবন অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। 'রায়মঙ্গলে'র-কাহিনীতে দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর যুদ্ধ এবং তার মীমাংসা করতে ঈশ্বরের অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বর বেশে অবতীর্ণ হওয়া ও উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

'রায়মঙ্গল'-কাব্যের প্রথম কবি মাধব আচার্যের নাম পরবর্তী কবি কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গল'-কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই মাধব আচার্যই ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম নিবাসী মাধব আচার্য, যিনি 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'গঙ্গামঙ্গল' রচনা করেছেন। কারণ, দুই কবির নামই শুধু এক নয়, শেষোক্ত মাধব আচার্যের বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারক 'মঙ্গলকাব্য' লেখার যে প্রবণতা ছিল তার দিকে লক্ষ রাখলেও তাঁকেই 'দক্ষিণরায়ে'র মঙ্গল রচয়িতা বলতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু, এঁর রচিত 'রায়মঙ্গলে'র কাব্য এখন আর পাওয়া যায় না। যাঁদের কাব্য পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে পূর্বোক্ত নিমতা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণরামদাসই প্রাচীনতম।

। **কৃষ্ণরামদাস** । সতেরো শতকের অন্যতম কবি কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গল'-কাব্য ১৬০৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই কাব্যখানি অত্যন্ত শক্তিশালী রচনা। এর মধ্যে দিয়ে কবি সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় 'মঙ্গলকাব্যে'র এই নতুন ধারা 'রায়মঙ্গলে'র দেবতা দক্ষিণরায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত করেছেন। এই দিক দিয়ে কৃষ্ণরামদাসের কৃতিত্ব অসাধারণ। এছাড়া, কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গলে'র সাহিত্যিক মূল্যও অল্প নয়। কাব্য রচনার প্রারম্ভেই কবি কাব্যরচনার উপলক্ষটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে উপভোগ্য হাস্যরসের নিদর্শন মেলে। তিনি দাবী

১. বা. সা. ই. পৃ. ১০৪০।

২. এঁর রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আমরা ইতিপূর্বেই 'রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি'-শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

করেছেন যে, দক্ষিণরায় তাঁকে বর দিয়েছিলেন, যে লোক তাঁর কাব্য পছন্দ করবে না, বাঘের হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য।

'তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে॥'[১]

মূল-কাব্যেও দেখি, যত্র তত্র হাস্যরসের অভিসিঞ্চন।

কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গল'-কাব্যের প্রধান গুণ, এর ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং আদ্যন্ত সরস। কৃষ্ণরামদাস নিজেই নতুন কাব্যধারার সৃষ্টি করেছেন বলে কাব্যখানি ভাষার জটিলতা ও দুরূহতা এবং অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘতা ইত্যাদি পূর্বানুসরণের ত্রুটিমুক্ত। বাস্তবতা আলোচ্য কাব্যখানির আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ। প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহারে, আবার কোথাও বা সামান্য দু-একটি পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে এই বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণরামদাসের এই বাস্তবানুসরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন অবোধ কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণের বর্ণনায় মেলে। অভিমানিনী কন্যা সেখানে বলে—

'দূরে বিভা দিলে মোরে সাগরের পার।
কাঁদিলে এখন তবে কি হইবেক আর॥'[২]

কন্যার বিরহের আশঙ্কায় কাতর রাণীকে সান্ত্বনা দিতে রাণীর সহচরীর মুখের বচনের মধ্যে দিয়েও এই বাস্তবানুরাগের সঙ্গে দার্শনিকতার সুরও ধ্বনিত হতে দেখা যায়—

'অকারণে কাঁদ রাণী শুন দেখি বলি।
মনেতে ভাবিয়া দেখ সংসার সকলি॥
কেবা কার পুত্রকন্যা কেবা মাতা পিতা।
জ্ঞানবান জন তার না থাকে মমতা॥
তুমি জনমিলে কোথা বসতি কোথায়।
সংসার এমনি দেখ মোহিত মায়ায়॥'[৩]

কাব্যে ব্যবহৃত ভাষার প্রয়োগেও কবির বাস্তবতার পরিচয় মেলে। কৃষ্ণরামদাসের কাব্যে পাত্র-পাত্রীর মুখে চরিত্র অনুযায়ী ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে, একদিকে যেমন কবির প্রখর বাস্তব জ্ঞান, অপর দিকে তেমনি আরবী ফারসী শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারে কবির পাণ্ডিত্যের নিদর্শনও পাওয়া যায়।

নিছক কবিত্বশক্তির পরিচয়ও আলোচ্য কাব্যখানিতে দুর্লভ নয়। 'রায়মঙ্গল'-কাব্যে কবি বাঘেদের বর্ণনা যেভাবে করেছেন তাতে, বাঘকে কোথাও কোথাও মানুষ বলেই ভাবতে ইচ্ছে করে—

১. কৃ. গ্র. পৃ. ১৬৭।
২. ঐ. পৃ. ২৪১।
৩. ঐ পৃ. ২৪০।

'প্রথমে আইল বাঘ নাম রূপচাঁদা।
সুমুখের দন্ত তার সোনা দিয়া বাঁধা॥'[১]

কোথাও আবার শব্দ-ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে বাঘের প্রচণ্ডতাই ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণরামদাস অনেক রকমের বাঘের রূপগুণও বর্ণনা করেছেন। তাদের নামও কতো বিচিত্র ধরনের। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি,—

'বেড়াজাল বেকাল বাজাল কাল যায়।
বাতাল বেতাল তনু দাবানল প্রায়॥
উগ্রচণ্ড প্রচণ্ড অখণ্ড দণ্ডধর।
নাটুয়া সাটুয়া হুড়া তিন সহোদর॥'[২]

এই সব নাম ও বর্ণনা নিঃসন্দেহে লোক-ঐতিহ্য থেকে গৃহীত। সেদিক্ দিয়ে প্রাচীন কালের 'লোকাচার' বা লোক-সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন এই কাব্যে আমরা পাই।

কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গল'-কাব্যের একটি প্রধান দোষ অশ্লীলতা। এই দোষ তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যেও প্রকট। একমাত্র 'কমলামঙ্গল' কাব্যখানি এর ব্যাতিক্রম। তবে, 'কালিকামঙ্গল' ও 'রায়মঙ্গল'-কাব্যেই এই অশ্লীলতার নিদর্শন সর্বাধিক।

॥ শীতলামঙ্গল ॥

অন্যান্য লৌকিক দেবতার মতো মারী-দেবী শীতলারও জন্ম মানুষের ভয় ও অজ্ঞানতার উৎস থেকে। বসন্ত রোগের কারণ ও উপশমের উপায় নির্ণয় করতে না পেরে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এই ভয়াবহ মহামারীর পিছনে যে দেবীর উদ্ভব কল্পনা করেছে, তিনি 'শীতলা দেবী'।[৩] লক্ষ্মী, ষষ্ঠী ও শীতলার পাঁচালী প্রায় একই সময়ে রচিত হলেও, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে লক্ষ্মী ও শিশু-রক্ষয়িত্রী দেবী হিসাবে ষষ্ঠী যেমন দ্রুত সমাজে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন, কেবলমাত্র ব্যাধির দেবতা বলে শীতলা দেবী তেমন পারেন নি।

'শীতলামঙ্গল'-কাব্যেরও প্রথম রচয়িতা কৃষ্ণরামদাস। কৃষ্ণরামদাসের পরে কয়েকজন কবি 'শীতলামঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। তাঁরা সকলেই আঠারো শতকের কবি।

কৃষ্ণরামদাসের 'শীতলামঙ্গল' তিনটি পালায় বিভক্ত। 'মদনদাস জগাতির পালা', 'কাজির পালা' ও 'হৃষীকেশ সাধুর পালা'। এর কাহিনী-অংশ অকিঞ্চিৎকর। কৃষ্ণরামদাস তাঁর 'শীতলামঙ্গল'-কাব্যে মুসলমান-সম্প্রদায়কে দিয়ে মন্দির-গঠন ও দেবী-প্রতিষ্ঠা করিয়ে পুজো করিয়েছেন।

কৃষ্ণরামদাসের রচিত অন্যান্য কাব্যের মতো আলোচ্য কাব্যখানিতেও জায়গায়

১. কৃ. গ্র. পৃ. ২৯০।
২. ঐ. ঐ.।
৩. পূর্ববর্তী, 'রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি'-শীর্ষক অধ্যায়ে 'শীতলা' সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জায়গার বাস্তবতার পরিচয় রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মদন জগাতির পালা'র অন্তর্গত নদী-পারাপার সময়ে শুল্ক আদায় পদ্ধতি, যাত্রী সাধারণের ওপরে শুল্ক আদায়কারীর নির্যাতন ইত্যাদির বর্ণনা অংশের উল্লেখ করা যায়। কৃষ্ণরামদাসের 'শীতলামঙ্গল'-কাব্যখানি সম্ভবতঃ তাঁর রচিত 'রায়মঙ্গল'-কাব্যের পূর্ববর্তী রচনা।

॥ কমলামঙ্গল ॥

সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী বা কমলার মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্য 'লক্ষ্মীমঙ্গল' বা 'কমলামঙ্গল'। সতেরো শতকের 'লক্ষ্মীমঙ্গল'-কাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণরামদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য কাব্যের লক্ষ্মীদেবীকে আমরা কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পাই। তিনি 'আভরণ ধান্যের পরিয়া নবরঙ্গে'[১]—কমলদহে ভক্তকে ছলনা করেন। কৃষ্ণরামদাস এই ধান্যাভরণা দেবীর সঙ্গে ধান্যেরও বন্দনা করেছেন তাঁর 'কমলামঙ্গল'-কাব্যে। কৃষ্ণরামদাসের 'কমলামঙ্গলে'র কাহিনী খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে পুরোপুরি রূপকথার ধাঁচে রচিত। কৃষ্ণরামদাস প্রচলিত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কালিদহে 'কমলে-কামিনী'র অনুরূপ 'কমলদহে', লক্ষ্মীদেবী-কর্তৃক ভক্তকে ছলনার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এছাড়া, ব্রাহ্মণ জনার্দন ও বণিক বল্লভ তাদের যাত্রাপথে এক মহাশূন্য শ্মশানপুরীতে উপস্থিত হয়। সেখানকার অধীশ্বর এক বৃদ্ধা রাক্ষসী ও তার পালিতা কন্যার কাহিনী, রূপকথার রাজকন্যা ও রাক্ষসীর কাহিনীর অনুরূপ। 'কমলামঙ্গলে'র এই কাহিনী পরিকল্পনা দেখে মনে হয়, কৃষ্ণরামদাসের রচিত কাব্যগুলির মধ্যে 'কমলামঙ্গল' সর্ব প্রথম রচনা। এছাড়া, আলোচ্য কাব্যে অশ্লীলতা একেবারেই নেই। অথচ কৃষ্ণরামদাসের রচিত প্রথম দিকের কাব্য অপেক্ষা শেষ দিকের কাব্যেই এই অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকেও এই কাব্যটিকে কৃষ্ণরামদাসের প্রথম রচনা বলে মনে করা চলে।

॥ ষষ্ঠীমঙ্গল ॥

ষষ্ঠীদেবী শিশুদের রক্ষয়িত্রী দেবী হিসেবে আরাধ্য।[২] তাঁর মাহাত্ম্য 'ষষ্ঠীমঙ্গল'-কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। যতদূর জানা যায়, এই কাব্যটিও প্রথম রচনা করেছেন কৃষ্ণরামদাস।

কৃষ্ণরামদাসের 'ষষ্ঠীমঙ্গল'-কাব্যটির রচনাকাল ১৬০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। 'ষষ্ঠীমঙ্গলে'র কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অনেকটা ব্রতকথা-ধর্মী। কৃষ্ণরামদাসের 'ষষ্টিমঙ্গলে'র সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নি। খণ্ডিত পুঁথির বিষয়বস্তু আলোচনা করলে তার মধ্যে তিনটি ভাগ লক্ষ করা যায়। প্রথম অংশে, সপ্তগ্রামের রাণীর সঙ্গে

---

১. কৃ. গ্র. পৃ. ৩০৩।

২. 'রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি'-শীর্ষক অধ্যায়ে এই দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।

সখী লীলাবতীর সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় অংশে সায়বেনের গল্প ও তৃতীয় অংশে ষষ্ঠীদেবীর পূজার বর্ণনা পাওয়া যায়। কৃষ্ণরামদাসের 'ষষ্ঠিমঙ্গলে'র কাহিনীর অকিঞ্চিৎকরতা একে 'মঙ্গলকাব্য' অপেক্ষা ব্রতকথারই পর্যায়ভুক্ত করে।

এতক্ষণ যে সমস্ত 'মঙ্গলকাব্যে'র ধারা নিয়ে আলোচনা হলো, তা ছাড়াও আরও কিছু কিছু 'মঙ্গলকাব্য' রয়েছে—যেমন, 'গঙ্গামঙ্গল' 'সূর্যমঙ্গল', 'কপিলামঙ্গল', 'পঞ্চাননমঙ্গল' ইত্যাদি। সেগুলি কাহিনীর দিক দিয়ে যেমন অকিঞ্চিৎকর, তেমনি তার অধিকাংশই পরবর্তী আঠারো-উনিশ শতকের রচনা।

এদের মধ্যে কেবলমাত্র রাজারামদাসের 'নারায়ণীমঙ্গল' সতেরো শতকের রচনা। রাজারামদাস কবি হিসাবে যেমন বাংলা সাহিত্যে নতুন, তেমনই তাঁর রচিত এই 'নারায়ণীমঙ্গল'-কাব্যখানিও বাংলা 'মঙ্গলকাব্যে'র ধারায় এক সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। এইজন্য আমরা পরবর্তী 'অপরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত কবিগণের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক আলোচনা'-শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো।

অপরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত কবিদের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক আলোচনা

মোর মনে সাধ যে সারদা পদতলে।
যারে দেখা দিল মাতা স্বপ্ন ভাঙ্গাকালে।

এতক্ষণ আমরা সতেরো শতকের প্রধান প্রধান কবি এবং তাঁদের রচনা-সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আলোচ্য শতকের অন্য কয়েকজন কবি সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এঁদের নাম যথাক্রমে—'যশশ্চন্দ্র', 'দ্বিজ গঙ্গাদাস', 'দ্বিজ ত্রিলোচন', 'কৃষ্ণরামদাস', 'রাজারামদাস', 'ধর্মদাস বণিক' ও 'সারলাদাস'। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞাতপূর্ব; আবার কারও কারও সম্পর্কে ইতিপূর্বে সামান্য আলোচনা হয়েছে মাত্র। কৃষ্ণরামদাসের অন্যান্য কাব্য ইতিপূর্বে আলোচিত হলেও তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের পুঁথি নবাবিষ্কৃত। রাজারামদাসের 'নারায়ণী-মঙ্গল' বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। দ্বিজ গঙ্গাদাস ও দ্বিজ ত্রিলোচনও সম্পূর্ণ নতুন কবি। স্বল্প পরিচিত কবিদের মধ্যে রয়েছেন যশশ্চন্দ্র, ধর্মদাস বণিক ও সারলাদাস। বর্তমান অধ্যায়ে এঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই কিছু কিছু নতুন পরিচয় নবাবিষ্কৃত পুঁথির আলোকে দেবার চেষ্টা করা হলো।

।। যশশ্চন্দ্র : গোবিন্দবিলাস ।।

বিশ্বভারতী পুঁথি বিভাগে যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যের একখানি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। পুঁথি সংখ্যা ১৯০৯। পত্র সংখ্যা ৪৯৮। অখণ্ডিত। লিপিকাল ১২৩৮ বঙ্গাব্দ। যে আদর্শ পুঁথিটি দেখে অনুলিপি হয়েছিল, তার লিপিকাল ১১১৪ বঙ্গাব্দ। লিপিকর নফরচন্দ্র দাস। পাঠক শ্রীনীলকণ্ঠ সিংহ। ইনি রায়পুরের সিংহ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আলোচ্য পুঁথিখানির প্রাপ্তিস্থান নবগ্রাম—রাইপুর। জেলা বীরভূম। পুঁথির পুষ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত হলো।

"ইতি মথুরা খণ্ড সমাপ্ত। ইতি শ্রীগোবিন্দবিলাস সমাপ্ত। পূর্ব সকাব্দা ১৬২৯ সাং ...গ্রন্থ দেখিয়া লেখা হইল ইহাতে দুই এক অক্ষর দৃষ্ট হয় না। যথা দৃষ্টং তথা লিখিত সাক্ষরাদিং শ্রীনফরচন্দ্র দাস সাং নবগ্রা(ম) পাঠক শ্রীশ্রীবাবু নিলকণ্ঠ সিংহ সাং রাইপুর ইতি সকাব্দ ১৭৫৩। সন ১২৩৮ বার সর্ত্ত আটত্রিশ সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র শুক্র (বার)।'

আলোচ্য পুঁথিখানির লিপিকাল ১২৩৮ বঙ্গাব্দ এবং আদর্শ পুঁথির লিপিকাল ১১১৪ সন (বঙ্গাব্দ), অর্থাৎ ১৭০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই কাব্য আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ। সুতরাং আদর্শ পুঁথিটি যদি সমকালীন হয়, তাহলেও এই কাব্যের রচনা যে সতেরো শতকেই আরম্ভ হয়েছিল তা অনস্বীকার্য। এই কারণে আমরা যশশ্চন্দ্রকে আলোচ্য শতকের কবি বলেই গণ্য করেছি।

। বিষয়সূচী। বাংলা 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের ঐতিহ্য অনুসারে আলোচ্য 'গোবিন্দ-বিলাস'-কাব্যটির বিষয়সূচী গ্রথিত হয়েছে। কাব্যখানি মোট পনেরটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি খণ্ডের মধ্যে কতকগুলি অধ্যায় রয়েছে। কাব্যটির বিষয়সূচী নিম্নরূপ—

(১) আত্মখণ্ড, (২) রাধাখণ্ড, (৩) বাল্যখণ্ড, (৪) বাণখণ্ড, (৫) পোগণ্ড-খণ্ড, (৬) অনুরাগ-খণ্ড, (৭) সূর্য-খণ্ড, (৮) পূর্ণিমা-খণ্ড, (৯) দান-খণ্ড, (১০) নৌকা-খণ্ড, (১১) উত্থান-খণ্ড, (১২) বংশী-খণ্ড, (১৩) কৈশোর-খণ্ড, (১৪) অক্রুর-খণ্ড, (১৫) মথুরা-খণ্ড।

। কবি পরিচিতি। 'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যের কবি যশশ্চন্দ্রের প্রকৃত নাম হরিদাস। কবি বন্দনা অংশেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

'জন্মদাতা পিতা বন্দ অপর জননী।
বন্দিব পরম ভক্তি গুরুর কামিনী॥
শ্রীহরিদাস নাম জন্ম বৈষ্ণকুলে।
কৃষ্ণের ভকত সব দাস বলি বলে॥
ভবসিন্ধু তরিবারে চিত্তে করি আশ।
দীন যশশ্চন্দ্র বলে গোবিন্দবিলাস॥'[১]

এই অংশে উল্লিখিত 'হরিদাস'কে কবির নাম না ধরেও, এ সম্পর্কে তিন রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ কবির গুরু, দ্বিতীয়তঃ কবির পিতা, তৃতীয়তঃ অপর কোনো কবি।

"বন্দিব পরম ভক্তি গুরুর কামিনী"—এই ছত্রটির পরেই 'শ্রীহরিদাস' নামের উল্লেখ থাকায় এঁকে গুরু বলে ভ্রম সৃষ্টি হতে পারে। এবং কবি কাব্যোমধ্যে একাধিকবার 'দাসের দাস' হবার আকাঙ্খা সহজেই করতে পারেন। আবার "শ্রীহরিদাসের আশ পূর্ণ কর হার"[২] কিংবা "শ্রীহরিদাসের আশ হইতে দাসের দাশ"[৩] ইত্যাদি অংশও সহজেই বলতে পারেন। কিন্তু, কবি নিজের কোনো রকম পিতৃ পরিচয় না দিয়ে গুরুর নাম এবং জন্মগত জাতি কুলের উল্লেখ করবেন, এটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

১. প. সং. ২ক-২খ।
২. প. সং. ৪৫৩খ।
৩. প. স. ৪৭৯খ।

দ্বিতীয়তঃ, কবি বৈষ্ণব বিনয়ে নিজেকে দীন, দাস ইত্যাদি বলতে পারেন, কিন্তু, গুরুর সম্পর্কে কোনোক্রমেই তিনি 'দাস' শব্দটি প্রয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু আমরা পাই হরিদাস সম্পর্কে কবি বলছেন—

'কৃষ্ণের ভকত সব দাস বলি বলে।'[১]

তৃতীয়তঃ, গুরু সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হয়ে থাকেন। উল্লিখিত হরিদাস জাতিতে বৈদ্য। সুতরাং হরিদাস কবির গুরু কোনোক্রমেই হতে পারেন না।

শ্রীহরিদাস কবির পিতা হতে পারেন এবং কবি সহজেই কাব্যের আরম্ভে পিতৃপরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু, সমগ্র 'মথুরা-খণ্ডে' হরিদাসের নামে ভণিতা থাকায় ইনি কবির পিতা হতে পারেন না।

'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যের সর্বত্র যশশ্চন্দ্রের ভণিতা পাওয়া গেলেও, কেবলমাত্র 'মথুরা-খণ্ডে' বা, শেষ খণ্ডে তার কোনো ভণিতা পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে হরিদাসের নামে ভণিতা পাওয়া যায়। এর থেকে সহজেই মনে হতে পারে যে, কবি যশশ্চন্দ্র 'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যখানি রচনা শুরু করেন এবং যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি তা শেষ করতে পারেন নি। শেষ করেছেন হরিদাস নামে অন্য কোনো কবি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এরকম উদাহরণ নতুন নয়।

কিন্তু, এই প্রস্তাবটি সমর্থন করা যেতো, যদি কাব্যের প্রথম ভণিতাটিতে একই সঙ্গে শ্রীহরিদাস ও যশশ্চন্দ্র এই দুটি নামেরই উল্লেখ না থাকতো। হরিদাস ও যশশ্চন্দ্র ভিন্ন ব্যক্তি হলে একই ভণিতায় এবং বিশেষ করে প্রথম ভণিতাটিতেই উভয়ের নাম পাওয়া যেতো না।

দ্বিতীয়তঃ, যশশ্চন্দ্র ও হরিদাস সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি হলে, কাব্য মধ্যে স্পষ্ট তার ছাপ পড়তো। কিন্তু 'গোবিন্দবিলাসে' কোথাও দুই ভিন্ন হাতের ছাপ নেই। সমগ্র কাব্যখানি একই ভাষায়, একই ভাবে লেখা, একই সুরে বাঁধা।

সুতরাং, একথা বোধহয় বলা যায়, এই হরিদাস স্বয়ং কবি, যাঁর উপনাম 'যশশ্চন্দ্র'। কবি সম্ভবতঃ বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে হরিদাস নাম খুব বেশী প্রচলিত। অধিকন্তু যশশ্চন্দ্র নামটি একটু খাপছাড়া লাগে। বৈষ্ণব বলেই কবি কাব্যে একাধিক বার বলেছেন—

'হইতে দাসের দাস মনে ইচ্ছা করি।'[২]

অথবা—

'শ্রীহরি দাসের আশ হইতে দাসের দাস
করিবারে চাহ পূর্ণ হরি।

১. প. সং, ২ক-২খ।
২. প. সং ৪৬৬খ।

তোমার ভজন কর্ম নাহি জানি সেবা ধর্ম
কেমনে তরিবে কৃপা করি ॥'[১]

বৈষ্ণবদের পক্ষে শুধু কৃষ্ণ-ভজনা করলেই হয় না। নিজেকে দাসানুদাস মনে করে 'সেবা-ধর্মে' আত্মনিয়োগ করাই বৈষ্ণবদের আদর্শ।

প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কে শেষ কথা কেউ বলতে পারেন না, যতোদিন না সমস্ত পুঁথি সংগ্রহের কাজ শেষ হয়। তবু আপাততঃ একথা বলা যায় যে, কবি হরিদাস এবং যশশ্চন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি। এবং কবি তাঁর উপনাম যশশ্চন্দ্র দিয়ে কাব্য রচনা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত আর আত্মগোপন করে থাকতে পারেন নি। তাই কাব্যের শেষে 'মথুরা-খণ্ডে' তিনি আত্মপ্রকাশ করে প্রকৃত নাম শ্রীহরিদাসের ভণিতা দিয়েই কাব্য শেষ করেছেন। কাব্যের প্রথম দিকে তিনি 'সজভাই' অর্থাৎ সকল বৈষ্ণব ভাইদের জন্য প্রার্থনা করলেও 'মথুরা-খণ্ডে' এসে শুধুমাত্র নিজে "অপার সংসার সিন্ধু" পার হবার আকুল প্রার্থনা জানিয়ে কাব্য শেষ করেছেন।

সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে কবি তাঁর নিজের পরিচয় সামান্যই দিয়েছেন। তার থেকে জানতে পারা যায়, কবি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত এবং জাতিতে বৈদ্য। কাব্য রচনার প্রেরণাদাতা-রূপে কবি 'বিদ্যালঙ্কার' প্রভুর নাম উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ আরাধনার পঞ্চ-ভক্তি ভাবের মধ্যে কবি মধুর ভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন।

'অপূর্ব গোপীর ভাব কোন জনে পাবে।
ইহা জানি সজ ভাই ভজ গোপী ভাবে ॥'[২]

কাব্যমধ্যে কবি কোথাও তাঁর জন্মস্থানের নাম উল্লেখ করেন নি। তবে, কাব্যের ভাষা-বিচারে, বিশেষ করে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার দেখে মনে হয়, যশশ্চন্দ্র বীরভূমের লোক হতে পারেন। কারণ, 'দূরকে পালায়'[৩], 'কেনে'[৪], 'পারা'[৫], 'বট'[৬] 'বুলি'[৭], 'ঘরাঘরি'[৭], 'একো'[৮], 'হটকে টাটক'[৯] ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ বীরভূম অঞ্চলের কথ্যভাষার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। এছাড়া, আলোচ্য পুঁথিটিও পাওয়া গিয়েছে বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামের সিংহ-পরিবারের নীলকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকে। এই সব কারণে আমাদের অনুমান, কবি বীরভূমেরই লোক ছিলেন।

---

১. প. সং. ৪৭৬খ।
২. প. সং. ৪৫৯খ।
৩. প. সং. ১১খ।
৪. 'কোটি কেনে', প. সং [১৩ক], 'জানিতে শুনিতে কেনে' [১৩খ]
৫. 'এই পারা রামা' [৫১খ]।
৬. 'তুমি সব বট' [৫২খ]।
৭. 'শিশু খুঁজি বুলি ঘরাঘরি' [৫৩ক]।
৮. প. সং. ৫৩খ।
৯. 'হটকে টাটক লাগে' [২১২ক]।

যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস' একটি বর্ণনা-বহুল বৃহৎ কাব্য। কবি কৃষ্ণকথার পৌরাণিক ও লৌকিক ধারাকে একাধারে গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যপুটে; আলোচ্য কাব্যটির প্রথম পাঁচটি ও শেষ দুটি খণ্ডে কবি পুরাণকে অনুসরণ করেছেন যথাযথভাবে; এবং তার উৎস-স্বরূপে কবি শ্রীমদ্‌ভাগবত ও পদ্মপুরাণের উল্লেখ করেছেন একাধিকবার। এই খণ্ডগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপের বর্ণনা রয়েছে। কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ে কোনো নতুনত্ব নেই। তবে, এরই মধ্যে কবি মাঝে মাঝে তৎকালীন সমাজের রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর ঋজু ভাষা ও সাবলীল ভঙ্গির রূপরেখায়। প্রবাদ-প্রবচন, উপমা-উৎপ্রেক্ষার অজস্র প্রয়োগে কাব্যখানির উৎকর্ষ লক্ষণীয়।

কাব্যমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মমুহূর্তের রূপ বর্ণনার রীতি আমাদের সংস্কৃত কাব্যের উপমা-অলংকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'ভুজের বর্ণন কেবা পারিব করিতে।
সমান হইব কেবা তাহার সহিতে॥
কর্কশ করিব কর মৃণাল কঠোর।
সুবলিত মৃদু বাহু কেবা পাব ওর॥
রম্ভাতরু উরু দেখি লাজে হেট মাথে।
ফল কালে ছলে পারা করে প্রণিপাতে॥'[১]

এছাড়া, কাব্যমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ ও তার অনুবাদ দেখে মনে হয়, যশশ্চন্দ্রের সংস্কৃত সাহিত্যেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

কোনো মানুষই তাঁর সামাজিক পরিমণ্ডলকে একেবারে অতিক্রম করতে পারেন না। তাই, 'কৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্য রচনা করতে গিয়েও কবি তৎকালীন সমাজের অনেক রীতি-নীতির বর্ণনা করেছেন। কোথাও কোথাও দু-একটি ছত্রে জীবনচিত্র আমাদের সামনে বাস্তব ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে এই বার্তা পেয়ে কংসরাজ সেই শিশুকে হত্যা করার জন্যে, পুতনা রাক্ষসীকে মোহিনীরূপ ধারণ করে যেতে বলেন। পুতনা পুত্রশোকের ছল করে এসে, যশোদাকে তাঁর সদ্যোজাত পুত্রকে একবারমাত্র কোলে নেবার প্রার্থনা জানিয়ে বলেন,—

'দাসী হঞা তোমার পায় সদত খাটিব।
বিনি মূলে আত্মা আমি তোমারে বিচিব॥'[২]

পুতনার এই উক্তি শ্রবণে যশোদার মনে যে চিন্তার উদয় হয়, তার অতি সহজ ও বাস্তব বর্ণনা করেছেন কবি নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রের মধ্যে—

'যশোমতি বলে এই রূপে বিদ্যাধরি।
দাসী হব আসি মোর মনে ভয় করি॥

১. প. সং, ২৫ খ।
২. প. সং, ৫৩ ক।

ইহার দাসীর রূপ নাহি মোর অঙ্গে।
রাখিলে কখন পাছে হয় কোন্ রঙ্গে ॥'[১]

নিজের চেয়ে রূপবতী রমণীকে সংসারে দাসী করে রাখাও নিরাপদ নয়, যশোদার এই স্বাভাবিক মনোভাবটি এখানে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

আলোচ্য কাব্যের পূর্ণমাসীর রূপবর্ণনা আমাদের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' বড়াই-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়—

'ধবল সকল বেশ তাহে জটাভার।
কপালে উজ্জল ফোটা গঙ্গামৃত্তিকার॥
লুলিঞা ভালের চামে ঢাকএ লোচন।
... ...
পিঞ্জরী লোচনে গলে জলের সহিতে।
ভালমতে কোন জনে না পাএ দেখিতে॥
বদনে দশনহীন গাল মুখে পৈসে।
পরকাশ ভাষ নাহি বলিবারে আস্তে॥
গলাএ তুলসীমালা জপমালা করে।
পীঠ মাঝে আছে কুজ দেখি লাগে ডরে॥'[২]

'গোবিন্দবিলাস'-কাব্যের লৌকিক অংশের ওপরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অনেক প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাক্যাংশগত মিলও অনেক পাওয়া যায়। তবে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধার সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের রাধার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 'গোবিন্দবিলাসে'র রাধা অল্পবয়সী হলেও সে অশেষ চাতুরী জানে। এবং কৃষ্ণদর্শনের পূর্ব থেকেই পদাবলীর রাধার মতো সে কৃষ্ণ প্রেম-পাগলিনী। তবে, সম্ভোগের বর্ণনায় কবি যতোখানি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, বিরহের বর্ণনায় ততোখানি নয়। তাই রাধাবিরহের আকৃতি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বা 'পদাবলী'র মতো আলোচ্য কাব্যে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

আলোচ্য কাব্যে ভক্তিরসের আধারে আদিরস পরিবেশিত হয়েছে। যদিও তার সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য, মধুর ও করুণ রসও পাশাপাশি রয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যেই আদিরসের ছড়াছড়ি। তার কারণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশে ধর্ম লোক-জীবনে ভোগাকাঙ্খার বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে নি। মন্দির-শিল্পে, বৈষ্ণব-কাব্যে, তান্ত্রিক-আচারে তার পরিচয় আছে। ধর্মের সঙ্গে কামকে আমরা একসঙ্গে মেনেছি। তাই দেবদেবীর আখ্যান-বর্ণনা করতে গিয়ে মধ্যযুগের কবিকুল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোগের

১. প. সং, ৫৩ক।
২. ঐ. ২৩০খ।

দায়িত্ব দেবতায় সমর্পণ করে 'অপ্রাকৃত ব্যাপার' বলে নিজেরা পাশ কাটিয়েছেন। কিন্তু, তবু সব সময়ে তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গার-রসের বর্ণনারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতো। আর আঠারো শতকে এর যে প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, তার শুরু হয়েছিল যে সতেরো শতকের শেষ দিক থেকেই, বিভিন্ন কবির কাব্যে তার পরিচয় মেলে। যশশ্চন্দ্রও সম্ভবতঃ পরিবেশের প্রভাবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শৃঙ্গার-রসের অবলম্বনস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে গ্রহণ করে সমকালীন রুচিকেই তৃপ্ত করেছেন।

সেকালে মেয়েদের মুখে প্রবাদ প্রবচনের ছড়াছড়ি ছিল। এমন অনেক সুন্দর প্রবচন পাই আমরা আলোচ্য কাব্যে। এদের দু-একটি উদ্ধৃত করা হলো—

এক। 'বামন হইয়া চাহ চান্দ ধরিবারে।
লাফ দিয়া যাত্যো চাহ সমুদ্রের পারে॥'[১]

দুই। 'কামারের ঘরে সুচি বিচিবারে চাহ।'[২]

তিন। 'সমুদ্রের জলে আমি থল বুঝিবারে।
দণ্ড অবলম্ব করি জলের মাঝারে॥'[৩]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধা—"সাকে দিলোঁ কানা সোর্ষ্বা পানী", এবং "বিনি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল"। 'গোবিন্দবিলাসে' দেখি, শুধু রাধা নয়, সেখানে সকল গোপীরই একই অবস্থা। কেউ শাকের সঙ্গে তণ্ডুল মিশিয়ে দেয়, কেউ চালের বদলে শুধু জল, কেউ জল ছাড়া শুধু চাল বসিয়ে জ্বাল দেয়, কেউ বা 'শর্করা বিহুনে' কেবলমাত্র লুন দিয়েই পায়সান্ন রান্না করে। এই সব বর্ণনার পরে কবির বর্ণনা ক্লাইমেক্সে পৌছায়—

'কেহো বা ধেনু মুখে দিতে ছিল লুন।
তার নিজ পতি গাবি করিছে দোহন॥
ছাড়াইঞা গাবির মুখ সেই রূপবতী।
পতিমুখে লুন দেই অচেতন মতি॥
তার নিজ পতি বলে হাসিঞা হাসিঞা।
পরিহাস কর পারা একলা দেখিঞা॥'[৪]

আলোচ্য কাব্যখানিতে পদাবলীর ভাব ও রূপেরও প্রভাব লক্ষ করা যায় কোথাও কোথাও।

১. প. সং ২২৪ক।
২. ঐ. ২২৮খ।
৩. ঐ ১৩৩ক।
৪. ঐ ৩৫১খ।

'তপনের তাপে যদি অঙ্কুর মরিব।
পশ্চাত হইলে বৃষ্টি তাহে কি করিব॥
বিরহ সন্তাপে যদি আজি প্রাণে মরি।
কি করিব পাছু আর রাধিকা সুন্দরী॥'[১]

এই অংশটি আমাদের বিদ্যাপতির 'মাথুর-বিরহে'র 'অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে'—এই বিখ্যাত পদটিকে মনে করিয়ে দেয়।

'ছাড়ে যদি নিজ পতি অসতী বলিয়া।
লঞাছি সেকথা আমি গলায় পড়িঞা॥'[২]

এই পদাংশটি বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ—'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ'—ইত্যাদি কাব্যাংশ স্মরণে আনে।

'গোপীজন বলে সখী কিসের বিচার।
যতন করিঞা রাখ নন্দের কুমার॥
সুন সব সখিগণ চাহ কার বাট।
রাখিতে পরান নাথ চল যাব ঠাট॥'[৩]

এই অংশটি আমাদের খুব সহজেই গোবিন্দ ঘোষের বিখ্যাত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ—"হেদেরে নদীয়া বাসী কার পানে চাও"—মনে করায়। আবার কোথাও দেখি, কেবল ভাব এবং ভাষার দিক দিয়ে মিলই নয়, পদাবলীর সুরও সেখানে শোনা যায়,—

'অগাধ বিরহ সিন্ধু গহন গম্ভীর।
বিষম বিরহ বাধা তাহ সব নীর॥
অশেষ মনের ঘূর্ণ আবর্ত্ত তাহার।
অগাধ বিরহ নদী শতত অপার॥
ডুবিল তাহার মাঝে বিরহিনী রাধা।'[৪]

।। দ্বিজ গঙ্গাদাস : চণ্ডীমঙ্গল ।।

রাঢ়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য, অন্য চণ্ডীমঙ্গলকার কবিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সতেরো শতকের কবি দ্বিজ হরিরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি কেবলমাত্র 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র প্রথম খণ্ডেই তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। আজ তাঁর পুঁথি পরীক্ষার কোনো উপায় নেই। কৃষ্ণরাম দাসের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। আমরা বর্তমানে 'চণ্ডীমঙ্গলে'র একজন অপরিজ্ঞাত কবির পরিচয় দিচ্ছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি সম্পূর্ণ নতুন।

১. প. সং ২৭৪খ।
২. ঐ. ৪১৭ক।
৩. ঐ. ৪৩৪ক।
৪. ঐ. ৩২১ক।

মেদিনীপুরের বরদা পরগণার রাজা দলপৎ সিংহের সভাকবি দ্বিজ গঙ্গাদাসের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের পরিচয় সম্প্রতি আমরা পেয়েছি। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চল থেকে এক মাইলের মধ্যে বরদা গ্রাম। এখানে দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির রয়েছে।[1] সতেরো শতকের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটালের চন্দ্রকোণা বিভাগের জমিদার ছিলেন শোভা সিংহ। এঁর ভাই হিম্মৎ সিংহের নামে 'হেতমপুর' এবং দলপৎ সিংহের নামে 'দলপতপুর' গ্রাম রয়েছে ঘাটাল মহকুমায়। 'বাহারিস্তান'-গ্রন্থে[2] জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের (১৬০৫-১৬২৮) প্রথম ভাগে বাংলার বিশিষ্ট জমিদারবর্গের মধ্যে বরদার নাবালক জমিদার দলপৎ সিংহের নাম পাওয়া যায়। ইনি চন্দ্রকোণা, বরদা ইত্যাদি অঞ্চলের জায়গীরদার চন্দ্রভানের আত্মীয় ছিলেন।[3] সুতরাং দলপৎ সিংহের সভাকবি দ্বিজ গঙ্গাদাস নিঃসন্দিগ্ধভাবে সতেরো শতকের প্রথম দিকের কবি ছিলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের সংগ্রহে কবি দ্বিজ গঙ্গাদাসের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র খণ্ডিত পুঁথি আছে। তার মধ্যে শ্রীমন্তের মশান পালাটি স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হয়েছে। পুঁথিখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৬, লিপিকাল ১১৪৩ বঙ্গাব্দ। পুঁথির পুষ্পিকাটি নীচে দেওয়া হলো।

"ইতি অষ্ট দিনের গীত শ্রীগঙ্গাদাস বিরচিত সমাপ্ত॥ সন ১১৪৩ সাল ১৭ মাঘ রোজ শুক্রবার মকাম রাধাবল্লভপুর, পরগণে জানাবাজ (জাহানাবাদ) চন্দ্রকোণা। ভিদেপুর স্বয় আক্ষরমিদং শ্রীজীবন সর্ম্মন। পঠনার্থে শ্রীআনন্দি মহারাজ॥"

কবির নাম দ্বিজ গঙ্গাদাস। সংক্ষেপে গঙ্গেশ। কবির পিতার নাম শ্রীহরি।

'শ্রীহরিনন্দন, গঙ্গেশ বিরচন
রঘুবীর যেন দহে লঙ্কা।'[4]

দ্বিজ গঙ্গাদাস যে রাজসভার কবি ছিলেন, ভণিতা-অংশ থেকে তা জানা যায়—

'পরিচয় পাঞা রায় পড়িল চণ্ডীর পায়
কন্যা দিতে কল্য অঙ্গীকার।
চামুণ্ড চরণ সেবি গাএন গঙ্গেশ কবি
প্রতিষ্ঠিত বরদা রাজার॥'[5]

কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা সম্পর্কে কবি বলেছেন—

'রসিক মাঝেতে রাজা রণকালে মহাতেজা
আছিলা বরদা নগরে।

১. দাসপুরের ইতিহাস, পৃ. ৬০।
২. Baharistan-i Ghayebi V. 1.
৩. H. B. B. V. 2. P. 236
৪. পৃ. সং ৬৬ক।
৫. ঐ. ৪৮খ।

হইআ সুখসীত প্রকাশ কল্য গীত
গনেশ গাএন কবিবরে ॥'[১]

অন্যত্র পাওয়া যায়—

'ধন্য দলপতি রাজা রণকালে মহাতেজা
ছিলা রাজা বরদা নগরে।
হআ রাজা সুখসিত প্রতিষ্ঠা করিল গীত
গায়েন গনেশ কবিবরে ॥'[২]

কবি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। এবারে কাব্যের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। 'কমলে-কামিনীর' বর্ণনা-অংশ উদ্ধৃত করছি—

'কামচাপ ভ্রুভঙ্গী সহজে চঞ্চলাপাঙ্গী
অপাঙ্গে রাখেন গুণবান।
অধরে অরুন গঞ্জে বিম্বফল তাহে রঞ্জে
যেন ভাষা কোকিলী সমান ॥
নাসাদেশে নাকচোনা হীরায় জড়িত সোনা
শ্রুতিমূল রত্নের কুণ্ডল।
শ্রবণ উপর মাঝে কনক বঅলি সাজে
লজ্জাভরে গীধিনী চঞ্চল ॥
দশন চপল রুচি নিন্দিঞা দাড়িম্ববীচি
··· হল্যা অনাদরী।
গঞ্জিয়া আপন কায় সর্ব্বফুলে মধু খায়
অভিমানে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
কণ্ঠে হার মনিমালা যেন সৌদামিনী কলা
প্রবেশে লজ্জায় জলধারে।
বিষ্ণুপদ নখভঙ্গা পতিতপাবনী গঙ্গা
যেন ধারা হিমাদ্রি শিখরে ॥
মৃণাল জিনিঞা ভুজে বিচিত্র কেয়ুর সাজে
করে শঙ্খ স্বর্ণ কঙ্কণ।
অঙ্গুলী চম্পক ছাঁদ দশভাগ হয়্যা চাঁদ
নখরে পাইল সুশোভন ॥
(দাড়িম্ব) ফলের আভা কুচযুগ পাল্য শোভা
অভিমানে দাড়িম্ব বিদরে।

১. প. সং ৪৭খ।
২. ঐ. ১৪ক।

কমল কাঞ্চন দিয়া নির্ম্মিল কে জানে ইহা
সুরঙ্গ কাচলী পয়োধরে ॥
মাঝা ক্ষীণ দেখি তার নগর ছাড়িয়া আর
মৃগেন্দ্র গেলেন বনবাসে।
রামরম্ভা যেন ভরু তারে জিনি দিব্য উরু
বারণের কর নীবিপাশে ॥'[১]

শ্রীমন্তের 'মশান' পালার অন্তর্গত আলোচ্য অংশটি সংস্কৃত-ঘেঁষা হলেও এর অনুপ্রাস ও অলংকারের সৌন্দর্য তুলনারহিত। চণ্ডীর সঙ্গে শালিবাহন রাজার যুদ্ধের বর্ণনার অংশ থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতি করছি—

'সদনে সাজিয়া যদি চলে নৃপবর।
পঞ্চপাত্র তার সঙ্গে চলে হরিহর ॥
সাজিল হাতির পিঠে নৃপতির খুড়া।
শত শত পাকী ধায় বান্ধি রণচূড়া ॥
নৃপতির দশ বেটা আঠার জামাই।
মার মার হাক ছাড়ে বিশাশয় ভাই ॥
সাজিল রাজার করী যেন মেঘ ঘটা।
দশণ শুভিছে প্রায় চপলের ছটা ॥
ধাইল রাজার বল নাঞি লেখাজোখা।
পিপিলিকা দল যেন আসি দেই দেখা ॥
কটকের মাঝে লক্ষ পড়ে সিঙ্গা কারা।
বাজয়ে মৃদঙ্গ ঢাক বীরকালি পড়া ॥
জয়ঘণ্টা দামা বাদ্য কিছুই না শুনি।
নাচয়ে রাজার মল্ল খড়্গ লইঞা পানি ॥
সাজিঞা নৃপতি রণে রহে কথোদূরে।
আজ্ঞা দিল সেনাগণে নাম্বিতে সমরে ॥
রাজার আদেশে সেনা বলে ধর ধর।
দেখিঞা শ্রীমন্ত ভয়ে হইলা ফাঁপর ॥
শ্রীমন্ত বলেন সব পালাঅ্যা জাহ দূরে।
আমার লাগিআ কেন মরিবে সমরে ॥
হাসিঞা অভয়া বলে না করিহ ডর।
আমার নফরে এখন জিনিব সমর ॥

১. প. সং ১২ক-১২খ।

শুম্ভ আদি মৈষাসুর জারে নাঞি আটে।
সিংহল নৃপতি কিবা তোমার নিকটে॥
চারিদিকে ধায় দানা লইঞা সেনাপতি।
বেশরী বিমান মধ্যে রহে ভগবতী॥
ঝাকে ঝাকে এড়ে বান নৃপতির ঠাট।
দ্বিজ গঙ্গাদাস বলে দুই দলে কাট॥'[১]

সুশীলা ও জয়াবতী এই দুই সতীনের কোন্দলের বর্ণনার অংশ থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

'সতীনে সতীনে তথা বাজিল কন্দল।
মুখে বস্ত্র দিঞা সাধু হাসে খল খল॥
জয়াবতী বলে মেয়া তোর ভাই কাটি।
মুখ সামালিঞা থাক শুন উড়্যা বেটি॥
রাজার কুমারী আমি বসি রাজকোলে।
প্রভুর দক্ষিণে বসি কত বড বোলে।
মোর রাজ্য মোর ভূমি মোর অধিকারে।
কিঙ্করী বলিয়া কেহো না বলে তোমারে॥'

দ্বিজ গঙ্গাদাসের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তার লিপিকাল ১১৪৩ বঙ্গাব্দ; অর্থাৎ ১৭৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং পুঁথির লিপিকালের ঊর্ধ্বতম সময় থেকে কবি সতেরো শতকে জীবিত ছিলেন অনুমান করা অসমীচীন হয় না। কিন্তু আলোচ্য কাব্যখানির একটি ভণিতা থেকে কবির সময় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। ভণিতাটি এখানে উদ্ধৃত হলো—

'ধন্য দলপতি রাজা রণকালে মহাতেজা
ছিলা রাজা বরদা নগরে।
হঞা রাজা সুখসিত প্রতিষ্ঠা করিল গীত
গায়েন গণেশ কবিবরে॥'[২]

এই দলপৎ রাজা বা দলপৎ সিংহ সতেরো শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বরদা পরগণার জমিদার ছিলেন এ কথা প্রামাণিক ভাবে জানা যায়। অতএব কবি দ্বিজ গঙ্গাদাসও সেই সময়কার লোক।

॥ দ্বিজ ত্রিলোচন : মহাভারত ॥

কবির নাম ত্রিলোচন চক্রবর্তী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি সম্পূর্ণ নতুন। বিশ্বভারতী পুঁথি ভাণ্ডারে এঁর একখানি 'মহাভারতে'র পুঁথি রক্ষিত আছে। পুঁথি

১. প, সং ৪৩খ-৪৪ক।
২. ঐ. ১৪ক।

সংখ্যা ৬২৫৫। পত্র সংখ্যা ৪১৯। খণ্ডিত। মহাভারতের আদি পর্ব। প্রাপ্তিস্থান আরামবাগ অঞ্চলের সালেপুর গ্রাম। লিপিকাল অজ্ঞাত। লিপি দেখে মনে হয়, আনুমানিক দুশো বছর আগেকার। কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলে রচনাকাল সতেরো শতকের পরে নয় বলেই বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন। বাংলা 'মহাভারত' রচনার ঐতিহ্য অনুসারে আলোচ্য গ্রন্থের পর্ব বিভাগ নেই।

। কবি পরিচিতি। কাব্য পাঠে জানা যায়, কবির কৌলিক পদবী ছিল চক্রবর্তী।

'ব্যাসের রচিত শ্লোক মধুর কবিত্ত।
গোবিন্দের পাদপদ্ম সদা ভাবি চিত্ত॥
চক্রবর্ত্তী ত্রিলোচন ভণে এই রস।
শুন সাধু সর্ব্বক্ষণ বৃদ্ধি পুণ্য যস॥'[১]

কাব্যারম্ভে কবি দীর্ঘ গুরুবন্দনা করলেও গুরুর নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। তবে, কবি তাঁর অগ্রজের নামোল্লেখ করেছেন একাধিক বার।

'ভারথ চন্দ্রিমা বর্ণিতে অসিমা
শ্রবণেতে পাপ হরে।
কৃষ্ণদাসানুজ কৃষ্ণ পদাম্বুজ
বন্দি কহে ত্রিলোচন॥'[২]

এর থেকে মনে হয়, কবির অগ্রজ কৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী তৎকালে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। হয়তো সেই কারণেই কবি পিতা-মাতা কারও নামোল্লেখ না করেও একাধিকবার অগ্রজের নামোল্লেখ করেছেন। অথবা এর কারণ, কবির শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ বিয়োগও হতে পারে। যুগধর্মের প্রভাবে কবির বৈষ্ণব-ধর্মের মানসিকতাও কাব্য মধ্যে লক্ষ করা যায়। কারণ, কবি একাধিকবার নিজেকে 'হরিদাস দাস', 'গোবিন্দের দাস' ইত্যাদি বলেছেন। এছাড়া, সমগ্র ভণিতাগুচ্ছেই হরি, গোবিন্দ বা নারায়ণের পাদপদ্ম স্মরণ করেছেন কবি।

'বিনতা নন্দন যারে পৃষ্ঠেতে ধারণ করে
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত সে চরণ।
বহু আশা করি মনে ধ্যানে ধ্যায় ত্রিলোচনে
সেই পদে মাগয়ে স্মরণ॥'[৩]

অথবা—

১. প. সং ২৫৯ক।
২. ঐ. ২০৬খ।
৩. ঐ. ২৭২ক।

'জীবনে মরণে গতি গোবিন্দ চরণে।
চক্রবর্ত্তী ত্রিলোচন মাগে অনুক্ষণে ॥'[১]

। **কাব্য পরিচিতি** । দ্বিজ ত্রিলোচন প্রথমে গুরুর বন্দনা, তারপর গণেশ, নারায়ণ ও দ্বৈপায়ন ব্যাসের বন্দনা করে 'ভারত'-উপাখ্যান আরম্ভ করেছেন। কবি তাঁর কাব্যের উৎস হিসাবে বেদব্যাসের কথাই বার বার বলেছেন এবং কাব্যমধ্যে কাশীরামদাসের কথা কোথাও উল্লেখ করেন নি।

'ব্যাসমুখে পদ্মস্ফুটে ত্রৈলক্ষে ব্যাপিল।
দাস বলি কৃপা করি ব্যাস আদেশিল ॥
ব্যাস আজ্ঞা ভাষাছন্দে কহে ত্রিলোচন।
গোবিন্দচরণে মতি রহু অনুক্ষণ ॥'[২]

এছাড়া কবি নিজেকে 'সত্যবতী সুতদাস', 'ব্যাসের কিঙ্কর', 'ব্যাসদাস ত্রিলোচন' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, কবি ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী তাঁর রচিত কাব্যে কাশীরামদাস অথবা বেদব্যাস কাউকেই অনুসরণ করেন নি। তিনি মূল 'মহাভারতে'র বিভিন্ন পর্ব এবং 'শ্রীমদ্ভাগবতাদি' অন্যান্য উৎস থেকেও অনেক পৌরাণিক আখ্যান সংগ্রহ করে তাদের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। আর সেই পুরাণ-সংকলনের নাম দিয়েছেন 'মহাভারত'। ফলে কাব্যখানি সুবৃহৎ কলেবর ধারণ করেছে।

দ্বিজ ত্রিলোচনের নামে 'মহাভারতে'র এই আদি পর্বটি ছাড়া অন্য কোনো পর্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই, কাশীরামদাসের অতি জনপ্রিয় 'মহাভারতে'র আদিপর্ব থাকা সত্ত্বেও কবি কেন আবার নতুন করে ঐ একই পর্ব রচনার প্রেরণা পেলেন। আমাদের মনে হয়, তৎকালীন সমাজ-জীবনে 'মহাভারতে'র নাম দিয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক গল্পও জনসাধারণের মধ্যে সাদরে গৃহীত হতো। বর্তমান কাব্যটিতে সেই পৌরাণিক গল্প-কাহিনী এতো বেশি পরিমাণে স্থান লাভ করেছে যে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে যেতে অনেক সময়েই পাঠক কাহিনীর যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন এবং সে সম্পর্কে কবিও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ, কাব্যমধ্যে কবি অনেকবারই পাঠকদের পুরানো প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেছেন।

আলোচ্য কাব্যটিতে 'মঙ্গলকাব্যে'রও যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রায় সব 'মঙ্গলকাব্যে'ই যেমন নায়িকার বারমাস্যার বর্ণনা পাওয়া যায়, আলোচ্য কবিও তেমনি একটি বারমাস্যার বর্ণনা করেছেন। অবশ্য নায়িকার বলা চলে না। কবি 'দেবযানী'-উপাখ্যানে দেবযানী-সখী শর্মিষ্ঠার বারমাস্যার একটি দীর্ঘ-সুন্দর বর্ণনা করেছেন। তার অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত হলো—

১. প. সং ৩২৪খ।
২. প. সং ২৮০ক।

'বিরহ দারুণ শেলে হৃদয় বিদরে।
বারমাস বঞ্চি আমি বিরহের জরে॥
বৈশাখে দারুন রৌদ্র দিবসের কালে।
নিবাপে না হয় স্নিগ্ধ সদা অঙ্গ জলে॥
রজনী প্রবেশে নর্ম্ম বহিলে পবন।
দাহনে নিবর্ত্ত হয় স্বামীবত্তিগণ॥
রাত্রি দিবা সম মোর বিরহ দাহনে।
জ্যৈষ্টি মাসে আম জাম আদি বৃক্ষগণে॥
সপক্ক সকল ফলে অতি সুশোভন।
ক্রিড়া করি পক্ষগণ ফিরে অনুক্ষণ॥
বৃক্ষের সদৃশ ভাগ্য আমার নইল।
এ হেন যৌবন মোর বৃথা বৈয়্যা গেল॥'[১]

বর্ণনাটি দীর্ঘ হলেও কবিত্বপূর্ণ।

অন্যান্য 'মঙ্গলকাব্যে'র প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ, বিবাহ-বাসরে নারীগণের পতিনিন্দাকেও কবি গ্রহণ করেছেন। শিবদুর্গার বিবাহ-বাসরে বরবেশে শিবকে দেখে সমাগত রমণীরা আপন আপন পতিনিন্দা আরম্ভ করেন। বর্ণনাটির অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত হলো—

'জতেক রমণিগণ অত্যান্ত মোহিল।
নিজ নিজ পতিনিন্দা কহিতে লাগিল॥...
কেহ বলে পতি মোর বড়ই অধম।
বচনে সর্ব্বস্ব তার কর্ম্মে নহে ক্ষম॥
কেহ বলে পতি মোর মূর্খ দুরাচার।
বিদ্যালেশ কেমন শরীরে নাহি তার॥
লোকের অধম সেই অতিশয় মূঢ়।
মিষ্টি বানি নাহি জানে সদা কহে রূঢ়॥
বুঝাইতে মন্দমতি ওঠে ক্রোধ করি।
বচন আনলে তার সদা পুর্যা মরি॥...
কেহ বলে তোর পতি শতগুণে শ্রেষ্ঠ।
মোর পতি অভাগার সর্ব্বাঙ্গেতে কুষ্ঠ॥
তথাপি তাহার অহংকার নাহি ঘাটে।
সুয়্যা থাকে তথাপি কথায় কাঠ ফাটে॥

১. প. সং ২১খ।

আর জন বলে মোর দুখের নাহি অন্ত।
নিদারুণ বিধি মোরে দিল বৃদ্ধ কান্ত॥
সুতিলে উঠিতে তারে হয়ত প্রমাদ।
লোকেরে কহিতে লজ্জা মোর চিত্তবাদ॥'[১]

কবি এখানে রমণীদের পতিনিন্দার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। আবার, কোথাও কোথাও যুগ-প্রভাবজাত আদিরসের স্পর্শও দেখতে পাওয়া যায়।[২]

দ্বিজ ত্রিলোচনের 'মহাভারতে' কোথাও কাশীরামদাসের নামোল্লেখ নেই। তবু, কবি তাঁর প্রভাবমুক্ত নন। কাশীরামদাস বিরচিত 'মহাভারতে'র আদিপর্বের মধ্যে বিষয়গত মিল শুধু মূল কাঠামোটুকুতে। তবু, তারই মধ্যে কোথাও কোথাও কাশীরামদাসের বর্ণনাভঙ্গী কবির লেখনীতে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে যুদ্ধের বর্ণনায়। আমরা দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। কাশীরামদাসের 'মহাভারতে' দেখা যায়, ভীমসেন সুযোগ পাওয়া মাত্র সকলকেই পায়ে ধরে অন্তরীক্ষে ঘুরিয়ে ছেড়েছেন।—

'ঈশত হাসিয়া ভীম ধরে দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেক মন্দ্র মহাকায়॥
রুদ্রমির ধরিয়া প্রহারে যেন নক্র।
আকাশে ভ্রময়ে যেন কুম্ভকার চক্র॥
বুলাইতে তথাই তেজিল মন্দ্র প্রান।
পেলাইয়া দিল ভূমে যেন তলাখান॥'[৩]

দ্বিজ ত্রিলোচনে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।—

'একবারে ধরে ভীম সভাকার কর।
ঝাঁকড়ায়্যা ধরি তুলি শূন্যের উপর॥
অন্তরিক্ষে ভ্রময়ে সকল সহদরে।
কুম্ভকার চক্র যেন ঘন পাকে ফিরে॥'[৪]

অথবা,—

'দুই হাথে হিড়ম্বেরে ধরিল বলবান।
অন্তরিক্ষে ভ্রময়ে যেমত তলাখান॥'[৫]

ছোটো বড়ো যে কোনো যুদ্ধের পরেই রণস্থলের আহত সৈন্যগণের বর্ণনার ক্ষেত্রে

---

১. প. সং ১৭১ক।
২. ঐ. ১৬০খ।
৩. বি. ভা. পুঁ. সং ৯২০। প. সং ৭ক।
৪. ঐ ৬২৫৫। প. সং ১৮৭ক।
৫. ঐ. ঐ. ঐ.

প্রত্যেক মহাভারতকারই কাশীরামদাসকে হুবহু অনুকরণ করেছেন। কাশীরাজ-কন্যাত্রয়ের স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

'কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজাগণে করিল প্রহার॥
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কার দেখি বিপরীত॥
শরীর তেজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি।
রত্ন অলংকার সব যায় গড়াগড়ি॥
বাম হাথ সহিত ধনুক পেলে কাটি।
বুকেতে বাজিলে কেহ করে ছটফটি॥'[১]

যুদ্ধোত্তর রণক্ষেত্রের এই সুন্দর বর্ণনা ভঙ্গীটিকে অতিক্রম করে পরবর্তী কোনো কবিই আর অগ্রসর হতে পারেন নি। দ্বিজ ত্রিলোচনের বর্ণনার শৈলীটিও অনেকটা এই রকমের—

'মুহূর্তেকে গঙ্গাপুত্র করি মহামার।
মারিল যতেক সৈন্য বর্ণিতে বিস্তার॥
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
অস্ত্রাঘাতে কোন জন হৈল মূর্চ্ছিত॥
বুকে বান বাজি কার বারি হইল অস্ত।
কাহার কাটিয়া পড়ে দুই পাটি দন্ত॥
কুচ্ছিত করিল কার নাসা কর্ণ কাটি।
ভূমিতলে পরি কেহ করে ছটফটি॥'[২]

'বিরাট-পর্বে' কুরুদল কর্তৃক বিরাট রাজার গোধন হরণ করতে এলে, তাঁদের বাধা দিতে গিয়ে অর্জুন দূর থেকে দ্রোণাচার্যকে দেখতে পান। তখন ছদ্মবেশের অন্তরালে, আপন পরিচয় গোপণে দ্রোণাচার্যকে দিতে গিয়ে অর্জুন, অস্ত্রের মাধ্যমেই গুরু-প্রণাম ও আত্ম-পরিচয় নিবেদন করেন। কাশীরামদাসের সেই সুন্দর বর্ণনাটির অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় দ্বিজ ত্রিলোচনের কাব্যে কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রপরীক্ষা প্রসঙ্গে—

'তবে পার্থ মহাবীর টংকারি ধনুকে॥
গুরু প্রণমিব হেন বিচারিল মন।
দেখাইতে সভাপানে ইন্দ্রের নন্দন॥
অস্ত্র মারি গুরুপদে করিল প্রণাম।
অদ্ভুত পার্থের বিদ্যা লোকে অনুপাম॥'[৩]

---

১. বি. ভা. পুঁ. সং ১৭২০। প. সং ৭৪ক।
২. ঐ. ৬২৫৫। প. সং ১২৩ক।
৩. ঐ. ঐ. প. সং ২০৯খ।

সর্বোপরি বলা যায়, কাশীরামদাসের 'মহাভারতে'র একাধিক ভণিতার মধ্যে একটিকে কবি বারংবার তাঁর কাব্য মধ্যে ব্যবহার করেছেন।

'কৃষ্ণদাসানুজ কৃষ্ণপদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশিদাসে।'[১]

ত্রিলোচন চক্রবর্তী এই ভণিতাটিকে এই ভাবে ব্যবহার করেন—

'কৃষ্ণদাসানুজ কৃষ্ণপদাম্বুজ
বন্দি কহে ত্রিলোচন ॥'[২]

আশ্চর্যের বিষয় এই, উভয়েরই অগ্রজের নাম 'কৃষ্ণদাস'।

আলোচ্য পুঁথিখানি খণ্ডিত থাকায় পুঁথির লিপিকাল জানা যায় না। তবে, লিপি দেখে মনে হয়, অন্ততঃ দু'শো বছরের পুরানো হতে পারে; এবং পুঁথির ভাষা দেখে মনে হয় কবি অন্ততঃ আরও এক শতাব্দী পূর্বের হতে পারেন। এছাড়া কাব্যের ভাষায় অভিশ্রুতির কোনো নিদর্শন নেই। এর থেকেও মনে হয়, ত্রিলোচন চক্রবর্তীর 'মহাভারত'খানি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা।

॥ কৃষ্ণরামদাস : চণ্ডীমঙ্গল ॥

কৃষ্ণরামদাস রচিত পাঁচখানি 'মঙ্গলকাব্যে'র কথাই পণ্ডিত মহলে পরিচিত। এঁর রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩] সুতরাং, আলোচ্য কাব্যের আলোচনা কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে নেই। পুঁথিটি মগরাহাট থানার কামালপুর মৌজার পশ্চিমবেলে গ্রামের, শ্রীহরেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের বাড়ী থেকে সংগৃহীত। পত্র সংখ্যা ২-১৩। খণ্ডিত। 'চণ্ডীর মশান পালা'।

আলোচ্য পুঁথিখানি 'চণ্ডীর মশান পালা' হলেও আমরা একে 'চণ্ডীমঙ্গল' নামেই উল্লেখ করছি। তার কারণ কবি নিজেই একে 'চণ্ডীমঙ্গল' আখ্যা দিয়েছেন—

'কালীর পাচালী আদি রচিল সকল।
অধিক যতনে এই চণ্ডীর মঙ্গল ॥'[৪]

কবি যদি এই অসম্পূর্ণ রচনাকে 'চণ্ডীর মঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল' আখ্যা দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদেরও এই নাম ব্যবহারে আপত্তি হওয়ার কথা নয়।

তবে কবি যে কেবল 'চণ্ডীর মশান পালা' রচনা করে, তাকেই গৌরবান্বিত করে 'চণ্ডীর মঙ্গল' বলেন নি, তিনি যে 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্যই রচনা করেছিলেন তারও প্রমাণ প্রাপ্ত পুঁথিখানি থেকেই পাওয়া যায়। সাধারণত তৎকালীন

১. বি. ভা. পু. সং ৫১১। প. সং ৪১খ।

২. ঐ. ৬২৫৫। প. সং ২০৬খ।

৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখিকার প্রবন্ধ 'কবি কৃষ্ণরামদাসের অপ্রকাশিত রচনা'—Viswa Bharati Research Journal, Vol. V. P. 75-86 দ্রষ্টব্য।

৪. প. সং ১৮খ।

কবিরা কাব্য মধ্যে এক একটি বিশেষ ছন্দোবদ্ধ পদনিচয়ের শেষে পদ সংখ্যা জ্ঞাপনের জন্য একটি সংখ্যাজ্ঞাপক অঙ্ক ব্যবহার করতেন। আলোচ্য 'মশান পালা'র পুঁথিখানিতেও দেখা যায় পত্র সংখ্যা এক থেকে শুরু হলেও, পয়ার ত্রিপদীর পদ সংখ্যা সেখানে অনেক বেশী। লিপিকর 'চণ্ডীর মশান' পালাটি নকল করবার সময় পূর্ণাঙ্গ কাব্যখানির পদসংখ্যাগুলি অবিকল রেখেছিলেন বলেই কৃষ্ণরামদাস যে কেবলমাত্র 'চণ্ডীর মশান' পালাই রচনা করেন নি, একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করেছিলেন, একথা অনুমান করতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

কৃষ্ণরামদাসের 'চণ্ডীমঙ্গল' তাঁর সর্বশেষ রচনা। এর প্রমাণ 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য মধ্যেই পাওয়া যায়—

'শুনরে গায়ন সব এক বোল আগে।
জে জাও এড়িয়া গিত মোর দিব্য লাগে॥
চণ্ডীর আদেশে ইহা রচিল জতেক।
নিশ্চয় এড়িয়া গেলে অধর্ম্ম অনেক॥···
কালির পাচালি আদি রচিল সকল।
অধিক জতনে এই চণ্ডীর মঙ্গল॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে ভাবিয়া ভবানি।
ও রাঙ্গা চরন বিনে আর নাহি জানি॥'[১]

আলোচ্য কৃষ্ণরামদাস যে সতেরো শতকের নিমতা গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণরামদাসের সঙ্গে অভিন্ন সে কথাও কাব্য থেকে জানা যায়—

'ভগবতি নাম দাষ নিমিতা গ্রামেতে বাষ
কায়েস্ত কুলেতে উতপতি।
হইয়াত একচিত রচিলা চণ্ডির গিত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি॥'[২]

কৃষ্ণরামদাস তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যের মতো আলোচ্য কাব্যেও রাজার কোটাল ইত্যাদি চরিত্রের মুখে আরবী-ফার্সী-হিন্দী মিশ্রিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। নারীর রূপ বর্ণনায় সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারী ভাষা ব্যবহার করেছেন। কোথাও আবার ব্রজবুলী ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগও আমাদের মন হরণ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা 'কমলে কামিনী'র বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

'ত্রিভুবন জননি লিলা কর অপঘন
হর নাহি বুঝত মায়া।

১. প. সং ১৮খ।
২. ঐ. ২২খ।

মাগত লছমিনাথ কমলাসন সাথ
পদ পঙ্কজ ছায়া ॥
লোচন সারস তাহে মধু লালস
ভ্রমর পতি ভুরু জোর।
মালতি মালা করবি ভেল বেড়ল
তড়িত জড়িত ঘন ঘোর ॥
মাজা খিনতর কিঙ্কিনি চঞ্চর
মঞ্জির পদ অরবিন্দে।
লোহিত অধর সদা কন্দুঁঢল ঢল
বাধুনি জাবক নিন্দে ॥
খেনেকে উগারই পুন পুন লোপ্পই
খেলত নগরব বালা।
রাজ হংস জত চৌদিগে উনমথ
কামলু ভয় মাতোয়ালা ॥
আননে আনন চকরবাকগণ
কোকিল পঞ্চম গানে।
গুঞ্জরি ঘন ঘন সঞ্চরি মধুকর
ভূলি রহল রস পানে ॥
কিসনরাম ভনে হর মোন মোহিনে
দুরগত তারিনি নামা।
ভব অন্ধকার পার কর গ
করুনামই হর রামা ॥'[১]

সিংহলে বন্দী ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত শ্রীপতির, জননী খুল্লনার জন্যে শোকের বর্ণনাটিও হৃদয়স্পর্শী—

'খুলনা জননি মোর দুঃখের নাহিক ওর
ভাবিতে ফাটীয়া জায় বুক।
দুখানি চরণ তার সেবা না করিলাম আর
আর না দেখিব গিয়া মুখ ॥
পূর্ব্বকালে শত্রু ছিনু পুত্র হইয়া জনমিনু
পালন করিলা কাখে কোলে।
বাড়াইয়া মায়া কুল হৃদয় হানিয়া শুল
ডুবাইনু দুঃখ সিন্ধু জলে ॥'[২]

১. প. সং ১৬ক।
২. ঐ. ৩০ক-খ।

শ্রীপতিকে রক্ষা-হেতু দেবী চণ্ডীর জরাতুর বৃদ্ধাবেশে মশানে আবির্ভাবের বর্ণনাটি বাস্তবধর্মী—

'কোটরে নয়ন দুটী মিটী মিটী করে।
নাবিয়া পড়িল ভুরু তাহার উপরে॥
কোকড়া সকল গায় সুখাইল মাস।
লাগিয়াছে তনু বাড় নিত্য উপবাস॥
ক্ষেনে উচা হয় বুড়ি পিঠ নড়ি দিয়া।
দুআটু কোকড় করি আকাস চাইয়া॥
কাখেতে চুপড়ি তাতে সম্ভাপানা জত।
তুলসী বিল্লির পত্র দুর্ব্বা গাছি কত॥'[১]

সিংহলে শালিবাহন রাজার সঙ্গে শ্রীপতির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে রাজার সহৃদয় চরিত্রটি ফুটে উঠেছে—

'তোমার জনক ধন্য কৈরিল অনেক পুণ্য
ভাগ্যের অবধি নাহি তার।
কামনা করিয়া বুঝি সাগরে ঋষির তেজি
পাইয়াছে জননি তোমার॥
ভাগ্যবতি বটে সেই দোস মাত্র বলি এই
হৃদয়ে নাহিক দয়া লেস।
নিসেধ নাহি করি কেমনে পরান ধরি
হেন পুত্র পাঠায় বিদেশ॥
রাজা বড় নিদারুন জতেক কহিলা গুন
বিপরিত বুঝি আমি সে।
দয়া নাহি কিবা ধর্ম্ম বুঝিনু দেখিয়া মর্ম্ম
এতদূরে পাঠায় তোমাকে॥'[২]

শ্রীপতি বিক্রমকেশরীর কন্যাকে বিবাহ করবে,—দুর্ব্বলার মুখে এই সপত্নী আগমন-বার্তা পেয়ে, শ্রীপতিজায়া শীলার কাতর বর্ণনায় কৃষ্ণরামদাস উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—

'শুনি দুর্ব্বলার কথা মরমে পরম ব্যাথা
বসিয়া রূপসি মন হরা।
মন পোড়ে দুঃখানলে ফুকরিয়া নাই বলে
নখরে আখর লিখে ধরা॥

১. প. সং ৬৮ক।
২. ঐ. ২০খ।

ভাবিয়া সভার জ্বালা কাদে নৃপতির বালা
মুখ থুয়্যা অধর করেতে।
তাই দেখি বুঝি হেন বিমল দর্পণ যেন
স্বর্ণদণ্ড তাহারে ধরিতে ॥'[১]

কৃষ্ণরামদাসের অন্যান্য কাব্যের মতোই আলোচ্য কাব্যখানিও অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট। নৌকার বাঙাল নাবিকদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এবং সিংহলের শালিবাহন-রাজার কন্যা শীলার 'বারমাসিয়া'-বর্ণনা অংশে এই অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

।। রাজারামদাস : নারায়ণীমঙ্গল ।।

রাজারামদাসের 'নারায়ণীমঙ্গল'-কাব্যের পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।[২] পুঁথিটির লিপিকাল ১২০৬ বঙ্গাব্দ। পত্র-সংখ্যা ৫৪। অখণ্ডিত।

বাংলা 'মঙ্গলকাব্যে'র ধারায় 'নারায়ণীমঙ্গল' একটি সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন। রাজারামদাস ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্মের গীত' রচনা করেন। তার আগে 'সত্যপীরের গীত' ও 'নারায়ণীমঙ্গল' রচনা করেন।[৩] কবির পিতার নাম দশরথ, বাস ছিল মাগুরা জেলার শিহরবালি গ্রামে। 'নারায়ণীমঙ্গল'-কাব্যে রাজারামদাস এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

'পশ্চিমে মাগুরা সীমা পুর্ব্বে মেদনমল।
মধ্যস্থানে ভাগীরথী সুধাসম জল ॥
গঙ্গার পশ্চিমকূল যেন সুরপুর।
উত্তম শিহরবালি সভার সুন্দর ॥
পিতামহ গোকুল বসতি পূর্ব্বাপর।
দশরথ নাম পিতা গুণের সাগর ॥
উত্তম তনয় তিন রাজারাম জ্যেষ্ঠ।
অভিরাম জয়কৃষ্ণ ভাজন কনেষ্ঠ ॥...
মাগুরা বসতি শিহরবালি গ্রাম।
তালুক আনায়া খাঁ জেন কলি রাম ॥'[৪]

আলোচ্য কাব্যটির রচনার নিদর্শন হিসাবে আমরা এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

'আগোড়া পৃথিবী নাই চাহিলে অবনী।
ভাবিতে চিন্তিতে শেষ হইল রজনী ॥

হেনকালে দেবীর পড়িয়া গেল মনে।
গোর্ক্ষনাথ সঙরিল বার দুই তিনে॥
দেবী সঙরণে গোর্ক্ষ রহিতে না পারে।
দ্রুতগতি উপনীত দেবীর গোচরে॥
দেবী বলে গোর্ক্ষনাথ তুমি শিষ্য পো।
বল দেখি পূজা হেতু করি কোন জো॥
প্রণমিয়া গোর্ক্ষ বলে শুন সতী মাই।
তোমারে অধিক আর কে আছে গোঁসাই॥
ত্রিদেবা অধিক ঘোষে তোমার মায়ায়।
প্রবঞ্চণা করি কেন ছল গ আমায়॥
ভবানী বলেন গোর্ক্ষ চাতুরালি ছাড়।
আগম চাহিয়া জুক্তি নাই তোর বড়॥
প্রকাশিয়া বল পুত্র চিত্তে বিচারিয়া।
পাইলে আপোড়া খিতি যাই পূজা লৈয়া॥
ধেয়ানে বসিলা গোর্ক্ষ করি উর্দ্ধ পানি।
সবার আকৃতি দেখে সকল মেদিনী॥
তিল অর্দ্ধ অবধি গণিল মহীতল।
বিংছালি নগর মাঝে পাইল সুস্থল॥
স্বরূপ জানিয়া বলে গোর্ক্ষ মহামতি।
ভরথ রাজার পূজা লই ভগবতী॥
বিংছালি নগর তার দেশের দুর্ল্লভ।
বাজারে বকুল তরু সুচারু পল্লব॥
সেই স্থানে মূর্তিমান হও দশভুজা।
নৃপতিরে দেখা দাও যদি লবে পূজা॥
এতেক বলিয়া গোর্ক্ষ লইয়া বিদায়।
নারায়ণী পদতলে রাজারাম গায়॥'[১]

রাজারামদাসের কাব্যের ভাষা সহজ, সরল, অলঙ্কার বর্জিত। কিন্তু বিষয়-বস্তুর নতুনত্বই আলোচ্য কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধর্মদাস বণিক : নিরঞ্জন পুরাণ

বিশ্বভারতী পুঁথি বিভাগে ধর্মদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের একটি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। পুঁথি-সংখ্যা ৪০৮। পত্র-সংখ্যা ৩২৩। পুঁথিখানির লিপিকাল ১৩২৫

শকাব্দ বা ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাপ্তিস্থান রামনগর। সংগ্রাহক স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়। পুঁথিটিতে কোথাও কোথাও শ্যামপণ্ডিতের ভণিতাও রয়েছে। তবে, অধিকাংশই ধর্মদাস বণিকের রচনা। পুঁথির পুষ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত হলো।

"যথাদিষ্টং তথা লি[খি]তং লেখকো নাস্তি দোসকঃ ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমশ্চ। লিখিতং শ্রীরামদেব সর্ম্মা। পুস্তকমিদং শ্রীধর্ম্মদাস ঘোষ। সাকিম শ্রীরামনগর। শকাব্দা ১৬২৫।"

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-গ্রন্থে এবং ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-গ্রন্থে ধর্মদাস বণিকের নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু আলোচ্য কবি এবং তাঁর কাব্য-সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নি।

ধর্মদাস বণিক জাতিতে বেনে ছিলেন। কাব্যের ভণিতা-অংশে একথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে।

'ধর্ম্মের মঙ্গল কথা সুন সর্ব্বজন।
বান্যা ধর্ম্মদাস গীত করিল রচন॥'[১]

ধর্মদাস বণিকের রচিত কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন পুরাণ'

'নিরঞ্জন পুরাণ সুনহ সর্ব্বজন।
বাণ্যা ধর্ম্মদাস ভাসে আনন্দিত মন॥'[২]

কবি একে 'পুরাণ' বলে উল্লেখ করলেও এতে পৌরাণিক বা দেব-কাহিনী নেই, রয়েছে মানবীয় কাহিনী। 'ধর্মমঙ্গলে'র অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গে এর কাহিনীগত বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

ধর্মদাস বণিকের কাব্যরচনা কাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে, ধর্মদাস বণিকের 'নিরঞ্জন-পুরাণে'র যে পুঁথি আমরা পেয়েছি তার লিপিকাল ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই পুঁথির মধ্যে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক উভয়ের ভণিতা রয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায় গায়েন বা লিপিকরদের হাতে পড়ে দুই কবির কাব্য এই পুঁথিতে মিশ্রিত হয়েছে। সুতরাং, এই দুই কবির কাব্য ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্ততঃ ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে রচিত হয়েছে বলে স্বীকার করতে হয়। সেই হিসাবে ধর্মদাস বণিক নিঃসন্দেহে সতেরো শতকের কবি।

ধর্মদাস বণিকের বাড়ী কোথায় ছিল, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। তবে, কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলে মনে হয়, কবি বীরভূম অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। আলোচ্য 'নিরঞ্জন-পুরাণ'-কাব্যের ভাষা অনেকাংশে বীরভূমের কথ্যভাষাকেই অনুসরণ করেছে। এ-ছাড়া, কাব্যমধ্যে লাউসেনের ঢেকুর

১. বি. ভা. পুঁ. সং ৪০৮, প. সং ১৬৮ক।
২. ঐ. প. সং ১৬ক।

যাঁত্রা পথের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তাতে উক্ত অঞ্চলের সন্নিকটস্থ গ্রামগুলির নাম ও অবস্থানের যে নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়, একমাত্র স্থানীয় লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর বলে মনে হয়। অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হলো—

'পদ্মাবতী পার হইলা চাপিঞা নৌকায় ॥
হীরাপুর দিঞা সেন করিল গমন।
মাঁড়াগঙ্গে স্নান করি পুজে নিরঞ্জন ॥
সুন্দরপুরে আসি দিল দরশন।
লাঙ্গলহাটা দিঞা করিল গমন ॥
ঠৈয়া কান্দরকুলা বাম ভাগে থুঞা।
সাহাপুর গ্রামে সেন উত্তরিল্য গিঞা ॥
চণ্ডীর চরণে সেন করিঞা প্রণতি।
বিশ্রাম করিল সভে তোথা সেই রাতি ॥
প্রভাতে চলিলা সেন হঞা তোরাবান।
সন্মুখে দেখিতে পাল্য মুলুক সিঙ্গান ॥
বোলপুর গ্রামখান রহে কথেক দূরে।
স্নান দান কৈল সভে আসিঞা বল্লভপুরে ॥
ভালুকডাঙ্গা রূপপুর বামেতে থুঞা।
আন্দুর পায়েড় সেন উত্তরিলা গিঞা ॥
আন্দুর পায়েড়ের ভিতর গ্রাম দিঞা।
ঘুড়িসার মাঠে সেন উত্তরিলা গিঞা ॥
ঘুড়িসার মাঠে সেন বাজাল্য দামামা।
ডাহিনে সুগড় রহিল বামেতে আকামা ॥
অজয়ের ধারে আসি হইলা সুস্থির।
বড়ই দুর্গম দেখে ঢেকুরের গড়।
সেইস্থানে লাউসেন তোলে তামুঘর ॥'[১]

সর্বদাস বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের ভাষার যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি মোটামুটিভাবে উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের, বিশেষতঃ বীরভূম অঞ্চলের কথ্যভাষার সঙ্গে মিলে যায়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে দেওয়া হলো।—

কতকগুলি স্বরবর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে অপর কতকগুলি স্বর উচ্চারণের দিকে বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন—অ>ই। যেমন, প্রাণ>প্রানি[২], ডাল>ডালি

১. প. সং ২০২খ।
২. 'এবার জনের প্রানি কেনে নিল কাড়ি।' প. সং ৮০খ।

ইত্যাদি। অ>এ যেমন, কেন>কেনে[১] ইত্যাদি। এ>ই যেমন, বেটি>বিটি[২] ইত্যাদি। অ>উ যেমন, একই>একুই[৩] ইত্যাদি।

এছাড়া, ঘরে অর্থে 'ঘরকে'[৪], মতো অর্থে 'পারা'[৫], আমার অর্থে 'মো'[৬], ফেরে অর্থে 'বুলে'[৭], যেতে অর্থে 'যাত্যে'[৮] এবং 'যাছিলাঙ'[৯], 'আইলাঙ' 'হইলাঙ'[১০] ইত্যাদির ব্যবহার, বীরভূমের কথ্য-ভাষারই বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য সর্বত্র লক্ষ করা যায়। কোথাও কোথাও ভাষার এই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আলোচ্য কাব্যে দু-একটি ছত্রের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে—

'আছিলাঙ দুই জনে হইলাঙ একেশ্বর।
আমারে ছাড়িঞা ভাই গেলা কোথাকার॥
না জানি প্রাণের ভাই আছে কি মরিল।
ঘরকে যাত্যে মোরে পথ বেন্দ্যা গেল॥'[১১]

ধর্মদাস বণিকের কাব্যের ভাষা সহজ, সরল, পাণ্ডিত্যবর্জিত। এই সহজ সরল ভাষায় বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাব্যখানি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণ-স্বরূপ, লাউসেন কাঙুর জয়ে গেলে, কাঙুরের কোটাল জয়সিঙ্গার সঙ্গে কালুডোমের যে কথোপকথন হয়, তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো।

'জয়সিঙ্গা বলে হৈল ইষ্ট দরশন।
কাঙুরের গড়ে কালু আল্যা কি কারন॥
তুমি তো ডোমের সুত আমি তো চাণ্ডাল।
ভায়ানি সম্বন্ধ তোমা সনে সর্ব্বকাল॥
বীর কালু বলে ভায়া কর অবধান।
ভায়ানি সম্বন্ধ গেল ইবে হইল আন॥'[১২]

তখন রুষ্ট হয়ে জয়সিঙ্গা বলে—

---

১. 'এমন জনের প্রাণি কেনে নিল কাড়ি।' প. সং ৮০খ।
২. 'বিটি আটকুড়া হইলে জল নাহি খাই।' প. সং ৪৯ক।
৩. 'একুই আছাড়ে তাহা পেলিলে ভাঙ্গিঞা।' প. সং ৯৩ক।
৪. 'চলিয়া যাইব সভে আপন ঘরকে।' প. সং ৬৩ক।
৫. 'ডাড় পাইড়া হইলা পারা যাবে যম ঘর।' প. সং ৯৩ক।
৬. 'মুণ্ড মুড়াইঞা মো চালিয়াছ ঘোল।' প. সং ৩৮খ।
৭. 'বাদল বরিসায় বৃত্তি বুলিতে না পাইখে।' প. সং ১৬৭খ।
৮. 'ঘরকে যাত্যে মোর পথ বেন্ধ্যায় গেল।' প. সং ৯৩ক-১২৮খ।
৯. 'যার লাগি যাছিলাঙ গৌড় নগর।' প. সং ৯৩খ।
১০ 'আছিলাঙ দুই জনে হইলাঙ একেশ্বর।' প. সং ১২৮খ।
১১. প. সং ১২৮খ।
১২. প. সং ২৬৭ক।

'রমতি কিনারে তোমার ছিল ঘর।
কোনকালে নাহি ছিলে রাজার চাকর ॥
সাত গাঁঠ্যা টেনা খান টানিঞা পরিতে।
হাত ডের সোটাখানি কান্দে করি নিতে ॥
সুকর রাখিতে তুমি পথরে পথরে।
বাটুল মারিঞা খগ বিচিতে নগরে ॥
কুলিন ডোমের কন্যা লক্ষা ডুমনি।
তোর তরে ঘরে ঘরে মাগিথ আমানি ॥
ভোজনের পাত্র নাই অন্নের কাঙ্গাল।
আমানির তরে ঘরে কুড়্যা ছিলে খাল ॥
সাঙজুড়ি দুটা মোছ বান্দ নিঞা ঘাড়ে।
আমানির চমকে কুড়্যার খড় উড়ে ॥
বাদল বরিসায় বৃত্তি বুলিতে না পাইথে।
উপবাস করিঞা তোমাদের দিন গেছে ॥
অহঙ্কারে ডোমসুত না চিন আপনা।
পাটের পাছড়া গায় কানে দেখি সোনা ॥'[১]

তখন এর উত্তরে কালুডোম বলে—

'বৃত্তি করি অন্ন খাই ইথে দোস কিসে।
তোমার পূর্ব্বের কথা শুন মোর পাশে ॥
সরোবর পখোরে তুলিতে পানিফল।
খুদে চাল্লে জর করি কুলাথ্যো সম্বল ॥
গড়্যা নালা খোদে প্রজা গ্রামের ভিতর।
কান্দে ভারে মৃত্তিকা বহিতে নিরন্তর ॥
বরিষা বাদলে যবে কাটিতে না পাইথে।
পালের ভাটি আঁড়্যা গরু চুরি করি দিথে ॥
বাখুড়ি করিঞা গরু বিচিথে অন্যত্র।
এমন প্রকারে তোমাদের দিন গেছে ॥'[২]

সোমঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায়[৩] সেকালের যুদ্ধসজ্জার বিবরণ পাওয়া যায়। কানড়ার সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের বর্ণনায়ও বিশেষ বৈচিত্র্য রয়েছে।[৪]

১. প. সং ২৩৭খ।
২. ঐ. ।
৩. প. সং ১৮খ।
৪. প. সং ১২৪খ।

ধর্মদাস বণিকের কাব্যে অনেক সময় দু-এক ছত্রে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন কানড়ার দাসী দুর্মুখের বর্ণনায়—

'শত হাত বস্ত্রখান এক বেড়ে জায়।
সাত সলি ধান তার পিঠেতে সুখায়॥
তিন সের গুয়া বিটি এক গালে খায়।
তবু তার মা বলে দুবলঞা যায়॥'[১]

কানড়াকে বিবাহ করতে ব্যাকুল রাজা গৌড়েশ্বরের বর্ণনা কবি সরসভাবে দিয়েছেন,

'আশি নিবড়ীঞা নৈ বৎসরের হৈল।
জে হকু সে হকু সত্য তোমারে কহিল॥
নড়িতে চড়িতে রাজা করে থরবর।
ভোজনের কালে ধরে তিনটা নফর॥
সেচা গুয়া খায় রাজা নলিতে পিয়ে দুধ।
ঘোড়াতে চাপিতে নারে দোলায় আতুর॥
কপালের মাস গুলি পড়িছে ঝুলিঞা।
কোলে ভার্য্যা থাকিতে বুলেন হাতড়িঞা॥'[২]

ধর্মদাস বণিকের কাব্যে প্রত্যেকটি চরিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পুত্রস্নেহে অন্ধ রঞ্জাবতীর স্নেহময় সহজ সরল চরিত্রটি সর্বত্র পরিস্ফুট। শিশু লাউসেন চুরি হলে রঞ্জাবতীর ব্যাকুলতা নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রে ফুটে উঠেছে—

'নিদ্রাভঙ্গ হৈল রঞ্জা বসিল উঠিঞা।
বাছা বাছা বলি কান্দে পুত্র না দেখিঞা॥
অন্ধকার ঘর বলি বুলে হাতাড়িঞা।
কোন জন নিল মোর তনয় হরিঞা॥
পুত্র না পাইঞা রামা কান্দে উচ্চস্বরে।
... ...
হাপুতের পুত মোর অন্ধনের নড়ি।
এমন জনের প্রাণি কেনে নিল কাড়ি॥'

পাত্র মহামদের চরিত্রটি যেমন জীবন্ত হয়েছে, এমন বোধ হয় আর কোনো কবির কাব্যে হয় নি। এখানে মহামদ কেবলমাত্র একটি খল ও জিঘাংসু চরিত্র নয়, তাঁর চরিত্রের এই পরিণতির পিছনে রয়েছে যে স্নেহপরায়ণ একটি ভ্রাতৃহৃদয়ের অভিমান, তাও খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মহামদ তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী রঞ্জাবতীকে

১. প. সং ১৮০খ।
২. প. সং ১৭৯খ।

অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁকে গোপন করে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জার বিয়ে দেওয়াতে মহামদের প্রবল অভিমান হয়। তাই সে তাঁর পিতামাতাকে বলে—

'মোরে লুকাইঞা জবে দিলে গা বিবাহ।
তখন ঘরের আমি না ছিলাঙ কেহ ॥
এখন আসিঞা মোরে কহিলে যেমন।
ইঙ্গিত করিঞা কিছু না কহিলে তখন ॥
মুণ্ড মুড়াইঞা মো ঢালিয়াছ ঘোল।
বুঝিলাঙ মনে আমি সেই সে কেবল ॥
সেকথা তুলিতে উঠে আগুনের খুনি।
মোর ঘরে জামাতারে না আনিহ তুমি ॥
যেখানে কন্যা দান করিলে গা তোরা।
সেই খানে পাত গিঞা আদর পসরা ॥
জামাতারে আদর করহ তোথা গিঞা।
হেথা যদি আন তবে পেলিব মারিঞা ॥'[১]

এইভাবে মহামদের স্নেহ ও অভিমান জিঘাংসায় রূপান্তর লাভ করলো। সে ভাবলো, কর্ণসেনকে নিহত করে আদরের ভগিনী রঞ্জাবতীকে ঘরে এনে রাখবে। অতঃপর মহামদ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে যতোই ব্যর্থ হতে থাকলো, ততোই তাঁর জিঘাংসা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠতে লাগলো। যার ফলে মহামদের খলতাও যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত ও বাস্তবমুখী করে তুলেছে। পরে শুধু কর্ণসেন নয়, রঞ্জার পুত্র লাউসেনের উপরও তার অচরিতার্থ জিঘাংসা গিয়ে পড়লো।—

'তর্জ্জন গর্জ্জন করে মোচরিঞা দাড়ি।
কোন বুদ্ধে রঞ্জাকে করিব আটকুড়ি ॥'[২]

এইভাবে কবি মহামদের চরিত্রকে অপরাপর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের কবিদের মতো কেবলমাত্র খলতার প্রতিমূর্তি না করে, কতকটা জীবন্ত করে তুলেছেন। পাত্র মহামদের কথায় ও কাজে কোনো কোনো সময়ে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটিকে মনে করিয়ে দেয়। হস্তিবধ করে গৌড়েশ্বরের কাছে পুরস্কৃত হয়ে দেশে ফিরে যাবার পূর্বে লাউসেন তার ফলা রেখে ঘোড়ায় চেপে অন্যত্র গেলে, পাত্র মহামদ সকল নগরবাসীকে ডেকেও সেই দেবদত্ত ফলা তুলে নিয়ে যেতে পারে না। তখন কামার-ছুতোর ইত্যাদি ডেকে ফলাটিকে খণ্ড খণ্ড করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাও কিছুতে

১. প. সং ৬৮খ।
২. প. সং ১৯৭খ।

সম্ভবপর হলো না দেখে, "ভাসিতে লাগিল পাত্র শোকের সাগরে।"[১] ইতিমধ্যে লাউসেন সেই স্থানে ফিরে এলে মহামদ আপন দুর্গতি গোপন করতে গিয়ে—

'খলবুদ্ধে জায় পাত্র সেনের গোচরে ॥
তোমা না দেখিঞা বাছা হইলাঙ কাতর।
কান্দিঞা বেড়াই আমি সকল নগর ॥
কোন্ দেসে বাছাকে মারিল আছাড়িঞা।
ইবে সে আইল প্রাণ তোমাকে দেখিঞা' ॥[২]

আলোচ্য ছত্র কটি মহামদ-চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে। এখানেই কবির সার্থকতা।

সারলা দাস : মহাভারত

এই শতাব্দীর অপর একজন মহাভারতকার সারলাদাস, ওরফে 'সারল কবি'। এঁর ভণিতায় মহাভারতের 'আদি-পর্ব'[৩] ও 'বিরাট-পর্ব' পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী পুঁথি-ভাণ্ডারে সারলাদাসের 'বিরাট-পর্বে'র তিনখানি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। এদের ক্রমিক-সংখ্যা যথাক্রমে ৬২৬৩, ৪৮২১ ও ২৯৯। এদের মধ্যে ৬২৬৩ ও ৪৮২১ সংখ্যক পুঁথি দু'খানি অখণ্ডিত।

৪৮২১ সংখ্যক পুঁথিখানির নাম 'বৃহৎ বিরাট পর্ব। পত্র সংখ্যা ১০০। সংগ্রাহক শ্রীশিবরতন মিত্র। প্রাপ্তিস্থান সিউড়ী অঞ্চল। পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ,—

"যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে দোস নাস্তি ডিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম লিখিতং শ্রীগো[রা] চাঁদ মিত্র সাকিম ভুতুড়া পরগণে খটঙ্গা থানা সিহুড়ি মতালকে জেলা বীরভোম পাঠক শ্রীমধুশোদন মণ্ডল সামি[ল] ভামরা পরগণে মল্লারপুর আর্কেট পুষ্ট গনপুর মতালকে জেলা বীরভোম। এই পুস্তক নদেই ঘোষের পশ্চীমদারি ঘরের ভিটাতে বসিয়া সমাপ্ত হয় বেলা আন্দাজি ১॥ প্রহর হইয়াছিল সোমবার বিকণ্ড শ্রীযুধিষ্টির মণ্ডল বসিয়া দেখিতে ছিলেন ইতি সন ১১৭৬ এগারসত্ত ছেয়াত্তর সাল তারিখ ৯ অগ্রাণ ॥"

৬২৬৩ সংখ্যক পুঁথিখানির পত্রসংখ্যা ১৩৪। সংগ্রাহক শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল। প্রাপ্তিস্থান বুড়ুল অঞ্চল: পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ,—

"ইতি বিরাট পর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত।···লিখিতং শ্রীরাম লাল কুণ্ডু সাং নারায়ণপুর পরগণে সমরসাহী সন ১২৪৭ সাল তারিখ ৯ শ্রাবণ বৃহস্পতি বার কৃষ্ণপক্ষে তিথৌ নবমি বেলা ছয় দণ্ড সমএ সমাপ্ত এ পুস্তক লিখিলাম নিজের পড়িবার কারণ।"

২৯৯ সংখ্যক পুঁথিখানির সংগ্রাহক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পত্র সংখ্যা ১৩। খণ্ডিত।

১. প. সং ১৫৫ক।
২. প. সং ১৫৫খ।
৩. বা. সা. ই. পৃ. ৬৮৯।

এই পুঁথি তিনখানির মধ্যে তারিখ সংবলিত পুঁথি দুখানির মধ্যে প্রথমটির তারিখ ১১৭৬ বাংলা সন বা ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ এবং অপরটির তারিখ ১২৪৭ বাংলা সন বা ১৮৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দ। পুঁথি তিনটির পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। মূলকাব্য রচিত হবার অন্ততঃ ৬০।৭০ বছর অতিবাহিত না হলে বিভিন্ন পুঁথির পাঠে এরকম পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। বিশেষতঃ সারলাদাসের মতো একজন অপ্রধান কবির কাব্যের ক্ষেত্রে একথা সহজেই প্রযোজ্য। সুতরাং সারলাদাসের 'মহাভারত' সতেরো শতকের শেষ দিকে রচিত হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। ডঃ সুকুমার সেনও 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-গ্রন্থে সারলাদাসকে সতেরো শতকের কবি বলেই অনুমান করেছেন।[১]

সারলাদাস নিজেকে সর্বত্র 'উৎকল ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করলেও কবির পদবী কি ছিল জানা যায় না। ভণিতা অংশে কখনও কখনও কবি 'হরি', 'গোবিন্দ' ও 'ভারথীর পাদপদ্ম' স্মরণ করলেও তিনি 'সারদা' দেবীর পদতলেই প্রণতি জানিয়েছেন বারংবার।

'শারদার পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
রচিল সারল কবি উৎকল ব্রাহ্মণ ॥'[২]

আর এক সারলাদাসকে আমরা পাই ওড়িয়া সাহিত্যে। এর নামে তিনটি প্রধান গ্রন্থ পাওয়া যায়। 'বিলঙ্কা রামায়ণ', সম্পূর্ণ 'মহাভারত' ও 'চণ্ডীপুরাণ'। এই প্রসঙ্গে সারলাদাসের 'চণ্ডীপুরাণে'র দুটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা যায়—

'প্রথমে রামায়ন দ্বিতীয়ে মহাভারত।
তৃতীয়ে অনুবাদ লেখন কলইমু ভাগবত ॥'[৩]

এই সারলাদাসের সময় সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নন। তবে, সারলাদাস নিজের 'মহাভারতে' একস্থানে বলেছেন,—

'কোলিকাল ধ্বংসনকু ভোগ গোটি পূজা।
প্রণমিতে খটয়ি কপিলেশ্বর রাজা ॥'[৪]

এর থেকে মনে করা হয়, কপিলেন্দ্র দেবের সমসাময়িক বা পরবর্তী কালে ওড়িয়া কবি সারলাদাস বর্তমান ছিলেন। আবার সূর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই কপিলেন্দ্র দেবের রাজত্ব কাল ১৪৩৫ থেকে ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর নাম কপিলেশ্বর রাউত রায়। এঁর পুত্র পুরুষোত্তম দেব, তাঁর পুত্র প্রতাপরুদ্র দেব।

আলোচ্য সারলাদাস কটক জেলার ঝঙ্কর নামক গ্রামে বাস করতেন। সেখানে সারলা দেবীর মন্দির আছে।[৫] এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়[৬], ওড়িয়া কবি সারলাদাস ও

১. বা. সা. ই. প. ৬৮৯।
২. পুঁ. সং ৪৮২১। প. সং ৫৬৭।
৩. ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৪২।
৪. ঐ. পৃ. ৪৩।
৫ ঐ. পৃ. ৪১।
৬. বিশ্বভারতীর ওড়িয়া বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নরেন মিশ্র ওড়িয়া কবি সারল দাস-সম্পর্কিত তথ্যটুকু দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বাংলায় 'সারল কবি' সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, বাংলার সারল কবি বার বার নিজেকে উৎকল ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করলেও তাঁর কাব্য পাঠে মনে হয় তিনি বাংলার জল হাওয়াতেই বড়ো হয়েছিলেন।

বাংলা 'মঙ্গলকাব্যে'র কবিকুলের মতো সারল কবিও দেবী সারদা চণ্ডীর কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁরই দয়ায় কাব্য রচনা করেন।

'মোর মনে সাধ যে সারদা পদতলে।
যারে দেখা দিলে মাতা স্বপ্ন ভাঙ্গা কালে ॥'[১]

অথবা—

'ভারতীকে ভাবিয়া ভারত বিরোচিল।
সারল কবিরে সারদার দয়া হইল ॥
সারদা সেবিয়া মনে চিন্তিত উপায়।
বিরাট পর্ব সারল কবি গীত গায় ॥'[২]

'সারল কবি' বাঙালি ছিলেন। 'বালির বান্ধেতে চাহে বান্ধিবারে সিন্ধু'[৩] 'বাউল হইয়া চাহে ধরিবারে ইন্দু'[৪] ইত্যাদি বাংলা প্রবাদ প্রবচণের ব্যবহার ও বর্ণনা-ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে কবির পরিপূর্ণ বাঙালিয়ানাই প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র কাব্যখানিতে।

আলোচ্য কবির রচনা-শৈলী সুন্দর কাব্যগুণমণ্ডিত হলেও কোথাও কোথাও কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে'র সুস্পষ্ট প্রভাবও লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের বর্ণনা, যুদ্ধোত্তর রণভূমির বর্ণনা ইত্যাদি অংশে আলোচ্য কবি কাশীরাম দাসের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। এছাড়া, কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে'র বিরাট পর্বে গোধন হরণকারী কুরুসেনাদলের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন যেভাবে দ্রোণাচার্যের কাছে সকলের অগোচরে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন অস্ত্র নিক্ষেপ করে; কাশীরাম দাসের সেই ভঙ্গিমাটিকে হুবহু অনুসরণ করেছেন 'সারল কবি'।

আমাদের বিবেচনায় 'দক্ষিণরাঢ়-প্রান্তনিবাসী'[৫] এই বাঙালি কবি সারলাদাস, উৎকল গাঁইএর ব্রাহ্মণ ছিলেন। এবং তিনি বাংলা ভাষায় 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন। উড়িষ্যার পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি সারলাদাসের 'মহাভারত'-গ্রন্থই হয়তো এঁর আদর্শ ও অবলম্বন ছিল। তবে, স্থানীয় প্রভাববশতঃ কাশীরাম দাসের প্রভাবও এড়াতে পারেন নি।

---

১. পুঁ. সং ৬২৬৩। প. সং ২৮খ।
২. ঐ. । প. সং ১৩৩ক।
৩. ঐ. । প. সং ১৩৫ক।
৪. পু. সং ৬২৩৬। প. সং ১৩৫ক।
৫. বা. সা. ই. পৃ. ৬৮৯।

পীর মাহাত্ম্য কবিতার কথা ও ইসলামি সাহিত্য সমীক্ষা

আসরে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান।
সবাকার তরে আল্লা হও মেহেরবান।
ইউসুফ জোলেখার গীত পালা হৈল সায়।
সেহ ভাই আল্লার নাম দিন বয়া যায়।

মুসলিম-সাহিত্য ষোড়শ শতক থেকে রচিত হতে শুরু হলেও, সতেরো শতকের শেষদিক পর্যন্ত প্রধানত চট্টগ্রাম-অঞ্চলের মুসলমানগণই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। রাঢ় অঞ্চলে সতেরো শতকের মুসলিম-কবিদের রচনা খুব অল্পই পাওয়া যায়। তবে মুসলমানি বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো কোনো হিন্দু কবিও এই অধ্যায়ে দু-একটি কাব্য রচনা করেছেন। মুসলমান এবং হিন্দুদের এই জাতীয় রচনাকে একত্র করলে আমরা প্রধান দুটি সাহিত্য-ধারা লক্ষ করি—পীর-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কবিতা এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য।

'পীর' শব্দের অভিধানগত অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন। আর প্রচলিত ভাবার্থ মহাপুরুষ বা আধ্যাত্মিক গুরু। এই আধ্যাত্মিক গুরু বা 'পীর'গণ ছিলেন ইসলাম-ধর্ম-প্রচারক। খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম-ধর্ম প্রচারক পীর ফকীর দরবেশদের আগমন ঘটতে থাকে। খৃষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গাজী ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক গৌড়-লক্ষণাবতী অধিকৃত হবার পরবর্তী সময়ে, অনেক পীর-দরবেশ রাঢ়-বাংলায় আগমন করেন। এইসব পীর ফকিরগণ ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের শাসনকার্যেও সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতেন। ইসলাম-ধর্ম প্রচারক এই পীরগণকে কেন্দ্র করে যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সংক্ষেপে তাই 'পীর-সাহিত্য' নামে পরিচিত।

'পীর' রূপে যাঁরা উপাসিত হতেন বা হচ্ছেন, তাঁদের আমরা কয়েকটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। ঐতিহাসিক পীর, কাল্পনিক পীর এবং হিন্দুদেবতার মুসলমান সমরূপ বা নামভেদ।

।। **ঐতিহাসিক পীর** ।।

এঁদের আবার দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—মুসলমান ও অমুসলমান। মুসলমান পীরদের মধ্যে পীর ইসমাইল, পীর গোরাচাঁদ, যাঁর প্রকৃত নাম পীর হজরত শাহ্‌, সৈয়দ আব্বাস আলী রাজী, প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। যেসব অমুসলমান মহাপুরুষেরা কালক্রমে মুসলমান-সম্প্রদায়ের উপাস্য হয়ে 'পীর' নামে আখ্যাত হয়েছেন তাঁরাই শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়েন। মুসলমান ভক্তেরা অনেক সময়ে এঁদের নামকেও প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে নিয়েছেন। যেমন, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকের[১] খ্রীষ্টান সন্ত Saint Manichee মুসলমানদের হাতে পড়ে 'মাণিক পীরে' পরিণত হয়েছেন। বাংলা ভাষাতে মাণিক পীরের যে গীত রচিত হয়েছিল, তার কাহিনী-অংশের সবটুকুই প্রায় অনৈতিহাসিক।

।। **কাল্পনিক পীর** ।।

এই শ্রেণীর পীরদের মধ্যে চট্টগ্রামের মাহে আনোয়ারের ও পাগল পীরের নাম উল্লেখযোগ্য।

।। **হিন্দু-দেবতার মুসলমানী সমরূপ বা নামভেদ** ।।

এঁদের মধ্যে হিন্দুদের পূজিত সত্যনারায়ণ, কালু রায়, সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখকেই আমরা নাম ভেদে যথাক্রমে সত্যপীর, কালুশাহ, মোছরা পীর ইত্যাদি রূপে মুসলমানদের মধ্যে উপাসিত হতে দেখি।

এই সমস্ত পীরদের মধ্যে একমাত্র সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ, মাণিক পীর ও বড় খাঁ গাজী ছাড়া আর কারো কথা সতেরো শতকের রাঢ়ের কোনো কবি লিপিবদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায় না।

পীর-মাহাত্ম্য কাব্যগুলি একদিকে যেমন কতকটা মঙ্গলকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত, তেমনই মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর কিছু মৌলিক পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। দেবদেবীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মঙ্গলকাব্যের মতো এই পীর সাহিত্যেও কবির আত্মপরিচয়, ভণিতা, দেবদেবীর বন্দনার মতো আল্লাহ্‌র বন্দনা, পীরের মাহাত্ম্য, লৌকিক ও অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক কাহিনী ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আবার মঙ্গলকাব্যের মতোই কাব্যগুলি একক বা দলবদ্ধভাবে গীত হবার উপযুক্ত। কিন্তু, এই সামান্য মিল থাকা সত্ত্বেও পীর সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। যেমন, গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, বারমাস্যা, চৌতিশা, নারীদের পতিনিন্দা, কাব্য শেষে নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণ ইত্যাদি পীর-পাঁচালীতে বর্জিত হয়েছে। এই বহিরঙ্গগত অমিল ছাড়াও পীর-সাহিত্যের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

---

১. বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, পৃ. ৪১৭।

মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব দেবদেবীই চেয়েছেন, নিজেদের পূজা প্রচার করতে। অপর পক্ষে, পীরগণ চেয়েছেন, মানব-সমাজকে আল্লাহ অভিমুখী করতে। এই সব কারণে, পীর-সাহিত্যকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

। সত্যপীর।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সত্যপীরের উপাসনার প্রচলন আছে। এঁর হিন্দু-সংস্করণ সত্যনারায়ণের পূজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত। সত্যপীর নামটির 'সত্য' শব্দে হিন্দু প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ প্রকৃত-পক্ষে একই উপাস্যের দুটি রূপ। এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতম রূপ বলা কঠিন। সত্যনারায়ণ প্রাচীনতর হলে বলতে হয়, হিন্দুদেবতা পরবর্তী কালে মুসলমানী প্রভাবে পীর-এ পরিণত হয়েছেন। আবার সত্যপীর প্রাচীনতর হলে বলতে হবে, 'পীর'ই হিন্দু-প্রভাবে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তবে, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজার ব্যবস্থা প্রায় অভিন্ন বললেও চলে। সত্যনারায়ণের পূজায় ব্যবহৃত উপচারের মধ্যে বিশেষতঃ শিরণী, মোকাম, তীরকাঠি, মোমবাতি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এর মুসলমানী সংশ্লেষটি খুব স্পষ্ট। অপরপক্ষে, সত্যপীরের পূজায় হিন্দুদেবতার প্রভাবজাত কোনো দেবমূর্তি থাকে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করতে গিয়ে, অধিকাংশ কবিই পীরের বন্দনা করেছেন এবং কাব্যমধ্যে যে দেবতার দেখা আমরা পাই, তিনি নারায়ণ নন, পীর, অর্থাৎ সত্যপীর। এই সব কারণে সত্যপীর থেকেই সত্যনারায়ণের উদ্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস। এবং তাহলে স্কন্দপুরাণের সত্যনারায়ণ-প্রসঙ্গ পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলে ধরে নিতে হয়।

সাধারণভাবে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলন প্রচেষ্টায় এই সত্যপীরের উদ্ভব বলে পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১] কিন্তু এই সমন্বয়ের সূত্রপাত কবে হয়েছিল, তা যেমন নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, তেমনই সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের উদ্ভব ও পূজার সূচনা কবে হয়েছিল, তাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে এর সূচনা যে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকেই হয়েছিল, তা ঐ সময়ে রচিত বলে অনুমিত 'সেক্ শুভোদয়া'-নামক গ্রন্থের পীর শেখ শাহ্‌জালালের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত ছড়াগুলি থেকে অনুমান করা যায়। পীর-সাহিত্য রীতিমতোভাবে রচিত হতে আরম্ভ করে সতেরো শতকের শেষ দুই দশক থেকে। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে[২], সতেরো শতকের শেষ দুই দশক হতে পীর ও নারায়ণের একাত্ম মূর্তি পশ্চিমবঙ্গে নতুন দেবতা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর রূপে আবির্ভূত হন। এবং এর প্রথম নিদর্শন পাই আমরা সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণ-

---

১. বা. সা. ই. পৃ. ৮০৫।
২. পুঁ. প. ১, ভূ. পৃ. ১৭ ২২, পরিশিষ্ট, পৃ. ২১৮ দ্রঃ।

রামদাসের 'রায়মঙ্গল'-কাব্যে। কবি সেখানে বড় খাঁ গাজীর কাহিনীতে পীর ও নারায়ণের অভেদ মূর্তি দেখিয়েছেন।

সতেরো শতকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের কবি যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ'-কাব্যে দশ অবতারের বর্ণনায় সত্যপীরের নামের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং সেখানে তিনি ম্লেচ্ছ আকারের দেবতা। কবির কল্পনায় ইনি আবার যবনরূপে দিল্লীর বাদশাহ। কলি সংহারের নিমিত্ত এঁর আবির্ভাব। সেখানে এই বৌদ্ধ কল্কি অবতার ধর্মঠাকুর ও ম্লেচ্ছ সত্যপীর অভিন্ন দেবতা—

'দশমে বন্দিনু বৌদ্ধ কল্কি অবতার।
সত্য শূণ্য তার নাম মেলশ্চ আকার॥
যবনরূপে দিল্লীয়ে কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালি।
যবনরূপে একাকার সংহারিলে কলি॥'[১]

সতেরো শতকের অপর কবি সীতারামদাস ধর্মঠাকুরকে পীর-ফকিরের বেশে দেখেছিলেন—

'সীতারাম দাস গান ধর্ম্মের চরণে।
ফকিরের বেশে ধর্ম্ম দেখা দিল বনে॥'[২]

রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যেও ধর্মঠাকুরকে আমরা যেভাবে পাই, তাতে ধর্মঠাকুরের মধ্যেই যেন সত্যপীরের স্বরূপের আভাষ পাওয়া যায়—

'একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা।
সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা॥
গলায় চাঁপার মালা আশা-বাড়ি হাতে।
ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে॥'[৩]

এছাড়া রূপরাম তাঁর কাব্যমধ্যে একাধিক বার নিজেকে 'রূপরাম ফকির' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] এর থেকে ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেছেন—"ধর্মঠাকুরের এই সন্ন্যাসী-ফকির রূপ-কল্পনা হইতে পরবর্তী কালে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।"[৫] সুতরাং মোটামুটি ভাবে সতেরো শতকের শেষের দিকে এই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ সংক্রান্ত সাহিত্যের সূচনা হয়।

পীর সাহিত্যের মধ্যে সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীগুলি সংখ্যায়, কাহিনীগত বৈচিত্র্যে এবং কাব্যগুণে প্রধান স্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে কারো

---

১. ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত 'যাদুনাথের ধর্মপুরাণ', পৃ. ৭।
২. বি. পুঁ. সং ৪৩৯৫। প. সং ১৪খ।
৩. 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল'. ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত, পৃ. ১৯।
৪. 'রূপরাম ফকীর ধর্মের গীত গায়।' বি. ভা. পু. সং ৮৯৮। প. সং ১৮ক।
৫. 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত। ভূ. দ্রঃ।

কাহিনী নিতান্ত ব্রতকথা ধরনের, কারো কাহিনী মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে ঢালা, কোথাও দেখা যায়, রূপকথার মতো গল্পরসেরই প্রাধান্য, আবার কোথাও বা সত্যপীরকে মানব সন্তান রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

॥ সত্যপীরের পাঁচালী ॥

। কবিকর্ণ। সত্যপীরের পাঁচালী-রচয়িতাদের মধ্যে কবিকর্ণ সতেরো শতকে বর্তমান ছিলেন বলে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর পুঁথি পরিচয় গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেন।[১] এঁর ওড়িয়া অক্ষরে লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র মেদিনীপুরেই ওড়িয়া অক্ষরের প্রচলন ছিল। কবিকর্ণও উক্ত অঞ্চলেরই লোক ছিলেন বলে মনে হয়। কবিকর্ণের নামে সতেরোটি পালা প্রচলিত আছে।[২]

কবিকর্ণের নামে প্রচলিত পালাগুলির নাম—যথাক্রমে, সত্যপীর জন্ম পালা, পদ্মলোচন পালা, মর্দ্দগাজী পালা, বিদ্যাধর পালা, মদনসুন্দর পালা, সদানন্দ সদাগর পালা, শঙ্কর গুড়িয়া পালা, দুর্জ্জন সিংহ পালা, হেরাচান্দ পালা, উগ্রতারা পালা, কাঠুরিয়া পালা, লক্ষ্মণকুমার পালা, অভিন্নমদন পালা, শ্বেতবসন্ত পালা, মনোহর ফাস্তাড়া বা রঙ্গলতা পালা, হরিঅর্জ্জুন পালা ও স্বর্গারোহণ পালা।

এই সতেরোটি পালার মধ্যে 'সত্যপীর জন্ম' পালা, 'পদ্মলোচন' পালা ও 'হরিঅর্জ্জুন' পালায় ব্যাঘ্র ফৌজের প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে, রাঢ়ের সুপরিচিত কাহিনী 'রায়মঙ্গলে'র অনুসরণে; 'সত্যপীরের জন্ম' পালার সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত 'মালঞ্চার' পালার কাহিনীগত ঐক্য রয়েছে। 'সদানন্দ সদাগর' পালায় 'সুমতি-কুমতি'র মঞ্জুসায় ভেসে যাওয়ার বর্ণনায় ও 'উগ্রতারা' পালায় জামাতাকে সর্পদংশনের কাহিনীর মধ্যে 'মনসামঙ্গল'-এর ছায়া পড়েছে। 'শ্বেতবসন্ত' পালায় নীলধ্বজ-রাজপুত্র বাঢ়ই জো-ঘোড়ায় চাপা ও সত্যপীর শ্বেতবসন্তের সেই ঘোড়ায় চেপে উড়ে যাওয়ার মধ্যে 'গোর্খ-বিজয়' কাহিনীর ছায়া পড়েছে। 'অভিন্ন মদন' পালায় বীরসিংহ সুশীলা অভিন্ন মদনকে বিদ্যায় জয় করে বিবাহ করবার প্রসঙ্গে 'বিদ্যাসুন্দরে'র কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া, 'মর্দ্দগাজী' পালা, ইসলামি কেচ্ছায় 'গাজী কালু চম্পাবতী কন্যার পুঁথি'তে পাওয়া যায়।[৩] 'মদনসুন্দর' পালার কাহিনীও ইসলামি কেচ্ছা 'মদন ও কামদেব' পালায় বিধৃত হয়েছে।[৪] এই পালাটি বাংলায় শ্রীকবিবল্লভের[৫] ও গোহর

---

১. পুঁ. প. ১ম. ভূ. পৃ. ১৭।

২. এ সম্পর্কে পুঁথি পরিচয় ১ম খণ্ডের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৩. মুনশী আবদুর রহিম সাহেব-বিরচিত—'গাজী কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি' দ্রষ্টব্য।

৪. মুন্সী ওয়াজেদ আলী সাহেব-বিরচিত—'সত্যপীরের পুঁথি—মদন ও কামদেব পালা'। মদিনা বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত।

৫. বি. ভা. পুঁ. স: ৯৪৫।

ফকীরের[১] ভণিতায় প্রচলিত আছে। 'শঙ্কর গুড়িয়া' পালা বাংলায় শ্রীদয়ালের ভণিতায় 'শঙ্কর গুড়্যা' পালা নামে প্রচলিত রয়েছে। 'মনোহর ফাস্তাড়্যা ও রঙ্গলতা' পালার বাংলা বই রয়েছে। 'কাঠুরিয়া' পালা স্কন্দপুরাণ হতে গৃহীত।

সতেরো শতকের কবিকর্ণের ভণিতায় সত্যপীর পাঁচালীর কাহিনীর এই বিশাল বিস্তৃতি দেখে মনে হয়, আলোচ্য শতকের শেষার্ধে এই কাহিনীর বিকাশ ঘটলেও ধারাটি আরও প্রাচীন।

। **গরীবুল্লাহ** । ভুরশুট অঞ্চলের কবি ফকীর গরীবুল্লাহের ভণিতায় একখানি 'সত্যপীরের পাঁচালী' পাওয়া যায়। আলোচ্য কবি ও তাঁর রচনাকাল সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

। **রামকৃষ্ণ** । বিভিন্ন অঞ্চলের পুঁথি ভাণ্ডারে রক্ষিত 'সত্যপীরের পাঁচালী'র মধ্যে 'রামকৃষ্ণ' ভণিতায় বেশ কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া যায়। আলোচ্য পাঁচালীটির ভণিতা-অংশ নিম্নরূপ—

'বড়ই মধুর সত্যপীরের পাঁচালী।
রচিল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম সে কলি॥'[২]

আলোচ্য কবি যদি 'শিবায়ন'-কাব্যের কবি রামকৃষ্ণ রায় হন, তবে কাব্যখানি নিঃসন্দেহে সতেরো শতকের রচনা। সতেরো শতকের শেষে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধের অনেক প্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যের কবিই সত্যপীর তথা সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ রামেশ্বর, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের নাম করা যায়। সুতরাং শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণেরও সত্যপীর পাঁচালী-রচনা মোটেই অসম্ভব নয়।

॥ সত্যনারায়ণের পাঁচালী ॥

। **ভৈরবচন্দ্র ঘটক** । সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে ভৈরবচন্দ্র ঘটকের পাঁচালী রচনা সমাপ্ত হয় ১৬২২ শকাব্দে বা ১৭০০ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং, কাব্যটির রচনা তার কিছু পূর্বেই অর্থাৎ সতেরো শতকের মধ্যেই শুরু হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

। **রামেশ্বর ভট্টাচার্য** । শিবায়ন-কাব্যের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যও একখানি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন। এটি তাঁর প্রথম রচনা।[৩] রামেশ্বর ভট্টাচার্য তখন মেদিনীপুর জেলার যদুপুরে বাস করতেন। হিম্মৎ সিংহের অত্যাচারের ফলে সেখানকার বাস উঠিয়ে তিনি মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ে এসে রাজা রাম সিংহের

---

১. ।ব. ভা. পুঁ. সং ১৬৪৬।
২. ঐ. সং ৪৫৪৫। প. সং ২খ।
৩. বা. সা. ই. পৃ. ৭৮৭।

নিকটে আশ্রয়লাভ করেন, এবং তাঁর পুত্র যশোবন্ত সিংহের রাজত্বকালে, ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে 'শিবায়ন'-কাব্য রচনা করেন।[১] হিম্মৎ সিংহের অত্যাচার, কবির দেশত্যাগ, রাম সিংহের মৃত্যু, যশোবন্ত সিংহের সিংহাসনে আরোহণ, কবিকে 'শিবায়ণ'-কাব্য রচনার আদেশ দান, কবির 'শিবায়ন'-কাব্য রচনা সমাপ্ত করা, ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে অন্তত দশ-এগারো বছর সময় লেগেছিল সন্দেহ নেই। অতএব, রামেশ্বরের 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' সতেরো শতকে রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

রামেশ্বরের 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' ব্রতকথা-মূলক। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও এক কাঠুরিয়ার প্রতি সত্যপীরের কৃপা-বর্ষণের কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী-অংশে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

॥ মাণিকপীর ॥

'মাণিকপীরের গীত' কবে থেকে রচিত হতে শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না। উনবিংশ শতকের রাঢ় বাংলায় যে 'মাণিকপীরের গীত' খুব জনপ্রিয় ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি 'মাণিকপীরের গীতে'র পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। বিশ্বভারতী পুঁথি ভাণ্ডারে 'মাণিকপীরের গান'[২] 'মাণিকপীরের জহুরা নামা'[৩]—ইত্যাদি নামে কয়েকটি খণ্ডিত পুঁথি রয়েছে। তার মধ্যে দু-একটির ভাষা বেশ পুরোনো। এগুলি সতেরো শতকের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। তবে, এ সম্পর্কে জোর করে কিছুই বলা যায় না। তবু বর্তমান অধ্যায়ে এই রচনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা অসঙ্গত হবে না মনে করে, খুব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

। জয়রদ্দি। মুসলমান কবি জয়রদ্দি রচিত 'মাণিকপীরের জহুরা নামা'য়[৪] কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহ্‌র আজ্ঞায় ৩য় বদরের মর্ত্যে আগমন এবং শান্তিপুর, সাহবাজার, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম, মহানাদ, পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী, সাঁকরাইল ইত্যাদি অঞ্চলে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য প্রচারের যে কাহিনী এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে ধর্মীয় ভিত্তিতে সমন্বয় প্রচেষ্টার সুরটি সুস্পষ্ট। সেখানে দেখা যায়, ত্রিবেণী তীর্থে গঙ্গাদেবীর দর্শন লাভের কারণে মুনিঋষিগণ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ তপস্যা করেও তাঁর দেখা পান না। কিন্তু ৩য় বদর তাঁকে 'বড় ভাই'-রূপে ডেকে সহজেই দর্শন লাভ করেন। শুধু তাই নয়, গঙ্গাদেবীকে তিনি আপন ঝোলার মধ্যে ভরে রাখেন এবং সেতুবন্ধ থেকে, জলে ভাসিয়ে পাথর এনে দিতে হবে, এই শর্তে তাঁকে মুক্ত করেন। এরপর বদর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে 'মসিদ' নির্মাণ করান। 'ফুল-সিন্নী' পাবার আশ্বাস

---

১. বা. সা. ই. পৃ. ৭৮৭।
২. বি. ভা. পুঁ. সং. ৪৭, ৪৮।
৩. ঐ সং ৯৫৬, ৯৭৭, ৯৮৪।
৪. পুঁ. প. ২য় খণ্ড। পৃ. ৩০৫-১৮।

দিয়ে দফর খাঁ গাজীর হাতে ত্রিবেণী সমর্পণ করে, বদর দিল্লীর সুলতান বাদশাহর কন্যা দুধবিবিকে চতুর্ভুজরূপ দর্শন করিয়ে বারো বছরের জন্যে চট্টগ্রামে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে যান, এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে আবার দুধবিবির নিকট ফিরে আসেন।

আলোচ্য কাহিনীতে 'রায়মঙ্গল'-কাব্যের অনুরূপ বাঘ সেনা, বাঘের নাম ও তাদের রূপগুণের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে 'মাণিকপীরের জহুরা নামা'য় মাণিকপীর অপেক্ষা ৩য় বদরের কার্যকলাপের বর্ণনাই বেশী রয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে কেবলমাত্র যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টার সুর ধ্বনিত হয়েছে তাই নয়, 'সেতুবন্ধ' থেকে গঙ্গার পাথর আনয়ন, সেই পাথরে বিশ্বকর্মা কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের বিচিত্র কাহিনী, দফর খাঁ গাজীকে ত্রিবেণী সমর্পণ ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকের গৌড়ের মুসলমান সুলতানের সেনাপতি জাফর খাঁ গাজীর ত্রিবেণী বিজয়ের ইতিহাসটি বিকৃত আকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

॥ বড় খাঁ গাজী ॥

বড খাঁ গাজীর কাহিনী রূপায়িত হয়েছে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল'-কাব্যে। সেখানে দেখা যায়, আঠারো-ভাঠি অঞ্চলের অধিকার নিয়ে দক্ষিণ রায় ও বড খাঁ গাজীর মধ্যে বিরোধ বাঁধে। বড় খাঁ গাজীর অনুচরগণ দক্ষিণ রায়ের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেললে দুই দলে লড়াই বাঁধে। দুই দলই তাদের ব্যাঘ্র ফৌজ নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এদিকে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় দেখে বড় খাঁ গাজী তাঁর এক অনুচরের পরামর্শে, অঞ্চল প্রধান ব্রাহ্মণ মটুকের কন্যাকে নিয়ে পলায়ন করেন। এতে দক্ষিণ রায়ের ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। এর পরে দুই দলের লড়াই ঘোরতর রূপ ধারণ করে। দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর প্রবল প্রতাপে ধরণী টলমল করে, দেবতাগণও ভীত হয়ে ওঠেন। অবশেষে স্বয়ং ঈশ্বর অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বর রূপে অবতীর্ণ হয়ে দুজনের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। কবির এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের সুরটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

॥ মদনের পালা ॥

সতেরো শতকের রাজপুরের ভূম্যধিকারী মদন রায় নবাব শায়েস্তা খাঁর কাছে তিন বছরের খাজনা বাকী পড়ার জন্যে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। নবাবের তলব নিয়ে পাইক পৌঁছলে মদন রায় তাঁর এক মুসলমান কর্মচারীর পরামর্শে অনন্যোপায় হয়ে মবারক গাজীর স্মরণ নেন এবং সিন্নি দেন। মবারক পীর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নবাবের দরবারে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনি মবারক গাজীর কৃপায় উদ্ধার লাভ করেন। এই ঘটনা নিয়ে কোনো একজন কবি ছড়া লিখেছিলেন। এর কিয়দংশ আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি—

'নতুন নবাব আসেন তার নাম সাম্বিল্লি-খাঁ।
জহুর জুলুম করে সে ইনসাব করে না॥
জমিদার মাণ্ডাএ নবাব আনে যেই ঘড়ি।
তজবিজ তঙ্কা খাই তার পায় লাগায় বেড়ি॥'[১]

আলোচ্য ছড়াটি 'মদন পালা' বলে উল্লিখিত হয়েছে। রচয়িতার নাম জানা যায় নি। কিন্তু রচনাটি কোনো মুসলমানের লেখা বলেই মনে হয়। ছড়াটির বিভিন্ন পংক্তিতে তাঁর সমর্থন মেলে। এছাড়া, পুঁথিখানি "শ্রীশ্রী খোদায়" বলে আরম্ভ হয়েছে।[২]

আলোচ্য ছড়াটি পরবর্তী কালের রচনা হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তবে ছড়াটি দেখে মনে হয়, সতেরো শতকে বড খাঁ গাজীর এবং মবারক গাজী পীরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে এই জাতীয় কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল এবং কিছু কিছু ছড়াও রচিত হয়েছিল। আলোচ্য ছড়াটি সেরকম কোনো একটি ছড়ার আধুনিক সংস্করণও হতে পারে।

॥ ইসলামি সাহিত্য ॥

। স্বরূফ। মধ্যযুগে রাঢ়ের মুসলমানদের রচিত কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বরূফের 'দামিনী চরিত্র'। রাঢ়ের প্রণয়-কাহিনীঘটিত বিশুদ্ধ গাথা-কবিতার একমাত্র প্রাচীন নিদর্শন এই 'দামিনী চরিত্র'-কাব্য। আলোচ্য কাব্যের প্রণয়-প্রার্থী নায়ক ও প্রণয়-প্রত্যাখ্যাত্রী নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো—

'আষাঢ় মাসে কন্যা লো মেঘের ঘটা।
শান্তিপুরে সাধু তোমার মাথা গেছে কাটা॥
... ...
মরুক মরুক শত্রু মোর সাধুর বালাই।
যে বলে এমন কথা মুখে তার ছাই॥
আমার সাধু মরিত যদি জানিতাম আমি।
সতেসরি হার মোর খসিত তখনি॥'[৩]

'দামিনী-চরিত্রে'র পুঁথিখানি আঠারো শতকের শেষ দিকের।[৪] রচনা-কাল জানা যায় না। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে হতে পারে। আবার সতেরো শতকের শেষদিক হওয়াও অসম্ভব নয়। কাব্যটি বিশুদ্ধ রোমান্টিক আখ্যান-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। এর রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্যের জন্যেই রচনা-কাল সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সত্বেও কাব্যখানি নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হলো।

১. সা. প. পুঁ. সং ২৪৩। প. সং. ২ক।
২. ঐ. ঐ. প. সং ১ক।
৩. বা. সা. ই. পৃ. ২৪৫।
৪. ঐ. পৃ. ২৪৭।

দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মুসলমানগণ হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালী শুনে সাহিত্য-রস পিপাসা মিটিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে তারা নিজেদের ঐতিহ্য-নির্ভর কাব্য কাহিনী পাঠ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং এই প্রয়োজনের তাগিদেই কালক্রমে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি-মূলক সাহিত্যের সূত্রপাত। এই সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসেবেই বাংলায় 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর সাহিত্য গড়ে ওঠে।

। ফকির গরীবুল্লাহ। ইসলামি বাংলা সাহিত্যে প্রথম জঙ্গনামা শ্রেণীর কাব্য রচনা করেন ফকীর গরীবুল্লাহ। তাঁর পূর্বে আর কোনো কবি এই নতুন ধারায় কাব্য রচনা করেছেন কিনা জানা যায় না। কবি ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের হুগলী জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী।[১] এঁর নামে অনেকগুলি কাব্য পাওয়া যায়—'সোনাভান', 'আমীর হামযা', 'ইউসুফ জোলেখা', 'জঙ্গনামা' ও 'সত্যপীর'।[২] এদের মধ্যে 'সোনাভানে'র রচনাকাল পাওয়া যায় ১১২৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭২০ খৃষ্টাব্দ।[৩] এটি কবির প্রথম রচনা না হলে এঁর দু-একটি কাব্য সতেরো শতকেও রচিত হওয়া অসম্ভব নয়।

ফকীর গরীবুল্লাহর সর্ববাদীসম্মত কোনো জীবৎকাল এ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নি। ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, কবি আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ছিলেন; এবং ডকটর মুহম্মদ এনামুল হক্-এর মতে, তিনি সতেরো শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।[৪] ডকটর সুকুমার সেন কবির কোনো সময়কাল নির্দিষ্ট করেন নি। তবে তিনি কবির জীবৎকালের শেষ সীমা আঠারো শতকের প্রথমার্ধ বলে মনে করেন।[৫] গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে একাধিকবার 'বাদশাহ্'র উল্লেখ থাকায় মনে হয়, কাব্যখানির রচনাকাল সতেরো শতকের শেষার্ধে হওয়া অসম্ভব নয়।

'আল্লা তাল্লা সালামৎ রাখিবে বাদশারে।
সের সালামাৎ রাখ বাদশার উজীরে॥'[৬]

পরবর্তী শতাব্দীর নবাবী আমলে দিল্লীর কোনো নামেমাত্র বাদশাহের জন্য কবির এই প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

দক্ষিণ রাঢ়ের সমকালীন 'ধর্মমঙ্গলের' কবিদের মতো দেবতার সাক্ষাৎ আদেশ লাভ করে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার কথা গরীবুল্লাহ তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা'-কাব্যের ভণিতায় উল্লেখ করেছেন।[৭]

১. বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য, পৃ. ২০১।
২. ঐ. পৃ. ২০২।
৩. ঐ. পৃ. ২০৩।
৪. ঐ. পৃ. ২০৪।
৫. ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১০৭।
৬. ঐ. পৃ. ১০৮।
৭. ঐ. পৃ. ১০৭।

'গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত।
বড় খাঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাৎ॥'

এছাড়া, হিন্দু কবিদের মতোই গরীবুল্লাহ্, তাঁর কাব্যের শেষে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্যেই আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন।

'আসরে বসিয়া যত হিন্দু-মুসলমান।
সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান॥
ইউসুফ-জোলেখার গীত পালা হৈল সায়।
নেহ ভাই আল্লার নাম দিন বয়্যা যায়॥
গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত।
নায়েকের তরে আল্লা বাড়াও হায়াৎ॥'[১]

গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা'-কাব্যগুলি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের ভাষা অলঙ্কার-প্রধান নয়। তাঁর ভাষা নিতান্ত আটপৌরে। অথচ, এই ভাষায় যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে, সমকালীন অপরাপর ইসলামি সাহিত্যের কবিদের কাব্যে তা দুর্লভ। কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সহজ অথচ শ্রুতিমধুর ভাষা ব্যবহার করেছেন। অনেক স্থলেই তাঁর বর্ণনার সংযম প্রশংসনীয়। শোক, যুদ্ধ, নারী বা পুরুষের রূপ বর্ণনায় গরীবুল্লাহ্‌র কৃতিত্ব অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা বেশী। তিনি ফারসী-উর্দু-হিন্দী বহুল বাংলা ভাষায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা কালে কোথাও বর্ণনার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক ফারসী, উর্দু বা হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেন নি। গরীবুল্লাহ্ অনুসৃত রীতি অবলম্বন করে পরবর্তী কালের অনেক কবি আলোচ্য কাব্যধারায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই ভাষার সৌন্দর্য ও লালিত্যের দিক্ দিয়ে তাঁর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেন নি।

। **রাধাচরণ গোপ** । বাংলার মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় এই 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর কাব্যধারা সতেরো শতকের বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বেশ কয়েকখানিই রচিত হলেও, রাঢ় অঞ্চলে ঐ সময়ে ঐ শ্রেণীর কাব্য বিশেষ রচিত হয় নি। কারবালা যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রাঢ়ের হিন্দু কবি কর্তৃক দুখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য রচিত হয়েছিল। কাব্য দুখানির নাম 'আফৎনামা' ও 'ইমামের কেচ্ছা'। কবি উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী, নাম শ্রীরাধাচরণ গোপ বা রাধব গোপ। বিশ্বভারতী পুঁথি ভাণ্ডারে রাধাচরণ গোপের 'আফৎনামা'র একখানি এবং 'ইমামের কেচ্ছা'র চারখানি খণ্ডিত পুঁথি রক্ষিত আছে।[২] পুঁথিগুলি সব কখানাই উত্তর রাঢ়ের বীরভূম জেলার বোলপুর-শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাধাচরণ গোপের

১ ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১০৮।

২. প্রাপ্ত পুঁথিগুলি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত ও আলোচিত হয়েছে। এগুলির সংখ্যা যথাক্রমে ৬২৫, ৬২৩, ৬৮১, ৬৮২ ও ৬৮৩।

'আফৎনামা' ও 'ইমামের কেচ্ছা' এই দুই নামে মোট পাঁচখানি পুঁথি পাওয়া গেলেও 'আফৎনামা' পুঁথিটি ও 'ইমামের কেচ্ছা'র দুখানি পুঁথি—এই মোট তিনখানি পুঁথিরই লিপিকাল ১২৩৪ বঙ্গাব্দ। 'ইমামের কেচ্ছা'র অবশিষ্ট পুঁথি দুখানির কোনো লিপিকাল নেই। এর থেকে মনে হয়, এই পুঁথিগুলি রাধাচরণ গোপের 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর একটি সমগ্র রচনার খণ্ডিত অংশ বিশেষ। কারণ, একই লেখকের স্বতন্ত্র রচনার যতোগুলি পুঁথি পাওয়া যায়, সবগুলির একই লিপিকাল হওয়া শুধু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিছুটা অসম্ভবও বটে। এছাড়া, কাব্য দুখানির কাহিনীগত ঐক্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'ইমামের কেচ্ছা'র মতো 'আফৎনামা'তেও 'ইমাম এনে'র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, 'আফৎনামা', 'ইমামের কেচ্ছা'রই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রাধাচরণ গোপের আলোচ্য কাব্যখানি পরবর্তী কালের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। তবে, হিন্দু কবির রচিত ইসলামি-সাহিত্য হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। এই কারণেই আলোচ্য কাব্যখানির সময় সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা না-গেলেও কাব্যখানিকে আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূক্ত করা হলো।

রাধাচরণ গোপের কাব্য মুসলিম কবিদের মতোই ফারসী-রীতিতে রচিত। কবি হিন্দু হয়েও ইসলামি ঐতিহ্য ও ইসলামি ভাষায় 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর কাব্য রচনা করেন। ফারসী-উর্দু-হিন্দী-মিশ্রিত ভাষায় বাংলা কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে রাধাচরণ গোপের যে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, সে-কথা কাব্য-পাঠেই জানা যায়। এ ছাড়া, কবির শব্দ নির্বাচনের কুশলতাও কাব্যমধ্যে সর্বত্র লক্ষ করা যায়। রাধাচরণ গোপের কাব্যের নিদর্শন-স্বরূপ নীচে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো—

'খঞ্জরা বঞ্জরা নামে দুই জঙ্গি আন।
বিরেসি গজের ভারা লাখাতে জোয়ান॥
দেখিতে দুই বেটা জেন পাহার সোমান।
জাইঞা বেরিল তখন মদিনার ময়দান॥
বিরেসি হাজার জায় লস্কর লইঞা।
এজীদার কাছে তখন পোঙছিল আসিঞা॥
বসিঞা সে এজীদা তক্তে দিঞা বার।
খানখা ছিরের ওপর মারিল খর্কড়॥
এজীদ বলে বাপ মুখে পাটাইল জোমের ঘর।
খানখা খার্কড় মেলেক সিরের ওপর॥
জঙ্গি বলে গোস্‌সা না হয় মুন হে ভামাম।
এই মতে আমাদের দেসের ছালাম॥

এজীদ বলে ওজীর শুন জে খবর।
ছালাম বলে কোন দিনে পাটাবে জোমের ঘর।[১]

ইসলামি-আদর্শ ও ঐতিহ্য-অনুসৃত এই শ্রেণীর সাহিত্য-ধারা সতেরো শতকে আরম্ভ হয়ে, আঠারো-উনিশ শতকেও পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে। তবে এই সব কাব্যের পর্ব-বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ, রস-বৈচিত্র্য, ছন্দ-অলঙ্কার, এমন-কি নামকরণের ক্ষেত্রেও মুসলমান কবিগণ হিন্দু-পুরাণ-পাঁচালীর পারিপার্শ্বিক প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। সে যুগের রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে, মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রভাবও সেখানে দুর্লক্ষ নয়। 'হরিবংশ' প্রভৃতির অনুসরণে 'নবীবংশ'; 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', 'পাণ্ডব-বিজয়' ইত্যাদির অনুসরণে 'রসুল-বিজয়', 'মহম্মদ-বিজয়'; 'মেঘনাদবধে'র অনুসরণে 'কাশেম বধ'—ইত্যাদি নাম নির্বাচনের মধ্যে দিয়েও বাংলার পরিবেশ লালিত ইসলামি সাহিত্যের উপরে হিন্দু প্রভাব লক্ষ করা যায়। অপর পক্ষে, সতেরো-আঠারো শতকের হুগলী-মান্দারণ ও ভুরশুট অঞ্চলের মুসলমান কবিগণের রচিত পীর-ফকিরের মাহাত্ম্যমূলক যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, হিন্দু সমাজও যে তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি, রাধাচরণ গোপের কাব্য তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। এই মিলন-মিশ্রণের ফলে একটি অনস্বীকার্য সমন্বয়ের সুর আলোচ্য কাব্য ধারার মধ্যে উভয় তরফেই ধ্বনিত হতে দেখা যায়।

১. পু. প. ২য়, পৃ. ২০।

গদ্য রচনার সূত্রপাত

'পুস্তক পড়িতে দিবে পণ্ডিতের ঠাঞি।
গবাগুণা গ্রন্থ লেন গোবরায় নাঞী।'

বাংলা গদ্যের বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম চিরকালের জন্য যুক্ত হয়ে আছে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনভার কোম্পানীর হাতে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখার সেই প্রাথমিক স্তরে কিছু বিলিতি পণ্ডিতদের এদেশে আনিয়ে, ছেনি দিয়ে কেটে বাংলা হরফ তৈরী করে, মুদ্রণ-শিল্পের সূচনা এবং তাকেই অনুসরণ করে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড সাহেবের ইংরেজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ ছাপানোই বাংলা গদ্যের সূচনা সম্পর্কিত প্রথম পদক্ষেপ। এর পরে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা, উইলিয়াম কেরী সাহেবের সহযোগিতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সেই কলেজ থেকে রামরাম বসু রচিত 'মহারাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম ছাপা গদ্য বইকে সামনে রেখে একের পর এক বাংলা গদ্য গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলা গদ্যের বিকাশ পর্বের সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ইতিহাস।

কিন্তু এই ইতিহাস বাংলা গদ্যের বিকাশ পর্বের হলেও, সূচনা পর্বের অবশ্যই নয়। বাংলা গদ্যের সূচনা হয়েছিল এর অন্ততঃ দুশো বছর আগে। তবে সে গদ্য সাহিত্যিক গদ্য নয়, নিতান্তই ব্যবহারিক গদ্য।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ভাষা ও সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বত্রই পদ্যের অনেক পরে গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা ঘটে নি। বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এর কাল থেকে সাহিত্য-গুণমণ্ডিত না হলেও, মোটামুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল দীর্ঘ ব্যবধানে। পদ্য ও গদ্যের অন্তর্বর্তী এই দীর্ঘ ব্যবধানের উল্লেখ সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, মানুষ সর্বত্রই গদ্যে কথা বলতো। চিঠিপত্র, ফর্দ, দলিল-দস্তাবেজে ব্যবহারিক গদ্যের প্রচলন ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকের আগের সেই সব গদ্যের কোনো নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি। তার কারণ, কাব্য মানুষ যেমন সযত্নে রক্ষা করে থাকে, ব্যবহারিক কাগজপত্র ঠিক তেমনভাবে রক্ষিত হয় না। তার প্রয়োজন শেষ

হলেই মানুষের কাছে তা হয় মূল্যহীন আবর্জনা মাত্র। তাই সাহিত্যিক-গুণবর্জিত সেই সব গদ্যের খুব প্রাচীন নিদর্শন স্বভাবতঃ দুর্লভ।

তখনকার দিনে, সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাতেই প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ ও বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র সংস্কৃতে রচিত হতো। কোনো কোনো পুঁথির শেষেও এরকম পত্রের দু-একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন 'ভক্তি রত্নাকর', 'কর্ণানন্দ', 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই রকম কয়েকটি পত্রের নিদর্শন উদ্ধৃত হয়েছে।[১] এঁদের লেখা বাংলা চিঠিতেও অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হতো। মুসলমান আমলে রাজকীয় কাজকর্মও সংস্কৃত অথবা ফার্সী ভাষার মাধ্যমেই চলছিল। মুসলমান নবাব বা আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান তথা দলিলপত্র হুকুমনামা ইত্যাদি ধরনের চিঠিপত্র বাংলায় লেখা হলেও তাতে অনেক উর্দু শব্দ মেশানো থাকতো। কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যবহারে, চিঠি-পত্রাদি, হুকুমনামা, দলিল-দস্তাবেজ, সাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, টোটকা পুঁথির পুষ্পিকা এবং আরও পরবর্তী কালে কড়চা, কথকতা ও অনুবাদ সাহিত্যের প্রসঙ্গে অল্প-বিস্তর বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল। সে সব গদ্যে উর্দু এবং সংস্কৃত দুয়েরই মিশ্রণ দেখা যায়। কিন্তু এই সব গদ্যকে সাহিত্য বলা যায় না। আধুনিক গদ্য সাহিত্য গড়ে ওঠার পিছনে, এই শ্রেণীর ব্যবহারিক গদ্যের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবু, বাংলা গদ্যের সূচনা থেকে তার উন্মেষ এবং অভ্যুদয়ের স্তর-বিন্যাসগুলি, অর্থাৎ কি রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্য তার সাহিত্যিক স্বরূপটি ধীরে ধীরে লাভ করেছিল, সে সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা অর্জন করতে এই নিদর্শনগুলি সহায়তা করে।

সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ হয়ে দশম শতকের কোনো এক সময়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে নেপালে প্রাপ্ত সন্ধ্যা ভাষায় রচিত পঞ্চাশটি চর্যাপদ, বন্দ্যঘটিয় সর্বানন্দকৃত 'অমরকোষে'র টীকায় প্রদত্ত তিন শতাধিক ভাষাশব্দ[২] কয়েকটি শিলা ও তাম্রশাসনে ব্যবহৃত প্রাচীন গ্রাম নাম ও নদীর নাম[৩], মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্য বংশের রাজা সোমেশ্বর ভূলোক মল্লের নির্দেশে ১০৫১ শকাব্দ বা ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ চিন্তামণি'[৪] নামে রচিত সংস্কৃত বিশ্বকোষে প্রাচীন বাংলার কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এসবই হলো চতুর্দশ শতকের পূর্বেকার বাংলা ভাষার নিদর্শন। এর পরেই বাংলা ভাষার নমুনা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' উল্লিখিত

---

১ বা. সা. গ. পৃ. ৪।

২. সা. প. প. ১৩২৬, ২য় সংখ্যা।

৩. ভাণ্ডগ্রাম, বায়িগ্রাম ইত্যাদি। বা. ই. পৃ. ২৭৫।

৪. এই পুঁথির পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ১৩১৭ সালের মাঘ মাসের 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায়।

হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেও গদ্যের স্থান এখানে নেই।

'মানসোল্লাসে'র অন্তর্গত দু-এক ছত্র বাংলা যা পাওয়া যায়, তাকে পণ্ডিতগণ 'পদ' বলে উল্লেখ করেছেন। তবু, এর মধ্যে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের পূর্বাভাষ লক্ষ করা যায়।

"জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয়া কার্তবীর্য্যা জেণে বাহুকরসে খাণ্ডিয়া পরশরামু দেউ সে মাহর মঙ্গল করউ।"

অর্থাৎ, যে (যিনি) ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হয়েছিলেন, কার্তবীর্য যাঁহার দ্বারা বাহু-পরশে খণ্ডিত (বিধ্বস্ত) হয়েছিল, সেই পরশুরাম দেবতা আমার মঙ্গল করুক (করুন)।'[১]

আলোচ্য অংশটুকুতে পদান্তে মিল থাকলেও ছন্দ খুব স্পষ্ট নয়। অনেকটা ভাঙ্গা-ছন্দ বলা চলে। সেইহেতু একে বাংলা গদ্যের পূর্বাভাষ বলা যেতে পারে বলে আমাদের মনে হয়।

রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে'র মুদ্রিত পুস্তকে কিছু কিছু বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন—বার মাসি অংশে—'...কোন মাসে কোন রাসি। বৈশাখ মাসে মেস রাসি। হে বাসুদেব। বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি লেহ সেবকর পুষ্প পানি। সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎকন্নি।'[২] অথবা 'ঘাট-মুক্ত' অংশে—'পশ্চিম দুআরে পরভু দিলা দরসন। পশ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুঁকার। আস বাছা চন্দ্র পহরি, বাটাল তাম্বুল খাব রূপার রাঙ্গিত খাট নিস্মান করি দিব।'[৩] ইত্যাদি অংশের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম রূপ দেখতে পান। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এমন প্রাঞ্জল ভাষা কোনোক্রমেই বাংলা গদ্যের শৈশবকালকে নির্দেশ করে না। এর ভাষা সতেরো শতকের শেষের, এমন কি আঠারো শতকের প্রথম দিকেরও হতে পারে। এখানে 'লেহ', 'সেবকর', 'বাটাল' ইত্যাদি শব্দগুলি দেখতে পাওয়া যায়। 'লেহ' শব্দ এখনও প্রচলিত আছে। 'সেবক' শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীর 'এর' প্রত্যয় যোগ করে 'সেবকের' আধুনিক বাংলা রূপ হয়েছে। এর প্রাচীন রূপ সেবকর (সেবক+অর)। 'বাটাল' মুদ্রণ প্রমাদ অথবা সম্পাদকের মুন্সিয়ানা প্রদর্শনও হতে পারে। সুতরাং, কতকগুলি শব্দের প্রাচীন রূপ অথবা রূপবিকৃতি দেখেই একে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম স্তরের নিদর্শন মনে করবার কোনো হেতু নেই। এছাড়া, বিরাম চিহ্নের এমন নিখুঁত ব্যবহার তখনকার দিনে অকল্পনীয় ছিল। সর্বোপরি মুদ্রিত গ্রন্থের এই সকল অংশ অন্যান্য মূল পুঁথিতে কোথাও নেই। এরই ভিন্নতর

১. দ্র উ. স্মা. গ্র. পৃ. ২৩০

২. শূ. পু. পৃ. ১২৬-২৭।

৩. ঐ. প. ১৬৫।

রূপ আমরা পাচ্ছি একটি পুঁথিতে।[১] এর সঙ্গে আলোচ্য পুঁথির সংশ্লিষ্ট অংশটুকু উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্টতর হতে পারে।

'...ফল্গুন মাসি কুম্ভরাশী নাম রুদ্রধর।
তিহোঁ অর্ঘ দিলে সন্তোষ্ট হন দিনের দিবাকর॥
চৈত্রী মাস মীনরাসি কমলা কর নাম।
তিহোঁ অর্ঘ দিলে পূরহ মোর কাম॥
বৈসাখ মাস মেষ রাশি নাম ভাস্কর।
তিহোঁ অর্ঘ দিলে বরদেহ দিনের দিবাকর॥'[২]

এর সঙ্গে অপর একটি অংশ উদ্ধৃত করলেই মুদ্রিত 'শূন্য পুরাণ' পুস্তকের রহস্য সহজে দৃষ্টিগোচর হবে।

'...সত সত দণ্ডবত করে রাজা রানি।
অঞ্জলি করিয়া দিল পুষ্প আর পানি॥
দক্ষিণ দ্বারে রাজা হৈল উপনীত।
ধর্মের চরন পূজে হৈয়া আনন্দিত॥...'[৩]

লক্ষণ সেনের রাজসভায় সেখ শাহজালাল তাব্রিজির শুভ উদয়কে কেন্দ্র করে, তাব্রিজ নামাঙ্কিত পরবর্তী কালে রচিত বা সংকলিত একটি গ্রন্থের নাম 'সেক শুভোদয়া'। পুস্তকখানিতে তাব্রিজির মাহাত্ম্য সূচক নানা রকম গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য'[৪] গ্রন্থে বলেছেন— 'ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সাধু গদ্যের প্রতিচ্ছবি পাইতেছি 'সেক শুভোদয়া'য়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন তোডরমল বাংলার রাজস্ব নির্ধারণ করেন সেই সময়ে এই বই লেখা বা সঙ্কলন করা হয়।" তবু 'সেক শুভোদয়া'র প্রামাণিকতা সম্বন্ধে এতোকাল যথেষ্ট মতভেদ বর্তমান ছিল। সম্প্রতি বীরভূমের অন্তর্গত সিআন গ্রামে রাজা হেতুকের গৌড়ী-রীতিতে লিখিত যে অনুশাসনটি পাওয়া গিয়েছে, তার অপর পৃষ্ঠে আরবী ভাষায় ত্রয়োদশ শতকের লিখিত একটি লিপি আছে।[৫] এটি ১২২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। লিপিটিতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম ধর্মালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অপর পক্ষে, যে মসজিদটিতে লিপিটি পাওয়া গিয়েছে সেটিরও নাম মখদুম পীরের দরগাহ। আবার সিআন গ্রামের যে অঞ্চলে ধর্মালয়টি প্রতিষ্ঠিত, সেটিও শাহজাপুর মৌজায় অবস্থিত। এখানে অনুমান করা যায়, এই মখদুম পীরের

১. ধ. পূ. প. শশ্রীশ্রী সংগ্রহ, নকুল্তার আদর্শ পুঁথি।
২. ঐ প. সং ৩৬৭।
৩. ঐ. (ন. পুঁথি)। পৃ. ৪৩৭।
৪. পৃ. ৪।
৫. 'শিক্ষানিকেতন' পত্রিকা—১৯৭৬। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের 'জয়দেব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পুরো নাম মখদুম শাহজালাল তাব্রিজি হতে পারে এবং উক্ত শাহজাপুর প্রকৃতপক্ষে শাহজালাল-এরই সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নয়। তা যদি হয়, তবে অনুশাসনটি 'সেক-শুভোদয়া'-গ্রন্থটির প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। 'সেক শুভোদয়া'র তাব্রিজি ও সিআন অনুশাসনের তাব্রিজি, স্থান ও কাল নৈকট্যের হেতু একই ব্যক্তি বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি সংগত কারণ রয়েছে।

'সেক শুভোদয়া'-গ্রন্থটির ভাষা একটু নতুন ধরনের। এর শুদ্ধাশুদ্ধ সংস্কৃতের আবরণের মধ্যে দিয়ে যেন বাংলা গদ্যের কাঠামোটি উঁকি মারে। পণ্ডিতদের মতে, ষোড়শ শতকের শেষার্ধের বাংলা গদ্যের প্রতিচ্ছাব আলোচ্য গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্টতর হবে।

"হে পাপীয়সি, রাজা মন্ত্রিণা সহ বর্ত্ততে। তব স্বভাবং বাচাটা নির্লজ্জা, ত্বং বিকথসে কিম্? ত তো ব্রতবতী মা। মাং মৃতাং যূয়মেব সর্ব্বে জ্ঞাপয়ত। মম্ শূকরীব। সেক পাদো বিদিতমস্তু। রাজগৃহে অপ্সরা যোগ্যা বিদ্যতে। ময়া শূকরীব...।'[১] এই অংশটুকুর বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়—'হে পাপীয়সি, রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন। আপনার নির্লজ্জ স্বভাব, তবে বলছেন কেন? সে আরও বলল। আপনারা সকলে জ্ঞাত আছেন আমি মৃত। আমি শূকরী একথা মহান শেখকে জানাতে দিন। রাজগৃহে অপ্সরা সকল রয়েছে। আমি শূকরী ...।'

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আলোচ্য অনুচ্ছেদটি পাঠ করলে মনে হয়, লেখক যেন বাংলা ভাষায় প্রথমে চিন্তা করে, বাংলাকেই অনুসরণ করে তার তথাকথিত সংস্কৃত ভাষা রচনা করেছেন। ডাঃ সুকুমার সেন যাকে বলেছেন, 'বাংলার কাঠামোর উপর শুদ্ধাশুদ্ধ, সংস্কৃতের চূণকাম করা।'[২] ফলে, অনেক শব্দের ব্যাকরণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের বাংলা ব্যাকরণেরই দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ, গ্রন্থটির শব্দের ব্যাকরণগত ও পদবিন্যাসগত রূপ বাংলা। কোনো কোনো অংশে পুরোপুরি বাংলা গদ্যের রূপ পাওয়া যায়।[৩] এই গ্রন্থটি যে খুব অর্বাচীন নয়, তার আর একটি কারণ হলো, এতে বাংলার সঙ্গে এমন কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দ সংকলিত হতে দেখা যায়, যা বাংলায় গৃহীত আরবী ফারসী শব্দের প্রাচীনতম রূপ বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।[৪] এছাড়া, গ্রন্থটির অন্তর্গত প্রাচীন বাংলা আর্যা ছন্দে রচিত পদ্যাংশগুলিও এর প্রাচীনত্বজ্ঞাপক।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তারিখ সংকলিত বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শনটি ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ("শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়") আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নর-

---

১. সে. শু. পৃ. ১৫।

২. বা. সা. গ. পৃ. ৪।

৩. সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের কাহিনী বর্ণনা অংশ দ্রষ্টব্য।

৪. সে. শু. ভ. পৃ. XXXVIII

নারায়ণের পত্রটি। ষোড়শ শতকের বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবে সুপরিচিত সেই পত্রটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

"...এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বৰ্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম।......"[১]

সাহিত্যিক গদ্য বলতে যা বোঝায় সতেরো শতকের ঘাটে তার কোনো উল্লেখ-যোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এই যুগের বেশ কয়েকটি দলিল ও চিঠিপত্র পাওয়া গিয়েছে। এগুলি থেকে সে যুগের ব্যবহারিক গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সেলিমাবাদের শাসনকর্তা বারা খাঁর প্রতিনিধি কুতুব খাঁ কর্তৃক মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীকে প্রদত্ত একটি ব্রহ্মোত্তর ভূমি দানপত্র দলিলের উল্লেখ করতে পারা যায়। দলিলটির তারিখ ১০৪১ বঙ্গাব্দ বা ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ সতেরো শতকের একেবারে প্রথম দিকের এই দলিলটি সম্পূর্ণ আমরা উদ্ধৃত করছি।

'শ্রীশ্রী যুৎ যুতায় মিঞা বারা খাঁ
ব্রহ্মোত্তর জমী দলদে শ্রীযুত কুতুব খাঁ
মহাসয় শ্রীযুত ৺জীউ
রকবনী অত শ্রীসিবরাম চক্রবর্ত্তী
মৌজে দামিন্যা পরগণে হাউলী
সরকার ছিলেমাবাজ গ্রাম মহকুরে
তোমাকে জমি বিষ ২০ বিঘা তুমি বাষবাড়ী দিন
যুতিয়া জোতাইয়া...কে দোহা করিয়া পরম সুখে
ভোগ করহ অপর হা তীন তরফে সভাপণ্ডিতি
বিত্তি আচায্য বরণ ও হুদি বিবরণ ও জলদান ও
জজ্ঞেস্বর বিধি বেবস্তার চোউত বেদীর সীমানা
ওগয়রহ তোমারে দিব ইতি ইস ১০৪১ সাল—
তাং ১ ফাল্গুন[২]—

এর পরে আর একটি দলিল উদ্ধৃত করা যায়। এটিও শিবরাম চক্রবর্তীকে প্রদত্ত

১. র. সা প. প., ৪র্থ ভাগ থেকে সংকলিত।

২. নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে দলিলটি আলোকচিত্র সমেত মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে এর তারিখটির পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে '১০৪৭ সাল'। কিন্তু শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত 'ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল' গ্রন্থে এর পাঠ ধরা হয়েছে ১০৪১। আমরা এই দ্বিতীয় পাঠটিই সঠিক বলে মনে করি।

একটি ভূমি দানপত্রের দলিল। এই শিবরাম চক্রবর্তী ও মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম চক্রবর্তী অভিন্ন। দলিলটির তারিখ ১০৫৯ বঙ্গাব্দ বা ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। দলিলটি নিম্নরূপ—

(পারসী মোহর)

৭ আদিকাঁদ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত সিবরাম চক্রবর্ত্তি সদাসয়েষু শ্রীলিখিত কার্য্যঞ্চ আগে মৌজে মুর্জ্জাপুর তোমাকে আয়মা দিল ওয়া দোয়া করিয়া ভোগ করহ গ্রামের রাজস্ব আমাদির তোমার সহিত রাজস্বের দায় নাহি আমল প্রদান আবহ পরগণাতে জে তোমার আমল আছে তাহা আমল করহ ইতি তাং ২১ ফাল্গুন সন ১০৫৯ সাল—"[১]

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সতেরো শতকের দলিলপত্র, সরকারী হুকুম-নামা ইত্যাদি ধরনের চিঠিপত্রে ব্যবহৃত বাংলা গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার এবং ফারসী পদ-বিন্যাসের অনুসরণ। তখন প্রয়োজন হলেই বাংলা ভাষায় ফারসী ভাষা থেকে শব্দ চয়ন করে নেওয়া হতো। সেই জন্যে আলোচ্য পত্রখানিতে 'ওয়া', 'দোয়া', 'আমল', 'আদিকাদ্দ'—ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বিরাম চিহ্নের অ-প্রয়োগ ও বিশৃঙ্খল পদ-বিন্যাসরীতির জন্যে ভাষা মোটেই প্রাঞ্জল নয়। বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য। পত্রটির ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়, কর্তৃকারকে বহুবচনের বিভক্তি ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হলেও, ষষ্ঠীর 'র' প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় নি। যেমন 'আমাদির' ব্যবহৃত হয়েছে আমাদিগের অর্থে।

আলোচ্য সময়ের রাজকীয় ভাষা 'লিঙ্গোয়াফ্রাঙ্কা' বা হিন্দুস্থানী ভাষা ছিল বলে আদালতের কাজকর্ম এই ভাষাতেই চলতো। সেই জন্যে দলিল পত্রে স্থানীয় বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হিন্দুস্থানী ভাষার প্রাবল্য দেখা যায়। সতেরো শতকের তারিখ সংবলিত এই শ্রেণীর কয়েকটি দলিল পাওয়া যায়। যেমন—

"...সকল মঙ্গলালয় শ্রীসুখদেব গোস্বামীনং[সু]চরিতেষু। ব্রহ্মোত্তরং পত্র মিদং লিখনং কার্য্যঞ্চাগে তরফ কলীগ্রাম পরগণে রুকুলপুর জোয়ার মালদহ সরকার জন্নতাবাদ পরগনা মজকুর হামার তালুক ইসমে তরফ মজকুরমে বসতবাস ও গুজরাণী আপ্তাধি জমী সবু মবলগে ২৩ তেইস বিঘা ও আম্‌কা দরখত ১২ বাড়ো পেড় তুমকো ব্রহ্মোত্তর দিয়া গেয়া মফিক তপশীল চিহ্নিত লে করকে আবাদানসে ভোগ করঙ্গে ইস্কা মাল গুজারিসে এলাকা নাই। এতদর্থে ব্রহ্মোত্তর পত্র দিয়া—ইতি সন ১০৬২ এক হাজার বাষট্টী সাল।"[২]

আরবী ফারসী শব্দের প্রাবল্যই দলিলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মুসলমান শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দলিল পত্রের ভাষা সতেরো শতকেও কতোখানি

১. চি. প. স. চি. ২য়, পৃ. ৪৭২।
২. পুঁ. প. ৩য়, পৃ. ৩৪০।

আরবী ফারসী ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তার উদাহরণ হিসেবে ঢাকা অঞ্চলের একটি দলিল এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

"......হকীকতমজুকর শ্রীজুত জসোমাধব ঠাকুর কুমরাল গ্রামে দেবালয়ত আছিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল রাত্রিদিন চৌকি দিতেছিল শ্রীরামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুষানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগণা পরগণাতে দেওড়া ও মুরত তোড়িবার আহাদে হুজুর থাকীয়া পরোয়ানা লইয়া আর আর পরগণাতে দেওড়া ও মুরত তোড়িতে লাগীল। এ বার্ত্তা সুনিয়া ঠাকুর রামজীবন মৌলিকের বাড়িতে বাহির বাড়িতে আসিয়া রহিলা রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকা পহরা রাত্রিদিন নিজুক্ত আছিল তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ১৮ জৈষ্ট ঠাকুর দেখিবার প্রাতঃকালে সকল লোকে গেল ঠাকুর সেখানে না দেখিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহতে সেবা করিতেছিল তারায় সেখানে নাই তদবধি রামজীবন মৌলিকের বাড়িতে ঠাকুর ও রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ কেহো নাহি ইতি সন ১০৭৯তে ২৯ মহরম মাহে।"[1]

দলিলটিতে প্রাদেশিক শব্দ কিছু কিছু থাকলেও এর ভাষা বাংলা সাধু গদ্য ভাষা।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বাংলা ১১০৩ সন বা ইংরেজি ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি চুক্তি পত্রের প্রতিলিপি[2] এখানে উদ্ধৃত করছি। সতেরো শতকের একেবারে শেষে লেখা এই চুক্তিপত্রখানির স্থান ঢাকা অঞ্চলের সোনার গাঁ। আলোচ্য চুক্তিপত্রখানিতেও আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

"শ্রীকৃষ্ণ
সাখি শ্রীধর্ম্ম
শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল
মহাসহেষু লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও
নরসিংহ দাস আগে আমারা দুই লুকে
করার করিলাম জে কিছু বারে স্থনা
রগায় ও গড খরি করি সকরাত ২দু
ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব
আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি
অমে করা[র] পত্র দিলাম স[ন] ১১০৩ তে ১৪ আ
গ্রান—"

শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনরহরি দাস
(স্বাক্ষর)

---

১. বা. সা. গ. পৃ. ৫।

২. ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহ, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আলোকচিত্র সহ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত। ভাগ ২৯, পৃ. ১১০ দ্রঃ।

দলিল পত্র ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মতো ভূমিদান পত্রও লেখা হতো আরবী ফারসী মিশ্রিত বাংলা গদ্যে। সতেরো শতকের তারিখ সংবলিত এরকম একটি দলিল এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

'৭ সকল মঙ্গলালয় শ্রীরাম রাম সর্ম্মা নাহা জীন জুন—

সুচরিতেষু ব্রহ্মোত্তর পত্রমিদং লিখনং কার্য্যঞ্চাগে

তরফ কলীগ্রাম ও বরগীর্দ্ধ সৈয়দপুর রুকুলপুর জোওব মালদহ সরকার জন্নতাবাদ পরগণা মজকুর হামারে তালুক ইসমে কলিগাঁ ও বরগীর্দ্ধ সৈয়দপুর হর দো গাঁমে বসত বাষ ও গুজরাণী সব্ব মবলগে ৯৭ সাতানব্বুই বিঘা লাখো অগ্নাদা জমী ও ২৫ পচীষ পেড আমকা দরখত তুমকো দিয়া গেয়া মত্তাফীক তপশীল হর দো তরফকা গাঁ গাঁ জে জমী চিহ্নিত লেকে আবাদানসে শ্রীশ্রীপাতসাজীও কো আশীষ করকে পুত্রপোত্রাদীসে ভোগ করঙ্গে ইস্কা মাল গুজারিসে এলাকা নাহী এতদর্থে ব্রহ্মোত্তর পত্র দিয়া—

ইতি সন ১০৬৩ এক হাজার ত্রিসট্টি সাল তাং—২৫ মাঘ—

শ্রী সবদল খানস্য।'[১]

এরপরে সতেরো শতকের শেষের দিকের আর একটি দলিলের উল্লেখ করছি। বিশ্বভারতী পুঁথি-বিভাগে এটি রক্ষিত এবং ইতিপূর্বে পত্রখানির কোথাও উল্লেখ বা আলোচনা হয় নি। সতেরো শতকের বাংলা ব্যবহারিক গদ্যের নিদর্শন হিসাবে দলিলটি বিশেষ মূল্যবান। এর তারিখ ১০৮৪ বঙ্গাব্দ বা ১৬৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দ। এর ভাষা এক দিকে যেমন আরবী-ফারসী বাহুল্য বর্জিত, অপর দিকে, সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষাও নয়। সুতরাং এই দিক দিয়ে দলিলটি বিশেষ মূল্যবান। কারণ, এখানে বাংলা গদ্যের নিজস্ব নির্দিষ্ট ছাঁদটি ধরা পড়েছে। দলিলটির পাঠ নিম্নরূপ।

'সকল মঙ্গলালয়—
শ্রীজুত কৃষ্ণানন্দ অধিকারী—
সুচরিতেষু ব্রহ্মোত্তরজমীপট্টক মিদং আগে।
আমার ইজারা মৌজে লছমনপুর মৌজে
মজকুরের মধ্যে য়ুখানগোড়িয়ার মাটে
সালিবাদি ১ একবিঘা ভূমী তোমাকে
ব্রহ্মোত্তরদিয়া শ্রীশ্রীকে যুভাশীষ
করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ এতদর্থে
খতপত্র দিই ইতি সন ১০৮৪ সাল—১৫ মাঘ—
শ্রীকমলাকান্ত সর্ম্মনং।'[২]

আঠারো শতকের প্রথম দিকে লেখা দলিল পত্রের মধ্যে ১১৩৮ সালের বৈশাখ

---

১. বিশ্বভারতী পুঁথি ভাণ্ডারে সংরক্ষিত একটি পত্র। সং ১০২৬খ।
২. বি. ভা. পু. সং ৫১৭৩।

মাসে লিখিত একখানি ইস্তফা ও পরাজয় পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য পত্রটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এর বিষয়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় স্ত্রী অথবা পরকীয়া নায়িকা। এই বিষয় নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি বিতর্ক বা মতদ্বৈত বরাবরই ছিল। ১১২৫ বঙ্গাব্দে জয়পুরের মহারাজার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য বাদশাহী পরোয়ানা নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন পরকীয়াবাদ নিরাস করে স্বকীয়বাদ প্রতিষ্ঠা করতে। তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রধান রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কৃষ্ণদেবের বিচার চলেছিল দীর্ঘ ছয় মাস ধরে, মালিহাটী গ্রামে রাধামোহনের বাড়িতে। এই তর্ক যুদ্ধে কৃষ্ণদেব সদলবলে পরাজিত হয়ে রাধামোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই পরাজয় পত্রের দলিলে সাক্ষীদের মধ্যে বৈষ্ণব গোস্বামী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহস্থ বৈষ্ণব এবং সরকারী কানুনগো, কাজী ও হিন্দুমুসলমান ভদ্রলোক ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই নাম পাওয়া যায়। দলিলটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ—

'শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণ ভট্টাচার্য্য সাং জয়নগর—

এই পত্রে লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য জয়পত্র মিদং আমিহ সকিয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুৎ সেওায় জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে সকিয় ধর্ম্মের পরওয়ানা লইয়া গৌড মণ্ডলে সকিয় সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুৎ পাত সাহার হুকুম ও তৈলাতি :লোক সঙ্গে করিয়া গৌড় মণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধা সকিয় সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আসিয়া ছিলাম মালিআটি মোকামে তোমা নিকট সকিয় পরকীয় ধর্ম্ম বিচার অনেক মতে করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রীগোস্বামিদির্গের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে সকিয় ধর্ম্মের স্থাপন করিতে পারিলাম নাই অতএব পরকীয় ধর্ম্ম বেদ বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্র সংস্থাপন হইল ইহাতে পরাভূত হইয়া জয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং সিষ্য হইলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাংলা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ'[১]—

এই দলিলগুলি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়, যে আঠারো শতকের অনেক আগেই বাংলা সাধু গদ্য ভাষার একটি সার্বভৌমিক রূপ গড়ে উঠেছিল। যদিও ষোড়শ শতক থেকেই দলিল দস্তাবেজে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাংলা গদ্যের কিছু নমুনা সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত সচেতন, তবু উনিশ শতক থেকেই বাংলা গদ্যের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়। ডঃ অতুল সুর তাঁর 'আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগৃতির সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করেছিল বাংলা গদ্য ভাষা, এর সূচনা আঠারো শতকেই হয়েছিল।"[২] এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আঠারো শতকের তারিখ সংবলিত কোনো চিঠি বা দলিল পেলে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে পড়েন।

১. রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ থেকে সংকলিত।
২. পৃ. ১৩২।

"আমাদের মেনে নিতে হয়েছে যে, বাংলার কোনো প্রাচীন বা নেহাত মধ্যযুগের গদ্যও নেই। ......ছাপার হরফের সাক্ষে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, উনিশ শতকের শুরুতে সাহেবদের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আর শ্রীরামপুর মিশনে বাংলা গদ্য জন্মেছে। উইলিয়াম কেরীই আমাদের সে সব প্রাচীন গদ্যের জনক।......এখন আমাদের হাতে নতুন তথ্য এসেছে যার জোরে বাংলা গদ্যকে অন্তত আঠারো শতকে পেছিয়ে নেয়া যায়। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া/অফিস লাইব্রেরীতে দুহাজারের বেশি বাংলা চিঠি বস্তাবন্দী হয়ে ছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সেই চিঠিগুলোর একটি তালিকা তৈরী করেন। ...আনিসুজ্জামানের এই দু হাজারের বেশি চিঠিতে...প্রাক্ বৃটিশ বাংলা গদ্যের প্রমাণের সংখ্যাগত পরিমাণ যা দাঁড়াচ্ছে তাতে আমাদের গদ্যের ইতিহাসের পুনর্পাঠ আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।"[১]

আনিসুজ্জামানের সংগৃহীত চিঠিগুলির প্রায় সবই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঢাকা কুঠি ও তাদের আটটি বস্ত্রর উৎপাদন কেন্দ্রের (আডঙ) মধ্যে একান্ত কারবারী গদ্যে লেখা চিঠি।[২] এদের তারিখ ১৭৯২ ও ১৮০০ সাল।

প্যারিসের বিবলিওথেক ন্যাশিওনেল থেকে ইন্দ্রানী রায় কর্তৃক সংগৃহীত ও দেবেশ রায় কর্তৃক সম্পাদিত, 'আঠার শতকের বাংলা গদ্য' গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের পত্র সংকলিত হয়েছে। ভূমিকায় শ্রীরায় বলেছেন, "এই চিঠিপত্রে ব্যবহৃত গদ্য নিশ্চিত ভাবেই বৃটিশ-পূর্ব। ··বিবলিওথেক ন্যাশিওনেল থেকে সংগৃহীত এই সংকলনটি প্রাক্ বৃটিশ বাংলা গদ্যের এক নিশ্চিত প্রমাণ। প্রায় শ'দুই বিচিত্র চিঠি ও বৈষয়িক বিবিধ প্রথাগত লেখায় শব্দ ব্যবহার বিচিত্রতর, বাক্য গঠন বর্তমান বাংলা গদ্য থেকে স্বতন্ত্র।"[৩]

আলোচ্য পত্রগুচ্ছের তারিখ ১১৭৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১১৯১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই চিঠিগুলিরও সবই প্রায় আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকের বাংলা গদ্যের নমুনা।[৪]

---

১. 'বাংলা গদ্যের ইতিহাস, নতুন করে পড়া', প্রতিক্ষণ—ডিসেম্বর-১৯৮৫।

২. "সুচরিতেষু আগে আড়ং নারায়ণপুরের গোমস্তাগিরি কাজে তোমাকে মকরর করা গেল। তাগিদ আড়ঙে পৌছিয়া তহবিল কাগজ বিলাত ও গওরহ বুঝিয়া লইয়া আপন এক্তারে রাখিবা সন ১৭৮৭ সনের ২৩শে জুলাইয়ের ও সন ১৭৮৯ সনের ৩০ অক্টোবরের সদরের দুই হুকুমনামা এবং সদর কুঠির বহাল হুকুম বিসয় জিম কায করিবা ইহাতে হয়গিজ তফাত না হয়।"—'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি', আনিসুজ্জামান।

৩. আঠার শতকের বাংলা গদ্য, ভূ. পৃ. ৭।

৪. "পরম কল্যানিয়স্ত কল্যানীয় শ্রীরামহরি ঘোষজা প্রপৌত্র বাবাজীউ পরম কল্যাণবরেষু প্রতিপাল্য শ্রীরামকানাঞী দাষ ঘোষস্য পরমযুভাসিব্বাদ বিজ্ঞাপনাঞ্চ আগে বাবাজীউর কল্যাণ সদা সর্ব্বক্ষণ করিতেছি তাহাতেই অত্রানন্দ।বশেষঃ দিবস কএক হইল পত্রাদী কোন সমাচার পাই নাঞী তাহাতেই ভাবিত আছি বিবিরিয়া কুসলাদী লিখিয়াপ্যাইত করিবে অপর আমার পরিধিয় বস্ত্র নাঞী ইহার সংঙ্গতি করিয়া তুমি পাঠাইবা আমার বাটীর খরচের অপ্রতুল তাহা লিখিয়া কি জানাইব জেয রাতে কিঞ্চিত খরচ পাঠাইতে পার তাহা মনজোগ করিয়া পাঠাইবে জেয়াদা কি লিখীব ইহা স্নাতো করিলাম ইতি সন ১১৮৬ সাল তারিখ ১ বৈশাখ রোজ রবিবার সময় উর্দ্ধকাল।" সম্পাদকের মতে পত্রোক্ত রামহরি ঘোষের পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এসব চিঠি লেখালেখি হয়েছিল। কিন্তু আমাদের অনুমান পত্র সংগ্রাহক চন্দননগরে নিযুক্ত ভারতীয় ভাষার ফরাসি রাজ দোভাষী অগস্ত্যাঁ অসাঁ উক্ত রামহরি ঘোষকে দিয়ে বাংলা চিঠির আদর্শ নমুনা হিসেবে পত্রগুলি প্রস্তুত করান।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙলা পত্র সংকলন'-গ্রন্থেও প্রায় এই একই সময়ের পত্রগুচ্ছ সংকলিত হয়েছে। তার ভাষার সঙ্গে আলোচ্য পত্রগুচ্ছের ভাষার গঠনগত মিল সহজেই চোখে পড়ে।[১] এবং এই ভাষার প্রাথমিক রূপ দেখতে পাই এর প্রায় দেড়শো বছর আগের, অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের চিঠিপত্রগুলির মধ্যে।

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে সতেরো শতকের তারিখ সংবলিত চিঠি বিশেষ পাওয়া যায় না। তার মধ্যে ১৫৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে গৌহাটীর তৎকালীন ফৌজদার নবাব আলোয়ার খাঁকে লিখিত জনৈক আসাম নৃপতির পত্রখানি[২] উল্লেখযোগ্য। পত্রটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো।

"স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্যপরমোদয় শ্রীযুক্ত নবাব আলোয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্র হিত আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনাস্বিতা না রহে ওষে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপ জানিতে আছো তোমার আমার আন্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক !…" ইত্যাদি।

আলোচ্য পত্রটিতে সতেরো শতকের বাংলা গদ্যের মূল কাঠামোটি মোটামুটিভাবে ধরা পড়েছে। বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ক্রমশঃ অনুসৃত হতে থাকে। অপর দিকে, আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারের পরিবর্তে, এই শতকের শেষের দিকে তৎসম শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। আঠারো শতকের সাধু গদ্যে এই সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে ঘটতে থাকে। এর অন্যতম কারণ হয়তো অনুবাদ-সাহিত্যের চর্চা। তৎকালীন বাংলা গদ্যের রীতি অনুযায়ী আলোচ্য পত্রখানিতে দেখা যায়, নিষেধাত্মক 'না' শব্দ ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'না রহে', 'না হইবেক' ইত্যাদি বাক্যাংশগুলি লক্ষ করবার বিষয়। এই রীতি হিন্দী বাক্য-

---

১. "পূর্ব্বে বাঙ্গালাতে ও লাগার মলুকে বহুত তেজা রত হইত হিন্দু মোশলমান লোক তেজারত জন্যে জাইত আশীত তেজারত করিত কথ দিন হইল লাড়াই ভিড়াই কারণ মহাজন লোক জাতায়াতে মশ্‌কীল হইয়াছে শ্রীশ্রীদেবধর্ম্মলামাঃ রিম্পোছে সহিত শ্রীযুত ৺কম্পানি সঙ্গে মোনের সহিত দোস্তী হইয়াছে সেমতে দোতরফা লিখাপড়া হইয়াছে জে দেবরাজ হিন্দু মোশলমান লোক আশীতে জাইতে তেজারতী করিতে কোন আটক করিবেন না তাহারা চন্দন, মিল গুগুল সাবব পান ষুপারি নিতে পারিবেক না এঙ্গরাজ ফেরঙ্গী মহাজন লোক উপরে জাইতে না পারে বাঙ্গালাতে ভোটান্তের জে লোক ঘোড়া ও গয়রহ আনিয়া খরিদ ফরুক্ত করিবেক তাহার হাশীল মাবুল দোতরপী নাহী এ দফাতে আমিহ করার লিখিয়া দিতেছি এহিমত আমলে আশীবেক কোন মতে তফাওত হবেক না ইতি" সন ২৬৯ দুই সত্ত উনশত্তরি মোতাবেক সন ১১৮৫ পচাশী বাঙ্গালা তারিখ ৯ নও পৌষ মোঃ কৈলকাত্তা।

২. বা. গ. সা. ই. পৃ. ১৪।

গঠনরীতির প্রভাবজাত হতে পারে বলে মনে হয়। আলোচ্য দলিলগুলি থেকে আমরা সতেরো শতকের রাঢ়ের ব্যবহারিক গদ্যের যে নমুনা পাই, তার মধ্যে সাহিত্যিক গুণ একেবারেই নেই। এগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সতেরো শতকের রাঢ়ের বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে সকল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছি, আঞ্চলিক প্রভাব বাদ দিয়ে আলোচ্য সময়ের সর্বভারতীয় বাংলা গদ্যরূপেরও সেগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যায়।

সতেরো শতকের তারিখ-সংবলিত ঘরোয়া হিসাব-পত্রের মধ্যেও কিছু কিছু গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। বাংলা ১১০১ সালের অর্থাৎ ১৬৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দের একটি ঘরোয়া হিসাবের[১] মধ্যে কিছু গদ্যের নমুনা রয়েছে।

সতেরো শতকে রচিত নিবন্ধাদিতে কিছু কিছু গদ্যরূপ পাওয়া যায়। আলোচ্য শতকের প্রথম দিক্ থেকেই বৈষ্ণব-সাধক সম্প্রদায় তাঁদের সাধন সম্পর্কিত গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত নানা রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করতে আরম্ভ করেন। এগুলি সাধারণভাবে 'কড়চা' নামে আখ্যাত হয়ে থাকে। বৈষ্ণব নিবন্ধের গদ্যের সরল শব্দে ও স্বল্প পরিসরের বাক্যে বক্তব্য প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ করবার মতো।

আঠারো শতকে লেখা এই শ্রেণীর নিবন্ধ অনেক পাওয়া গেলেও সতেরো শতকে রচিত বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায় এমন নিবন্ধ একটি মাত্র পাওয়া যায়। এই অতি ক্ষুদ্র নিবন্ধটির নাম 'দেহ কড়চ'।[২] রচয়িতা নরোত্তম দাস। গদ্য পদ্য মিশ্রিত এই নিবন্ধটির প্রথমাংশ ছাঁটা-ছাঁটা গদ্য এবং শেষাংশ পয়ার। গদ্যাংশটুকু নিম্নরূপ—

"আর্ত্তা জিজ্ঞাসা। তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপে হইল। তর্ত্ত্ববস্তু হইতে। তর্ত্ত্ববস্তু কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা। এই সকল একযোগে ভাণ্ড হইল।..."

নরোত্তম দাসের ভণিতায় 'শিক্ষাপটল'[৩] নামক নিবন্ধ পাওয়া যায়। এর ভাষাও একই ধরনের প্রশ্নোত্তরমূলক। যথা—

"কাল কি। দ্বাপর। পাত্র কে। শ্রীরূপ-মুগুরি: সাধকের কায় কি। বাচসি মানুসি। কায় কি কে। অদ্বৈত প্রভু। বাচসি কে। নিত্যানন্দ প্রভু। মানুসি কে। চৈতন্য প্রভু।"

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'আলোচ্য গ্রন্থকর্তা যদি লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য সুবিখ্যাত নরোত্তম দাস ঠাকুর হন, তবে এঁর রচনাগুলি ষোড়শ শতকের শেষ অথবা সতেরো শতকের প্রথম পাদেরই হবে।'

---

১. চি. প. স. চি.। পত্র সং-৫১২। পৃ. ৩৭৮-৮০

২. বি. ভা. পুঁ. সং ৬২৩১। লিপিকর শ্রীসরূপচাঁদ দাস বৈরাগী। লিপিকাল ১২৫৫ বঙ্গাব্দ। এর প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১৬০৩ শকাব্দ। [বা. সা. প. পৃ. ৭. পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য]

৩. বি. ভা. পুঁ. সং. ৬১৮৩। লিপিকাল ১২৫৫ বঙ্গাব্দ।

নরোত্তম দাসের ভণিতায় 'আশ্রয় নির্ণয়'[১] 'রাগমালা'[২] ও ভক্তিউদ্দীপণ[৩] নামক অপর কয়েকখানি গদ্যপদ্য মিশ্রিত নিবন্ধশ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়। এরও ভাষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য দ্বারা গঠিত। এই শ্রেণীর প্রশ্নোত্তরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য সমষ্টিকে ঠিক সাহিত্যিক গদ্য আখ্যা দেওয়া না গেলেও, বাংলা গদ্যের শৈশবাবস্থার ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলি এর দ্বারা পরিস্ফুট হয়।

তবে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে অনুলিখিত একটি নিবন্ধের ভাষা প্রকৃতই সাহিত্যিক গদ্যের প্রাথমিক রূপটিকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো—

"শ্রীগুরু শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের পার্থিবাদি পঞ্চভূতের অচৈতন্য রূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন সাধক সিদ্ধক রূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে শিষ্যের অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন।… …পরে সেই জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ কহিলেন 'তোমার সুজ্ঞান আদি জন্মিয়াছে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম লক্ষণার রসময়ী ভক্তিতে বিরাজ কর।' ইতি বেদাদি যোগ শাস্ত্রের অনুসারে নিষ্কাম ধর্ম্মের জ্ঞানাদি সাধন কথা সমাপ্ত।"[৪]

এই সমস্ত পুঁথির সন্ধান জানা না থাকায় অনেকেই মনে করেন যে, শ্রীরামপুরের পার্দার এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকেরাই সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের প্রবর্তক।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের ভণিতায় 'রাগময়ীকণা'[৫] নামে বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর-মূলক নিবন্ধ পাওয়া যায়।—

"উপাসনার মূল কি। যুগল মন্ত্র। তার পঞ্চনাম শ্রীরাধিকাভিয়ের। রস কি। স্বরূপ কি। শ্রীরাধিকার স্বরূপ কি। রূপের লক্ষণ উন্মাদি। গতির লক্ষণ সাহজিক। প্রেমের লক্ষণ বাউল। রসের লক্ষণ মধুর।"

আলোচ্য নিবন্ধকার 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র কবি হলে, নিবন্ধটি সতেরো শতকের প্রথম দিকের হতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, এই সকল সহজিয়া নিবন্ধশ্রেণীর রচনার প্রামাণিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। কারণ, সহজিয়াগণ পূর্ববর্তী কবি সাধক ও মহাজনদের নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করেছেন। এঁরা নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচয়িতা হিসাবে নিজেদের নাম না দিয়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নরহরি সরকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম দাস প্রমুখ প্রাচীন কবি ও

১ সা. প. প. ১৩০৮। ১ম সং., পৃ. ৫৩-৫৪।
২. বি. ভা. পু. সং ৪২২২। লিপিকর শ্রীচরণ দাস। লিপিকাল ১১৫৭ বঙ্গাব্দ।
৩. ঐ পু. সং. ৫২১।
৪. সা. প. প. ৪, পৃ ৩৪৭।
৫. বি. ভা. পুঁ. সং ২৩৪৯।

গ্রন্থকারদের নাম দিতেন। এবং তাঁদের নাম দিয়ে গান ও নিবন্ধ রচনা করতেন। সুতরাং আলোচ্য নিবন্ধ শ্রেণীর রচনাগুলি যে সতেরো শতকেই রচিত, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তবে, প্রশ্নোত্তরের ছলে বিবৃতি দান, অধিকাংশ বৈষ্ণব নিবন্ধের যা সাধারণ লক্ষণ, পরবর্তী কালে "ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক সংবাদে" দেখি এর অনুসরণ।

ষোড়ষ শতকের শেষের দিকে, এদেশে পর্তুগীজদের আগমন ঘটে। এদেশে বাণিজ্য বিস্তার তাদের প্রধান লক্ষ হলেও সেই সঙ্গে তারা এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করে, খৃষ্টধর্ম-শাস্ত্র বাংলা গদ্যে অনুবাদ করতে আরম্ভ করে।[১] এই শ্রেণীর নিবন্ধ সবই প্রায় লোপ পেয়েছে। এর মধ্যে সতেরো শতকে লিখিত দোম আন্তনিওর 'ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক সংবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি বাঙালি কর্তৃক লিখিত সাহিত্যিক গদ্যের মধ্যে অন্যতম প্রামাণিক প্রাচীন নিদর্শন।[২] জনৈক ব্রাহ্মণ ও খৃষ্টানের তর্ক-বিতর্ক-মূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের অসারত্ব ও খ্রীষ্টানধর্মের সার সত্য প্রতিপন্ন করাই গ্রন্থখানির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ব্রাহ্মণ—তুমি কারে ভজো ?
রোম—পরমেশ[শ্ব]রেরে পূর্ণো ব্রমে[হ্ম]রে।
ব্রাহ্মণ—তবে তোমোরা বরো উত[্ত]ম ভজোনা ভজো, আমোরা
তাহারে ভজি।······ইত্যাদি।[৩]

বৈষ্ণব-সাধন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর-মূলক 'কড়চা' জাতীয় রচনাগুলিই এর আদর্শ স্থানীয়। বাংলা সাধু গদ্য ভাষাও যে মোটামুটি একটি রূপ ইতিমধ্যেই লাভ করেছিল, গ্রন্থটির সহজ সরল ভাষা পাঠে তা বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে 'নেপালে বাংলা নাটক'-এর উল্লেখ করা যায়।[৪] সতেরো শতকের শেষভাগে নেপালে বাংলা-ভাষা-চর্চার আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাতগাঁও-এর শেষ নেওয়ার-রাজ ভূপতীন্দ্র মল্ল ও তাঁর পুত্র রণজিৎ মল্লের সময়ে[৫] মল্লরাজগণ দেশী বিদেশী অনেক পণ্ডিত প্রতিপালন করতেন এবং সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহ দান

১. ১৫৯৯ হতে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একাধিক খৃষ্টান প্রচারক এই জাতীয় পুস্তক রচনা করেন। ব্রা. রো. ক্যা. সং. প্রস্তাবনা—পৃ. ২ দুই আনার চিহ্ন।

২. দোম আন্তনিও তাঁর পুঁথি বাংলা অক্ষরেই রচনা করেছিলেন। আঠারো শতকের প্রথম দিকে মানোএল-দা-আসসুম্‌পসম্‌ এটি পর্তুগীস ভাষায় অনুবাদ করেন। ব্রা. রো. ক্যা. সং প্রস্তাবনা—পৃ. ২ দুই আনার চিহ্ন।

৩. ব্রা. রো. ক্যা. সং. পৃ. ১।

৪. 'নেপালে বাংলা নাটক'-এর বিষয়বস্তু—কাশীনাথকৃত 'বিদ্যাবিলাপ', কৃষ্ণদেবকৃত 'মহাভারত', গণেশকৃত 'রামচরিত্র' ও ধনপতিকৃত 'মাধবানল—কামকন্দলা'। পুঁথিগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লেখা হলেও এর ভাষা বাংলা। এতে আমি—হমে, আমাকে—হমরাকে, তুমি—তোহে এবং তোমার বা তোর—তোহর হতে দেখা যায়। এগুলি বাদ দিলে একে পরিষ্কার বাংলা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

৫. 'বঙ্গশ্রী'—চৈত্র ১৩৪০। পৃ. ২৯৩।

করতেন। এঁদের দরবারে বাঙালি ও মৈথিলীদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। সম্ভবতঃ এই মল্লরাজ-বংশের সময়েই নেপালে 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' বিষয়ক একটি নাটকও রচিত হয়েছিল। নেওয়ারী লেখকদের হাতে পড়ে এর সংলাপ-অংশের একটু-আধটু শব্দ বিকৃতি ঘটলেও, তার মূল যে বিস্ময়কর ভাবেই সাধু বাংলা, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

"অহা মাতা তুমার রাজা আমাকে ডাকিতে ছিলো তুমার রাজা সনে আমাকে কার্য্য না হয় তুমার রাজা সনে বেদী মানিয়া অমী জাইবো। অহা মহারাজেশ্বর গোপীচন্দ্র তুমি মায়া এড়িতে না পারো তুমি উদনা পতুমার সঙ্গে সুখে রাজা করিয়া থাকো তুমার সনে আমার কাযা না হয়।"[১]

সতেরো শতকের শেষভাগেও যে বাংলা গদ্যের সাধুরূপ নিতান্ত অপারণত ছিল না আলোচ্য নাটকের গদ্যাংশের ভাষা তারই উপযুক্ত প্রমাণ।

রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপূজা-বিধান' পুস্তকে কিছু কিছু গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে ধর্মপূজার প্রবর্তক আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় 'ধর্মপূজা পদ্ধতি' প্রচলিত থাকলেও, পুঁথিগুলির অধিকাংশই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের লিপিকৃত। সুতরাং, তার ভাষার মধ্যে খুব প্রাচীন কিছু আশা করা ঠিক নয়। যেমন,—

"অথ দিগ ডাক। শ্রীদেব নিরঞ্জন নৈরাকার। সর্গ মর্ত্তা পাতাল মদ্ধে চতুর্দ্দিগ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন্ চণ্ডিয়ান উড়িয়ান অগ্নি ইশান অদ্ধে যুদ্ধে সর্ব্ব উদ্ধমধ্যে গঙ্গার দুইকুল রুহা সহস্র কোটি সাটি সহস্র কোটি সাটি সহস্র পাড়ার মধ্যে শ্রীবদ্ধমান।"[২]

সতেরো শতকে লিপিকৃত অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে। সেই সকল পুঁথির পুষ্পিকা হতে এক দিকে যেমন তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির নানান তথ্য পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি তৎকালীন বাংলা গদ্যের ধারাটিও উপলব্ধি করতে পারা যায়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আলোচনায় এ পর্যন্ত কেউই এই দিকে দৃষ্টি দেন নি। অথচ বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারাটি আলোচনা-প্রসঙ্গে পুঁথির পুষ্পিকা যেমন অপরিহার্য তেমনি এর ভাণ্ডারটিও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। তাই পুঁথির পুষ্পিকাকে বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যের বিকাশের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা বর্তমানে সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই একশো বছরের তারিখ সংবলিত কয়েকটি বাংলা পুঁথির পুষ্পিকা এখানে উদ্ধৃত করছি, বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারাটিকে অনুধাবন করার জন্য।

১৬৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত 'পাষণ্ডদলনের' একটি পুঁথির শেষে গদ্যপদ্য মিশ্রিত নিম্নোক্ত পুষ্পিকাটি পাওয়া যায়।

"ইতি পাষণ্ডদলন গ্রন্থস্পূ সন্ন শ্রীশ্রীরবি সিত মদন গোপাল দেব শ্রীরবি দামোদর

১. 'বঙ্গশ্রী'—চৈত্র ১৩৪০, পৃ. ২৯৩।
২. ধ. পূ. বি. ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

জয়তি। শ্রীজিবচরণারবিন্দে সদা জার স্বাশ। স্বাক্ষরে লিখিতং শ্রীজীবনদাস।······ ইতি সন ১০৭৬ সাল তারিখ ১৫ মাঘ রোজ সুক্কবার এক দণ্ড হইতে সমাপ্ত।"[১]

১০৮১ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত 'স্বরূপ বর্নন'-গ্রন্থের একটি পুঁথির পুষ্পিকার গদ্যাংশটি নিম্নরূপ—

"ইতি স্বরূপ বর্ণ্যান গ্রন্থ সর্পুন। লিখিতং শ্রীগদাধর পোদ্দার। মোকাম কলিকাতা। গঙ্গা ধারে বসি লেখা গেল। সন ১০৮১ সাল। জথা দিষ্টেতং তথা লেখিতং, লিখনের দোস নাস্তিকা।"[২]

১৬৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত 'স্বরণমঙ্গল'-এর একটি পুঁথির পুষ্পিকা অংশে রয়েছে—

"শ্রীনিত্যানন্দ দাসেন পুস্তক সন ১০৯১ সাল মোকাম চিচ্ছড়িয়া শ্রীসবল রায় মহাশয়ের বাড়ি বসিয়া লিপি শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ।"[৩]

১৭০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত নরোত্তম দাসের 'ভক্তি উদ্দীপন'-এর একটি পুঁথির পুষ্পিকায় পাওয়া যায়—

"ইতি শ্রীভক্তি উদ্দিপন সাধকাবস্থা গ্রন্থ সংপুন্নামোস্তু॥ যথা ইতি॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং॥ মিদং শ্রীচৈতন্য দাসানুদাস দে দাস ইতি॥ সন ১১১১। তাং ৩ মাঘ মঙ্গলবার ইতি শ্রীভক্তি উদ্দিপন সমাপ্ত হইল।"[৪]

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত বৃন্দাবনদাসের ভণিতায় বৈষ্ণব মাহাত্ম্যের একটি পুঁথির পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ—

"বৈষ্ণব মাহাত্ম্য সমাপ্ত ইতি সন ১১৩৩ সাল মাহ অগ্রায়ন সোমবার বিকালে পুস্ত[ক] লেখা সমাপ্ত মোকা[ম] শ্রীশ্রীমন্দির আদর শ্রীজুত লালদাস বৈষ্ণব ঠাকুর লি[খি]তং শ্রীআনন্দীরাম দাস।"[৫]

লোচনদাস বিরচিত 'দুর্লভ সার' গ্রন্থের একটি পুঁথির পুষ্পিকায় আঠারো শতকের প্রথম পাদের সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি লিপিকরের কলমে জীবন্ত হয়ে নাটকীয় রূপ ধারণ করেছে। পুষ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত করা হলো।

"সন ১১৩৭ সাল শকাব্দ ১৬৫২ মাহ মাঘ নাগাদি ২৮ রোজ শ্রীদুর্লভ সার গ্রন্থ সমাপ্ত। শ্রীকালীচরন দেবসম্মনঃ এবং শ্রীমস্তচরন দেবসম্মন এই দুজনাতে পুস্তক সমাপ্ত করিলেন অনেক প্রয়াসে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। শ্রীরাখালদাস বৈরাগীঠাকুর ধম্মপুর নিবাসী তাহার পুত্রের কারন গ্রন্থ হইল শ্রীধম্মদাস নওগ্রাম শ্রীভাগবত সমাপ্ত ২৯ মকর।

১. বি. ভা. পু. সং ৫৬৮৯।
২. ক বি. সং ৩৭৭৮।
৩. ঐ. সং ১৪৭০।
৪ ঐ সং ৫২০।
৫. ঐ সং ১৪৮৯।

বুধবার ২॥ আড়াই প্রহরের কালে গ্রন্থ পুর্ন্ন হইল শ্রীবিদ্যাবাগিস ওর কবীত্ত পাডিতে ছিল তাহার সাক্ষী শ্রীনারায়ন সরকার এবং শ্রীসিতাম মণ্ডল তামাকু তয়ার কারণ পত্রে কর্ণে লেখিব। শ্রীবৈদ্যনাথ আবন্ধা ধুতি পরা। শ্রীনিধিরাম মণ্ডল তামাকু ভক্ষন করেন।"[১]

গৌরীমঙ্গলের একটি পুঁথির[২] পুষ্পিকায় পাই, "এই পুস্তকের মালিক শ্রীপিতাম্বর গুহ জানিবা। কেহ জানে দাবি না করিবা। এই পুস্তক জেবা চুরি করে কুম্ভিপাকে সেই জন থাকে।"[৩] পুঁথিখানির লিপিকাল সন ১১৯৬ মঘি, অর্থাৎ[৪] ১১৫১ বঙ্গাব্দ।

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের জাতীয় অভিলেখাগারে[৫] সংরক্ষিত ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত মহাভারতের একটি পুঁথির পুষ্পিকায়[৬], বর্গীরা কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম লুঠপাট করেছে, কিভাবে এক একটি গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারে ঢুকে, তাদের বাড়ির লোকজনকে হত্যা করে, কোনো কোনো লোককে প্রহার করে, বাড়ির যথা সর্বস্ব নিয়ে গিয়েছে, তার এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে, "সন ১১৫২ সালে মাহ ৬ ছউই জৈষ্ঠে সোমবারে কথাসডাঙ্গার বাগবাজার বরগিতে লুঠ করিয়া লইয়া গেল এবং সোনারামানির ভাতারকে খুন করিয়া গেল রামচন্দ্র সুরের সর্ব্বস্ব লইয়া গেল সুরের পিতা ও জামাতা ও নফর ও বৈবাহিক শ্রীসহস্ররাম নিয়োগীকে প্রহার করিয়া গেল।"[৬]

অজ্ঞাতনামা প্রত্যক্ষদর্শী লিপিকরের এই সংক্ষিপ্ত অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাটি এক দিকে যেমন দুর্লভ ঐতিহাসিক রিপোর্টের চেয়েও মূল্যবান, অন্যদিকে এটি আঠারো শতকের বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারার ইতিহাস রচনায় একটি মূল্যবান সংযোজন।[৭]

সতেরো শতকের তারিখ-সংবলিত কথকতার পুঁথি আমাদের হস্তগত না-হলেও, ঐ সময় হতেই যে একশ্রেণীর লোক পুরাণ-ভাগবত,রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করে আসরে লোক-রঞ্জন করতেন, সে-কথা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য ও রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য থেকেই জানা যায়।[৮] কথক-ঠাকুরগণ উক্ত গানের মাঝে মাঝে

১. বি. ভা. পু. সং ১৪৮৭।
২. বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুথির তালিকা— শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ-সংকলিত।
৩ পু. প. ৩য়। দ্র. পৃ. ৭। পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।
৪. মঘি সন থেকে ৪৫ বছর বাদ দিলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়।
৫. Arquivo Nacional da Torro do Tombo.
৬. প. সং ১৪৮ক।
৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখিকার গ্রন্থ 'আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।
৮. ক. ক. চ. পৃ. ৩৫১। 'পুরাণ শ্রবণ আশে আনি বিপ্র নিজ বাসে', রূ. ধ. পৃ. ৩৮-৩৯।

সাধারণের বোধগম্য কিছু ব্যাখ্যাও দান করতেন। নিজেদের সুবিধার জন্যই সেই সকল বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যাও পুঁথিতে লিখে রাখতেন। বলা বাহুল্য, অংশগুলি গদ্যেই লেখা হতো। তৎকালীন বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে সে-সকল অংশকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সতেরো শতকের তারিখ-সংবলিত কথকতার কোনো পুঁথি আমাদের হস্তগত না হওয়াতে পরবর্তী কালের লিপিকৃত পুঁথি থেকে আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, পরম্পরাগত নিদর্শন-স্বরূপ।

"অপূর্ব্ব সভা স্বর্ন সিংহাসনাভ্যন্তরবর্ত্তী মহারাজ চক্রবর্ত্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত অতুল পরমে সুন্দর ··· কাক পক্ষোধর শ্রুতিগত গজমুক্তান্দোলিত ভালে মলজা তিলক দিব্য কৌশুক গাত্রাচ্ছাদন ক্ষৌমবাস পরিধান উভয় ··· শ্বেত চামর কৃষ্ণ চামর ব্যজন হতেছে চতুর্ভিতে হৈমদণ্ডতদুপরি চারু বিচিত্রিত চন্দ্রাতকত মুক্তি মালা প্রবাল মালা ··· পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ সকল গননাসীকৃত বর্শা করযুগলে আদিকাঙ্খী মুখনিরীক্ষন করিতেছেন।"[১]

গদ্যাংশটির তৎসম-বহুল ভাষা দেখে মনে হয়, পুঁথিটি আঠারো শতকের প্রথম দিকের রচনা হতে পারে।

ষোড়শ শতকের শেষের দিক থেকেই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীদের রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ হতে থাকে। সতেরো শতকে এসে এই অনুবাদ সাহিত্যের ধারা প্রবলভাবে চলতে থাকে। কিন্তু এই সকল রচনার প্রায় সবই পদ্যাশ্রিত। গদ্যানুবাদ আঠারো শতকের পূর্বে পাওয়া যায় না। এই শতকে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের গদ্যানুবাদ হয়। এদের মধ্যে ন্যায়, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্রই প্রধান। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে, প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ন্যায়শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ 'ভাষা পরিচ্ছেদ'-এর অনুবাদ।[২]

'মীমাংসা মতে কর্ত্তাত্মক শব্দ নিজে ধ্বন্যাত্মক শব্দে জন্য বর্ণাত্মক শব্দকে ঈশ্বর কহেন। মীমাংসকেরা পরমাত্মা মানেন না। অতঃপর কর্ম্মের পরিচয় কহিতেছি। ···' ইত্যাদি।

পুঁথিখানি ১১৮১ বাংলা সনে অর্থাৎ ১৭৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত। মূল সংস্কৃতের অনুবাদ সত্ত্বেও ভাষা পরিচ্ছেদের গদ্যের ভাষা সাবলীল।

এতক্ষণ বাংলা গদ্যের যে সকল নমুনা উদ্ধৃত ও আলোচিত হলো, তাদের প্রসঙ্গে একটি কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ গদ্য সাহিত্যিক গদ্য নয়। নিছক গদ্য রচনার উদ্দেশ্য বা আদর্শ এতে রূপ লাভ করে নি। মুখের কথাকে দূরে পাঠাবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল চিঠির গদ্য। কোনো বিশেষ জ্ঞান, বিদ্যা বা হিসাব-পত্রকে জাগতিক প্রয়োজনে অক্ষর মাধ্যমে স্থায়িত্ব দানের জন্যে যে গদ্যের সৃষ্টি, তাকেও সাহিত্যিক

১. বি. ভা. পুঁ. সং ৪৪৭৩।
২. সা. প. প. ৪র্থ সং ১৩০৪, পৃ. ২২৫।

গদ্যের মর্যাদা দান করা চলে না। ব্যবহারিক জীবনের জটিল মনোভাবের আদান-প্রদানের ঊর্ধে গদ্যের এক বিশেষ মর্যাদা, লেখ্য ভাষা হিসাবে বাংলা গদ্যের রূপ অনুসন্ধানের পথ প্রথমে পর্তুগীজদেরই সৃষ্টি। পরে, ইংরেজ কর্মব্রতীরা সে পথকে প্রশস্ততর ও বিস্তৃততর হতে সাহায্য করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে যে, সাধারণের ব্যবহৃত বাংলা গদ্য তার জন্মলগ্নের প্রথম থেকেই ছিল সংস্কৃত শব্দ-সম্ভার নির্ভর। সতেরো এমন কি আঠারো শতকের হিন্দু বাঙালির সৃষ্ট গদ্যে বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে অল্পই। অপর পক্ষে, আইন আদালত ও সরকারী পত্র-পত্রিকায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায় সতেরো শতক থেকেই। সেক্ষেত্রে আরবী-ফারসী শব্দের অতিবাহুল্য হেতু বাংলা গদ্য একান্ত কৃত্রিম অস্বচ্ছন্দ ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। মুঘল-পূর্ব বাংলায় বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী আর্যভাষা নির্ভর। ইসলামি ভাব বা ভাষার সেখানে কোনো প্রকার ছায়াপাতও ঘটতে পারে নি। সতেরো শতক থেকেই মুঘল শাসন-যন্ত্রের প্রভাবে বাংলায় আরবী-ফারসী ভাষার চর্চা এক প্রকার বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীগণের পক্ষে। পরে ক্রমশঃ এই চর্চা আভিজাত্যের বাহক হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। ভারতচন্দ্রের 'যাবনী ভাষা' তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু তবু, এই দরবারী ভাষা লোক-জীবনের অন্তঃপুরে একান্তভাবে প্রবেশ লাভ করতে পারে নি। তাই একই সময়ে, একদিকে বাংলা গদ্যে আমরা যেমন আরবী-ফারসী শব্দের অতি প্রয়োগ দেখতে পাই, তেমনি সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চিঠি-পত্রাদিতে সংস্কৃতানুসারী ভাষার ব্যবহারের প্রাবল্য দুর্লক্ষ নয়।

এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, "আমাদের দেশে সেকালে ভদ্র সমাজে তিন প্রকার বাংলা ভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাংলায় অনেক উর্দু শব্দ মিশানো থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহু সংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাংলায় উর্দু ও সংস্কৃত দুই মিশানো থাকিত। কবি ও পাঁচালিওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বিষয়ী লোক, ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিনরকম বাংলা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাংলা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাংলা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত।"[১]

আমাদের আলোচ্য সময় সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। পূর্বোদ্ধৃত চিঠিপত্র-গুলি এরই সাক্ষ্য বহন করছে। এদের মধ্যে বহু বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় চিরকালের

১ বাংলা ভাষা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭২।

জন্য রয়ে গেছে। আবার কিছু শব্দের ব্যবহার আধুনিক বাংলায় অচলবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে, আধুনিক বাংলা যে কেবল তার পারসী সিহরান পরিত্যাগ করেছে তাই নয়, সংস্কৃত উষ্ণীষও ফেলে দিয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বের যে কাঠামোটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো তার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যের এমন এক গডন ধরা পড়েছে, যা আমাদের কাছে একেবারে নতুন। যা আমাদের অভ্যস্ত গদ্য নয়, এমনকি আমাদের অভ্যস্ত গদ্যের প্রাথমিক বা প্রাক্ প্রাথমিক রূপও নয়। এ গদ্য স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ ও স্বাধীন গডনের এক বাংলা গদ্য। যাকে প্রাক্ বৃটিশ বাংলা গদ্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা যাকে তখনও প্রভাবিত করতে পারে নি। আর বিভিন্ন অঞ্চলের এইসব বাংলা গদ্যের নিদর্শনগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে, আঞ্চলিক প্রভাব সত্ত্বেও তাদের গঠনগত মিল এতো সহজেই ধরা পড়ে, যা উপলব্ধি করবার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞতারও প্রয়োজন হয় না। অথচ বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্য ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এ পর্যন্ত এই সব দলিল-পত্র, ব্যক্তিগত চিঠি এবং বিশেষ করে পুঁথির পুষ্পিকার ভাষা বা শৈলী বিশ্লেষণ করা হয় নি। আর এই মূল্যবান্ তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বৃটিশ শাসনের অনেক আগে, সেই ষোড়শ সপ্তদশ শতকেই বাংলা গদ্যের একটি নির্দিষ্ট রূপ গড়ে উঠেছিল, যার সার্বভৌমিক রূপটি সমগ্র বাংলাতেই প্রচলিত ছিল।

পরিশিষ্ট

কয়েকটি সমস্যার বিচার

শাকে সীমে জড় হইলে যত সন হয়।
তিন বান চারি যুগ বেদে যত রয়॥
রসের উপরে রস তায় রস দেহ।
এই শকে গীত হইল লেখা করা নেহ॥

মুকুন্দরামের কাব্যরচনাকাল

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আবির্ভাবকাল, দেশত্যাগকাল এবং কাব্যরচনাকাল নিয়ে আজ এক শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে আলোচনা চলছে। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে শুরু করে ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস-সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত বহু গ্রন্থে এ সম্পর্কে নানা তথ্য উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে এবং নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য এতো বেশী যে মনে হয়, মুকুন্দরামের সময় সম্পর্কে সঠিক মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যা হোক, বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আপাততঃ সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের দুটি 'আত্মকাহিনী' পাওয়া যায়। তার মধ্যে দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটি বেশী প্রসিদ্ধ। এতে লেখা আছে, মামুদ শরিফ বা মহম্মদ শরীফ নামে একজন ডিহিদারের[১] ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাচারের ফলে, মুকুন্দরাম তাঁর স্বগ্রাম দামিন্যা ছেড়ে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামে চলে যান। এই দেশত্যাগ প্রসঙ্গে বর্ণনা আত্মকাহিনীর যে শ্লোকটিতে শুরু হয়েছে, তার পাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন পুঁথিতে গুরুতর পাঠান্তর দেখা যায় এবং এই সব পাঠান্তরের ফলেই মুকুন্দরামের কালনির্ণয় সমস্যা এতো জটিল হয়েছে। প্রথমে আমরা মুকুন্দরামের দেশত্যাগ ও কাব্যরচনাকাল প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুঁথিতে প্রাপ্ত শ্লোকটির পাঠান্তর নিয়েই আলোচনা করবো। নীচে আমরা শ্লোকটির বিভিন্ন পাঠ উদ্ধৃত করছি—

(ক) ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে যেবা ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ।

১. পাঠান্তর অনুসারে উজির বা খিলাতলাভকারী।

রাজা মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডীহীদার মামুদ সরিপ ॥[১]

(খ) ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে ॥[২]

(গ) ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে নব ভৃঙ্গ[৩]
গৌরবঙ্গ উৎকল মহিপ।
রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে
বিলাত (খিলাত) পাইল মামুদ সরিপ ॥[৪]

পূর্ববর্তী গবেষকগণ এই পাঠান্তরগুলি নিয়ে বিচার করবার সময়ে ধরে নিয়েছেন, এর মধ্যে একটি পাঠই প্রকৃত, অপরগুলি সবই লিপিকর-প্রমাদে সৃষ্ট। কিন্তু এই সবগুলি পাঠই কবির লেখনী-নিসৃত হতে পারে। জনৈক গবেষক লিখেছেন— "অনেক গবেষক একটি পদের বিভিন্ন পাঠ পেলে সব সময়েই মনে করেন যে গায়েন ও লিপিকরদের হস্তক্ষেপের ফলে পাঠের বিভিন্নতা সৃষ্ট হয়েছে; কিন্তু কবি নিজেও যে বিভিন্ন সময়ে একই পদকে বিভিন্ন রূপ দিতে পারেন, তা এঁদের মাথায় ঢোকে না।

১. ১৩৪৯ শকাব্দের আষাঢ় মাস অর্থাৎ ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি পুঁথির পাঠ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' থেকে গৃহীত। পৃ. ১২ ১৩ দ্রঃ।

২. রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে'র প্রথম সংস্করণে প্রদত্ত পাঠ।

৩. নবভৃঙ্গ পাঠান্তরে নবভৃঙ্গ। পুরোণো পুঁথিতে সর্বত্র মানসিংহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'বিষ্ণুপদে নবভৃঙ্গ' অথবা 'কৃষ্ণকথা মধুভৃত' (ক বি পুঁ. সং ৩৩১৫) বা 'বিষ্ণু পদে লহে ভৃঙ্গ' (ক. বি. পুঁ. সং ৬৫৮৬) ইত্যাদি। এই সব বিশেষণের মধ্য দিয়ে, মানসিংহ যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন সেই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা বিজয়ের পর মানসিংহ জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পক্ষকাল যাপন করেন এবং ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান। এর আগে বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ এবং পরে গৌড়েও একাধিক মন্দির নির্মাণ ও ভক্তি প্রদর্শন তাঁকে 'নবভৃঙ্গ' বিশেষণে ভূষিত করবার কারণ।

৪. কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮৬ সংখ্যক পুঁথির পাঠ। পত্র সংখ্যা ২ক। আলোচ্য পুঁথিখানির লিপিকাল ১২২৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ। এতকাল এইটিই এযাবৎ প্রাপ্ত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথি ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বভারতী সংগ্রহে ...... বঙ্গাব্দের একটি পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। আলোচ্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে প্রাপ্ত 'রাজা মানসিংহ গেলে' পাঠটি শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ১৫৩)। কিন্তু তিনি উক্ত পাঠটি সম্পর্কে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ না করে ১৭১৭ শকাব্দে বা ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত একটি পুঁথিতে এই পাঠটি পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শকাব্দে অনুলিখিত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কোনো পুঁথি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তাছাড়া পুঁথির পরিচয় পরিগ্রহণ সংখ্যা দিয়েই জানতে এবং জানাতে হয়। লিপিকাল দিয়ে জানানো কতকটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই কারণেই মনে হয় শ্রীমুখোপাধ্যায় পুঁথিখানি নিজে না দেখে কোনো পরোক্ষ সূত্র থেকে উক্ত তথ্যটি সংগ্রহ করে থাকবেন এবং এই কারণেই ভুল তথ্য পরিবেশন করে ফেলেছেন।

আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তিনি তাঁর অনেক গানের বারবার পরিবর্তন সাধন করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছেন। মধ্যযুগে লেখা ছাপা হতো না বলে কবিদের একটি পদের মূল রূপকে সারাজীবন একভাবে রাখবার সুযোগ ও অন্তপ্রেরণা এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল।[১]

মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীর আলোচ্য অংশটির যে-পাঠগুলি আমরা উপরে উদ্ধৃত করলাম, তাদের সবগুলিই মুকুন্দরামের রচনা বলে আমরা মনে করি। এই চারটি পাঠ থেকেই মুকুন্দরামের দেশত্যাগ-কালের অভিন্ন সময় পাওয়া সম্ভব।

তৃতীয় পাঠে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, 'গৌড়বঙ্গ উৎকলে'র শাসনকর্তা মানসিংহ চলে যাবার পরে, মামুদ সরীফ ক্ষমতা লাভ করেন। মানসিংহ এই অঞ্চলের শাসনকর্তার পদ ত্যাগ করে চলে যান ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে মামুদ সরীফ ক্ষমতায় আসেন।

এখন দ্বিতীয় পাঠটি বিচার করা যাক। ইতিপূর্বে এই পাঠটির অর্থ করা হয়েছিল মানসিংহের পূর্ববর্তী কোনো অধর্মী রাজার শাসনকালে। কিন্তু, মানসিংহের পরবর্তী কোনো রাজার পক্ষেও তো অধর্মী হতে কোনো বাধা নেই, কবি এ-রকমও তো বলতে পারেন যে, মানসিংহের 'গৌড়বঙ্গ উৎকলে'র শাসনকর্তার পদ থেকে বিদায় গ্রহণের পরে এমন একজন লোক দেশের শাসক হলেন, যিনি ঘোরতর অধর্মী এবং তাঁরই আমলে মামুদ সরীফ প্রাধান্য লাভ করলেন।

এবারে প্রথম পাঠটি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। এই পাঠের 'রাজা মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে'—এই উক্তির অর্থ করা হয় মানসিংহের শাসন কালে প্রজার পাপের ফলে, মামুদ সরীফ ডিহিদার হয়েছিলেন। এর থেকে কোনো কোনো গবেষক মুকুন্দরাম মানসিংহের শাসন কালেই দেশত্যাগ করেছিলেন বলে স্থির করেছেন। কিন্তু মানসিংহের শাসন কালে যদি মামুদ সরীফ প্রজাদের উপরে অত্যাচার করতে থাকেন, তবে মানসিংহ ধন্য রাজা হন কেমন করে? আসলে এখানে 'রাজা মানসিংহের কালের' অর্থ হচ্ছে, 'যে কালে মানসিংহ আবির্ভূত হয়েছেন সেই কালে', অর্থাৎ যে সময়ে পৃথিবীতে মানসিংহের মতো লোক বিরাজ করছিলেন, সেই সময়ে মামুদ সরীফের মতো দুষ্ট লোকেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। এই কথা বলাই কবির উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পাঠ অনুসারেও মানসিংহের শাসন কাল ও মামুদ সরীফের ক্ষমতা লাভের কালকে সমসাময়িক ধরা আবশ্যিক হয় না।

আত্মকাহিনীর অপর একটি উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মামুদ সরীফের অভ্যুদয় মানসিংহের শাসন কালে ঘটে নি। উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

'উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি।'[২]

১ ম. বা. ত. কা. পৃ. ৮৩৮৪।
২. ক. বি. পু. সং ১০৮৬। প. সং ১ক।

এর অন্য একটি পাঠ পাওয়া যায়—

'রাজা তো হারামজাদা বেপারি না বহে বঝা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেব অরি।'[১]

উজীর যখন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের 'অরি' তখন সে নিশ্চয়ই ছিল একজন হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমান। মানসিংহ হিন্দু ও বৈষ্ণব ছিলেন। যাকে কবি 'বিষ্ণুপদে নবভৃঙ্গ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আমলের ভারত সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর ছিলেন পরম উদার মতাবলম্বী, হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। সুতরাং মানসিংহের শাসন কালে এরকম উজীরের আবির্ভাব কল্পনা করা যায় না। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে 'উজির হইল রায়জাদা'র পরিবর্তে 'রাজা তো হারামজাদা'—পাঠ পাওয়া যায়। এই পাঠ ঠিক হলে তৎকালীন রাজা অর্থাৎ শাসনকর্তা যে 'ধন্যরাজা মানসিংহ' থেকে পৃথক ব্যক্তি তা নিঃসংশয়ে স্বীকার করতে হয়। মোটের উপরে 'রাজা মানসিংহের কালে'র অর্থ রাজা মানসিংহের শাসন কালে কোনো মতেই হতে পারে না। অতএব আমরা এর যে অর্থ করেছি, তাই সুসংগত বলে মনে করি।

এই তিনটি পাঠের পর্যালোচনা করলে মনে হয়, 'গৌড়বঙ্গ উৎকলে' মানসিংহের শাসনকাল শেষ হবার পরেই মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন। তৃতীয় পাঠটি এ সম্পর্কে স্পষ্ট। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠও তার বিরোধী নয়। সুতরাং মুকুন্দরামের দেশত্যাগ কালের উর্ধতম সীমা ১৫৯৬-১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ। আবার পাঠ তিনটিকে যদি পৃথক অর্থেও ধরা হয় তাহলেও ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ওপারে কোনো ভাবেই যেতে পারে না। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের ভূমিকা অংশে দেখিয়েছেন বাংলায় মুকুন্দ বর্ণিত প্রশাসনিক পরিবর্তন ১৫৯৬-এর আগে কার্যকর হয় নি।[২] আবার মুকুন্দরামের কাব্যরচনার অধঃস্তন সীমা নির্ধারণ করা যায় আড়রার নিকটবর্তী জয়পুর গ্রামের 'জয়চণ্ডী'র মন্দিরের শিলালিপি থেকে। এটি ১৫৪৫ শকাব্দে বা ১৬২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এতে 'দ্বিজাবনীশ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণভূমির অধিপতি শ্রীধরের নাম আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্ব ১৬২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই শেষ হয়েছিল। অতএব মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যও ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই রচিত হয়েছিল। কারণ এই কাব্য রচনার সময়ে ব্রাহ্মণ ভূমের রাজা ছিলেন রঘুনাথ রায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৬০৬-২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' লিখিত হয়। মুকুন্দরামের এই সময় পরোক্ষ ভাবেও দুটি দলিলের দ্বারা সমর্থিত হয়।

মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর যে দুটি দানপত্র পাওয়া গিয়েছে, তাদের

১. ক. বি. পুঁ. সং ৩৩১৫। প. সং ৯ক।
২. কবিকঙ্কণ চণ্ডী—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ভূ. পৃ. (XXI) দ্রঃ

প্রথমটির তারিখ ১০৪১ বঙ্গাব্দের পয়লা ফাল্গুন অর্থাৎ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস।[১] অপরটির তারিখ ১০৫৯ বঙ্গাব্দের একুশে ফাল্গুন অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস।[২] এর থেকে বোঝা যায় শিবরাম চক্রবর্তী ১৬৩৫ থেকে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় বর্তমান ছিলেন। এ দিক দিয়েও তাঁর পিতা মুকুন্দরামের গ্রন্থ রচনাকাল ১৬০৬-২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ধরা খুব যুক্তিযুক্ত হয়। অপর দিকে ডঃ সুকুমার সেন সমর্থিত ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সঙ্গে আড়রা গমন করলে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিদান গ্রহণ করার মতো সক্ষম অবস্থায় জীবিত থাকা কবি পুত্র শিবরামের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

কয়েকটি বিষয় অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে মুকুন্দরামের গ্রন্থ রচনাকাল সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। এখন আমরা সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করছি।

প্রথমতঃ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে[৩] এই কাল নির্ধারক শ্লোকটি ছিল—

'শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥'

এই কাব শকাব্দটির অর্থ নিরূপণ করলে পাওয়া যায়—"রস=৬, রস=৬, বেদ=৪, শশাঙ্ক=১" এইভাবে গণিত বর্ষ গণনা করে এর থেকে ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই সালে মুকুন্দরাম চণ্ডার আদেশ পেয়েছিলেন বলে উদ্ধৃত শ্লোকটিতে বোঝাচ্ছে—একথা অনেক গবেষক বলেছেন। কিন্তু শাকে রস' ইত্যাদি চরণটি আসলে দ্বিজ মুকুন্দ কবিচন্দ্রের 'বাশুলামঙ্গলে'র কাল নির্দেশক। এর ব্যাখ্যা এই — শাকে 'রস' ৬, সেই 'রসে' 'বেদ' ৪, তাতে 'শশাঙ্ক গণিত' বা চন্দ্রকলা ১৬। অর্থাৎ ১৬৪৬ শক বা ১৭২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্বিতীয়তঃ রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-গ্রন্থে মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল ১৪৯৫ শকাব্দ বা ১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৪ শকাব্দ বা ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু রঘুনাথের এই তথাকথিত রাজত্বকাল কোনো প্রামাণিক সূত্র থেকে পাওয়া নয়। রামগতি ন্যায়রত্ন এটি পেয়েছিলেন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি আবার পেয়েছিলেন কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে। সুতরাং এর কোনোই মূল্য নেই। কাজেই এর থেকে বলা যায় না যে, রঘুনাথ রায় ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে জীবিত থাকতে পারেন না, অথবা মুকুন্দরাম ঐ সালের পরে দেশত্যাগ ও কাব্য রচনা করতে পারেন না।

তৃতীয়ঃ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কোনো কোনো পুঁথিতে এই ত্রিপদীটি রয়েছে,

---

১. 'ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল'—শ্রীঅক্ষয় কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২. চি প. স. চি. ২য়। পৃ. ৩৪৩।

৩. ১৭৪৫ শকাব্দ বা ১৮২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

'অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে।
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গাইলেন প্রসাদ আদরে॥'[১]

অনেক গবেষক 'অমর সাগর মুনিবরে'-কে কালবাচক বলে মনে করেন। এঁদের মতে অমর=১৪, সাগর=৭, মুনি=৭ অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দরামের 'অষ্টমঙ্গলা' গীত হয়েছিল এ-কথাই ত্রিপদীটির মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু 'অমর' শব্দের আঙ্কিক অর্থ ১৪, একথা কোনো সূত্রেই পাওয়া যায় না। 'অমর সাগর মুনিবরে'র পরে 'শকাব্দ' কথাটিও উল্লিখিত হয় নি। কাজেই, একে কালবাচক শ্লোক ধরবার কোনো সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। আসলে অনেক পুঁথিতে[২] এর পাঠান্তর পাওয়া যায়—'শ্রীঅমর সোমের মন্দিরে'—এটিই সঠিক পাঠ বলে আমরা মনে করি। ত্রিপদীটির মধ্য দিয়ে এই কথাই বলা হয়েছে যে, অমর সোম নামক কোনো ব্যক্তির গৃহে 'অষ্টমঙ্গলা' গাওয়া হয়েছিল।

চতুর্থতঃ মেদিনাপুর জেলার কেশিয়াড়ী গ্রামের সর্বমঙ্গলার মন্দিরে উড়িয়া অক্ষরে একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এটি আবিষ্কার করেন শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ।[৩] শিলালিপিটির কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করছি।

"শ্রীমানসিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নিজ কুলে কুমুদানন্দ শ্রীলরঘুনাথ শর্ম্মা ভূমিপ সুত শ্রীচক্রধর শর্ম্মা প্রকাশিলে সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি। শকাব্দ ১৫২৬ কামিজা বতুপাত্র।"

এখানে মানসিংহের নাম পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যেশ্বর হিসাবে, আর মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথের নাম পাওয়া যাচ্ছে রাজা হিসাবে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এই শিলালিপি অনুযায়ী চক্রধর শর্মাই রাজা। সুতরাং রঘুনাথের মৃত্যু ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেই হয়েছে। কিন্তু পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাধা কোথায়? বিশেষ করে এই সময় রঘুনাথ জীবিত না থাকলে তাঁর নামের আগে 'শ্রীল' যুক্ত হতো না। আর চক্রধরও নিজেকে 'ভূমিপ সুত' বলে পরিচয় না দিয়ে ভূম্যধিকারি বা রাজা বলেই উল্লেখ করতেন। এই রঘুনাথ শর্মাকে অনেকে মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। এঁদের ধারণা সত্যি হলে, মুকুন্দরাম ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পরে দেশত্যাগ করতে পারেন না। কারণ, শিলালিপিটি থেকে দেখা যায়, রঘুনাথ শর্মা ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন। মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন রঘুনাথ রায়ের পিতা বাঁকুড়া রায়ের রাজত্বকালে।

১. ক. ক. চ. পৃ. ২৯৯। ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত।

২. শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', ১৩৪৯ শকাব্দের আষাঢ় মাস অর্থাৎ ১৭২ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত পুঁথি।

৩. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ১ম. সং। পৃ ৪১৬।

কিন্তু নাম ও সময়ের মিল থাকলেও, রঘুনাথ রায় ও রঘুনাথ শর্মা যে অভিন্ন ব্যক্তি তা জোর করে বলা যায় না। তবে এদের উভয়ের নামের প্রায় অভিন্নতা ও চক্রধর এবং রঘুনাথের পরবর্তী রাজা শ্রীধরের নামের সাদৃশ্য থেকে উভয়কে একই ব্যক্তি বলে সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত। তা যদি হয়, তবে মুকুন্দের দেশত্যাগের সময় ধরতে হয় ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে। অতএব মুকুন্দরামের দেশত্যাগ ও কাব্যরচনার সময় সম্পর্কে আমরা পূর্বে যে সিদ্ধান্ত করেছি, এই শিলালিপির সাক্ষ্য তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে না। অর্থাৎ মুকুন্দের গ্রামত্যাগ ও কাব্যরচনা সমাপ্তির সময়সীমা ১৫৯৮-২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সময়সীমার অধিকাংশই যেহেতু সপ্তদশ শতকের মধ্যে পড়ছে, সেই হেতু বর্তমান গ্রন্থে আমরা মুকুন্দরামকে সতেরো শতকের কবি হিসেবেই সর্বত্র উল্লেখ করেছি।

অন্যদিকে ডঃ সুকুমার সেন মুকুন্দরামকে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁর মতে, "মুকুন্দের আড়রা গমনের কাল ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ এবং কাব্যরচনা-সমাপ্তি কাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।"[১] সর্বত্র প্রাপ্ত মানসিংহের প্রসঙ্গটিকে তিনি কোনো গুরুত্বই দিতে চান না॥ তাঁর অবলম্বিত আদর্শ পুঁথিখানি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮৬ সংখ্যক পুঁথি। তাতে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ মূলক পদটিতে রয়েছে, 'রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে', ইত্যাদি। অথচ ভূমিকায় ডঃ সেন বলেছেন, "আমার অবলম্বিত আদর্শ পুঁথিতে পাঠ আছে, 'সে মানসিংহের কালে'। ইহার পরিবর্তে 'রাজা মানসিংহ গেলে' এই পাঠ গ্রহণ করিলে 'গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণ' পদটিকে ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত বলাই যায় না।"[২] তাঁর মতে মুকুন্দ এটি কাব্য সমাপ্তির পরে কোনো এক সময়ে লিখেছিলেন। তার মধ্যেও কবির নিজকৃত সংযোজন সবটা নয়, পদটির গোড়ার দিকে অপরের প্রক্ষেপ থাকা অধিকতর সম্ভব।"[৩] এই কারণেই এতে মানসিংহের প্রশস্তি এসেছে। অর্থাৎ মানসিংহের উল্লেখ পূর্বাপর সম্বন্ধ বিহীন একটি প্রশস্তি বাক্য মাত্র। অথচ ইতিবৃত্তে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, রাজা মানসিংহ বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার হবার পর প্রজার পাপের ফলে এই সব ঘটনা ঘটল। যার ফল হিসেবে কবিকে লুকিয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে হলো, আর পথে চণ্ডী স্বপ্নাদেশ দিয়ে কাব্যরচনা করতে বললেন। ইতিবৃত্তটি কবি গ্রন্থরচনার প্রারম্ভেই লিখুন আর পরেই লিখুন তাতে ঘটনার পারম্পর্যের কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না। এই ইতিবৃত্তের যাথার্থ্যতা অস্বীকার করবার প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

"গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণের বর্ণনা সত্য বলিয়া মানিলে মুকুন্দ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে দেশত্যাগ করিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে কোন ক্রমেই

১. ভূ. পৃ. ৪৫ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ. পৃ. ৪২ দ্রষ্টব্য।
৩. ঐ. ঐ.।

মানসিংহকে পাওয়া তো দূরের কথা, ছোওয়াও যায় না।"[১] মনে হয় যেন কবিকে যতটা সম্ভব প্রাচীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারাটাই গৌরবজনক ব্যাপার। আর এই কারণেই প্রায় সব পুঁথিতে প্রাপ্ত[২] বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার হিসাবে মানসিংহের উল্লেখের কোনো গুরুত্বই তিনি দিতে চান নি। অথচ কবি প্রদত্ত এই বিবরণটি থেকে পরোক্ষভাবেও যে মুকুন্দরামের কাব্য রচনাকালের হদিস মিলতে পারে, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ডঃ ক্ষুদিরাম দাস তাঁর সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-কাব্যের ভূমিকা অংশে।[৩] তাঁর মতে কবি মুকুন্দের গ্রাম ত্যাগ ১৫৯৬ এর শেষের দিকে, সম্ভবতঃ আশ্বিন মাসে[৪] ঘটে থাকবে।

দেশত্যাগ করে সপরিবারে ব্রাহ্মণ ভূমে উপস্থিত হলে, আড়রার রাজা অর্থাৎ জমিদার বাঁকুড়া রায় কবিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ছোটো ছেলে অথবা রঘুনাথ রায়ের শিশু সন্তানদের[৫] শিক্ষকতায় নিযুক্ত করলেন। কবির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে ভাবী জমিদার রঘুনাথ তাঁকে গুরু বলে সম্মান দিতে লাগলেন। এবং বাঁকুড়া রায়ের পরে রঘুনাথ রায় রাজা হলে কবিকে চণ্ডীকাব্য রচনায় উৎসাহিত করলেন। সুতরাং মুকুন্দের দেশত্যাগ কাল ও কাব্যরচনা কালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান অনুমান করা যায়। কাব্যের আভ্যন্তরীণ তথ্য থেকেও এর সমর্থন মেলে। কাব্য রচনায় দীর্ঘসূত্রিতা দেখিয়েছিলেন বলে কবিকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল এরূপ তথ্যের সমর্থন মেলে, "গীত না করিয়া মৈলা ছাল্যা" ইত্যাদি উক্তিতে।

এছাড়া, রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে আত্মকাহিনীর অংশে রয়েছে।

'সঙ্গে ভাই রামানন্দী সে জানে স্বপ্নের সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।'

এর থেকেও জানা যায় যে স্বপ্নাদেশ ও কাব্যরচনা কালের মধ্যে বেশ ব্যবধান ছিল। তাই দেশত্যাগের সময়ের সঙ্গী রামানন্দ ভাই স্বপ্নের কথা জানতেন এবং তাই নিয়ে কবিকে কাব্যারম্ভের জন্য 'অনুদিন' তাগাদা দিতেন।

শুধু তাই নয়, কবিকঙ্কণ তাঁর রচনার প্রথম দিকে স্থাপিত একটি ভণিতায় বলেছেন,

১. ভূ. প ৮০ দ্রষ্টব্য।

২. এই বিবরণ যে যে পুঁথিতে দেওয়া আছে, সেই সেই পুঁথিতেই মানসিংহের বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদারির উল্লেখ রয়েছে। সব পুঁথিতে না থাকার কারণ, কোনো কোনো পালা গায়েন একে অবান্তর মনে করে গাইতেন না বলে পুঁথি নকল করার সময়েই বর্জন করতেন।

৩. ভূ. পৃ. XX-XXi দ্রষ্টব্য।

৪. ভূ. পৃ. XXI দ্রষ্টব্য।

৫. কারণ রঘুনাথ তখন শিশু হলে তাঁর পুত্র চক্রধর, ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না।

'উরহ কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।'[১]

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় কাব্যারম্ভের সময় তাঁর চারটি সন্তানই জন্মগ্রহণ করেছিল। আর সম্ভবত এই মহেশই কবির গ্রাম ত্যাগের সময়ের সেই শিশু সন্তান, যার সম্পর্কে কবি লিখেছেন 'শিশু কাঁদে ওদনের তরে'। অথচ সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "মুকুন্দ যখন দামিন্যা ছাড়িয়া যান তখন হয়ত তাহার পুত্র হইয়াছিল।"[২] আবার কাব্যের শেষের দিকের ভণিতায় অনেকগুলি পুঁথিতেই পাওয়া যায়,

'রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।'[৩]

সুতরাং কাব্যখানি শেষ করার সময় কবি যে প্রৌঢ়ত্বে পৌছে গিয়েছিলেন একথা অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

কবিকঙ্কণের কাব্যরচনা কালে বাঁকুড়া রায়ের দেহাবসানের সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, কবি লিখেছেন—

'দুলাল সিংহের সুতা দনাদেবী পাটমাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত।
তার সুত নৃপরত্ন করিল অনেক যত্ন
বৈরিভঞ্জনা দেব রঘুনাথ॥
আড়রা তরিয়া ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবেন গোপাল কামেশ্বর।
নূতন কবিত্ব রসে নৃপতির অভিলাষে
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥
দুলাল সিংহের সুতা দনাদেবী পাটমাতা
রঘুনাথ তাহার নন্দন।
তার আজ্ঞা পরমান মুকুন্দে করয় গান
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥'[৪]

এখানে রঘুনাথ রায়কে রাজা এবং বাঁকুড়া রায়ের স্ত্রী দনাদেবীকে পাটমাতা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "মা যেখানে পাটরাণী সেখানে ছেলে পাটে-বসা রাজা হইতে পারে না।"[৫] কিন্তু আমাদের মনে হয় কবি সচেতন ভাবে তাঁকে পাটরাণী না বলে 'পাটমাতা' বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ বাঁকুড়া রায় জীবিত

১. ক. বি. পুঁ. সং ২৩১৪। পত্র সংখ্যা ১ম। লিপিকাল ১৬৭৫ শকাব্দ বা ১০৯১ মল্লাব্দ।
২. ভূ. পৃ. ৪৩।
৩. ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'-গ্রন্থে ব্যবহৃত দামিনে পুঁথির শেষ ছত্রের পাঠ।
৪. একাধিক ভালো পুঁথিতে, ধনপতি-উপাখ্যানে-র ভণিতা অংশে এই ছত্রকটি বার বার পাওয়া যায়।
৫ ভূ. পৃ. ৪১।

থাকলে তাঁর স্ত্রীকে পাটরাণী বলেই উল্লেখ করতেন, 'রাজমাতা' বা 'পাটমাতা' বলে নয়। মুকুন্দরামের কাব্যরচনার সময়ে রঘুনাথ রায়ই যে রাজা বা জমিদার ছিলেন এ কথাকে অস্বীকার করা যায় না। কাব্য মধ্যে যত্রতত্র এর সমর্থন মেলে।

'ধন্য রাজা রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
ব্রাহ্মণ ভূপের পুরন্দর।
হইয়া তার সভাষদ বন্দিয়া চণ্ডীর পদ
বিরচিল চণ্ডির কিঙ্কর ॥'[১]

ব্রাহ্মণ ভূমের পুরন্দর, রাজা রঘুনাথ যে এই সময়ে পাটে বসা রাজা তাতে কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে?

এই ধরনের ভণিতা একাধিকবার পাওয়া যায় বিভিন্ন পুঁথিতে। যেমন,

'ব্রাহ্মণ ভূমের নাথ রূপে গুণে অবদাত
গুরু বলি করিল পুজিত।
সঙ্গে ছিল রমানন্দি সে জানে সকল সন্ধি
অনুদিন করিত জতন ॥
নিত্যদিন অনুমোতি রঘুনাথ নরপতি
গাএনেরে দিলেন ভূষণ।
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান
তার সুত রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
শ্রীকবি কঙ্কণ রসগান ॥'[২]

সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই যে রাজা মানসিংহের বাংলায় সুবাদারি চলাকালীন অথবা সুবাদারি থেকে বিদায় নেবার পরে অর্থাৎ ১৫৯৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে কবি দেশত্যাগ করেন। আর কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন এর অনেক পরে। তবে তারও সময়সীমা নির্দিষ্ট ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।

সুতরাং কোনো বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বলা যায় মুকুন্দরাম ১৫৯৬-১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই দেশত্যাগ করেছিলেন, কাব্যরচনায় দেবী চণ্ডীর কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যরচনা সমাপ্ত করেছিলেন, আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি।

---

১. ক. বি. পুঁ. সং ১০৮৬। প. সং ৯৯ক।
২ ঐ. সং ৪৪০০। প সং ১খ।

কাশীরামদাসের দেশ কাল

কাশীরামদাসের আদি নিবাস কোথায় ছিল, তা এখনও অমীমাংসিত। কাশীরাম ও তাঁর অনুজ গদাধর দুজনেই বলেছেন, তাঁদের বাসস্থান ছিল কাটোয়ার নিকটবর্তী ইন্দ্রানী নগরের সন্নিহিত কোনো একটি গ্রামে। উভয়ের কাব্যেই গ্রামটির নাম পাওয়া যায়। তবে, কোনো পুঁথিতে 'সিঙ্গি', কোনো পুঁথিতে 'সিদ্ধি, আবার 'সিংহ'-ও পাওয়া যায় অর্বাচীন দু-একটি পুঁথিতে। কাটোয়ার কাছে 'সিঙ্গি' ও 'সিদ্ধি' এই দুই নামেই দুটি গ্রাম রয়েছে। 'সিঙ্গি' গ্রামের 'কেশে পুকুর' ও 'সিদ্ধি' গ্রামের 'কাশীগড়ে', কাশীরামদাসের দেশ-সম্পর্কিত সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। তবে কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণ থেকে বলা যায়, 'সিদ্ধিই' প্রকৃত পাঠ। অর্থাৎ কাশীরামদাসের দেশ ছিল ভাগীরথীর তীরবর্তী 'সিদ্ধি' গ্রামে।

প্রথমতঃ কাশীরামদাস ও তাঁর অনুজ গদাধরদাস উভয়েই লিখেছেন যে, তাঁদের গ্রাম ছিল ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। 'সিদ্ধি' নামক গ্রামটিই ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল। অপরপক্ষে, 'সিঙ্গি' ভাগীরথীর তীর থেকে দশ-বারো মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

দ্বিতীয়তঃ গদাধরদাস তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল'-কাব্যে লিখেছেন তাঁদের গ্রাম ছিল অগ্রদ্বীপের কাছে।

> 'অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
> নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥'

কিন্তু অগ্রদ্বীপের সঙ্গে 'সিঙ্গি' গ্রামের ব্যবধান অনেকখানি। 'সিঙ্গির' অবস্থান নির্দেশ করতে হোলে অগ্রদ্বীপের নাম না করে কাটোয়ার নাম উল্লেখ করবার কথা। পক্ষান্তরে, অগ্রদ্বীপ থেকে 'সিদ্ধি' গ্রামের দূরত্ব যৎসামান্য।

তৃতীয়তঃ কাশীরামদাস ও গদাধরদাস উভয়েরই রচিত কাব্য থেকে জানা যায়, তাঁদের গ্রাম ছিল 'ইন্দ্রানী' নামক এক বৃহৎ নগরের অংশ। কাশীরামদাসের মহাভারতের অনেক পুঁথিতে এবং মুদ্রিত পুস্তকেও ইন্দ্রাণী নগরের এই বর্ণনা পাওয়া যায়,

> "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
> দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগিরথী ॥"[১]

ইন্দ্রাণী নগর কোথায় ছিল সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। প্রচলিত মত এই যে, ইন্দ্রাণী নগরে তেরটি হাট ছিল এবং তার মধ্যে অন্যতম দাঁই-হাট। কিন্তু, এই মত কিংবদন্তীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই কিংবদন্তী যে প্রামাণিক তা বলার কোনো হেতু নেই। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন আমলের সেই ইন্দ্রাণী নগর ও বর্তমান দাঁইহাট সহর অভিন্ন। ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে, 'ইন্দ্রাণী' থেকে 'দাঁই' হয়েছে।[২] এবং তার সঙ্গে পরে 'হাট' শব্দ যুক্ত হয়েছে।

---

১. বি. ভা. পুঁ. সং ৯২০। আদিপর্ব। প. সং ১৬১খ।

২. ইন্দ্রাণী—ইদাঁই—দাঁই।

এ-সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, "ভাগীরথীর পুরাতন প্রবাহ পথের কিনারে বা তটে অবস্থিত সেকালের ইন্দ্রাণী নগরের ধ্বংসস্তূপের উপর বর্তমানের 'দাঁইহাট' নামক বিশাল গণ্ডগ্রামটি নানা পল্লীতে বিভক্ত ছিল। তার সংলগ্ন এবং মধ্যেই 'সিদ্ধিবেড়া' পল্লীটি আজও বর্তমান। সিদ্ধিবেড়ার গ্রামদেবী 'সিদ্ধেশ্বরী কালী' এবং ইন্দ্রাণী নগরের 'ইন্দ্রেশ্বর' শিবঠাকুর ভাগীরথী তীর ছেড়ে এখনও একই সিদ্ধিবেড়ার দেহারায় সহাবস্থান করে পূজো লাভ করছেন।......কাশীরাম-গদাধরের পৈতৃক নিবাস ছিল, ইন্দ্রাণী দেশের বা বর্তমান দাঁইহাট নগরের অন্তঃপাতী এই সিদ্ধিগ্রামে।"[১] একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অর্বাচীন পুঁথিতে 'সিদ্ধি' নামের পাঠান্তর 'সিঙ্গি' পাওয়া যায়। কোথাও আবার 'সিংহ' নামও পাওয়া যায়।

'ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিংহ গ্রামে।'[২]

আমাদের মনে হয়, 'দাঁইহাট'-নগরের নামটি প্রচলিত হবার পরে তার খ্যাতি 'সিদ্ধি' পল্লীর নামটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কালক্রমে 'সিদ্ধি'-গ্রাম যখন জন-বিরল অরণ্যাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন অবাচীন পুঁথির কোনো কোনো লিপিকর অদূরবর্তী স্বতন্ত্র 'সিঙ্গি' গ্রামের নামটিকে আশ্রয় করেন এবং 'সিদ্ধি'র অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে 'সিঙ্গি'কেই কাশীরামদাসের বাসভূমি বলে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। উপরন্তু, পুঁথির পাঠে 'ঙ্গ' এবং 'দ্ধ' অক্ষরের পার্থক্য খুবই সামান্য এবং দূরাঞ্চলের লেখকের পক্ষে এই পার্থক্য নির্ধারণও কতক পরিমাণে অসম্ভব। এই কারণেই পুরোণো পুঁথিতে 'সিদ্ধি' পাঠ পাওয়া গেলেও, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুঁথিতে 'সিঙ্গি' এবং একেবারে অর্বাচীন-পুঁথিতে 'সিঙ্গি'-র সাধুরূপ 'সিংহ'-ও করতে দেখা যায়।

সুতরাং, বর্তমান দাঁইহাট অঞ্চলে 'সিদ্ধিবেড়া' নামে যে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলটি রয়েছে, সেটিই প্রাচীন 'সিদ্ধিবেড়া' বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। এখানেই কাশীরামদাসের পুরুষ পরম্পরায় বাস।

সিদ্ধি গ্রামে কাশীরামদাসের পৈতৃক বাসভূমি হলেও কাশীরামদাস সেখানে কোনো-দিন বাস করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, গদাধরদাস তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল'-কাব্যে বলেছেন, তাঁর পিতা কমলাকান্ত উড়িষ্যায় চলে যান এবং সেখানেই তাঁর তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং, কাশীরামদাসের জন্ম উড়িষ্যাতেই হয়েছিল। গদাধরদাস বরাবর উড়িষ্যাতেই ছিলেন এবং তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন কটকের নিকটবর্তী মাখনপুর গ্রামে বসে। কিন্তু, এই কাব্যখানির আদৌ প্রচার হয় নি।

পক্ষান্তরে কাশীরামদাসের 'মহাভারত' সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। বাংলার বাইরে এই 'মহাভারত' রচনা করলে, তা এতো জনপ্রিয় হতো বলে মনে হয় না। এই কারণে মনে হয়, কাশীরামদাস বাংলাতে ফিরে এসেছিলেন এবং এখান থেকেই তাঁর খ্যাতি পরিব্যপ্ত হয়, 'মহাভারত' রচনার ফলে।

বাংলায় ফিরে কাশীরামদাস কোথায় বাস করেছিলেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা এখনই সম্ভব নয়। তবে, কাশীরামের 'মহাভারতে' বারবার 'হরিহরপুর' নামে একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে 'পুরুষোত্তম মুখটী' নামে এক ব্যক্তি ও তাঁর পুত্র 'অভিরাম মুখটী'র নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কাশীরামদাস।

'হরিহর পুরবাসী সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম সুত মুখুটী অভিরাম॥
কাশীরাম বিচরিল তার আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহু মোর ব্রাহ্মণের পদে॥'[১]

এই 'হরিহরপুর' যে বাংলায় অবস্থিত, 'মুখটী'-পদবী থেকেই তা বোঝা যায়। সুতরাং, বাংলায় ফিরে 'হরিহরপুরে' বসতি স্থাপন করেছিলেন কাশীরামদাস এবং অভিরাম মুখটী ছিলেন তাঁর উৎসাহদাতা। রাঢ়ে 'হরিহরপুর' নামে একাধিক গ্রাম বর্তমান। এদের মধ্যে কোনটিতে কাশীরামদাস বসতি স্থাপন করেছিলেন, উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোনো স্থির-সিদ্ধান্ত করা যায় না।

কাশীরামদাসের মহাভারত রচনার কাল সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করার দুটি সূত্র পাওয়া যায়। প্রথম সূত্র কাশীরামদাসের রচিত মহাভারতের পর্বগুলিতে উল্লিখিত রচনাকাল-নির্দেশক শ্লোকগুলি এবং দ্বিতীয়টি হলো তাঁর অনুজ গদাধরদাসের 'জগন্নাথমঙ্গল'-কাব্য। 'জগন্নাথমঙ্গলে'র রচনাকাল গদাধরদাস এইভাবে নির্দেশ করেছেন,

"চতুঃষষ্টি শকাব্দ সহস্র পঞ্চশত।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত॥
রাজচক্রবর্ত্তী শাহজঁহা দিল্লিপতি।
ধর্ম্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ।
সমান প্রতাপী হয় বৈরি জয় যশ॥"

অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে এবং ১৫৬৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্গল' সম্পূর্ণ হয়।

এরপরে, গদাধরদাস তাঁর মধ্যম অগ্রজ কাশীরামদাসের 'মহাভারত' রচনারও উল্লেখ করেছেন।

'দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত-পুরাণ॥'

---

১. বি. ভা. পুঁ. সং ৫১১। বনপর্ব। প. সং ২৯খ-৪০ক।

এর থেকে জানা যায় যে, ১৫৬৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কাশীরামদাস 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন।

কাশীরামদাসের 'মহাভারতে'র বিরাট্ পর্বের একটি পুঁথিতে এই রচনাকালবাচক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

'চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥'[১]

এর থেকে ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এটিই যে 'বিরাট' পর্বের প্রকৃত রচনা কাল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাশীদাসী 'মহাভারতে'র আদিপর্বের একটি পুঁথির শেষে এই রচনাকালবাচক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

'শকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিনগুণে।
রুক্মিনীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥'

এই শ্লোকটির মধ্যে যে উৎকট হেঁয়ালী আছে তা গবেষকগণকে বিব্রত করেছে। শ্লোকটির প্রথম ছত্রে 'শকাব্দা' এবং দ্বিতীয় ছত্রে 'সন' উল্লিখিত হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু শ্লোকটিতে মারাত্মক লিপিকর প্রমাদ থাকার জন্যে, এর থেকে আপাততঃ কোনো রচনাকাল-নির্ধারণ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি না।

কাশীরামদাসের রচিত 'মহাভারতে'র অন্যান্য পর্বের রচনাকাল এখনও সঠিক ভাবে নির্ণিত না হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর 'বিরাট' পর্বের রচনাকাল ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তিনি যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মহাভারত' সম্পূর্ণ করতে না পারায়, তিনি যে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরলোক গমন করেন, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

১ সা. প. প. ১৯। পৃ. ১২৬।

রূপরামের কাব্য রচনাকাল

রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের রচনাকাল বাচক শ্লোকের অনেকগুলি পাঠ এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি পাঠ একত্র করে মেলালে শ্লোকটির একটি আদর্শ পাঠ তৈরী করা যায়। সেটি এই—

'শাকে সীমে জড় হইলে যত সন হয়।
তিন বান চারি যুগ বেদে যত রয়॥
রসের উপরে রস তায় রস দেহ।
এই শকে গীত হইল লেখ্যা করা্যা নেহ॥'[১]

লক্ষ করতে হবে যে, এই শ্লোকটির মধ্যে 'শক' ও 'সন' এই দুটি শব্দই উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং রূপরাম 'শক' ও 'সন' দুয়েরই সাল, শ্লোকটির মধ্যে দিয়ে জানিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ থেকে তিন বাণ—৩ × ৫ বা ১৫, চারি যুগ—৪ × ২ বা ৮ এবং বেদ = ৪ অর্থাৎ আমরা ১৫৮৪ পাই। তৃতীয় চরণে আছে 'রসের উপরে রস তায় রস'। 'রস' শব্দের আঙ্কিক অর্থ ৬, আবার অলঙ্কার-শাস্ত্র মতে রসের সংখ্যা ৯। বাৎসল্য রসকে 'রস' ধরলে রসের সংখ্যা হয় ১০। আমাদের মনে হয় কবি, 'রসের উপরে রস তায় রস'—বলতে বোঝাচ্ছেন পূর্বোক্ত তিনটি সংখ্যাকে প্রয়োজন-অনুযায়ী একত্র করতে হবে; দশও রস, ছয়ও রস, নয়ও রস। দশের পরে ছয়, তারপরে নয় দিলে ১০৬৯ হয়। আলোচ্য শ্লোকের দ্বিতীয় ছত্র থেকে পাওয়া ১৫৮৪ কে শকাব্দ বাচক ধরলে, তার থেকে ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। আমাদের হিসাব অনুযায়ী তৃতীয় চরণ থেকে পাওয়া ১০৬৯-কে 'সন'-বাচক ধরলে তার থেকেও ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দই পাওয়া যায়। এই বছরই রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য রচিত হয়েছিল বলে আমাদের মনে হয়। কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গণনা করেও ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দকেই রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের রচনাকাল বলে নির্দিষ্ট করেছেন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, রামদাস আদক রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'কে প্রায় সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিজের নামে তাকে চালিয়েছেন, এবং তাঁর কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন ১৫৮৪ শকাব্দ, অবশ্য ভিন্ন ভাষায়। রূপরামের রচনাকালটিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। এদিক দিয়েও ১৫৮৪ শকাব্দ, বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দকেই রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের রচনাকাল হিসাবে ধরা সমর্থিত হয়।

---

১. 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল'। ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।